স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বিগত চৈত্র-সংখ্যা, ১৩৭৬, 'উদ্বোধনে' স্বামীজীর অনুবাদ-গ্রন্থ 'শিক্ষা' প্রসঙ্গে লিখেছিলাম যে, জাতীয় গ্রন্থাগারে এ বইয়ের ১৯১৭ সালের একটি সংস্করণ দেখেছি। সম্প্রতি শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীমতী বাণী বসু সঙ্কলিত অতি মূল্যবান পুস্তিকা "বিবেকানন্দ গ্রন্থপঞ্জী"-তে (বাক্‌-সাহিত্য প্রকাশিত) আরো আগের একটি সংস্করণের উল্লেখ পেয়েছি। বইটি গ্রন্থপঞ্জীতে এইভাবে তালিকা-ভুক্ত—শিক্ষা: শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯১৫, ০.২৫। অবশ্য বইয়ের মূললেখক হিসাবে স্বামীজীরই নাম আছে।

১৯১৫ সালের এ বইটি জাতীয় গ্রন্থাগারে পাইনি। কিন্তু উক্ত গ্রন্থপঞ্জীতে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত যে বইটির কথা আছে, সেটিকে বলা হয়েছে ২য় সংস্করণ, ১৯১৭, ১৪ পৃষ্ঠা (এটি স্পষ্টত: মুদ্রণ-বিভ্রাট, বইটি আসলে ৬৪ পৃষ্ঠা) এর দাম ০.৫০। জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৯১৭ সালের বইটির প্রচ্ছদে লেখা আছে—শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত: বসুমতী ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বাস্তবিক, এই সংস্করণটির ছাপা অতি সুন্দর।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, উক্ত গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্কলয়িতাদ্বয় ১৯১৭ সালের বইটিকে দ্বিতীয় সংস্করণ বলছেন কেন? জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বইটিতে কোথাও একথা নেই। ১৯১৫ সালের বইটি যদি তাঁরা দেখে থাকেন, তাহলে সেটিই যে প্রথম সংস্করণ এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত হলেন কেমন করে? বরং, নানা কারণে এ কথাই মনে হয় যে, বইটি স্বামীজীর জীবৎ-কালে (এমন কি খুব সম্ভব তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের আগে) ছাপা হয়। কিন্তু সে যাই হোক, ১৯১৫ এবং ১৯১৭—এ দুই সংস্করণেরই মুদ্রাকর পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আর বইটি যে খুবই জনপ্রিয় তার প্রমাণ এত অল্প সময়ের মধ্যে দুটি সংস্করণ এবং ১৯১৭-র সংস্করণটিতে দ্বিগুণ মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও পরবর্তীকালে সমান প্রচার।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের যে সংস্করণটি আমরা পেয়েছি তার প্রচ্ছদে লেখা—শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ১৬৬ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রাকরের নাম আখ্যাপত্রের (title page-এর) দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—শ্রীশশিভূষণ দত্ত, এই পৃষ্ঠায়ই দামের উল্লেখ—বারো আনা।

বইটি 'শিক্ষা'-সম্বন্ধে স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলে ধরে নিয়েই প্রকাশক ও পাঠকেরা এতদিন নিশ্চিত ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা নিয়ে যাঁরা এতাবৎকাল আলোচনা করেছেন, তাঁরা কেউই এই বইটির উল্লেখও করেননি। অপরপক্ষে অনুবাদ হলেও বিশ্বসাহিত্যে শিক্ষাচিন্তার একটি অমর গ্রন্থের অনুবাদরূপে এবং স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার বিবর্তনে এ গ্রন্থের বিশিষ্ট ভূমিকার দিক থেকে আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থটি আমাদের অপরিসীম ঔৎসুক্যের কারণ।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের নাম—Education: Intellectual, Moral and

Physical. বসুমতী-প্রকাশিত 'শিক্ষা' গ্রন্থটির[১] সূচনায় একটু পার্থক্য লক্ষণীয়—শিক্ষা : শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। স্পেন্সার যেখানে শারীরিক শিক্ষাকে শেষে স্থান দিয়েছেন, এ অনুবাদ-গ্রন্থের নামে সেখানে 'শারীরিক' শব্দটি আগে স্থান পেয়েছে। কিন্তু অধ্যায়-বিভাগে মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক পর্যায়টি ঠিকই বজায় আছে।

বসুমতী-সংস্করণে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক-এই পর্যায়ে 'শিক্ষা'কে দেখবার প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার নিগূঢ় মিল লক্ষণীয়। স্পেন্সার শারীর চর্চাকে বিশেষ মূল্যবান মনে করলেও তাঁর গ্রন্থে সর্বশেষে আলোচনা করেছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি চরম ঔদাসীন্যই দেখিয়েছেন। অপর পক্ষে স্বামীজীর চিন্তাধারায় জ্ঞানলাভের যন্ত্ররূপ এই দেহের সুস্থতা ও সবলতার কথা সর্বাগ্রে চিন্তনীয়। আপন স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী যথেষ্ট সচেতন হ'লেও স্বল্পজীবনসীমায় বিপুল কর্মভার তাঁর অকাল প্রয়াণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নিজের এবং অনুগামী গুরুভাই ও শিষ্যবৃন্দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজকে যাঁরা জীবন-সায়াহ্নেও শারীরচর্চার প্রচেষ্টারত অবস্থায় দেখেছেন, তাঁরাই এ বিষয়ে স্বামীজীর আদর্শের কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত: স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবনের একটি অপূর্ব স্বপ্নকথা উল্লেখযোগ্য। "একদিন ভোর রাত্রে অখণ্ডানন্দ স্বপ্নে দেখিলেন, স্বামীজী বহরমপুরের রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের ভাষায় : দেখলুম, স্বামীজীর প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ মুসলমান ফকীরের দেহ—কোমরে লোহার শিকল, পরনে আলখাল্লা, হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা, তার মাথায় একটা লোহার বল, সেই বলটা থেকে ছোট ছোট শিকল ঝুলছে। সেইটি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন। সঙ্গে চারজন শিষ্য। জিজ্ঞেস করলাম, এ রকম বেশ কেন? বললেন, 'এরকম শরীর নইলে কাজ ক'রব কি ক'রে? তোদের বাংলার ভেতুড়ে শরীর সামান্য কঠোরতায় ভেঙে পড়ে। জানলি?—আমি বসে নেই, আমি এদের মধ্যে ঠাকুরের উদার ভাব ছড়াচ্ছি। তাই এদের ফকীর সেজে এদের সঙ্গে মিশি।' জিজ্ঞেস করলুম—ওরা কারা? এক এক ক'রে চারজনকে দেখাতে দেখাতে বললেন, 'ইরান, তুরান, খোরাসান, আফগান।' 'ওদের দিয়ে তোমার কি হবে?' উত্তরে বললেন, 'এই রকম শরীরে বেদান্ত পড়লে তবে ধারণা করতে পারবে।' আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'এখন তুমি কি করতে চাও?' বললেন, 'যাতে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এদের মিল হয়, তাই দেখতে চাই। বেদ, মহাভারত পড়ে ছাখ্, এরা তোদেরই জাতভাই।'..." (স্বামী অখণ্ডানন্দ : স্বামী অন্নদানন্দ : পৃ ১৮৫)

প্রিয়তম এই গুরুভ্রাতার অন্তরে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের ধ্যানধারণা কতো গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, ওই দিব্যস্বপ্নে তারই প্রমাণ।

* * *

'শিক্ষা'-র শারীরিক আদর্শের আলোচনা আপাততঃ শেষ করে আমরা এই অনুবাদ-

---

১ জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৯১৭ সালের সংস্করণ লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত শশিভূষণ দত্ত সংস্করণে সূচনায় শুধু 'শিক্ষা' আছে। 'শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক'—কথাগুলি বর্জিত।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় ফিরে আসি। What Knowledge is of Most Worth? (সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?)—শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে স্পেন্সার তাঁর সমসাময়িক শিক্ষাচিন্তার পটভূমিতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অনুসন্ধানী।

সাধারণভাবে মানুষ যে বসনের চেয়ে ভূষণের প্রতিই বেশী যত্নশীল সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে সে-যুগের বিদ্যালয়গুলিতে যে ব্যবহারিক বিদ্যার চেয়ে আলঙ্কারিক বিদ্যার প্রতিই বেশী জোর দেওয়া হ'ত, সে কথা স্পেন্সার তাঁর গ্রন্থের গোড়াতেই বলেছেন। সে-যুগে ইংল্যাণ্ডের বিদ্যালয়গুলিতে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যচর্চার (বিশেষত: লাটিন ও গ্রীক) প্রাধান্যই বেশী ছিল। অথচ পরবর্তী জীবনে খুব কম ছাত্রই তাদের ব্যবহারিক জীবনে ওই অধীত বিদ্যার দ্বারা উপকৃত হ'ত। সে-কথা মনে রেখে স্পেন্সারের মন্তব্য—"It is not the savage chief only, who in formidable warpaint, with scalps at his belt, aims to strike awe into his inferiors; it is not only the belle, who, by elaborate toilet, polished manners and numerous accomplishments, strives to 'make conquests', but the scholar, the historian, the philosopher use their acquirements to the same end. We are none of us content with quietly unfolding our own individualities to the full in all directions; but bave a restless craving to impress our individualities on others, and in some way to subordinate them. And this it is which determines the character of our education. Not what knowledge is of most worth, is the consideration; but what will bring most applause, honour, respect—what will be most imposing. As throughout life, not what we are, but what we shall be thought, is the question; so in education, the question is, not the intrinsic value of knowledge, so much as its intrinsic effect on others."[২]

স্বামীজীর অনুবাদ—"কেবল যে অসভ্য দলপতি ভীষণ যুদ্ধ-চিত্রণে সর্বাঙ্গ চিত্রিত করিয়া কটিদেশে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহন করিয়া নিম্নস্থ লোকদিগের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চারের চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে; কেবল যে রূপগর্বিতা সুন্দরী ভূষার পারিপাট্য, সামাজিকতার নৈপুণ্য এবং অসংখ্য শোভন গুণের দ্বারা মনোদুর্গ অধিকারের চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা নহে;—কিন্তু পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক সকলেই আপনাপন গুণসমূহকে একই দিকে নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা সকলেই আপনাপন ব্যক্তিগত ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত নহি, অবিশ্রান্তভাবে অপর সকলের মনকে আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করি। এই ইচ্ছাই কোন ব্যক্তি কোন বিষয় শিখিবে, তাহা নির্দেশ করে। এই জন্যই আমরা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা, সম্মান এবং ভক্তি আনয়ন করে, যাহা অধিকতর লোককে বশীভূত করে, তাহাই শিক্ষা করি। যে প্রকার আমরা প্রকৃতপক্ষে কি প্রকার স্বভাবের লোক, তাহা না ভাবিয়া, লোকে আমাদিগকে কিরূপ ভাবে তাহাই অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেই প্রকার শিক্ষাকার্যেও জ্ঞানের আত্মগত গরিমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া পরপরাভব-শক্তিরই সমাদর করি।"[৩]

---

২ Education : Spencer . p 4-5 [1st, Edn.]

৩ শিক্ষা : অনুবাদ : স্বামী বিবেকানন্দ : পৃ: ৫-৬ [শশিভূষণদত্ত মুদ্রিত সংস্করণ]।

অধিকাংশ বিদ্যাভিমানীদের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে স্পেন্সার যে নৈপুণ্যের পরিচয় উপরি-উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টিতে দিয়েছেন, তা স্বদেশ ও বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাধারণ মনোভাব বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি করা যায়। বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য যে আত্মবিকাশ (স্পেন্সারের ভাষায় - unfolding our own individualities), তাকেই স্বামীজী বৈদান্তিক দৃষ্টিতে আরো গভীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।" সেই সঙ্গে "ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।"[৪] সুতরাং শিক্ষা ও ধর্মের পরম উদ্দেশ্য মূলতঃ এক। এই আত্মবিকাশের সাধনা কখনো বহিরঙ্গ প্রতিযোগিতার দ্বারা সাধ্য নয়। স্পেন্সার এত উচ্চ আধ্যাত্মিক দিক থেকে না দেখলেও শিক্ষাব্রতীর মূল আদর্শটি ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন।

ভারতীয় শিক্ষাচিন্তার বিবর্তনে উপনিষদের বিভাগ দুটি স্মরণীয়—'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ' (মুণ্ডক উপনিষদ্)—'পরা ও অপরা'—এই দুই বিদ্যাই মানবজীবনে আবশ্যিক। 'জ্ঞানার্জন'[৫] নিবন্ধে স্বামীজী এই দুই বিদ্যার প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছেন। বাস্তব জীবন ও পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে মহত্তম আধ্যাত্মিক সত্য অবধি প্রসারিত শিক্ষাচিন্তায় স্বামীজীর যে পূর্ণতা, স্পেন্সারের চিন্তাধারায় আমরা সে পূর্ণতা না পেলেও একটি সামগ্রিক জীবনবোধের ভূমিকা পাই। 'শিক্ষা'র এই সর্বাঙ্গীণ আদর্শকে স্বামীজী পরিণত মননের দ্বারা আরো প্রসারিত এবং গভীর করেছেন।

স্পেন্সারের দৃষ্টিতে—'How to live?—that is the essential question for us. Not how to live in the mere material sense only, but in the widest sense. The general problem which comprehends every special problem is—the right ruling of conduct in all directions under all circumstances. In what way to treat the body, in what way to treat the mind, in what way to manage our affairs, in what way to bring up a family; in what way to behave as a citizen; in what way to utilize those sources of happiness which nature supplies—how to use all our faculties to the greatest advantage of ourselves and others—how to live completely? And this being the great thing needful for us to learn, is by consequence, the great thing which education has to teach. To prepare us for complete living is the function which education has to discharge; and the only rational mode of judging of an educational course is to judge in what degree it discharges such function.'[৬]

"কি প্রকারে জীবন অতিবাহিত করা উচিত? ইহাই সকল প্রশ্নের সার। শুদ্ধ ইহার দ্বারা শরীর-ধারণের উপায় উক্ত হইতেছে না, শারীরিক এবং মানসিক সকল সম্বন্ধ ইহার অন্তর্নিহিত আছে। কি উপায়ে সকল অবস্থাতেই অবিচলিত হইয়া আমাদের ব্যবহারে সত্যতা এবং সাম্যরক্ষা করিব?

৪ স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য 'কিডি' বা সিঙ্গারভেলু মুদালিয়রকে লেখা ৩রা মার্চ, ১৮৯৫ সালের চিঠি। বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪০০।

৫ জ্ঞানার্জন : ভাববার কথা : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৩৮-৪১।

৬ Education : Spencer : p 8

জগতের অন্য সকল প্রশ্ন এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত। কি প্রকারে শরীররক্ষা হইবে? মনের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? কি প্রকারে সাংসারিক কার্য সুসম্পন্ন হইবে? কি প্রকারে সন্তানদিগকে লালন করা ও শিক্ষা দেওয়া উচিত? সমাজের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? কিরূপে প্রাকৃতিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যব্যবহারোপযোগী হইবে? মানসিক ব্যবহারসমূহকে কি প্রকারে ব্যবহার করিলে আপনার এবং পরের মঙ্গল সাধিত হইবে? ইহাই জীবনের সর্বোচ্চ শিক্ষা, ইহাই প্রকৃত শিক্ষা! সম্পূর্ণ জীবনের একটি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য; অতএব যে শিক্ষাপ্রণালী যত পরিমাণে সেই দিকে অগ্রসর হইবে, তাহা তত পরিমাণে উৎকৃষ্ট।"[৭]

এ ক্ষেত্রে "সর্বোচ্চ শিক্ষা" বলতে স্পেন্সার যা বুঝিয়েছেন, ভারতীয় শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে তার পার্থক্য স্পষ্ট। শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলতে ভারতবাসীর কাছে পরাবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—"মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ।" উদ্দেশ্য অনুসারেই বিভিন্ন দেশে শিক্ষাদর্শের পার্থক্য ঘটে।

(ক্রমশঃ)

৭ শিক্ষা পৃঃ ৮-৯।

বহুরূপে

শ্রীঅপূর্বকুমার বসু

অত্যাচারীর শাসনে ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকারে
তুমিই মূর্ত প্রতিবাদ জানি, কৃষ্ণের অবতারে।
দুঃশাসনের রক্তে ভিজেছে কঠিন পৃথ্বীতল,
গীতার বাণীতে জড়তা ঘুচায়ে এনে দিলে মনোবল।
হিংসামুখর পৃথিবীর বুকে তুমি, তুমি তথাগত,—
তোমার প্রেমের করুণাধারায় হিংসা সে অবনত।
দুষ্ট 'মারের' অশুভ বুদ্ধি মেনেছিল পরাজয়,
মানুষের রূপে ভগবান তুমি, নেই কোন সংশয়।
মানুষ যখন আত্মকলহে নিজেই নিজেতে মগ্ন,
তখনি তোমার পৃথিবীর বুকে এসেছে জনম-লগ্ন।
তাই বুঝি তুমি পৃথিবীর বুকে আসিয়া নতুন করে
শ্রীচৈতন্য, প্রেমের জোয়ারে দিয়েছিলে সব ভরে!
মানুষের ডাকে পৃথিবীর বুকে এসেছিলে বার বার,
কঠিন-কঠোর, কখনো বা হয়ে করুণার অবতার।
এবার এসেছো সারা জগতের মানুষের তরে, তাই
সমন্বয়ের কল্যাণরূপ তোমার মাঝারে পাই।

শিবজ্ঞানে জীবসেবা

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্বেতাঙ্গ দার্শনিকের কথা--দর্শনের ইতি আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ। স্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তি, 'বিদেশে একটু হৈ চৈ হ'লে ভারতে তার প্রবল প্রতিধ্বনি হয়।' সুতরাং পরানুকরণপ্রিয়, আত্মপ্রত্যয়হীন, পরনির্ভরশীল ভারতবাসীর নিকট শ্বেতাঙ্গ পীতাঙ্গ শ্যামাঙ্গ যে-কোনও পরদেশবাসীর উক্তি অসীম মূল্যবান. প্রমাণ-প্রয়োগের কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এই উক্তিটিও তাহাদের নিকট অভ্রান্ত সত্য।

আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ অজ্ঞাত হইতে পারে, কিন্তু ইঙ্গিত ও অস্তিত্ব সর্ববাদিসম্মত। হিন্দুর বেদান্ত আধ্যাত্মিকতার মিলনভূমি- জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গম। তপোবনের সাধনার চরম উৎকর্ষ এই বেদান্ত। প্রাচীন ঋষিগণ শাশ্বত সত্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত এক অতীন্দ্রিয় ভূমিতে তাঁহাদের শুদ্ধ চিত্তে যে 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই বেদান্ত বা উপনিষদ্। অদ্যাবধি মানুষ এই জ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই, কখনও পারিবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পূর্ণ একত্বের বেশি অগ্রসর হইতে পারে না।

বেদান্ত ভারতের নিজস্ব সম্পদ। স্বামীজী বলিয়াছেন, 'ভারতে বেদান্ত আছে, কিন্তু কার্যে প্রয়োগ করিবার শক্তি নাই।' ভারতে যেমন আদর্শ প্রেমের সাহিত্য আছে, কিন্তু বাস্তবে রূপায়ণ নাই। যেমন ভারতে সকল মহাপুরুষই বেদান্তোক্ত আদর্শ—'সর্বভূতে ভগবান', 'সব কিছুই এক ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ', 'সব কিছু সেই এক অনির্বচনীয়, অব্যক্ত সত্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি,' শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'তিনিই সব হয়ে আছেন'— শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মৈত্রী, আত্মীয়তাবোধ নাই—আছে মহাভেদজ্ঞান, ঘৃণা ও স্বার্থবুদ্ধি। মানুষে মানুষে মহা ব্যবধান। বর্জন, সংকীর্ণতা ও অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। অস্পৃশ্যতা, স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আজ সমাজের মজ্জাগত। ঘরে ঘরে মুখে মুখে পৌরুষের আস্ফালন, ত্যাগের উচ্চ নিনাদ এবং নীতিবাক্যের সমারোহ; কিন্তু জীবনে—নিষ্ক্রিয়তা, কর্মবিমুখতা ও ভীরুতা; যেন সোনার পাতে মোড়া পাথরের মূর্তি। ইহা আসক্তি, ত্যাগ নয়।

দুর্বলের তিতিক্ষা কাপুরুষতা। উপায়হীনের ত্যাগ ত্যাগ নয়, স্বার্থপরতা। আকণ্ঠ ভোগে নিমজ্জিত ব্যক্তির ত্যাগের বুলি—ঘোর আসক্তি, ত্যাগ নয়। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ত্যাগই ধর্ম। 'পথিক যদি গন্তব্য ভুলে পথকেই ভালবাসে, সমাজ যদি মানুষকে ভুলে অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরে থাকে', তবে পরিণাম—অনিবার্য ধ্বংস।

যে দেশে মৈত্রেয়ীর মুখে ধ্বনিত হইয়াছিল, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।' যে দেশে কিশোর ব্রাহ্মণকুমার নচিকেতা মৃত্যুদেবতার সম্মুখে অবিকম্পিত চিত্তে, দৃঢ়সঙ্কল্পে অমৃতের সন্ধান চাহিয়াছিলেন, সেই দেশে অন্তরে ভোগলিপ্সা, মুখে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বুলি।

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'—ইহার সহিত ত্যাগের বাণী মিলিত করিতে হইবে। সব কিছুই জুড়িয়া আছেন ঈশ্বর; সব কিছুর ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত মিলনই মুক্তিলাভের একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈষম্যই বন্ধনের কারণ, মিলনেই শান্তি, প্রেম ও মুক্তি—অবিরাম গতাগতির হাত হইতে উদ্ধার। পন্থা—'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—আসক্তি দ্বারা নয়, ত্যাগের পথে ভোগ। ত্যাগই নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগই বাধাহীন মিলনের পথ। রবীন্দ্রনাথ ত্যাগকেই নিখিলের সঙ্গে, ভূমার সঙ্গে মিলন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু নিজের স্বার্থ বৃহত্তর স্বার্থ নয়, সুতরাং ধর্ম নয়। ধর্ম যদি চিত্তশুদ্ধির উপায় হয় এবং একমাত্র শুদ্ধ চিত্তেই সত্য প্রতিভাত হয়, তবে স্বার্থের লেশমাত্র থাকিলে সত্যলাভ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং চাই বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যাগ এবং ত্যাগের দ্বারা নিখিলের সঙ্গে যোগ, তবেই ভূমার সহিত মিলন ঘটা সম্ভব, আপনাকে বিশ্বের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া সম্ভব। এভাবে সর্বভূতে আত্মীয়তা ঘটিবে। আত্মপর-ভেদজ্ঞান কমিয়া ক্রমে দূরীভূত হইবে।

বেদান্তের বাণী অমৃতের বাণী, অভয়ের বাণী। কাপুরুষতা, দুর্বলতা ও স্বার্থপরতার স্থান ইহার মধ্যে নাই। ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা কখনও অমৃতের পুত্রগণকে আশ্রয় করিতে পারে না। তাঁহারা অভী। অমৃতের ভয় কোথায়? তাঁহারা অনন্ত প্রেমের অধিকারী, সুতরাং তাঁহারা বিশালহৃদয়; সেখানে সর্বভূতে আত্মীয়তাবোধ, অবিনাশী অফুরন্ত আনন্দ। নিরানন্দ সেখানে স্থান পায় না।

মানুষ দুঃখ পায় স্বার্থহানি ঘটিলে। যেখানে স্বার্থ সেখানেই দুঃখ। যেখানে সুখ আছে সেখানে দুঃখও থাকিবে। কারণ সুখ দুঃখ একই অবস্থার দুই দিক। যেখানে সুখ নাই সেখানে দুঃখও নাই। অমৃতের পুত্রগণ সুখ-দুঃখের অতীত—চিদানন্দের অধিকারী।

মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে তবেই অমৃতত্ব লাভ হয়, নিখিলের সহিত যোগ ও ভূমার সহিত মিলন ঘটে। সর্বভূতে আত্মীয়তা-বোধ আসে। ক্ষুদ্র 'আমি' ও 'আমার' চিন্তা বিরাট 'আমি'তে লীন হয়। স্বামীজী ছিলেন অভীঃমন্ত্রের ঋত্বিক্‌, স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত, অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতের সুদিন যখন ছিল, তখন নচিকেতা ও মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসার উত্তর সহজ সরল পথেই তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কোনও হেরফের, ভুল ভ্রান্তি ঘটে নাই বা বাক্‌চাতুর্য বিচার-বিতণ্ডার বাগাড়ম্বরে সেই সত্য চাপা পড়ে নাই।

সর্ব দেশে সর্ব কালে বিবর্তনের পথে মানুষকে অধিকারিভেদে শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী অগ্রগামী হইতে হয়। এই অভ্রান্ত সত্য ভুলিলে পতনের পথ প্রশস্ত হইবে মাত্র। এই সত্য ভুলিয়া ভারত এক অশুভ মুহূর্তে সকল মানুষকে একই মাপের জামা পরাইতে চেষ্টিত হইয়া সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল। ঋষিবাক্যের বিকৃত ভাষ্য করিয়া বসিল। ঐহিক অভাব-অভিযোগ ও অসাম্যকে উপেক্ষা করিয়া দুঃখ-দৈন্যকে ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিল। সকলকে ত্যাগের কথাই শুনাইতে থাকিল। সন্দেহ নাই, অহিংসা ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি অতি উচ্চ আদর্শ; কিন্তু সে-অবস্থায় উঠিতে পারে কয় জন? বুভুক্ষুকে এক মুষ্টি অন্ন না দিয়া অজস্র নীতিবাক্য বর্ষণ করিলে তাহার ক্ষুধার জ্বালা তো মিটিবে না। এই সাধারণ সত্য অগ্রাহ্য হইল। স্বামীজী বলিয়াছেন, 'যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না

অথবা অনাথ শিশুর মুখে এক মুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে-ধর্ম বা সে-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত উচ্চ মতবাদই হউক, যত সুবিন্যস্ত দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম নাম দিই না।·· যে-ধর্মকে নিজের ধর্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশগুলি কার্যে পরিণত কর।'

আজ থেকে সার্ধদ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে এই ভারতেই বিশালহৃদয়, পরমকরুণাময়, জীবদুঃখকাতর, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া জনকল্যাণসাধনের শিক্ষা ও ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি জীবের জরা মৃত্যু দুঃখ প্রভৃতি হইতে উদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করিয়া প্রচার করেন ভারতে এক স্বর্ণযুগ আসে। অষ্টশীল অভ্যাসে বহু জনের চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। বুদ্ধদেবের উপদেশ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তার লাভ করিয়া মানবজাতির প্রাণে আশা ও শান্তির প্রলেপদানে সমর্থ হইয়াছিল। শুধু মাত্র মানুষের মধ্যেই তাঁহার করুণা সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতর প্রাণীরাও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত ছিল না। যদিও এই দেবমানবকে সাধারণতঃ বেদ-অমান্যকারী বলা হয়, তথাপি তাঁহার শিক্ষার মাধ্যমেই বেদের সার বেদান্ত বা উপনিষদের পরম সত্য কার্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই তপোবনের সাধনা-ত্যাগের দ্বারা সর্বভূতে একাত্মবোধ, অমৃতত্বলাভ—'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ', বহুতে এক উপলব্ধি-কার্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহারই প্রবর্তিত কার্যসূচী অহিংসা, সাম্য ও মৈত্রী কার্যক্ষেত্রে সার্থক প্রযুক্তির স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে।

'কালস্য কুটিলা গতিঃ'। কালের বিচিত্র গতিপ্রবাহে, নব নব তরঙ্গভঙ্গে সকলই বিস্মৃতির অতল গর্ভে লীন হইল। সে সময় আচার্য শঙ্কর আসিয়া আবার অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করিলেন। আবার সব ভুল হইল, যেটুকু টিকিয়া রহিল তাহা যেন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের রেশের মতো—একটা অস্ফুট ভাবমাত্র। অতঃপর ভারতবর্ষ ছিন্নভিন্ন, দিশেহারা - ভবিষ্যতের আশা নাই, বর্তমানও তমসাবৃত। অবহেলিত ঘৃণিত ভারত শুধু অতীত গৌরবের একটা বিকৃত কঙ্কাল আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল। যেন ভগবদারাধনায় আড়ম্বর অনুষ্ঠানের বাহুল্য, কিন্তু ভক্তি বা হৃদয়ের স্পর্শমাত্র নাই; মুখে জ্ঞানের কথা, কিন্তু উপলব্ধি নাই, ফলে গোঁড়ামি, কূপমণ্ডূকত্ব বিকৃত প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক নিগড়ে নিষ্পেষিত ভারত এক বীভৎস আকার ধারণ করিল।

এই পরিস্থিতিতে মানবকল্যাণে ধর্মসংস্থাপন-হেতু, বেদান্তের সত্যকে ভাস্বর করিতে অবতীর্ণ হইলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গে আনিলেন নরঋষি স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বামীজী কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন ভারতে ধর্ম আমদানির প্রয়োজন নাই। ভারতে ধর্মাদর্শের প্রাচুর্য বর্তমান, অভাব অন্নবস্ত্রের। ঐহিক ভোগের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর ইহার জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন শিক্ষা। ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, ভারতের মৌলিক চিন্তার উপযোগী করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। পরানুকরণ পরানুবাদ বর্জনীয়। চাই অস্তিমূলক শিক্ষা, নেতিবাচক শিক্ষা নয়। যে শিক্ষায় মানুষ নিজের পায়ে ভর করিয়া জীবন-সংগ্রামের সামর্থ্য অর্জন করিতে সমর্থ হয়, চাই তেমন শিক্ষা। নারী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই শিক্ষা চাই-বিশেষ যাহারা দারিদ্র্যের কঠোরতায় শিক্ষালয়ে গিয়া শিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ, তাহাদের ঘরে ঘরে গিয়া

শিক্ষাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সঞ্জীবনীমন্ত্রে ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিলেন, আর এই নবজীবন পুষ্ট ও পরিবর্ধিত করিবার কঠোর কর্তব্যভার ন্যস্ত করিলেন উপযুক্ত লীলাসহচর যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের উপর। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বপ্রথম বলিলেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' স্বামীজী এই জন্য কিছু ঐহিক ভোগের ব্যবস্থার প্রয়োজন সর্বাগ্রে অনুভব করিলেন। অনুভব করিলেন, এই প্রয়োজন মিটাইতে চাই সংঘবদ্ধ কর্ম এবং সঠিকভাবে এই কর্মসাধনে মাত্র তাহারাই সক্ষম, যাহারা নিঃস্বার্থ এবং ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন অর্ধবাহ্যদশায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'জীবে দয়া' প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' অনেকেই ইহা শুনিলেন কিন্তু ইহার সারমর্ম উপলব্ধি করিলেন একমাত্র স্বামীজী। তাঁহার হৃদয় নবালোকে উদ্ভাসিত হইল এবং তাহারই পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ, যার মূলমন্ত্র 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কর্মে পরিণত বেদান্ত, চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা নবীন যুগের এক নবীন বাণী—সহজ সরল অথচ গভীরতাৎপর্যপূর্ণ। পরোপকার নয়, মানবকল্যাণমাত্র নয়, স্বর্গাদিলাভের আকাঙ্ক্ষা নয়, দয়াদাক্ষিণ্য নয়—শিবজ্ঞানে জীবসেবা, ভগবদারাধনা, আত্মশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি করিবার সাধনা—নিঃস্বার্থ কর্ম।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যাহার বীজ উপ্ত, বরাহনগর মঠবাড়িতে যাহার অঙ্কুরোদ্গম, ১৮৯৭ খ্রীঃ মে মাসে তাহারই লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ। আরম্ভ হইল এক নূতন সাধনা —শিবজ্ঞানে জীবসেবা। ভারত সংঘবদ্ধ নিঃস্বার্থ কর্ম বিস্মৃত হইয়াছিল। সংঘবদ্ধ নিঃস্বার্থ কর্ম উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইলে দেশের ও দশের যে অশেষ কল্যাণ সাধন সম্ভব তাহা ভারতবাসী শিখিল। সংঘের প্রধান অবদান—ভারতের সুপ্ত আত্মচেতনা ও লুপ্ত আত্মপ্রত্যয় পুনরুদ্ধার; ভারতবাসীর ভীরুতা ও কাপুরুষতা ভুলিয়া অভীঃমন্ত্রে দীক্ষালাভ; নীচতা ও স্বার্থপরতা পরিহার—বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যাগ শিক্ষা।

পৃথিবীর সর্বত্র পূর্বাপর নানা প্রকার জনকল্যাণ সংস্থা বর্তমান। কিন্তু এইরূপ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজার ভাব লইয়া, যাহার সেবা করিতেছি তাহাকে উচ্চাসনে বসাইয়া নিজেকে তাহার নিম্নে রাখিয়া সেবা করার ভাব আর কোথায় আমরা দেখিয়াছি? রাষ্ট্রের অনুমোদন ও জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত বৃহৎ পরিকল্পনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় ও কার্যের সাবলীল গতি ব্যাহত হয়। সংঘের কার্যদক্ষতা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, পরহিতচিকীর্ষা, আত্মপরভেদরাহিত্য ও নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহাদের লোককল্যাণার্থে নিঃস্বার্থ সেবা চিত্তশুদ্ধিরই প্রয়োজনে, ইহা কোন উদ্দেশ্যমূলক নয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'কাজলের ঘরে থাকলে তুমি যত সেয়ানাই হও না কেন, গায়ে ছিটে ফোঁটা কালি লাগবেই।' সৎ ও পবিত্র হইবার যত চেষ্টাই করি না কেন, মানুষ যতক্ষণ সংসারে আছে তাহার কিছু স্বার্থ থাকিবেই।

সুতরাং পরোপকার, জনকল্যাণ সৎকর্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু একমাত্র ত্যাগী কর্মী ব্যতীত শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শকে সদা উজ্জ্বল করিয়া রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের

সাধারণ মানুষের জন্যও এ আদর্শ। আমাদিগকেও ইহা জীবনে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে—সমাজসেবা, রাষ্ট্রসেবা প্রভৃতি সর্ববিধ কর্মেই। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-ই যুগধর্ম। স্বামীজী নবযুগের সামনে এই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, রামকৃষ্ণ সংঘ গড়িয়া গিয়াছেন এ আদর্শের শিখাকে অনির্বাণ রাখিবার জন্য।

স্বামীজী বলিয়াছেন: আমি দিলাম, এখানেই উহা শেষ। আমার মন, আমার শক্তি, আমার যাহা কিছু দিবার আছে, সব দিয়াছি, দেওয়ার ভাব লইয়াই দিয়াছি, আর কিছু নয়।··যথার্থ উপকারের প্রেরণা সহস্র বৎসর পরেও ফলবতী হয়। বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সুযোগ পাইলেই তাহা আবার বজ্রের মতো ফাটিয়া পড়িতে চায়। আর যে ভাবাবেগের পশ্চাতে স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি থাকে সংবাদপত্রের শিরোনামার সমারোহ এবং লক্ষ লক্ষ লোকের করতালি লাভ করিলেও উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবেই।

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

পুনর্জন্ম ও মুক্তি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ

পুনর্জন্ম-বাদ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির এমন একটি সর্বজনসম্মত গভীর বিশ্বাস যে, আজ পর্যন্ত হিন্দুমনে ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ। এই মতের সিদ্ধান্তগুলি অন্ধ-বিশ্বাস বা কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক-নীতি (dogmatic faith)-মূলক ভিত্তির উপর গঠিত নয়; প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং যুক্তিকেও তুষ্ট করে। ভারতের নিজস্ব সম্পদ থাকিয়াও জগতের দর্শন-সাহিত্য-ভাণ্ডারে ইহাকে একটি অমূল্য দান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুনর্জন্মের ধারা জ্ঞাপন করিতে হইলে তাহার মূল বেদান্ত দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। বেদান্ত দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ উপনিষদ্‌, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা। এগুলিকে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়।

বেদান্ত দর্শনে সত্যদ্রষ্টাদের উক্তিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ (axiom)-রূপে অঙ্গীকার করিয়া লওয়া হয়। যথা, বিশ্বের কোনও আদি বা অন্ত নাই, পর্যায়ক্রমে "প্রলয়" ও "সৃষ্টির" প্রবাহ চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং ইহার নিমিত্ত-কারণ বা মূল অধিষ্ঠান সেই সর্বব্যাপী শুদ্ধ-চৈতন্য পরম-ব্রহ্ম। যোগশাস্ত্রে ইঁহাকেই পরমাত্মা বলে। তিনি স্বপ্রকাশ "সচ্চিদানন্দ"—সৎ অর্থাৎ নিত্য, তিন কালেই একভাবে স্থিত। তিনি চেতনস্বভাব ও আনন্দস্বরূপ। ইহা ছাড়া তিনি নিগুর্ণ, অখণ্ড ও একরস (homogeneous), এবং তাঁহার তুল্য না থাকায় "ইতি বাচক" উপমা দিয়া তাঁহাকে বোঝানো যায় না। তাঁহাকে বোঝানো যায় একমাত্র নিষেধোপদেশে—"নেতি নেতি"—এইরূপ নয়, এইরূপ নয় (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৩।৯।২৬) বলিয়া নির্দেশ দেওয়াই সম্ভব। তিনি স্বভাবতঃ ক্রিয়াহীন বলিয়া জগতের মূল কারণ হইয়াও সৃষ্টিতে প্রকৃষ্টভাবে তাঁহার কোনও ক্রিয়া নাই। সমস্তই ব্রহ্মের অব্যক্ত মায়াশক্তির অভিনয়। সে শক্তি অপরিসীম এবং মায়া, প্রকৃতি, মূলাবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এমন কোনও কার্য নাই যাহা এই শক্তির পক্ষে অসম্ভব, তাই ইহাকে "অঘটনঘটনপটীয়সী" বলে। তবে ইহা ব্রহ্মের শক্তিমাত্র বলিয়া ইহার পরমার্থতঃ কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ইহাকে "জড়" বলিয়া নির্দেশ করা হয়। জড়ের নিরপেক্ষভাবে কিছু করিবার সাধ্য নাই, চেতনের সংসর্গ পাইবার পরই নিজের কুহক দেখাইতে পারে। তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তমের সংমিশ্রণে ইহা গঠিত, তাই ইহাকে "ত্রিগুণাত্মিকা" বলা হয়। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বের কার্য প্রকাশ ও শান্তি; রজের কর্মসম্পাদন ও বিক্ষেপ; এবং তমের আবরণ ও প্রমাদ। এই তিন গুণের তারতম্যেই সৃষ্টির বিকাশ ও বিচিত্রতা। জগতের কোনও বস্তুতেই এই তিনের একটিমাত্র অংশ বিশুদ্ধভাবে থাকে বলিয়া স্বীকৃত হয় না, প্রত্যেকটিতেই ন্যূনাধিক সংমিশ্রণ থাকেই। গীতার ১৮।৪০ শ্লোকে একথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে :

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ॥"

বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্ম ও তাঁহার মায়াশক্তির একত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইরূপে বস্তুতঃ একই সত্তা হওযায় ব্রহ্ম জগতের "নিমিত্ত" ও "উপাদান" উভয় কারণ বলিয়াই গৃহীত। ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২৩-২৯ সূত্রে ইহার বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়।

জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণের নিরূপণ করিয়া এবার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার চর্চা করিব। উপরি-উক্ত শুদ্ধ-চৈতন্য ব্রহ্ম যখন নিজের মায়া-শক্তি প্রয়োগ করেন না, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমের সাম্য (equilibrium) থাকে তখন দৃশ্যমান জগতের সম্পূর্ণ অভাব প্রতীয় হয়, ইহাকেই "প্রলয়" কাল বলে; এবং যেহেতু ব্রহ্ম স্বভাবতঃ শান্তধর্মী তাই ইহাই প্রকৃত স্থিতি। ইহা সত্ত্বেও "চেতন-স্বরূপ" ব্রহ্মের ঈক্ষণ অর্থাৎ বিচার ও সংকল্পের ক্ষমতা অবশ্য স্বীকার্য। ঈক্ষণ করিয়া তিনি যখন নিজ শক্তি-প্রয়োগের সংকল্প করেন সেই মুহূর্তেই সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের যে সাম্যাবস্থা ছিল তাহা ভঙ্গ হয় ও চেতনের এই ইঙ্গিত পাইয়া প্রকৃতি নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। প্রকৃতির এই ক্রিয়াশীলতাকেই বলা হয় যে, ব্রহ্ম মায়ার উপাধি ধারণ করিয়াছেন। এই স্থিতিতে সেই সম্পূর্ণ নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্ম সত্ত্বগুণ-প্রধান "মায়োপাধি" ব্রহ্ম, "পরমেশ্বর" নামে অভিহিত হন। মায়া তাঁহার নিজস্ব শক্তি বলিয়া তাঁহার অধীন, এবং মায়ার অধীশ্বর এই সগুণ ব্রহ্ম "মায়াধীশ"। আগেই বলা হইয়াছে যে, মায়ার শক্তি অসীম, তাই মায়াধীশ ঈশ্বরের কার্যকরী ক্ষমতাও নির্গুণ ব্রহ্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই উপাধিতে তাঁহার সর্ব ঐশ্বর্য, সর্বধর্ম, সর্বযশ, সর্বশ্রী, সর্বজ্ঞান ও সর্ববৈরাগ্য থাকে, বস্তুতঃ সর্বপ্রকার গুণের চূড়ান্ত বিকাশ, এবং তিনিই জগতের সৃষ্টি, পালন, নিয়মন ও সংহারের কর্তা। তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার ভিতর অনুপ্রবেশ করিয়াছেন ও দৃশ্যমান জগদ্রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ"। (২।৬।১)। অতএব নিরুপাধি অবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়-কালে যিনি সম্পূর্ণ অরূপ ও অবর্ণনীয় থাকেন তিনিই মায়োপাধি ধারণ করিলে জগদ্রূপে প্রতীয়মান হন। বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন - "যদেতদ্দৃশ্যতে মূর্তমেতদ জ্ঞানাত্মনস্তব"—অর্থাৎ মূর্তরূপে যাহা কিছু দেখা যায়, হে জ্ঞান-স্বরূপ, সে-সমস্ত আপনারই রূপ (১।৪।৩৯)। বলিতে পারা যায় যে, তত্ত্বতঃ ঈশ্বর কোনও বিশেষ ব্যক্তিরূপধারী পুরুষ নন, তবে সাকার উপাসনার সময় তাঁহাকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু প্রভৃতি রূপে স্মরণ করা হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রলয় বা সৃষ্টিকালে এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় সদ্বস্তু নাই। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এ সমস্তই ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১)। এই বোধ অনুযায়ী ইহাকে "অদ্বৈতবাদ" বলা যুক্তিযুক্তই হয়।

পুনঃ উপরি-উক্ত সেই নিরুপাধি পরমাত্মাই আবার যখন প্রকৃতির রজ-তম-প্রধান "অবিদ্যা" নামে পরিচিত গুণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ধারণ করেন তখন তাহাকে "জীবাত্মা" বলা হয়। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সমস্তই জীব বলিয়া গণ্য এবং গুণের তারতম্যে ইহারা তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা (১) দেব, অবিদ্যার সত্ত্ব-গুণাংশের প্রাবল্যে; (২) মনুষ্য, সত্ত্ব ও রজ-তমের সামঞ্জস্যে; এবং (৩) তির্যক, রজ-তমের প্রাধান্যে।

সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নিজ মায়ার কার্যে কোনও-

রূপে লিপ্ত হন না কিন্তু অল্পজ্ঞ জীব প্রকৃতির ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারে না এবং অহংকার-বশতঃ নিজেকে স্বাধীন কর্তা মনে করিয়া, বস্তুতঃ যাহা প্রকৃতির ক্রিয়া তাহার ফল ভোগ করে। ভগবান বলিয়াছেন :

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥"

(গীতা, ৩।২৭)

—অর্থাৎ প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কর্মসকল সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ হইলেও অহংকারে বিমোহিত জীব 'আমি কর্তা' এইরূপ মনে করে।

কর্ম বেদান্তশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ, এবং বিশেষতঃ সেই ক্রিয়ার জন্যই ব্যবহৃত হয় যাহাতে ফলোৎপাদনের শক্তি আছে। ফলের অভিলাষী হইয়া পুরুষকারের প্রেরণায় কার্য করিলে অর্থাৎ অন্যের দ্বারা নিয়োজিত না হইয়া অন্তঃকরণের স্বাধীন নির্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেই ফল উৎপন্ন হয়—'আমি করিতেছি' এইরূপ মনোভাবের কার্যই প্রকৃত কর্মশব্দবাচ্য এবং সে কর্মের ফলও অবশ্যম্ভাবী, আর ফল উৎপন্ন হইলে ভোগ ব্যতীত তাহার ক্ষয়ও যুক্তিযুক্ত হয় না। বলা হইয়াছে যে,

"মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্ ॥"

—কর্মসমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে-সমুদায়ের ক্ষয় হয় না। তাহা হইলে দেখা যায় যে, কর্ম-জনিত ফলই বন্ধনের একমাত্র হেতু এবং কর্মফলভোগ শেষ না হইলে মুক্তি নাই। ভক্তিমার্গের সাধকেরা এই মতের বিপক্ষে বলিয়া থাকেন যে, অন্য উপায়েও ইহা সম্ভব, ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারিলে "ইচ্ছাময়" অব্যাহতি দিয়া থাকেন। অবশ্য আসক্তি-বিহীন হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে তাহা কোন বন্ধনেরই হেতু হয় না। গীতায় শ্রীভগবান ইহা বলিয়াছেন।

যাহা হউক, এইরূপ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ইহা নিশ্চয় যে, ফলভোগ করিতে হইলে তাহার উপযোগী শরীরের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই নিমিত্ত জীব-দেহকে দুই মুখ্য শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং উভয় শরীরেই ভোগ করিতে হয়। (১) "স্থূল" দেহ—মস্তক, হস্তপদাদি করণবর্গ-যুক্ত এই দৃষ্টিগোচর শরীর, ইহাকেই "অন্নময় কোশ" বলে ; এবং (২) "সূক্ষ্ম" বা "লিঙ্গ" শরীর—ইহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই ১৭টি অবয়বে গঠিত। এই লিঙ্গ শরীরই স্থূল দেহের ভিত্তি, এই কারণে স্থূল দেহের ভোগে সূক্ষ্ম শরীরও লিপ্ত হইতে বাধ্য হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে উল্লিখিত ইন্দ্রিয় এই দৃশ্যমান করণবর্গ নহে, কিন্তু ইহাদের সূক্ষ্ম শক্তি-বিশেষ, যে শক্তির দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় গোলকের ক্রিয়ার অনুভূতি হয়, বা কর্মেন্দ্রিয় কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের স্নায়ুকেন্দ্রের সহিত মনের সংযোগকারী বলা যাইতে পারে।

আত্মা এই লিঙ্গ শরীরের উপাধি গ্রহণ করিলে জীবাত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, চিদাভাস ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়।

যেহেতু কর্মফল স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শ্রেণীর শরীরেই ভোগ্য, ইহাকে দুই প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয়, যথা—(১) দৃষ্ট ভোগ ও (২) অদৃষ্ট ভোগ।

(১) দৃষ্ট ভোগ : এক জীবনে যে কর্ম করা হয় তাহার যতটুকু দৈহিক ও মানসিক ফল সেই জীবনেই অর্থাৎ ইহকালেই ভোগ

হয়, তাহাকে দৃষ্ট ফল বলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কর্ম ও তাহার অনুগামী ফলের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বুঝিতেও পারা যায়। (২) অদৃষ্ট ভোগ: মৃত্যুর পর এই দেহে কর্মফলের যে অংশ অভুক্ত থাকিয়া যায়, দেহপাতের পরে ভোগ হয় তাহাকে অদৃষ্ট ফল বলে। যেহেতু উৎপাদক কর্মের সহিত এই ভোগের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভবপর নয়, তাই শাস্ত্র-বাক্যই ইহার একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গৃহীত এবং ইহা 'আনুশ্রবিক'' নামে অভিহিত হয়। অদৃষ্ট ভোগ আবার দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—(ক) আমুষ্মিক, পরলোকে ভোগ্য এবং (খ) ঐহিক, মর্ত্যলোকে ভোগ্য।

২ (ক) আমুষ্মিক: ইহার ভোগ পরলোকে হয় বলিয়া কেবল সূক্ষ্ম শরীরই ইহাতে জড়িত হইয়া থাকে, স্থূলদেহের কোনও অংশ থাকে না; এবং স্থূলদেহের অভাবে সেই ভোগও সর্বতোভাবে মানসিক হওয়াই সম্ভবপর। কৃতদেহপাতের অব্যবহিত পরেই স্বর্গাদি পরলোকে এই ভোগ আরম্ভ হয় এবং সেখানেই নিঃশেষ করিতে হয়। ভগবান বলিয়াছেন:

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।"

(গীতা—৯।২১)

—তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

(খ) এইরূপে সূক্ষ্ম শরীরের ভোগ শেষ করিয়া নূতন স্থূলদেহে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে কর্মচক্র পুনরায় চালিত হয়।

জীবের প্রত্যেক জীবনে স্থূলদেহে ভোগের উপযোগী, উল্লিখিত দৃষ্টফল (১) রূপে যে অংশ অভুক্ত থাকিয়া যায় তাহা সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং বহু জন্মের এই সঞ্চিত কর্মের সমষ্টিকে সেই জীবের "কর্মাশয়" বলে। সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এই কর্মাশয় হইতে কিয়দংশ উঠাইয়া লইয়া তাহাকে ইহা ভোগ করিবার বিধান করেন, এবং ঠিক তাহারই উপযোগী সে উক্ত নূতনদেহ প্রাপ্ত হয়। কঠোপনিষদে যমরাজ বলিয়াছেন—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥"

(২।২।৭)

নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন দেহী শরীরগ্রহণার্থ মনুষ্য-পশ্বাদি জীবদেহ প্রাপ্ত হয় আবার কোন দেহী স্থাণু অর্থাৎ বৃক্ষ-পাষাণাদি স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হয়।

কর্মাশয়ে যাহা সুপ্ত অবস্থায় ছিল তাহা এখন ফলপ্রসূ হইয়া এই নূতন দেহে ভোগ করায়, ইহাকেই "প্রারব্ধ" বলে। কর্মের বিপাক একবার আরম্ভ হইলে তাহা নিঃশেষ হইয়া না গেলে ক্ষান্ত হয় না। এই কারণে ইহা জীবের আয়ত্তের বহির্গত এবং অগত্যা ভোগ করিতে হয়। যেহেতু কেবল প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্তই বর্তমান দেহ গঠিত হইয়াছে, তাহার শেষ হইলে সেই দেহের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না এবং অবিলম্বে দেহপাত হয়। অবশ্য প্রারব্ধ-ভোগকালে নূতন কর্ম করিলে তাহার অভুক্ত অংশ পুনরায় কর্মাশয়ে সঞ্চিত হয়। এই রূপেই কর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়া থাকে।

এই বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, কর্মের গতি অত্যন্ত গহন এবং পুনর্জন্মের মূলে জীবের স্বকৃত কর্মই নিহিত রহিয়াছে; পক্ষান্তরে কর্ম তাহাকেই বলিতে পারা যায়, যাহা জীবদেহ-উৎপাদনের শক্তি ধারণ করে।

ভগবান বলিয়াছেন—

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥"

(গীতা, ৮।৩)

কর্মের এই পরিণামেই অনাদি জীব ক্রমাগত জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, এবং সুখের সহিত অশেষ দুঃখ ভোগ করে। এই পুনঃপুনঃ যাতায়াতকেই সংসরণ বা সংসারচক্র বলে।

ঘটনাচক্রের প্রবাহ এইরূপ হওয়ায় স্বভাবতঃ মনে এই প্রশ্নই আসে যে, এই অশেষ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনও উপায় আছে কি? তাহার নিরূপণ করিবার চেষ্টাই এক্ষণে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, পরমার্থতঃ ব্রহ্মই একমাত্র বিদ্যমান সত্তা, মায়ার কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, কিন্তু তাহার শক্তি এমনই বিচিত্র যে, তাহার এই ভেল্কি নিঃসংশয়রূপে বাস্তব জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অজ্ঞানোপহিত জীব সে রহস্য ভেদ করিতে পারে না, এবং মায়ার দ্বারা আরোপিত অহংকারের বশবর্তী হইয়া এমন ভ্রান্তিতে পড়িয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে যাহা মায়ার নিজস্ব কার্য তাহাকে সে স্বকৃত কর্ম বলিয়া অভিমান করে ও তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় যদি সে কোনও ব্রহ্মবিৎ গুরুর উপদেশ লাভ করিতে পারে এবং নিজের বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে এই অধ্যাস খণ্ডন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহার মুক্তিও ইহার অনুবর্তী হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ।
ধৈর্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥"

(বিবেকচূড়ামণি, ২৭৯)

অর্থাৎ প্রারব্ধই যে শরীর রক্ষা করিবে ইহা নিশ্চিত জানিয়া তুমি (সাধক) ধৈর্যধারণ করিয়া এবং যত্নসহকারে নিজের এই অধ্যাস (ভ্রান্তি) মোচন কর।

কিন্তু এই ভ্রান্তি মোচন করিতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। এই সাধনা উপনিষৎ-কথিত "ব্রহ্মজ্ঞান"লাভের চেষ্টা, অখণ্ড পবিত্রতা ও সত্যনিষ্ঠা। সত্যনিষ্ঠা বা সত্যবচন বলিতে বুঝায় যে, বক্তা যে-বস্তু নিজমনে যেরূপ বুঝিয়াছেন তাহাকে ঠিক সেইরূপেই প্রকাশ করা। তাহা যদি পারমার্থিক, এমন কি ব্যবহারিক-রূপে গৃহীত সত্য নাও হয় তথাপি এরূপ বচনে বক্তা সত্যভ্রষ্ট হন না। এই সাধনার সম্বন্ধে কেনোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ
সর্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥"

—কেনোপনিষদ্ ৪।৮

অর্থাৎ সমস্ত শম, দম, তপস্যা, নিষ্কাম ও নিত্য কর্ম, বেদ বেদাঙ্গ ইত্যাদি তাহার প্রাপ্তির উপায়, কিন্তু সত্যনিষ্ঠাই তাহার আশ্রয়স্থান।

এই সাধনার পথে অতি সাবধানে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে। সর্বপ্রথমে সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য কর্মের নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যবায়কে নিরোধ করিতে হইবে, তাহার পর সাধনচতুষ্টয়ের যথারীতি অনুশীলন করিলে সে উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারে। অন্তঃকরণ নির্মল হইলে পর অন্য সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ আচার্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখ হইতে নিজের সহিত ব্রহ্মের অভেদত্বজ্ঞাপক 'মহাবাক্য' শ্রবণ করিতে হয়। এ বিষয়ে কঠোপনিষদ্ (১।৩।১৪) বলিয়াছেন: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" স্বামীজীও এই বাণী আবার

নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাবাক্যকে নিজমনে বিচার করিয়া, তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়া দৃঢ় করিতে হয়। ইহার পর ধ্যানের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা সেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিজে উপলব্ধি করিবার বিশেষ প্রয়াসের আবশ্যক।

সে সময় তিনি আত্যন্তিক আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন—ইহাই "ব্রহ্মানন্দ"। এই অবস্থিতিকেই "ব্রহ্মসাক্ষাৎকার" বলে। তখন দেহমনাদির সহিত নিজের একাত্মতার, স্বাতন্ত্র্যের অভাবে নিজস্ব কোন কর্ম থাকাও সম্ভব নয় ও তাহার ফলের প্রশ্নই উপস্থিত হয় না, তাঁহার কর্মাশয় ভস্ম হইয়া যায়। মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৯ বলিয়াছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

—সেই সর্বোত্তম ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে দ্রষ্টার অবিদ্যাসংস্কার নষ্ট হইয়া যায়, সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় ও কর্মরাশি ক্ষয় হইয়া যায়। ইহাকেই "জীবন্মুক্তি" বলে। কর্মাশয় দগ্ধ হওয়াতে "ব্যুত্থান" অবস্থাতেও অর্থাৎ সমাধিভঙ্গকালেও তিনি আর কোনও কর্মে লিপ্ত হন না। সেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছায় তিনি বারংবার এই সমাধির অভ্যাস করিয়া থাকেন, এবং প্রারব্ধ শেষ হইলে দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মে লীন হইয়া যান, অর্থাৎ সংসারচক্র হইতে তাঁহার আত্যন্তিক মুক্তিলাভ হয়। ইহাকেই "কৈবল্য" মুক্তি বলে। ইহা জ্ঞানমার্গের কথা।

সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভের অন্য পন্থাও আছে। "ভক্তিমার্গ" আর একটি পন্থা। এই মার্গের সাধকেরা ভগবদ্ভক্তিতে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দেন, এবং বিষ্ণু বা অন্য কোন রূপে সাকার ব্রহ্মকে সর্বতোভাবে ভজনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।৫।২৩

এই উপাসনার দ্বারাই তাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রেয় লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—মনমুখ এক করিয়া যে-কোন পথ ধরিয়া চলিলে মানুষ এই জীবনেই সত্য লাভ করিয়া ত্রিবিধ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম শান্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

"মৃত্যুর পর মানুষের ভোগবাসনা সূক্ষ্মভাবে থাকে। মৃত্যুকালে স্থূল দেহটারই কেবল নাশ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি—সবই থাকে সূক্ষ্মভাবে। তখন ভোগ আরও তীব্রভাবে হয়ে থাকে। সূক্ষ্মের পর কারণ অবস্থায়ও মন প্রভৃতি বীজাকারে থাকে। তুরীয় অবস্থায় পৌঁছুলেই পূর্ণ জ্ঞান হয়।"

"বাসনা থেকেই পুনর্জন্ম হয়। সমস্ত বাসনাকে যদি একেবারে বিসর্জন দেওয়া যায়, তাহলে আর জন্ম হয় না।"

—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

সমালোচনা

দিব্যরামায়ণ—স্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত। জেনারেল বুক্স্, এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৯৭, মূল্য—ছয় টাকা।

চলতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত সুখপাঠ্য এই রামায়ণকাহিনীটি বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। লেখক প্রধানতঃ মহাকবি বাল্মীকির মূল রামায়ণের উপাখ্যান-ধারা ও ঘটনাসন্নিবেশ অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তুলসীদাসের রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ প্রভৃতি রামায়ণসমূহ হইতে কিছু কিছু ঘটনা কাহিনীতে সংগ্রথিত হইয়াছে। তাহাতে এই 'দিব্যরামায়ণের' মনোজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিতে হইবে। 'প্রকাশকের নিবেদন' হইতে জানা যায় যে, লেখক এই গ্রন্থের সঙ্কলনে বাল্মীকির মূল রামায়ণ ছাড়া সংস্কৃত, পালি, বাংলা, হিন্দী, মারাঠি, তামিল, তেলেগু ও তিব্বতী ভাষায় প্রকাশিত অন্যূন চল্লিশখানি রামায়ণ এবং বিভিন্ন পুরাণাদির সাহায্য লইয়াছেন। বহু কবি, ভক্ত ও সাধকের চিন্তা ও ভাব-জ্যোতিঃ এই রামায়ণে প্রতিফলিত; অতএব এই গ্রন্থের 'দিব্যরামায়ণ' নাম সমীচীনই হইয়াছে।

গ্রন্থে বহু পাদটীকা সন্নিবিষ্ট। এই টীকাগুলিতে কোথাও কোথাও বাল্মীকি-বর্ণিত ঘটনা হইতে অন্যান্য রামায়ণে লিপিবদ্ধ ঘটনার পার্থক্য দেখানো হইয়াছে, কোথাও বা মহাকবি বাল্মীকির বর্ণনার সমালোচনাও করা হইয়াছে। এই টীকাগুলির কোনও কোনও স্থলে লেখকের স্বাধীন চিন্তা সুপরিস্ফুট। তবে মূল কাহিনীর কোথায় কোথায় তিনি বাল্মীকি রামায়ণ হইতে ভিন্ন অন্য রামায়ণের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সাধারণ পাঠকের বুঝিবার উপায় নাই। পাদটীকায় ইহার উল্লেখ থাকিলে বোধ করি ভাল হইত।

মূল রামায়ণের গল্প আরম্ভ করিবার পূর্বে গ্রন্থকার ছত্রিশ পৃষ্ঠার একটি 'প্রাগ্‌বাণী' সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলির ভাবালেখ্য অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে এবং রামায়ণের ভিতর দিয়া ভারতের সনাতন ধর্ম সংস্কৃতি যেভাবে অভিব্যক্ত ও পরিপ্রসারিত হইয়াছে তাহারও সুচিন্তিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাগ্‌-বাণীটি পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে রামায়ণের দিব্যপ্রেরণা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিবে।

দিব্যরামায়ণের ভাষায় ও কাহিনী-উপস্থাপনায় কোনও জড়তা নাই। পড়িতে বসিলে রামায়ণের চরিত্রসমূহ ও ঘটনাগুলিকে যেন অতি নিকটে পাওয়া যায়। তবে কয়েকটি টীকা অত্যন্ত দীর্ঘ ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হইল। কয়েক জায়গায় টীকার ভাষা অত্যন্ত হালকা হইয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকির প্রতি কটাক্ষ যেন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে মনে হইতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থকার এদিকে অবহিত হইলে পুস্তকের সম্পন্নতা বাড়িবে।

পরিশিষ্টে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নানা রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা তথ্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক। 'দিব্যরামায়ণ'-প্রণয়নে লেখক যে গবেষণা, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাচাতুর্যের পরিচয়

দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

—**স্বামী শ্রদ্ধানন্দ**

বেদান্তসূত্রম্—মূল, অবতরণিকাভাষ্য, শ্রীগোবিন্দভাষ্য এবং এতদুভয়ের সূক্ষ্মা টীকা, সকল ভাষ্যের ও টীকার বঙ্গানুবাদ এবং সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমেত - ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, ২৯ বি, হাজরা রোড হইতে ৪টি অধ্যায় ৪টি খণ্ডে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৬৩০, ৬০২, ৭৭৮, ৩২০ ; ভূমিকাদি স্বতন্ত্র। মূল্য— প্রথম খণ্ড ২৪৲, দ্বিতীয় খণ্ড ২০৲, তৃতীয় খণ্ড ৩২৲ এবং চতুর্থ খণ্ড ২০৲ , মোট ১০০৲ ।

ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, সনাতন ধর্মক্ষেত্রে প্রচলিত শাস্ত্রসমূহের উৎস বেদ। বেদের সারবস্তু উপনিষৎসমূহ বা বেদান্ত। এই বেদান্ত শ্রীব্যাসদেব কর্তৃক সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ। বেদান্তসূত্রের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র বা বেদান্তদর্শন।

শ্রীব্যাসদেবের বেদান্তসূত্র অতুলনীয় গ্রন্থ, ইহাকে বেদান্তশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত 'ন্যায়প্রস্থান' বলা হয়। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত অথবা ইহাদের অনুরূপ যে-কোন বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা চাহিয়া আচার্যগণ বেদান্তসূত্রের উপর যুক্তিপূর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ব্যতীত কোন মতই দার্শনিকগণের নিকট প্রতিষ্ঠা পায় না। বিভিন্ন মতের ভাষ্যমধ্যে স্বীয় মতকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য মতগুলিতে অসামঞ্জস্য দেখাইবার ও তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়—কোন কোন ভাষ্যে এইরূপ প্রচেষ্টা আবার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। যিনি যে মতের পোষকতা করেন, তিনি সেই মতেরই প্রাধান্য দিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে বিভিন্ন মতের সাধকগোষ্ঠী হইয়াছে। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, আচার্যগণ স্বীয় মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই অন্য মতের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন! যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাসূত্র এই বিষয়ে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, তাঁহার মতে- দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি মতগুলি লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন উপায়মাত্র, বিভিন্ন ধাপ মাত্র—'Steps to realisation.' এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বেদান্তভাষ্যগুলি অনুশীলন করিলে আচার্যগণের বক্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হইবে ও গোঁড়ামির ভাব আসিবে না।

আচার্য শঙ্কর, আচার্য রামানুজ, আচার্য মধ্ব, আচার্য নিম্বার্ক, আচার্য বলদেব প্রভৃতির বেদান্তসূত্রের ভাষ্য তাঁহাদের মতাবলম্বী সাধকগণের মধ্যে প্রচলিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভাগবদ্ধর্মের কথা আছে, সেই ভাব অবলম্বনে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বেদান্তদর্শন। শ্রীবলদেব-কৃত বেদান্তভাষ্যের নাম 'গোবিন্দভাষ্য'। 'শ্রীগোবিন্দের স্বপ্নাদেশে ভাষ্য রচিত হয় বলিয়া শ্রীগোবিন্দভাষ্য' নামটি সার্থক। এই ভাষ্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য : প্রতিসূত্রের পূর্বে অবতরণিকাভাষ্য ও তাহার টীকা দ্বারা বিষয়, সংশয় ও পূর্বপক্ষ সংযোজিত এবং পরে সূত্রটির বিশ্লেষণ, সঙ্গতি ও সিদ্ধান্ত মূলভাষ্য ও টীকার মাধ্যমে বিশেষভাবে আলোচিত।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের বেদান্তভাষ্য প্রায় বিলুপ্তির পথে যাইতেছিল, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন এই অমূল্য সম্পদ প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইলেন।

সহজ সরল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবৃতি 'সিদ্ধান্তকণা' পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 'সিদ্ধান্তকণা' অনুব্যাখ্যাটিতে গোবিন্দভাষ্যের গভীর অনুধ্যানের পরিচয় বিদ্যমান। ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সাবলীল ও সহজবোধ্য। অবতরণিকা, ভূমিকা ইত্যাদিও সুলিখিত।

বেদান্তদর্শনের 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' হইতে 'শ্রুতত্বাচ্চ' মূল এগারটি সূত্রের আলোকবর্ষী প্রচ্ছদপটটি শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। শোভন মুদ্রণ ও উত্তম বাঁধাই বৃহৎ গ্রন্থের উপযোগী। গ্রন্থগুলি গ্রন্থাগারে সংরক্ষণযোগ্য।

(১) **গীতা মাতা কী গোদ মেঁ** (দুসরা ভাগ—দুসরা খণ্ড),—লেখক 'সাকর'। (২) **গীতা মাতা কী অনুকম্পা** (পহলা ভাগ),—'সাকর'। (৩) **গীতা মাতা প্রদত্ত বৈভব**—প্রকাশক: শ্রীগীতা আশ্রম, ১০ সদর বাজার, দিল্লী ক্যাণ্ট। পৃষ্ঠা যথাক্রমে: ১৩৮ + প্রস্তাবনা ইত্যাদি, ১৩১, ৭২ (মূলগ্রন্থ)। মূল্য যথাক্রমে: ৪৲, ৪৲, ২'৫০।

(১) সাকর' এই ছদ্মনামে লিখিত 'গীতা মাতা কী গোদ মেঁ' অর্থাৎ 'গীতা মায়ের কোলে' গ্রন্থের প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়া হিন্দী পাঠকসমাজের নিকট প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার কারণ ভাষার স্বচ্ছতা এবং যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি।

সম্প্রতি-প্রকাশিত দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডেও সুধী লেখকের পাণ্ডিত্য ও গীতানুধ্যানের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমরা আশা করি এই খণ্ডটিও বহুল-প্রচারিত হইবে।

(২) 'গীতা মাতা কী অনুকম্পা' অর্থাৎ 'গীতা মায়ের দয়া' গ্রন্থে গীতার প্রথম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক শ্লোকের হিন্দীতে অনুবাদ ও অনুচিন্তন সুন্দরভাবে পরিবেশিত। পুস্তকখানি পাঠ করিলে গীতানুশীলনের আগ্রহ হইবে।

(৩) 'গীতা মাতা প্রদত্ত বৈভব'—গ্রন্থটি প্রধানতঃ 'সাকর'-লিখিত গীতাগ্রন্থের সমালোচনা ও প্রশংসাপত্রের সঙ্কলন।

কল্যাণ (বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৪)—অগ্নিপুরাণ ও গর্গসংহিতা অঙ্ক। **সম্পাদক:** শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী শাস্ত্রী। **প্রকাশক:** গীতা প্রেস, গোরখপুর। পৃষ্ঠা ৭০০, সূচী ইত্যাদি স্বতন্ত্র। মূল্য ৯৲।

হিন্দী ভাষায় হিন্দুধর্মপ্রচারে 'কল্যাণ' পত্রিকার কার্যধারা ভারতবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কল্যাণের সুযোগ্য পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অগ্নি-পুরাণের ২০০টি অধ্যায়ের এবং গর্গসংহিতার নয় খণ্ডের বিষয়বস্তু অবলম্বনে এবারের বিশেষ সংখ্যাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অগ্নিপুরাণে বর্ণিত বিবিধ বিষয় ও ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন সহজ অথচ সরস হিন্দীতে অনূদিত হওয়ায় দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুর কঠিনতা দূরীভূত হইয়াছে। গর্গসংহিতা শ্রীভগবানের লীলাকথা, ইহার চমৎকারিত্ব ভক্তজনস্বীকৃত। বর্তমান সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন এই গ্রন্থপ্রকাশ সময়োপযোগী হইয়াছে। আমরা আশা করি এই বিশেষাঙ্ক-খানি মানুষের মনে সদ্ভাব জাগাইতে সহায়তা করিবে। তিন রঙের ও এক রঙের বহু চিত্র দ্বারা গ্রন্থখানি সমলঙ্কৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সেবাকার্য : বসিরহাট ও হাসনাবাদ ক্যাম্পে ২৪.৪.৭০ হইতে ২০.৫.৭০ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৫১৭.৯১ কুইন্টাল চাল, ৮৯.২২ কুইন্টাল ডাল, ৪৭.৭৩ কুইন্টাল আলু, ২৬ বস্তা পেঁয়াজ, ৪১½ বস্তা লবণ, ৩২ পাউণ্ড বার্লি, ৪৫.৫ কেজি গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে। গড়ে দৈনিক ৮,৫৪৩ জন দুঃস্থকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। মে মাসের শেষের দিকে সমবেত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ২০,০০০।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা : গত ৪ঠা মে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই বন্যা-পীড়িত ৬টি গ্রামে বন্যার্তদের জন্য নির্মিত ৫৬৪টি কুটিরের উদ্বোধন করিয়াছেন। ২১টি পাকা সমাজমন্দির এবং আদিবাসীদের জন্য ২টি বিদ্যালয়-ভবন নির্মিত হইয়াছে। ১৪টি গ্রামে বৈদ্যুতীকরণ এবং ৫টি গ্রামে জলসরবরাহ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে আরও সেবাকার্য চলিতেছে।

গুজরাটে দুঃস্থসেবা : অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিতরণ করা হইতেছে। ইহা ছাড়া ভুজের সন্নিকটে অন্নকষ্টে প্রপীড়িত জনগণকে রান্নাকরা খাদ্য দেওয়ার জন্য 'ফ্রি কিচেন' খোলা হইয়াছে।

শিক্ষা অধিবেশন

গত ৮ই মে, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ পেরিয়ানায়েকেনপালয়ম (কোয়েম্বাতুর) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রসমূহের শিক্ষা অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই অধিবেশন ৮ই হইতে ১০ই মে দিবসত্রয় চলিয়াছিল।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব

পাটনা : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসের জনৈক ছাত্র এই বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

রহড়া : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৮—মার্চ, '৬৯) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি দুঃস্থ অনাথ বালক লইয়া এই আশ্রমের পত্তন করা হয়। বর্তমানে এখানে নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে :

		ছাত্রসংখ্যা (৩১।৩।৬৯)	শিক্ষকসংখ্যা
প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১টি	৫১	৩
নিম্ন „	৫টি	৮৮০	২২
উচ্চ „	৪টি	৫১৩	২৪
নিম্ন „ শিক্ষণায়তন	১টি	১০০	৯
স্নাতকোত্তর বুঃ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	১টি	১০০	১৫
উচ্চ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়	১টি	৫১১	৪৪
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়	১টি	৫৭৭	২৯
বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়	১টি	৫৫	৫
নিম্ন শিল্পবিদ্যালয়	১টি	২০২	১৬
গ্রন্থাগারিক শিক্ষণকেন্দ্র	১টি	২২	৫
সমাজশিক্ষা বিভাগ	১০টি		

মাত্র ৩৭টি বালক লইয়া যে আশ্রমের শুভারম্ভ হইয়াছিল, সেখানে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ৩,০৩১। তন্মধ্যে ৫৩৯ জন ছাত্র সম্পূর্ণ বিনা খরচে শিক্ষালাভ করিতেছে। শিশুদের জন্য নার্সারি বিদ্যালয় হইতে শুরু করিয়া শিল্প বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

এখানে আবাসিক ছাত্রসংখ্যা ৯৪৫ এবং বহিরাগত ছাত্রসংখ্যা ২,০৮৬।

বিপুলায়তন গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১১,৪০০ এবং সদস্যসংখ্যা ১,৫২৩।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সঙ্গে ছাত্রদের স্বাস্থ্যচর্চা এবং চরিত্রগঠনের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। রহড়া বালকাশ্রম পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে নিত্য উপাসনা-ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উৎসব এবং প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা প্রতিবৎসর মনোজ্ঞভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে এই বালকাশ্রমের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

সরিষা: (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৯শে এপ্রিল, ১৯৭০ রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ ১৩৫তম আবির্ভাব-উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

পূর্বদিন সন্ধ্যায় নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভজনসহ শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম পরিক্রমা করে। উৎসবের দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা ছিল। সারাদিনই বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভক্তসমাগম হইতে থাকে। দিনের প্রথম দিকে জয়নগর-মজিলপুর হইতে আগত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। পরে কলিকাতার সুহৃদ ক্লাব কর্তৃক কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসমেত প্রায় পাঁচ হাজার জন বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং আরও প্রায় দেড় হাজার জনকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে জনসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতির পর সারাদিনব্যাপী উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

দিনাজপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই হইতে ১৭ই মে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে ১৫ই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, ১৬ই শ্রীশ্রীমায়ের এবং ১৭ই স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পূজা এবং পাঠ, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশীলব্রত বড়ুয়া; প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং দ্বিতীয় দিন স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী কালিকানন্দ, স্বামী যোগদানন্দ, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য, অধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশ প্রভৃতি বক্তাগণ। তৃতীয় দিন শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই দিন প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় ক্লাব ও আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিভিন্ন শিল্পিবৃন্দ।

স্বামী বেদানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, গত ১৮ই মে, ১৯৭০ রাত্রি একটার সময় স্বামী বেদানন্দ (ভোলানাথ মহারাজ) ৬৫ বৎসর

বয়সে কানপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ পবিত্র গঙ্গায় সলিলসমাধি দেওয়া হয়।

স্বামী বেদানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। সন্ন্যাসজীবনের প্রায় ৩০ বৎসর তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে ও মহীশূর আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর জনহিতকর কর্মে অতিবাহিত করেন। ১৯৫৭ হইতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি চণ্ডীগড় আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন, এবং ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কানপুর আশ্রমের অধ্যক্ষের পদে ব্রতী ছিলেন।

স্বামী বেদানন্দ ছিলেন মধুরস্বভাব এবং সকলেরই প্রিয়, বিশেষ করিয়া ছাত্রগণের। তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

অনুষ্ঠানসূচী

[আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক, ১৩৭৭; বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে]

তিথি-কৃত্য

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণাত্রয়োদশী	১৫ই শ্রাবণ	শুক্রবার	৩১শে জুলাই
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	৩২শে শ্রাবণ	সোমবার	১৭ই আগষ্ট
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	৭ই ভাদ্র	সোমবার	২৪শে আগষ্ট
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণাচতুর্দশী	১৩ই ভাদ্র	রবিবার	৩০শে আগষ্ট
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণানবমী	৬ই আশ্বিন	বুধবার	২৩শে সেপ্টেম্বর
স্বামী অখণ্ডানন্দ	মহালয়া	১৩ই আশ্বিন	বুধবার	৩০শে সেপ্টেম্বর
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্ত্তিক শুক্লাদ্বাদশী	২৪শে কার্ত্তিক	মঙ্গলবার	১০ই নভেম্বর
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্ত্তিক শুক্লাচতুর্দশী	২৬শে কার্ত্তিক	বৃহস্পতিবার	১২ই নভেম্বর

পূজা-কৃত্য

স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	৪ঠা আষাঢ়	শুক্রবার	১৯শে জুন
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লাসপ্তমী	২০শে আশ্বিন	বুধবার	৭ই অক্টোবর
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১২ই কার্ত্তিক	বৃহস্পতিবার	২৯শে অক্টোবর

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ - ব্লক এ, ফ্লাট ২, এন্টালী গভর্ণমেন্ট হাউসিং এস্টেট, কলিকাতা-১৪)।

সেবাকার্য: বর্তমান বৎসরে মালদহে বন্যাপীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন স্থানীয় নিবেদিতা ব্রতী সংঘের শাখা। সদস্যবৃন্দ প্রতিদিন আড়াই মন সুজি রান্না করিয়া গ্রামে গ্রামে পরিবেষণ করেন। জামাকাপড় এবং পুস্তকাদিও বিতরণ করা হইয়াছে।

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্র: দুইটি কেন্দ্রে অতি দুঃস্থ বস্তিবাসী শিশুগণের শিক্ষাদান চলিতেছে। তিনটি রবিবাসরীয় সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়, একটি বিদ্যার্থীদের স্বল্পমূল্যে খাদ্যবিতরণ কেন্দ্র, একটি ছাত্রী কল্যাণ ভাণ্ডারও পরিচালিত হইতেছে। নিবেদিতা ব্রতী সংঘের সঙ্গে যুক্ত ভবানীপুরস্থ রামকৃষ্ণ পাঠচক্র চালাইতেছেন একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়, একটি বিনামূল্যে ঔষধবিতরণ কেন্দ্র, একটি সূচীশিল্প কেন্দ্র ও একটি পাঠচক্র।

পাঠচক্র: বিভিন্ন কেন্দ্রে ১২টি পাঠচক্রে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ ও আলোচনা করা হয়।

শিক্ষা ও সমীক্ষার আসর: মাসে একবার প্রধানতঃ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনার আসর অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠান: বিগত ১লা মার্চ রবিবার নিবেদিতা ব্রতী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে পৌরোহিত্য করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং ভাষণ দেন ডঃ রমা চৌধুরী।

উৎসব-সংবাদ

রূপনারায়ণপুর: হিন্দুস্থান কেবল্স শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব কমিটির উদ্যোগে গত ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, প্রতিবারের মতন এবারও বিশেষ পূজাপাঠাদির পর চার-পাঁচ হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী তদানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের সহযোগিতায় বিশেষ সঙ্গীত ও ভজন উপভোগ্য হইয়াছিল। ২১শে মার্চ 'বীরেশ্বর' ছায়াচিত্র ও দর্শিত হয়।

বেহালা (কলিকাতা ৬০): শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে পর্ণশ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মন্দিরে গত ২৭ হইতে ২৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ জন্মোৎসবসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিন স্থানীয় সারদা-সঙ্ঘ কর্তৃক উষাকীর্তন, পরে পূজা ও প্রসাদবিতরণ হয়। বৈকালে ভাগবতপাঠের পর ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সভাপতি), স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী (প্রধান অতিথি) শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেন।

তৃতীয় দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সারদা সংঘ নগরসংকীর্তন করেন। অপরাহ্ণে কীর্তন এবং সন্ধ্যায় রামপ্রসাদ যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

ভাঙ্গামোড়া: (হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৯শে ও ৩০শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নরনারায়ণ-সেবায় ২,৫০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় স্বামী উমানাথানন্দ ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন। উৎসবের দুই দিনই সন্ধ্যায় 'নিবেদন' শিল্পিগোষ্ঠী শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন।

পাঁচগ্রাম (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে ১৮ই হইতে ২০শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব পূজাদিসহ পালিত হয়।

ধর্মসভায় প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য, ডঃ এস, ই, ও এবং শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি মহঃ মোফাজ হোসেন, সম্পাদক, পাঁচগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল এবং প্রঃ রেজাউল করিম।

বাউল গান, কীর্তন মাধ্যমে ভক্তিমূলক যাত্রাগান, ছায়াচিত্র মাধ্যমে স্বামীজীর জীবনী ও শিক্ষামূলক ছবি দেখানো হয়। শেষ দিন প্রায় এক হাজার নরনারী বসিয়া অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রানীয়া কুলটুকারী (২৪ পরগনা)—এই দুই গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৬শে এপ্রিল এই আশ্রমের শুভ উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ। প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন শ্রীঅমিয়কান্তি সেন-গুপ্ত। অন্যতম বক্তা ছিলেন স্বামী পুণ্যাত্মানন্দ। বিভিন্ন বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকা-নন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

দেলুয়া (পাবনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৪ঠা বৈশাখ হইতে ১৩ই বৈশাখ পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উৎসবে জাতিধর্মনির্বিশেষে অগণিত ভক্ত যোগদান করেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন জনাব আবদুল আলীম (সভাপতি), স্বামী যোগদানন্দ, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য, মোঃ আবদুল মজিদ এবং অন্যান্য বক্তাগণ। ৫ই ও ৬ই বৈশাখ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা, ৩২প্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ প্রভৃতি এই উৎসবের অঙ্গ ছিল।

তপন (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সংঘের উদ্যোগে গত ৮ই বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানসহ মনোজ্ঞভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পূজা-পাঠাদি, ধর্মসভা, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ৮ই বৈশাখ সন্ধ্যায় স্বামী পর-শিবানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন। ব্রহ্মচারী মুরারিচৈতন্য ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচনা করেন। ৯ই বৈশাখ সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী পরশিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকা-নন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে তপন, গঙ্গারাম-পুর, নয়াবাজার প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫

দৈব স্বভাব মুক্তির হেতু,
আসুর স্বভাব বাঁধন বাড়ায় (বাসনা বাড়িয়ে দিয়ে,)
অর্জুন ! তুমি ক'রো নাকো শোক,
জন্মেছ তুমি দৈব স্বভাব নিয়ে।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬

দেবতার মতো, অসুরের মতো—
দুই ধরনেরই মানুষ আছে এ লোকে ;
দৈব স্বভাব অনেক বলেছি,
আসুর স্বভাব শোন মোর মুখ থেকে।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

– শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, ১৬

অসুর-স্বভাব মানুষ যাহারা
নাইকো তাদের ধর্মাধর্ম-জ্ঞান,
তাদের নিকটে আচার, শুচিতা,
সত্য আদির নাইকো কোনই স্থান।
তারা বলে, 'নাই ঈশ্বর, নাই
সত্যও কিছু এই জগতের নিয়ন্ত্রণে বা মূলে।'
বলিয়া বেড়ায়, 'ধর্মাধর্ম-
নিয়মে চলিছে জগৎ, একথা একেবারে যাও ভুলে,
জীবনেব হেতু জগতের হেতু
নহে ঈশ্বর, নহে আব কিছু, কামই ইহার হেতু—
স্ত্রী ও পুরুষে মিলন হতেই
উদ্ভূত জীব, (কামই চালক, জগৎ-জীবন-সেতু')
নষ্টস্বভাব, অল্পবুদ্ধি,
উগ্রকর্মা এসব লোকেরা এরূপ ধারণা নিয়ে
জন্মে কেবল এই পৃথিবীকে
ধ্বংস করিতে, অহিত কর্মে সর্বদা রত হ'য়ে।
জন্মে-জন্মে আসুর স্বভাব
সঙ্গে নিয়েই আসে তারা বারে বারে,
(উর্ধ্বগতি তো হয় না তাদের,)
পায় না আমায়, তাই নেমে যায় ক্রমেই নিম্ন স্তরে।

কথাপ্রসঙ্গে

অগ্রগতি না অধোগতি ?

কোন উচ্চস্থানে উঠা, সে আক্ষরিক অর্থেই হউক বা আলঙ্কারিক অর্থেই হউক, কঠিন, কষ্টকর এবং সময়ও তাহাতে বেশী লাগে। নামা সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ। নামার পথ যেন আমাদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে নীচে টানিয়া আনে। উহা গড়ানে পথ, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'কলম-বাড়া' পথ। নামিবার সময় টের পাওয়া যায় না, উপরের দিকে তাকাইলে তখন বোঝা যায় কোথা হইতে কোথায় নামিয়া আসিয়াছি। একথা ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয়ভাবেই, এবং আদর্শ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সত্য। ভাঙা-গড়ার ব্যাপারেও একই কথা।

আজ আমরা আমাদের দেশের যুবকগণকে এবং দেশনেতাগণকে একবার উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি—কোথা হইতে আমরা কোথায় নামিয়া আসিয়াছি, এবং সমাজকেও নামাইয়া আনিয়াছি আমাদের আদর্শ ও সংস্কৃতি হইতে কত নিম্নে! আমরা কি এইভাবে ক্রমবর্ধমান গতিতে একেবারে নীচে নামিয়া জাতির সমস্ত সংস্কৃতি ও সদ্‌গুণগুলি ক্রমে ধ্বংস করিয়া সভ্যতার বাল্যাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাই বা নিম্নের কোন খাদে পড়িয়া জাতি হিসাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে চাই? জাতির বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধানে আমরা কি নিজস্বতা ভুলিয়া মেরুদণ্ডহীন বিচার-বিবেক লইয়া অন্ধভাবে পরানুকরণের উন্মত্ততাকেই এখনো প্রগতি বলিয়া ভাবিতে চাই?

বর্তমান যুগে শুধু ভারত নয়, গোটা পৃথিবীই একটি যুগসন্ধিক্ষণের ভিতর দিয়া চলিতেছে। সভ্যতার উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত মানুষ বাহিরের ও ভিতরের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মানবসভ্যতাকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছে। কেবল বহিঃপ্রকৃতির সহিত লড়াই করিয়া বিজ্ঞান-শিল্প-কৃষি প্রভৃতির উন্নতি এবং নিত্য নূতন ভোগোপকরণ-সংগ্রহের ইতিহাসই, কেবল অন্নবস্ত্র ও বাসগৃহের সংস্থান ও উন্নতিই সে সভ্যতার উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি নয়। মানুষের মনের উন্নতি, তাহার হৃদয়ে অপরের প্রতি স্নেহ সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলির উন্নতি, এবং সর্বোপরি তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি যাহা তাহাকে অপরের সেবায় নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করে, যাহা তাহার মনে আনন্দ ও শান্তি লাভের পথ দেখায় (যে সুখ ও শান্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তরেরই, অন্তঃপ্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল, ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের জন্য সংগ্রামের উপর নহে) —এগুলিও তাহার মাপকাঠি। বরং বলা যায় যথার্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠি এইগুলিই। অবশ্য জাগতিক প্রয়োজনকে বাদ দিয়া নিশ্চয়ই নহে।

বর্তমান জগতে দ্বন্দ্ব চলিতেছে এইখানেই—একদল চাহিতেছেন কেবল জাগতিক প্রয়োজনের উপরই সব জোর দিতে, জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর বোধে সর্ববিধ প্রাচীন সংস্কৃতিকে নির্বিচারে ধ্বংস করিতে, আর অপর দল চাহিতেছেন সেগুলির ভাল-

মন্দ সব কিছুকে আঁকড়াইয়া থাকিতে।

ভারত কোন্ পথে চলিবে? যে পথে একদল লোক বর্তমানে চলিতে শুরু করিয়াছেন এবং আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির, আমাদের বহু যুগের সাধনালব্ধ সংস্কৃতির সুউচ্চ শিখরের অবস্থান হইতে নামিয়া নিম্নাভিমুখী হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, এবং জাতিকে টানিয়া নামাইতে চাহিতেছেন, ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন আমাদের জাগতিক উন্নতিসাধনের জন্য এরূপ করিবার কোন প্রয়োজন আছে কিনা। কালবশে সর্বত্র গলদ কিছু না কিছু না আসেই, উহার সংস্কার নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা কিছু শুভকর, ব্যক্তির পক্ষে জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর, তাহার সব কিছুকে এভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রচেষ্টার কোনই প্রয়োজন নাই। ইহা আত্মঘাতী প্রচেষ্টা, উন্মত্ততা। আমরা কি সকলকে সমানভাবে ভালবাসিতে চাই? সমভাবে সকলের কল্যাণ করিতে চাই? জনসাধারণের সেবায় আত্মদান করিতে চাই? জীবনে ইহা অপেক্ষা কল্যাণের কথা আর কি থাকিতে পারে? এরূপ করিতে হইলে নিশ্চয়ই ইহার পথের বাধাগুলিকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান বা যে আদর্শগুলি মানুষের কল্যাণসাধনেই রত, মানুষকে শিক্ষিত করিবার, অপরের সেবায় আত্মনিবেদন করিবার মতো মানসিক প্রস্তুতিদানে রত, সেগুলি কি পথের বাধা? শিক্ষা, কিছুটা সংযম, কিছুটা আত্মত্যাগ ছাড়া কোন সমাজই টিকিতে পারে না, উহা না থাকিলে স্বার্থপরতাই পরার্থের ছদ্মবেশে আসিয়া সমাজকে ও জাতিকে আত্মসংঘর্ষের মধ্যে টানিয়া আনে ও ধ্বংসের পথে তাহার গতিবেগ ত্বরান্বিত করে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য—পারিবারিক জীবনে, সমাজজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে সর্বত্রই। 'দাসসুলভ পরানুকরণস্পৃহা' ত্যাগ করিয়া নিজের বিচারবিবেক লইয়া পৃথিবীর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা আজ চোখে না পড়ার কোন কারণ নাই। অথচ অদৃষ্টের কি পরিহাস, মানবপ্রেমের নামে, সাম্যের নামে, সেবার নামে আজ আমরা অম্লানচিত্তে ত্যাগ ও সংযমের আদর্শকে, যাহা মানুষকে মানবপ্রেমের, সাম্যের, সেবার পথে অধিকতর অগ্রসর করায় তাহার সব কিছুকেই পথের বাধা ভাবিয়াই সাম্যের, মানবপ্রেমের পথে অগ্রসর হইতে চাহিতেছি। মানবসেবার নামে আজ মানুষকেই ধ্বংস করিতে চাহিতেছি। সব মানুষকে এক বলিয়া দেখিবার অতি উচ্চ আদর্শের দোহাই দিতেছি, অথচ আমার মতাবলম্বী একদল মানুষ ছাড়া বাকী সকলকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করিতেছি না। ইহার নাম আর যাহাই হউক জাতিপ্রেম বা মানবপ্রেম নহে।

ভারতকে পরাধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিবার যুদ্ধে যাঁহারা আত্মদান করিয়াছেন তাঁহাদের কি স্বজাতিপ্রেম ছিল না? তাঁহারা কি জনগণের জাগরণের জন্য নিজ নিজ জীবনযৌবন-আশা-আকাঙ্ক্ষা বলি দেন নাই? তাঁহারা কি বিপ্লবের আগুন বাহিরে ও জাতির অন্তরে জ্বালেন নাই? কিন্তু তাহার জন্য তো তাঁহাদের মানুষের উচ্চতর মনোবৃত্তিগুলিকে বিসর্জন দিতে হয় নাই, উচ্চ আদর্শকে বলি দিতে হয় নাই। বরং সংযম, ঈশ্বরবিশ্বাস, ত্যাগ প্রভৃতিই ছিল তাঁহাদের প্রেরণার উৎস। 'মানুষ' থাকিয়াই তাঁহারা সব করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহাদের 'অমানুষ' হইতে হয় নাই।

আমরা আজ আচ্ছন্ন-দৃষ্টি হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে বহু নিম্নে নামিয়া আসিয়াছি, এবং আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়িয়া জড়বাদী হওয়াকেই প্রগতি, উন্নতি, ঊর্ধ্বগতি ভাবিতেছি।

এখন সকলেরই একবার ফিরিয়া চাহিবার সময় আসিয়াছে। সকলে হয়তো ইহা বুঝিবেন না। কিন্তু যাঁহারা বুঝিবেন তাঁহাদের কেবল বুঝিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। নিজের দোষ যাহা আছে, আত্মবিশ্লেষণ করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহা সংশোধন করিতে হইবে—যথাসাধ্য ত্যাগ ও সেবার ভাব লইয়া জনগণের উন্নতি-সাধনে স্বেচ্ছায় ব্রতী হইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে জাতির কল্যাণকর আদর্শগুলিকে ভাঙিয়া ফেলার প্রচেষ্টায় বাধা দিতে হইবে সমস্ত কল্যাণশক্তিকে একত্র করিয়া। সংঘবদ্ধতাই শক্তি; সক্রিয়তাই সফলতার মূল; নিষ্ক্রিয় সাধুতা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অর্থহীন।

ভারতীয় আদর্শকে বাঁচাইবার এই প্রচেষ্টা কেবল ভারতের পক্ষেই নয় সারা জগতের পক্ষেই প্রয়োজন। বৌদ্ধিক-উন্নতিপ্রসূত শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির, জগতের সব মানুষকেই সমান ভোগ ও সমান অধিকার দানের প্রচেষ্টার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আদর্শের সমন্বয়সাধন শুধু ভারতের নয়, সারা জগতেরই আজ প্রয়োজন—যদি মানবজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। এই যুগসন্ধিকালে জড়বাদের সহিত সংঘর্ষ হইতে সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাইবার জন্য অবতীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে আর্নল্ড টয়েনবী বলিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ যে জগতে জন্মেছিলেন, তাঁর জীবৎকালেই সে জগৎ এই প্রথম সত্যিই এক-পৃথিবী হ'তে আরম্ভ করেছে। আমরা এখন পৃথিবীর ইতিহাসের এই যুগসন্ধির অধ্যায়ে বাস করছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে আসছে যে, পাশ্চাত্য-প্রারব্ধ এই অধ্যায়টিকে ভারতীয় পরিসমাপ্তি লাভ করতেই হবে—তা না হলে সে অধ্যায় সমাপ্ত হবে মানবজাতির আত্মধ্বংসে। পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যা বস্তুতান্ত্রিক স্তরে আজ পৃথিবীকে এক করেছে ঠিকই; কিন্তু পরস্পরকে জানতে ও ভালবাসতে শেখবার আগেই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে বিশ্বঘাতী মারণাস্ত্র।" তিনি বলেছেন, 'ভারতীয় পন্থাই, মহারাজ অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসনীতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আচরিত ধর্মসমন্বয়ের প্রমাণই হল—এই আণবিক যুগে আমাদের আত্মঘাতী হওয়ার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায়।''

মানবসভ্যতাকে নিজ আধ্যাত্মিক সম্পদ-দানে বাঁচাইবার দায়িত্ব ভারতের স্কন্ধেই ন্যস্ত —স্বামী বিবেকানন্দ একথা বলিয়া গিয়াছেন, আধুনিক যুগের বহু মনীষীও তাহা মনে করেন। সে সম্পদ নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া দেউলিয়া হইয়া আমরা যদি আজ জড়বাদের স্তরে নামিয়া বর্তমান আদর্শের দ্বন্দ্বে সমস্যার সমাধানলাভের আশায় অপরের মতোই হাত পাতিয়া দাঁড়াই, তাহার মত দুর্ভাগ্য ভারতের আর কি হইতে পারে? মানবকল্যাণের দোহাই দিয়া ভারত ও সমগ্র মানবজাতির অকল্যাণসাধন তাহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে?

অবশ্য "এ অবস্থা কখনই হইতে পারে না।" তবে সময়ে সজাগ না হইলে দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে প্রচণ্ডভাবে।

আজ আমাদের ফিরিয়া ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া ঊর্ধ্বাভিমুখী হইতে হইবে, যাহারা নিম্নাভিমুখী তাহাদেরও টানিয়া উপরে তুলিতে হইবে। দেশসেবা মানবসেবা, আত্মত্যাগ, বীরত্বপ্রকাশ করিবার সুযোগের অভাব নাই, অভাব যথাযথভাবে, অকপটভাবে তাহা করিবার মানুষের। 'মানুষ' হইবার ও করিবার পথগুলিকে যেন কোনমতেই রুদ্ধ করিতে না দেওয়া হয় আজ।

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

The Ramakrishna Math
Belur P. O., Howrah
সোমবার, ১লা আষাঢ়
1925

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী,

মায়ী—ঢাকায় তোমাদের সহিত দেখা করিয়া কয়েক দিন ছিলাম, পরে নারায়ণগঞ্জে দুই দিন ছিলাম। বেলুড় মঠে আসিয়া শরীর কিছু ক্লান্তবোধ করিয়াছিলাম। এখন শারীরিক ভাল আছি। এখানকার সকলে ভাল আছেন।

তোমার পত্রমধ্যে প্রফুল্লমায়ী, খুকী মায়ী ও চারুবালা মায়ী (রেণুর মা, যোগেশ ঘোষের পরিবার) সকলের পত্র; দিয়ে দেবে। তোমার পরীক্ষার গেজেট বাহির হইয়াছে কিনা জানিতে ইচ্ছা করি। আজকাল তোমরা সকলে শারীরিক কেমন আছ? আমি যখন কলিকাতায় আসিলাম বড় গরম বোধ হইয়াছিল. দুইদিন বৃষ্টি হওয়াতে এখন ঠাণ্ডা আছে। মায়ী, সদাসর্বদা সৎচর্চা লইয়া থাকিবে, যাহাতে মনে শান্তি থাকে এইরূপ পুস্তক পড়িবে। তোমাকে লেখা বেশির ভাগ। নিজে কত পড়িয়াছ ও শুনিয়াছ। যেন জীবনের উদ্দেশ্যহারা হবে না।

মায়ী. আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছাদি জানিবে, তোমার পিতামাতা ও বাড়ীর সকলকে জানাইবে। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সকলকে সুস্থশরীরে ও মনের শান্তিতে রাখুন।

তোমাদের
শ্রীসুবোধানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Sri Ramakrishna Math,
Belur, Howrah,
শনিবার, ২৩শে শ্রাবণ
1925

কল্যাণীয়া প্রতিভা মায়ী,

অনেক দিন তোমাদের কোনো সংবাদ পাই নাই। আমি ১০।১২ দিন পূর্বে তোমাকে ও খুকী মায়ীকে লিখেছি, তারও কোনো উত্তর পাই নাই। তোমরা সকলে কেমন আছ জানাবে। এখানে আমি ও মঠের সকলে ভাল আছি।

আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবে ও সকলকে জানাবে। কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

The Ramakrishna Math,
Belur P. O., Howrah
শুক্রবার, ২৯শে শ্রাবণ
1925

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী,

মায়ী,—অনেক দিন পরে এক পোষ্টকার্ড ও এক পত্র একসঙ্গে পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। পত্রের সম্বন্ধে খুকী মায়ীর পত্রে সমস্ত লিখেছি।

মঠের সব সাধুরা ভাল আছেন। তাঁহাদের শুভাশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। আমার শরীর এখনো দুর্বল আছে, ৩।৪ দিন জ্বর বন্ধ হইয়াছে।

শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্; ঔষধং জাহ্নবীতোয়ম্, বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ। যখন যাহা হবার হবে, আমি তাতে কিছুমাত্র ভয় খাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে, যার হেথায় নাই, তার সেথায় নাই।" ইহলোক ও পরলোকের বিষয় ঠাকুর ঐ রকম বলিতেন, এখানে যে রকম সঙ্গ, সেখানে সেই রকম সঙ্গ।

আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবে না। নামেতে কালপাশ কাটে, সামান্য ২ চিন্তা দূরে পলায়।

মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে, সকলকে জানাবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Sri Ramakrishna Math
Belur, Howrah
সোমবার, ১৯ আশ্বিন
1925

কল্যাণীয়া মায়ী,

সম্প্রতি তোমার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত ও সুখী হইলাম। তোমার পূর্ব পত্রও পাইয়াছি। এখানকার সব ভাল আছেন ও আছি। তোমরা সকলেই সাধুদের শুভাশীর্বাদ

জানিবে। আমাকে ৺কালীপূজার পর নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাতে যাইতে হইবে। কারণ বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযামিনীলাল রায়চৌধুরী তাঁর বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁদের ইচ্ছা ঠাকুরের সময়ের লোক কেহ উপস্থিত থাকেন। এখান হইতে এখন আর কেহ যাইতে পারিবেন না। সুতরাং আমাকে যাইতে হবে। ঢাকায় আবার সকলের সহিত দেখা হইবে। আজকাল শারীরিক ভাল আছি। মায়ী, তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে ও সকলকে জানাবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

ভুবনেশ্বর পোঃ

পুরী জিলা, ২১শে জ্যৈষ্ঠ

কল্যাণীয়া মায়ী,

তোমার পত্র ও সেই সঙ্গে তোমার দিদির পত্র বেলুড় মঠে আমি পাইয়াছিলাম। আজ ৪ দিন এখানে আসিয়াছি ও শারীরিক ভাল আছি। গতকল্য বৈকালে খুব বৃষ্টি ঝড় হইয়াছিল। সেইজন্য আজকে বেশ ঠাণ্ডা আছে। মধ্যে ভয়ানক গরম এখানে বোধ করিয়াছিলাম। ভেবেছিলাম এত গরম সহ্য হবে না। ৺পুরী জগন্নাথ চলিয়া যাইব ও সেইখানে থাকিব। এখন ঠাণ্ডা পড়িয়াছে এইখানেই থাকিব। ভগবান মানুষকে দুঃখ, কষ্ট, মনোমালিন্য দেন, আবার তিনি নিজে সমস্ত ভাল করেন, যেমন ধোপারা আছাড় দিয়া ময়লা কাপড় পরিষ্কার করে, যতক্ষণ না পরিষ্কার হয়, আছাড় দিতে ছাড়ে না। সেইজন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা—ঠাকুর, সহ্য-গুণ দাও, সুখে দুঃখে তুমি সহায়, আমি যদি ভুলে যাই, তুমি আমায় ভুলো না। নানারকম সুখদুঃখ নিয়ে সংসার। সকলে আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে। খুকীমায়ীকে ও তোমার দিদিকে জানাইবে। আমার পত্র লিখিতে দেরি হইলে চিন্তিত হবে না।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

আমার আহার্য্যাদি এখন সকল রকম হয়। আলু ও মিষ্ট জিনিস কম খাই। আর এখানে বাজারে শাক সবজী তাই ভাল পাওয়া যায় না। কলিকাতা হইতে আনাইতে হয়। গতকল্য বৈকালে ছোটো হায়না বাঘ বেরিয়েছিল। মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। এই স্থানটি বড় মনোরম

S.

বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চল্লিশ বৎসর ধরে গৌতমবুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন বোধিলাভের পর থেকে। তাঁর ধর্মের ভিত্তি ছিল চার আর্যসত্য। এই আর্যসত্যগুলির মধ্যে ছিল তপোবনের বাণীরই প্রতিধ্বনি। সমস্ত উপনিষদ্‌গুলির ভিতর দিয়ে একটি মূল সুরের সুরধুনী প্রবাহিত হচ্ছে। এই মূল সুরটি হোলো, "সকলেতে আমি, আমাতে সকল।" বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে সমস্ত ব্যক্তিসত্তার এই আনন্দময় বিস্তারের ঔপনিষদিক সত্যকেই গৌতমবুদ্ধ সর্বসাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সম্পদ ক'রে তুললেন, যদিও তিনি বেদের প্রামাণ্য মানতে বলেন নাই, খোলাখুলিভাবে উপনিষদের নামও করেন নাই। প্রেমধর্মের কথা শাস্ত্রের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকলে কি হবে? সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাক্যে ও কর্মে সেই প্রেমধর্ম আচরিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে। বুদ্ধ তাই যাগ-যজ্ঞ এবং ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলির উপরে জোর দিলেন না; এমনকি, বেদের প্রামাণ্যও অগ্রাহ্য করলেন। জোর দিলেন আমাদের খুঁটিনাটি আচরণগুলির উপর। আমাদের বাক্য এবং কর্ম এমন হওয়া চাই যাতে কেউ মনে দুঃখ না পায়, যাতে পৃথিবীর কারও অনিষ্ট না হয়, সেই বাক্যে ও কর্মে থাকবে না স্বার্থপরতার কালিমা, লোভের গন্ধ, ক্রোধের প্রকাশ। গৌতমবুদ্ধ বস্তুত: উপনিষদের ভাবকেই সাধারণের ভাষায় সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দিলেন।

বুদ্ধের মহানির্বাণলাভের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরে এই ভারতবর্ষের আর একজন সর্বত্যাগী গৈরিকপরিহিত সন্ন্যাসী বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্তে পরিণত করার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দও খোলাখুলিভাবেই উপনিষদ্ প্রচার করলেন জনসাধারণের মধ্যে। উপনিষদের অদ্বৈত তত্ত্বের উপলব্ধি বিবেকানন্দের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল। "সকলেতে আমি, আমাতে সকল, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।"—স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি'র এই দুইটি লাইনে উপনিষদের অদ্বৈত ভাবেরই প্রতিফলন। সকলের মধ্যে নিজেকে দেখলে কাউকে হিংসা করা চলে না। স্বামীজী উপনিষদে প্রচারিত এবং গীতায় ব্যাখ্যাত 'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি' শ্লোকের ভাষ্য প্রসঙ্গে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের বক্তৃতায় পাঞ্জাবের যুবকদের সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, "Know through Advaita that whomsoever you hurt, you hurt yourself, they are all you." যে-বেদান্তে আত্মকেন্দ্রিকতার মহাপাপকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি, যে-বেদান্ত অকুণ্ঠভাষায় ঘোষণা করেছে নিজের সমস্ত সত্তাকে সকলের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে, সর্বজীবের সুখকে নিজের সুখ এবং দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে ভাবতে, সেই বেদান্তের জন্মভূমি ভারতবর্ষে মানুষের প্রতি মানুষের আচরণে কী অমানুষিক নিষ্ঠুরতার প্রকাশ! জনসাধারণকে প্রতিদিনের আচরণের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে, দাসত্ব করবার জন্যই তাদের জন্ম। দাসত্ব করবার জন্যই তাদের জীবন-ধারণ! তাদের স্পর্শ

করলেও দেহ অশুদ্ধ হয়। জীবনে তাদের কোনো আশা নেই। উচ্চ শ্রেণীর কাছ থেকে এই রকম ব্যবহার যুগযুগান্ত ধরে পেতে পেতে জনসাধারণ নিজেদের দাস ব'লেই বিশ্বাস করেছে, বিশ্বাস করেছে দাসত্ব করবার জন্যেই তাদের জন্ম এবং প্রাণধারণ। স্বামীজী তাই হৃদয়ের গভীরতম বেদনার অনুভূতি থেকে বললেন লাহোরের ভাষণে: Aye, in this country of ours, the birthplace of Vedanta, our masses have been hypnotised for ages into that state. To touch them is pollution; to sit with them is pollution!

স্বামীজী দলিত, মথিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত জনসাধারণের অপরিমেয় দুঃখকে অনুভব করেছিলেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে। এদের দুর্গতির পঙ্ককুণ্ড থেকে টেনে তুলে মানুষের মতো বাঁচতে সাহায্য করাই যে যুগধর্ম, এই কথা স্বামীজী প্রচার করলেন। বললেন শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার ক'রে মানুষ জীবসেবায় প্রবৃত্ত হবে কেন? স্বামীজী বললেন, সব ধর্মেই বলা হয়েছে পরোপকারই নীতির মর্ম, the essence of all morality. কিন্তু কেন আমরা আত্মকেন্দ্রিক না হ'য়ে অন্যের ভালো করবো, তার ব্যাখ্যা একমাত্র বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বেই আছে। বেদান্তই শুধু বলেছে, হিংসা করবে কাকে? সকলের মধ্যে যে আমিই। অন্যকে হিংসা করলে নিজেকেই যে হিংসা করা হয়। স্বামীজী তাই বললেন, Here, in Advaita alone, is morality explained. জনসাধারণের অশেষ দুর্গতির জন্য বিবেকানন্দ আর কাউকে দায়ী করলেন না; দায়ী করলেন স্বদেশের শিক্ষিত সমাজকে যারা জনসাধারণের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে কেবল নিজেদের কোলে ঝোল টেনেছে, জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বললেন, we are to blame. বললেন, "দাঁড়াও, সাহস অবলম্বন করো, বলো, অপরাধ আমাদেরই।" এই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থসর্বস্ব অভিজাত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মনটাকে জনসাধারণের দিকে ফেরানো যায় কেমন ক'রে? যদি তাদের চেতনায় চিন্তার একটা নূতনতর ধারাকে বইয়ে দেওয়া যায়। কারণ 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'। যার যেমন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস অথবা চিন্তা তার জীবনও তদনুরূপ হবে। উপনিষদে ও গীতায় সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে দেখার কথা আছে। বিশ্বের অধমতম জীবের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তার গভীর অনুভূতির মধ্যে যে পরমসত্য রয়েছে সেই ঔপনিষদিক মহাসত্যকে স্বামীজী নব্য ভারতের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করতে কৃতসংকল্প হ'লেন। হাঁ, তুমি এবং আমি কেবলমাত্র পরস্পরের ভাই নই। এই ভ্রাতৃত্বের কথা সকল মহৎ সাহিত্যই প্রচার করেছে। কিন্তু তুমি আর আমি আসলে এক—দুই নই। স্বামীজী বললেন, "এই ঐক্যই ভারতীয় দর্শনের অমোঘ বাণী। এই ঐক্যকে আশ্রয় ক'রেই সমস্ত নীতিশাস্ত্র এবং সমস্ত অধ্যাত্ম-চেতনার যৌক্তিকতা!" তুমি আর আমি এক—এই ঐক্যবোধের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত ক'রে স্বামীজী বললেন, "This is the dictate of Indian philosophy. This oneness is the rationale of all ethics and all spirituality."

স্বামীজী বললেন, সমস্ত অশুভের মূলে ভেদবুদ্ধির প্রাবল্য এবং সমস্ত কল্যাণের উৎস সাম্যে বিশ্বাস, সবকিছুই মূলতঃ সমান এবং এক, এই বিশ্বাস। বললেন, এই সাম্যের

এবং ঐক্যের আদর্শই বৈদান্তিক আদর্শ। This is the great Vedantic ideal. স্বামীজী তো আমৃত্যু প্রেমধর্মের কথাই প্রচার ক'রে গেলেন। আর উপনিষদকেই তিনি আশ্রয় করেছিলেন প্রেমের ধর্ম প্রচার করবার জন্য। "It is love and love alone that I preach, and I base my teaching on the great Vedantic truth of oneness and omnipresence of the Soul of the Universe." "ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়। মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।"

কিন্তু শাস্ত্রে একটা আদর্শ লিপিবদ্ধ থাকা এক কথা, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আচরণে সেই আদর্শের প্রয়োগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। স্বামীজী বললেন, It is very good to point out an ideal but where is the practical way to reach it? পারস্পরিক প্রীতির ও সহযোগিতার আদর্শকে সমাজজীবনে সত্য ক'রে তোলার বিরাট সমস্যার সামনে বিবেকানন্দ এবং বুদ্ধ দু'জনকেই দাঁড়াতে হয়েছিল। সমস্যার সমাধানের একই পথ উভয়েরই কাছে দেখা দিয়েছিল। সাম্যের এবং ঐক্যের মহা-আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জনসাধারণের চেতনায়। ঔপনিষদিক অনাসক্তির ও প্রেমের আদর্শকেই সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দেওয়াই ছিল গৌতমবুদ্ধের জীবনব্রত। উপনিষদে কীর্তিত প্রেমের আদর্শে সকলকে, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবার জন্য দেশময় বেদান্তপ্রচারকে বিবেকানন্দও কি তাঁর ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন নি? জীবন-যাপন করতে হবে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ'—এই বাণী দেশময় ঘুরে ঘুরে বুদ্ধ প্রচার করলেন চল্লিশ বৎসর কাল। বিবেকানন্দ ইহলোকে ছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বৎসর। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোর ঐতিহাসিক বক্তৃতা, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মহাসমাধি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর কর্মজীবন সীমিত। কিন্তু তাঁর এক একটি বক্তৃতা যেন এক একটি আণবিক বোমা। সেই বক্তৃতাগুলি ভারতবর্ষের মর্মের গভীরে একটা আলোড়ন নিয়ে এলো। বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক চিন্তার প্রচণ্ড ধাক্কায় মৃতকল্প জাতির মধ্যে দেখা দিল প্রাণের একটা স্পন্দন। স্বামীজীর কণ্ঠেও ধ্বনিত হোলো সেই একই বাণী: "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ।" স্বামীজী বললেন, "Throw away everything, even your own salvation, and go and help others."

আসলে উভয়েরই জীবনব্রত ছিলো জনসাধারণের মধ্যে পরস্পরের জীবনকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো, সকলেরই জীবনের মূল্য সমান, এই সাম্যবোধের মধ্যে যাতে তারা জাগ্রত হয়, সমস্ত মানুষই মূলতঃ এক,—সত্যের এই আলোর মধ্যে নতুন দৃষ্টি তাদের খুলে যায়। তুমি আমি এক, জনসাধারণ ও আমরা এক—উপনিষদের এই অদ্বৈততত্ত্বের মধ্যে বিবেকানন্দ দেখেছিলেন 'The crest-jewel of all spiritual thought'. কিন্তু এত আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হয়েও আমরা লাখো লাখো মানুষকে সমাজের এক-প্রান্তে অস্পৃশ্যতার মধ্যে নির্বাসিত ক'রে রেখেছি। কোটী কোটী মানুষকে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে আমরা আধ্যাত্মিকতার বড়াই করছি। স্বামীজী বললেন, "What we want is not so much spirituality as a little of the bringing down of the Advaita into the material world. First

bread and then religion." উপনিষদের অদ্বৈতবাদ নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি কথা ব'লে কি হবে? ওদিকে কোটী কোটী মানুষের জীবন কাটছে অনশনের অসহনীয় যাতনার মধ্যে। উপনিষদের 'যস্তু সর্বাণি ভূতানি' শ্লোক শুনিয়ে মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায়? তাই বিবেকানন্দ বললেন, ভূরি ভূরি মতবাদের কথা আওড়াতে পারো, তোমাদের মধ্যে লাখো লাখো সম্প্রদায় গজাতে পারে। কিন্তু সবই ভুয়ো যদি হৃদয়ে তোমাদের করুণা না থাকে। স্বামীজী বললেন, "এদেশ দুটো অভিশাপে অভিশপ্ত। প্রথম অভিশাপ আমাদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়টি আমাদের ঘৃণা, আমাদের শুকিয়ে যাওয়া হৃদয়।" উপনিষদের ঐক্যের দিব্যবাণীকে স্বর্গলোক থেকে মর্তালোকে নামিয়ে আনার উপরে জোর দিলেন স্বামীজী। জনসাধারণের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে যে অনুভব করা, তার প্রকাশ হোক দৈনন্দিন আচরণে। এত অধ্যাত্মবাদের ছড়াছড়ির পরিবর্তে আমরা বাস্তব জগতে অদ্বৈতের স্বল্প অংশকেও যদি কাজে লাগাতে পারতাম। যারা দীন, দরিদ্র, উৎপীড়িত তাদের জন্য একটু ভাবতাম! কর্মের মধ্যে আমাদের মানব-প্রীতির একটু পরিচয় দিতাম। আমরা একটু কম আত্মকেন্দ্রিক এবং একটু বেশী মানব-প্রেমিক হোতাম। "The unnumbered millions to whom we have talked of Advaita and whom we have hated with all our strength." মুখে ঐক্যের কথা, অন্তরে ঘৃণা—এই কপটতা স্বামীজীর কাছে ছিল ভয়াবহ।

কিন্তু বিবেকানন্দের জীবন-বাঁশিতে প্রেমের সুর ছাড়া আরও একটা সুর বাজছে এবং সেই সুরটি প্রেমের সুরের তুলনায় যেন আরও বেশী জোরালো! বিবেকানন্দ আমাদিগকে জীবন-যুদ্ধে গাণ্ডীবধন্বার ভূমিকা নিতে আহ্বান করেছেন। এই পৃথিবীতে আমরা যারা বাস করছি, আমাদের সকলের কাছেই তো জীবন একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এই সংগ্রামে পরাজয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়, ভয় পেয়ে বাধার কাছে নতি স্বীকারের দুর্বলতাই সর্বনেশে! ছেলেবেলা থেকেই স্বামীজীর অনুরাগ নিঃশঙ্কচিত্তের ক্ষাত্রতেজের গরিমার প্রতি। ভগবদ্গীতার উপরে প্রদত্ত একটি ভাষণে স্বামীজী বলেছিলেন আমেরিকায় সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে: "পাপ বলতে একটিমাত্রই আছে—সেটি হচ্ছে দুর্বলতা। কিশোরবয়সে আমি কবি মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' পড়েছিলাম। আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল সাধুব্যক্তি হিসাবে একটিমাত্র চরিত্র এবং সেই চরিত্র হচ্ছে শয়তান। একমাত্র সাধু তিনিই যিনি বিপদে কখনো ভয় পান না, সমস্তকিছুর সম্মুখীন হ'তে যিনি প্রস্তুত, হয় জয়, নয় মৃত্যু—এই সংকল্পে যিনি দৃঢ়। ভয়ে অন্যের ইচ্ছার দ্বারা নিজের আচরণকে যেখানে আমরা নিয়ন্ত্রিত হতে দিই, সংসার-সমুদ্রে জীবন-তরী চালানোর ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যেখানে অন্যের ইচ্ছাকে আমরা শিরোধার্য করি রাজভয়ে, লোকভয়ে, মৃত্যুভয়ে—সেখানে মানুষের পর্যায় থেকে আমরা নিঃসংশয়ে নেমে যাই ক্রীতদাসের পর্যায়ে।" অনন্ত সুখের লোভেও শয়তান স্বর্গে দাসত্ব করতে প্রস্তুত নয়। শয়তানের মধ্যে কাপুরুষতার নামগন্ধ নেই। কি পুরুষ, কি নারী সকলের মধ্যেই বিবেকানন্দ দেখতে চেয়েছিলেন নিঃশঙ্ক বলিষ্ঠতার বিকাশ। নিবেদিতা তাঁর গুরুদেব সম্পর্কে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং সেটি হচ্ছে: "শক্তি, শক্তি, শক্তিই ছিলো একমাত্র গুণ যার

উন্মেষ সাধনে যত্নবান হ'তে নারী-পুরুষ সকলকেই তিনি আহ্বান করেছিলেন।" মহাভারতের ভগবদ্গীতার উদ্গাতা কৃষ্ণের কণ্ঠে শক্তিরই বাণী। চিত্তদৌর্বল্যের চরণে নতি স্বীকার করে অর্জুন বৈরাগ্যের পথে পা বাড়াতে যখন প্রস্তুত, কৃষ্ণ বললেন : 'নৈতৎ ত্বয়্যুপপদ্যতে'। বিবেকানন্দ এর ভাষ্য করেছেন : Because you are infinite spirit, it does not befit you to be a slave. কৃষ্ণের কণ্ঠে শান্তির ললিত বাণী নয়, তূর্যধ্বনি। গীতাসিংহনাদকারী এই শক্তিময় কৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রিয় ছিলেন। দাসত্বের প্রতি ঘৃণা এবং স্বাধীনতার অনুরাগ তাঁর ছিলো মজ্জাগত। নিবেদিতার লেখায় আছে : স্বামীজীর গৈরিকবসনের আড়ালে ছিলো বর্মপরা একজন যোদ্ধা। আলখাল্লা কতবার খ'সে খ'সে পড়তো আর দেখা দিতো যোদ্ধার বর্ম। How often did the habit of the monk seem to slip away from him and the armour of the warrior stand revealed !

পদব্রজে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে স্বদেশ সম্পর্কে যে গভীর অভিজ্ঞতা স্বামীজী সঞ্চয় করেছিলেন তার আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন জাতির সমস্ত দুর্গতির মূলে আত্ম-অবিশ্বাস ও ভীরুতা। স্বামীজী তাঁর দেশবাসীদের সম্বোধন করে বললেন : "শতাব্দীর পর শতাব্দী, কমসে কম একহাজার বৎসর ধরে উচ্চবর্ণের লোকেরা, রাজা-বাদশারা, বিদেশীরা এবং তোমাদের আপনজনেরা অত্যাচারে অত্যাচারে তোমাদের গুঁড়িয়ে দিয়েছে ; হে আমার ভ্রাতৃগণ, নিদারুণ অত্যাচার তোমাদের সমস্ত শক্তি নিংড়ে নিয়েছে। তোমাদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গিয়েছে, তোমরা এখন পদদলিত কীটের মতো ! কে তোমাদের শক্তি দেবে ? আমি বলছি তোমাদিগকে, এখন শক্তিতেই আমাদের প্রয়োজন আর শক্তি অর্জনের প্রথম সোপান উপনিষদ্‌কে আশ্রয় করা এবং বিশ্বাস করা—আমি আত্মা, অনন্ত শক্তির আধার।" বিবেকানন্দ আমৃত্যু উপনিষদ্ প্রচার করে গেলেন একটা নির্বীর্য, আশাহত তমোভাবাপন্ন জাতিকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এবং জাগ্রত করবার জন্য। স্বামীজী বললেন, "অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ কোন বাদই প্রচার করতে চাইনে আমি পৃথিবীতে। একটিমাত্র 'ইজ্‌ম্'-এ আমাদের এখন প্রয়োজন আছে এবং সেটা হ'চ্ছে - this wonderful idea of the Soul—Its eternal might, Its eternal strength, Its etermal purity, Its perfection." দেহাত্মবুদ্ধির মূঢ়তা থেকেই ভয়ের জন্ম। কাপুরুষতার এবং ক্লৈব্যের রাহুগ্রাস থেকে বিবেকানন্দ জাতিকে মুক্ত কবতে চেয়েছিলেন। তাই দেশময় প্রচার করে গেলেন উপনিষদের আত্মতত্ত্ব। সমস্ত শক্তি দিয়ে দিক থেকে দিগন্তরে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করে গেলেন : "আমরা আসলে আত্মা, যার বিনাশ নেই দেহের নাশে, যার শক্তি কোন কালেই ফুরোবার নয়, যার শুচিতা এবং পূর্ণতা অন্তহীন।" আজন্মসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বললেন, "যদি আমার একটা ছেলে থাকতো তাকে জন্মমুহূর্ত থেকে শোনাতাম, তুমি চির নির্মল আত্মা।" এইবার, বোধ হয়, আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি।

উপসংহারে আবার গৌতমবুদ্ধে ফিরে আসা যাক। 'The Sages of India' বক্তৃতায় বিবেকানন্দ চমৎকার কথা বলেছেন। বলেছেন, "বুদ্ধকে আমরা ভগবানের অবতার বলে পূজা করি। নীতির মর্ম প্রচার করেছেন যাঁরা পৃথিবীতে, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়,

সাহসের দিক থেকে তাঁর জুড়ি নেই ; কর্মযোগী হিসাবেও বুদ্ধ অতুলনীয়। বুদ্ধ অবতারে সেই একই কৃষ্ণ যেন নিজের শিষ্য হয়ে জন্মালেন তাঁর তত্ত্বগুলিকে কেমন করে কাজে পরিণত করা যায় তা দেখাবার জন্য।'' কৃষ্ণ-অবতারে ভগবান গীতায় ঘোষণা করলেন, "নারী হোক বৈশ্য হোক, শূদ্র হোক—সবাই পরম লক্ষ্যে পৌছাবে। "আরও ঘোষণা করলেন, "ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত জেনে যোগী নিজে নিজেকে কখনো হিংসা করেননা এবং এইভাবে চরম লক্ষ্যে উপনীত হন।'' এই যে সাম্যের এবং ঐক্যের পরম বাণী গীতায় ঘোষিত হোলো মেঘমন্দ্রস্বরে—এই বাণীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই যেন "the preacher himself came in another form and this was Sakya-muni, the preacher to the poor and the miserable, he who rejected even the language of the gods to speak in the language of the people, so that he might reach the hearts of the people ; he who gave up a throne to live with beggars, and the poor, and the downcast ; he who pressed the pariah to his breast like a second Rama." (Vivekananda) অর্থাৎ 'গীতার প্রচারক নিজেই এলেন শাক্য মুনির মূর্তিতে ; গরীবগুর্বোদের দ্বারে দ্বারে প্রচার করলেন ধর্ম : জনসাধারণের ভাষায় তাদের মর্মের কাছে তাঁর বাণী পৌছে দেবার জন্য দেবভাষা পর্যন্ত তিনি বর্জন করলেন ; যারা গরীব-দুঃখী, ভিক্ষুক এবং পতিত তাদের সঙ্গে বাস করতে সিংহাসন ছাড়লেন এবং দ্বিতীয় রামের মতো চণ্ডালকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।" এইবার বোধ হয় আমরা অকুণ্ঠ ভাষায় বলতে পারি, বুদ্ধ এবং বিবেকানন্দ কালের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও একই গোত্রের। জনসাধারণের প্রতি উভয়েরই হৃদয়ে কি বিশাল সহানুভূতি। সেই সহানুভূতির বশে গৌতম-বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ জনসাধারণের মধ্যে সাম্যভাব প্রচারকে জীবনের ব্রতহিসাবে গ্রহণ করেছিলেন যাতে সে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আমাদের জীবনকে আমরা নিবেদন করতে পারি, যাতে জনসাধারণের দুঃখে আমাদের শুকিয়ে-যাওয়া হৃদয়গুলি করুণায় অভিভূত হয়, যাতে আত্ম-কেন্দ্রিকতার মহাপাপ ও আদিম পাপ থেকে আমরা মুক্ত হই। বুদ্ধের ও বিবেকানন্দের জীবনব্রতের পরম তাৎপর্যকে বিবেকানন্দের ভাষাতেই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিবেদন করে এই প্রবন্ধ এইবার শেষ করি : "The time has come when the Advaita is to be worked out practically. Let us bring it down from heaven into the earth ; this is the present dispensation.'' জীবনে খুঁটিনাটি আচরণে অদ্বৈতভাবের অনুসরণ করতে হবে। অদ্বৈতভাবকে স্বর্গলোক থেকে নামিয়ে আনতে হবে আমাদের এই ধূলিমাটির পৃথিবীতে। এই হচ্ছে যুগের বিধান।

বিবেকানন্দের গৈরিকের নীচে সৈনিকের বর্ম। বুদ্ধের গৈরিকের নীচে বর্মের কথা ভাবতে কল্পনায় বাধে। শান্ত তথাগতের জীবনদর্শনে বিবেকানন্দের ব্রহ্মই বা কই ?

ভাষার বিচার

অধ্যাপক সুজয়গোপাল রায় পোদ্দার

ভাষা কি ? ভাষার তাৎপর্যই বা কোথায় ? এমন ধারা প্রশ্নের সদুত্তর পাবার প্রয়াস নতুন নয় ; বহুযুগ হতে বহু মনীষী নানান দৃষ্টিকোণ থেকে এমন সব প্রশ্ন নিয়ে অনেক বিচার-বিবেচনা করে মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ঐতিহাসিক, বৈয়াকরণ, বা দার্শনিক—এইসব কোন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রবেশ না করে সহজে অল্পকথায় সর্বজন-বোধগম্য এবং সর্বজনস্বীকার্য ভাবে এইটুকু অন্ততঃ বলা চলে যে, ভাষা হচ্ছে মনের কথা (ভাবনাচিন্তা, সুখদুঃখ কামনাবাসনা) প্রকাশ করার বাহন বা উপায় মাত্র। মনের গহনে ডুবে থাকা অস্ফুট বৃত্তিগুলোকে তার বুকের পরে ভাসিয়ে দিয়ে সর্বজনসমক্ষে তাদের ফুটিয়ে তোলার কৌশল হলো ভাষা।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য কিন্তু নয় ভাষার একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা। ভাষা তার উদ্দেশ্য সাধনে কতটা সিদ্ধিলাভ করেছে—এই মূল্যায়নটুকুই হলো বর্তমান আলোচনার প্রথম এবং প্রধান প্রেরণা।

শেষ থেকে শুরু করে সহজ কথায় বলা চলে যে, ভাষা তার আপন লক্ষ্যলাভে বেশী-দূর এগুতে পারেনি। কিছুটা পথ অতিক্রম করেই তাকে থেমে যেতে হলো। বিজয়ী বীরের বহু আকাঙ্ক্ষিত বরমাল্য তার কণ্ঠের শোভা হতে পারেনি। ভাষা যেন অর্ধপথ-গামী, শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিঃশেষিতপ্রাণ কোন এক পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী—দুর্বার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বুঝি বা বিধির কোন অদৃষ্ট বিধানে পথ চলার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে আর এগিয়ে যেতে অক্ষম ; দূর থেকে তার ইষ্টকে প্রণাম করেই তাকে তৃপ্ত থাকতে হয়। ভাষা চায় ভাবকে তুলে ধরতে, কিছুটা তুলে বুঝি বা ভাবের ভার সইতে না পেরে সে লজ্জায় পিছু হটে যায়। ভাবের কাছে ভাষার এইখানেই হার।

আমাদের এই সিদ্ধান্তটি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝে নেওয়া যাক। 'দুধ হয় সাদা' —এটি একটি ভাষায় প্রকাশিত মানসিক প্রক্রিয়া যার নাম অবধারণ বা বিচার। চোখ মেলে 'দুধ' নামক বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করে মনে মনে 'দুধ হয় সাদা' এমন বিচার করার পর যখন ঐ বিচারটিকে হয় কথায়, না হয় লেখায় রূপদান করি, তখন আসল 'দুধ' এবং তার 'সাদাত্ব' থাকে অনেক দূরে। 'দুধ' এই শব্দটি তো আর সত্যিকারের দুধ নয়। আসল দুধ হলো সেই দুধ যা একটু আগে কোন একটি পাত্রে সংরক্ষিত আছে বলে চোখ দেখতে পেয়েছে। সুতরাং 'দুধ' এই পদটি আসলে মূল দুধের প্রতিনিধি বা ছায়া মাত্র। ছায়া তো আর কায়া হতে পারে না। কায়া আসল, ছায়া নকল। তাই সহজেই অনুমেয় যে, 'দুধ' এবং 'সাদা' এ দুটি শব্দ বা ভাষারূপ দুটি আসল বস্তুসত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা অপ্রত্যক্ষ ধারণা যোগায় মাত্র। 'দুধ' শব্দটি কখনই সেই শ্বেতবর্ণ পুষ্টিকর একটি তরল পদার্থের—সম্পূর্ণ পরিচিতি প্রদান করতে পারে না। ঐ রকম কোন একটি পদার্থ বস্তুত যে আছে এমন

একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা সে দিতে পারে মাত্র। আসল 'দুধ' প্রকাশিত হয় সুস্থ ইন্দ্রিয় এবং সচেতন প্রকৃতিস্থ মনের কাছে। এমনি ভাবে এমনি প্রমাণ করা যেতে পারে যে আমরা কথায় যা বলি, লেখায় যা তুলে ধরি, এককথায় ধ্বনি ও চিত্র, শব্দ এবং রেখা'র মাধ্যমে যখন আমরা ভাবকে প্রকাশ করি তখন ভাব যথার্থই প্রকাশিত হয় না। আসল বস্তুটি, যাকে কেন্দ্র করে ঐ ভাব, তা নিশ্চয়ই উচ্চারিত বা চিত্রিত কোন শব্দ নয়, কারণ উচ্চারিত এবং চিত্রিত শব্দ আসল বস্তুটির চরিত্র বহন করে না এবং সেই অনুসারে কার্যও করে না। 'দুধ' পান করে স্বাস্থ্যের পুষ্টি-সাধন হয় সত্য, কিন্তু 'দুধ' শব্দটিকে তো আর পান করা যায় না এবং সেজন্য শুধুমাত্র 'দুধ' শব্দটি আমাদের স্বাস্থ্যলাভের কারণও হয় না। সুতরাং বোঝা গেল যে ভাষায় প্রকাশিত বস্তুটি অর্থাৎ শব্দটি আসল বস্তু নয়; আসল বস্তু বা বস্তুসত্তা এমনি ভাবে কখনও প্রকাশযোগ্য নয়। কোন কথার বাঁধনে বা লেখার মায়াজালে বস্তুসত্তাকে বন্দী করা যায় না। এখানে একটি আপত্তি উঠতে পারে যে আমরা দুধ দেখে যখন সঙ্গে সঙ্গে বলি 'দুধ হয় সাদা' তখন আসল দুধ তো সামনেই থাকে—সে তো অপ্রকাশ্য থাকে না। উত্তরে বলি,—এমন অবস্থায় দুধ প্রকাশিত হয়েছে সত্যি, কিন্তু 'দুধ' এই শব্দটির দ্বারা নয়—তা সম্ভব হয়েছে দুধ-এর সঙ্গে আমাদের চক্ষু ও মনের মিলনের ফলে—এটা হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞান। 'দুধ হয় সাদা'—একথা না বললেও দুধ আমাদের কাছে সাদা বলেই মনে হতো। এই স্থলে সাদা দুধের অস্তিত্ব আমাদের বলার উপর নির্ভর করে না। চোখ বন্ধ করে যখন বলি দুধ হয় সাদা—তখন এই উক্তিটি কিন্তু 'সাদা দুধ' নয়—আসল 'সাদা দুধের' প্রতি একটি ইঙ্গিত মাত্র। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কোন রকম অপত্তি থাকার কথা নয় যে, সত্য অথবা বস্তুসত্তা কখনই ভাষায় সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ ভাষা তার স্বধর্মপালনে নিতান্তই অক্ষম। এই হিসেবে ভাষা বড দীন, বড় অসহায়। বিশেষণের অলংকারে ভাষাকে যতই সাজিয়ে তোলা হোক না কেন, সে আসল বস্তুসত্তাকে কখনই পূর্ণভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারে না।

এই সিদ্ধান্ত যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহলে অতীন্দ্রিয় অসীমের বেলায় যে এর যাথার্থ্য আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতীন্দ্রিয় জগতের কথা বলতে গিয়ে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা নানা ভাবে এই কথাই শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে এ হলো 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—'বোঝে প্রাণ বোঝে যার।' ইহা যে শুধু বাক্যের (ভাষার) অতীত তাই নয়, আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে ঋষিরা বলেছেন যে, পরমসত্য মনেরও নাগালের বাইরে (ভারতীয় দর্শনে মনকেও একটি ইন্দ্রিয় বলে অভিহিত করা হয়)। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বোধির বোধে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণে সেই সত্য উদ্ভাসিত হয়। অসীম নীরবতায় অনন্ত প্রশান্তিতে সেই অতীন্দ্রিয় পরম সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে থাকে, সেখানে সবকিছু মিলে মিশে শুধু এক অদ্বৈত সত্তার অস্তিত্বই শেষ পর্যন্ত বর্তমান থাকে।

প্রশ্ন হতে পারে—পুঁথিপত্রে, শাস্ত্রগ্রন্থে, গুরুমুখে কত যুগ যুগ ধরে কত যে বিচিত্র বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছে এই সত্যকে কেন্দ্র

[শেষাংশ ৩৭৫ পৃষ্ঠায়]

উত্তরাখণ্ড তীর্থ-পরিক্রমা

স্বামী তেজসানন্দ

(১)

তত্ত্বজ্ঞানেপ্সু সাধকের প্রতি শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের নির্দেশ

এই অনিত্য সংসারের বন্ধুর পিচ্ছিল পথে বিচরণকারী মানুষ যখন দিশাহারা হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে শান্তির অমিয়ধারায় অবগাহন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন কোলাহল-মুখর এই সংসার হইতে দূরে কোন নির্জন স্থানে প্রকৃত শান্তি ও বিশ্রামের আশায় সে উদগ্র আগ্রহে ছুটিয়া যায়। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে অন্তরের জন্ম-জন্মান্তরীণ দৃঢ়মূল বাসনাসমূহ সেই অমৃতপথ-যাত্রীর যাত্রাপথে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া পথিককে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া তোলে। অঘটনঘটনপটীয়সী এই মায়ার কবল হইতে কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করা সম্ভব, যুগে যুগে তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ জগতের সম্মুখে স্ব স্ব জীবনের উপলব্ধির মাধ্যমে তাহা মানব কল্যাণে প্রকট করিয়া গিয়াছেন। যোগিরাজ শ্রীভর্তৃহরি তাঁহার অমূল্য 'বৈরাগ্যশতক' গ্রন্থে এই কুহকিনী মায়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন পূর্বক শাশ্বত শান্তির পন্থা নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

"আশানামনদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা,
রাগ-গ্রাহবতী বিতর্ক-বিহগা ধৈর্যদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী,
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি
যোগীশ্বরাঃ॥" ১০

—অর্থাৎ সংসারসুখের আশা যেন একটি মহানদী এবং চঞ্চল মনের অজস্র সংকল্প বিকল্প এই নদীর জল; আর বিষয়-তৃষ্ণাই উহার তরঙ্গ। ইন্দ্রিয়-ভোগাসক্তি এই নদীর কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তু। ভোগ্যবস্তুর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিবিষয়ক চিন্তা ও উদ্বেগ যেন সেই নদীবক্ষে সঞ্চরণশীল পক্ষিসমূহ। নদীর প্রবল প্রবাহ যেমন বৃহৎ বৃক্ষসকলকে উন্মূলিত করিয়া ফেলে তদ্রূপ সংসার-আশা চিত্তের নির্বিকারতাকে ধ্বংস করে। দম্ভদর্প প্রভৃতি অজ্ঞানপ্রসূত নানা মোহ এই আশানদীর অসংখ্য আবর্ত এবং সাংসারিক বহুবিধ দুশ্চিন্তা যেন উহার উচ্চতট। এই মহানদী সত্যই দুরতিক্রম্যা। বিশুদ্ধচিত্ত যোগিবরগণই শুধু এই মহানদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং এই নদী পার হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

এতাদৃশ তপস্বী যোগিবরের স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি আবার বলিয়াছেন—

"ভিক্ষাশী জনমধ্যসঙ্গরহিতঃ স্বায়ত্তচেষ্টঃ সদা,
হানাদানবিরক্তমার্গনিরতঃ কশ্চিৎ তপস্বী
স্থিতঃ।
রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনঃ সংপ্রাপ্তকন্থাসনো,
নির্মানো নিরহংকৃতিঃ শমসুখভোগৈকবদ্ধ-
স্পৃহঃ॥" ৯৫

—অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ অন্নে যিনি শরীর ধারণ করেন, জনসঙ্গে যাঁহার আসক্তি নাই, যিনি স্বচ্ছন্দবিচরণশীল এবং ত্যাজ্য-গ্রাহ্য-বুদ্ধিশূন্য, পথে পরিত্যক্ত ছিন্ন ও পুরাতন বস্ত্রখণ্ডই যাঁহার পরিধেয়, দৈবপ্রাপ্ত কন্থাই যাঁহার আসন, নিরভিমান, দেহাধ্যাসরহিত, বৈরাগ্যজনিত নিরতিশয় আনন্দাভিলাষী,—এমন বিরল ব্যক্তিই যথার্থ যোগী ও তপস্বী।

বলা বাহুল্য, স্মরণাতীত কাল হইতে এই সমুন্নত আধ্যাত্মিক আদর্শ ঋষিমুনিকণ্ঠে ও অধ্যাত্মশাস্ত্রে উদ্গীত হইয়া আসিতেছে এবং এই শ্রেয়ঃপথের পথিকগণই বিমল শান্তির অধিকারী হইয়া ধন্য হইয়াছেন এবং জগদ্বাসীকেও প্রকৃত শান্তি-পথের সন্ধান দিয়া আসিয়াছেন। কর্মকোলাহল মুখর জনপদ হইতে দূরে নির্জনে পার্বত্যপ্রদেশে নিরলম্বভাবে শান্তিতে সাধন-ভজন করিবার আকাঙ্ক্ষা কাহার না প্রাণে জাগিয়া উঠে? আচার্য শঙ্কর ত্যাগ ও তপস্যার মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'কৌপীন-পঞ্চকে' লিখিয়াছেন—

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ
চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু
ভাগ্যবন্তঃ॥ ১॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং
ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু
ভাগ্যবন্তঃ॥ ২॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ, সুশান্তসর্বেন্দ্রিয়-
বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু
ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩॥
দেহাদিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলো-
কয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ
খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৪॥
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি
বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ
খলু ভাগ্যবন্তঃ॥" ৫

—অর্থাৎ, সর্বদা বেদান্তবাক্যে রত, ভিক্ষান্ন-মাত্রের দ্বারা পরিতৃপ্ত, শোকহীন অন্তঃকরণে বিচরণশীল কৌপীনধারীই ভাগ্যবান।

কেবল বৃক্ষমূলে আশ্রয়কারী, ভোজনার্থ হস্তদ্বয়ের সাহায্যগ্রহণকারী, লক্ষ্মীকেও কন্থার ন্যায় পরিত্যাগকারী, কৌপীনধারীই ভাগ্য-বান।

যাঁহারা স্বীয় আনন্দস্বরূপে বিভোর, যাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সুসংযত, দিবা-রাত্র যাঁহারা ব্রহ্মধ্যানে রত সেই সকল কৌপীনধারীই ভাগ্যবান।

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিহীন, অন্তঃকরণে স্বীয় স্বরূপ সাক্ষাৎকারী এবং অন্ত, মধ্য ও বহির্বিষয়ে চিন্তাশূন্য কৌপীনধারীই ভাগ্যবান।

পবিত্রওঙ্কার-উচ্চারণশীল, 'আমি ব্রহ্ম'—এই চিন্তায় নিমগ্ন, ভিক্ষান্নভোজী, দিগ্‌দিগন্ত বিচরণশীল কৌপীনধারীই ভাগ্যবান।

বস্তুতঃ কোন মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে হইলে অধৈর্য হইলে চলিবে না। নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও অসীম ধৈর্যের একান্ত প্রয়োজন। তাই শ্রীমৎ স্বামী গৌড়পাদাচার্য তাঁহার মাণ্ডুক্যকারিকায় তত্ত্বজ্ঞানেপ্সু তপস্বী সাধক-মাত্রকেই ধৈর্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন—

"উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ॥"

৩৮।৪১

—অর্থাৎ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক এক বিন্দু জল তুলিয়া সমুদ্রসেচনের প্রয়াস যেরূপ, (যোগানুষ্ঠানে) অনির্বিণ্ণচিত্তে উদ্যমসহকারে নিগ্রহও ঠিক তদ্রূপ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুরূপ ধৈর্যের নির্দেশ দিয়াছেন—

"শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥"

৬।২৫

অর্থাৎ, ধীরে ধীরে ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে

উপরতি অবলম্বন করিবে এবং মনকে আত্মাতে নিবিষ্ট করিয়া অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করিবে না।

ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, তপস্যাদিকালে অপ্রত্যাশিতভাবে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সাধকের মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিপথগামী করিয়া তোলে। তজ্জন্য সাধুসজ্জনবিহীন নির্জন স্থানে একাকী তপস্যায় নিযুক্ত থাকা অনেকক্ষেত্রে বিপজ্জনক হইয়া উঠে। কারণ, অবচেতন মনে স্তরে স্তরে যে-সকল শুভ ও অশুভ সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, ধ্যান-জপাদির সময় সেই সুপ্তসংস্কারসমূহ একে একে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে এবং অবাঞ্ছিত ও বিরুদ্ধ বৃত্তিসকল সাধককে বিভ্রান্ত ও যোগভ্রষ্ট করিয়া তোলে। তাই বৈদিক যুগ হইতে অদ্যাবধি তত্ত্বদর্শীমাত্রেই সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণার্থে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসজীবনের বিষয়াসক্তি পরিবর্জন ও ত্যাগাদর্শের মহিমা কীর্তন করিয়া যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Song of the Sannyasin' (সন্ন্যাসীর গীতি) কবিতায় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"Have thou no home. What home
can hold thee, friend ?
The sky thy roof, the grass thy bed ;
and food,
What chance may bring, well cooked
or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble
Self
Which knows Itself. Like rolling
river free
Thou ever be, Sannyasin bold ! Say,
Om Tat Sat Om !"—(11).

—"সুখতরে গৃহ ক'রো না নির্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে, হে মহান্ ?
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস ;
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও ;
হউক কুৎসিত, কিংবা সুরন্ধিত,
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
কোন্ খাদ্য-পেয় অপবিত্র করে ?
হও তুমি চল-স্রোতস্বতী মতো,
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।"

এই সমুন্নত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কণ্টকাকীর্ণ জীবনপথে বিষয়াসক্তি পরিহারপূর্বক চলমান-স্রোতস্বতীর ন্যায় চলিতে পারিলে বাঞ্ছিত চরমলক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী আবার ইহাও বলিয়াছেন,—পূর্বোক্ত-শাস্ত্রবিহিত সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শ জীবনে সম্যক রূপায়িত করিতে হইলে ভগবদ্বুদ্ধিতে সর্বজীবের সেবারও একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ ভারতের বেদান্ত শিক্ষা দেয়,—ব্রহ্ম হইতে কীট-পরমাণু সর্বভূতে পরমপ্রেম এক ঈশ্বর বিদ্যমান। বৈচিত্র্যবহুল বিশ্বচরাচর সেই পরমাত্মারূপী ঈশ্বরেরই বিবিধ প্রকাশ। জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়, তাহার নাম দয়া,—উহা প্রেম নহে। আর আত্ম-বুদ্ধিতে জীবের যে সেবা করা হয়, তাহাই প্রকৃত প্রেম। এই আত্মাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে আরও বলিয়াছেন—সকল জীবকেই ঈশ্বরবুদ্ধিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও কৃপা করিতে পার না ; তুমি কেবল

সেবা করিতে পার! তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ। উহা তোমার পূজাস্বরূপ। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভোগ করিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। এইরূপ-ভাবে অপরের সেবা শুভ কর্ম। এই সৎকর্মবলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন।

বলা বাহুল্য, এই ত্যাগ ও সেবাধর্মই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও সকলে এই মহান সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ নিজেদের জীবনে এই সেবাদর্শ জীবন্ত করিরা তুলিয়া যুগ-প্রয়োজনে বনের বেদান্ত ঘরে আনিয়াছেন।

(২)

উত্তরকাশী-তীর্থে

'উত্তরকাশী-মাহাত্ম্যে' বর্ণিত রহিয়াছে যে, মুসলমানগণ যখন পূর্বকাশী (বারাণসী) আক্রমণ করিয়া ৺বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, যখন শিবভক্ত পূজারিবৃন্দ শিব-লিঙ্গের পবিত্রতারক্ষাকল্পে উক্ত শিবলিঙ্গকে তদানীন্তন-টিহরী-গাড়োয়াল রাজ্যান্তর্গত এই এই নির্জন পার্বত্য প্রদেশে আনয়নপূর্বক যথাবিধি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তদবধি এই স্থানটি * 'উত্তরকাশী' নামে জনসমাজে পরিচিত। হিন্দুর ধর্মীয়গ্রন্থোক্ত পঞ্চকাশার অন্যতম এই উত্তরকাশীতেও পূর্বকাশীর (বারাণসীর) অনুকরণে ৺বিশ্বনাথের মন্দির, অন্নপূর্ণা ও কালভৈরবের মন্দির, শক্তিমন্দির এবং মণিকর্ণিকা-শ্মশান ঘাট প্রভৃতি বিদ্যমান। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়,—যে-ভূমিখণ্ডে এই সকল মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত তাহার কিয়দংশ ঘিরিয়া পূর্বকাশীর ন্যায় গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নাতিবৃহৎ এই শহরটিতে তপস্যারত সাধুবৃন্দের কুটীর ও আস্তানা (আশ্রম) এবং তাহাদের ভিক্ষার সুবিধার জন্য কালীকমলী-সত্র, জয়পুর-রাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একাদশরুদ্রের মন্দির দ্বারা পরিচালিত সত্র এবং পাঞ্জাবী-সত্রও রহিয়াছে। ঐ সকল সত্র হইতে সাধু ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগকে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ভিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্তমানে পাঞ্জাবী সত্রের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের অর্থানুকূল্যে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজনের সৌকর্যার্থে কয়েকটি পাকা কুটীর নির্মিত হওয়ায় উত্তরকাশীর মত দুর্গম স্থানে তাঁহাদের তপস্যাদির সুযোগ সুবিধা হইয়াছে। এই উত্তরকাশীতেই অধুনাবিলুপ্ত কেদারঘাটে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়া-নন্দজী মহারাজ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃচ্ছ্রতা, নিষ্ঠা ও আদর্শ জীবন দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উজলীর প্রধান বিদগ্ধ ও উপলব্ধিমান সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী দেবী গিরি মহারাজ পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের তপস্যারত সাধুদের নিকট তুরীয়ানন্দজী মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং মঠ-মিশনের সাধুদের সম্বন্ধেও গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন।

* গুপ্তকাশী (উত্তরপ্রদেশে কেদার বদ্রীর পথে), উত্তরকাশী (বর্তমান উত্তরপ্রদেশে), পূর্বকাশী (বারাণসী অর্থাৎ কাশীবিশ্বনাথ ধাম), ব্যাসকাশী (পূর্বকাশীর গঙ্গার পূর্বকূলে) এবং কাঞ্চী (কাঞ্চীপুরম্,—মাদ্রাজ শহরের ৩৪।৩৫ মাইল দক্ষিণে)।

আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে উত্তরাখণ্ডের হিমাদ্রিক্রোড়শায়ী পুণ্যতীর্থ উত্তরকাশী দর্শন ও সেই তপঃক্ষেত্রে কিছুদিন অবস্থান করিবার অভিপ্রায়ে তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী (শ্রীশ্রীমহাপুরুষ) মহারাজের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া উত্তরাখণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গন্তব্যস্থলে যাইবার পথে কিছু দীর্ঘকাল কাশী-রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে বিশ্রামানন্তর আমাদের মঠকেন্দ্র কিষেণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া উত্তরকাশী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। সেই সুদীর্ঘ পথে একে একে মুসৌরী, কানাতাল, ভল্ডিয়ানা প্রভৃতি হিমালয়স্থ উচ্চ শাখা-শৃঙ্গসমূহ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া এবং পথিমধ্যে কালীকমলী-ধর্মশালায় রাত্রিযাপন ও আহারাদি করিয়া তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় যখন উত্তরাখণ্ডের সেই জনবিরল প্রসিদ্ধ তীর্থ উত্তরকাশীতে ক্লান্তদেহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও কোথায় কোন্ স্থানে আশ্রয় পাইব তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। যে স্থানে উপস্থিত হইলাম তাহার নাম 'উজলী,—উত্তরকাশী শহর হইতে উহা প্রায় এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গোত্রী যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। উক্ত উজলীতে দশনামী, উদাসী, নাথ সম্প্রদায় প্রভৃতির তিতিক্ষাপরায়ণ সন্ন্যাসিগণ গঙ্গার তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ও আস্তানা নির্মাণ করিয়া সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। কিষেণপুর হইতে আসিবার সময় নাগ নাথ নামক নাথ সম্প্রদায়ের জনৈক প্রবীণ সাধু আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ গঙ্গাতীরে একটি আস্তানায় বাস করিয়া তপস্যাদি করিতেন। তিনি কার্যব্যপদেশে হৃষীকেশে আসিয়াছিলেন এবং কয়েকদিন কিষেণপুর আশ্রমেও বাস করিয়াছিলেন। আমি যখন উজলীতে পৌঁছিলাম, তখন আমাদের মঠমিশনের জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী নাগ নাথজীর কুটীরসংলগ্ন অপর একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বিরক্ত মহাত্মাদের পন্থা অবলম্বন করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। আমার নিরুপায় অবস্থাদর্শনে তিনি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীরটি আমার জন্য ছাড়িয়া দিয়া গঙ্গাতীরস্থ অন্য একটি কুটীরে চলিয়া গেলেন। যাহা হউক এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে উক্ত স্বামীজীর সৌজন্যে আশ্রয় পাওয়ায় মনের উদ্বেগ দূরীভূত হইল।

আমি যে-সময়ের কথা বলিতেছি সে-সময় এই সকল তীর্থদর্শনের জন্য যানবাহনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তীর্থযাত্রী সকলকেই পদব্রজে সেই সুদীর্ঘ দুর্গম পার্বত্যপথ অতিক্রম করিতে হইত। এই বিপদ-সংকুল পথে চলিবার সময় তীর্থযাত্রীদের মধ্যে তীর্থ ও দেব-দেবী দর্শনের জন্য প্রবল আগ্রহ ও আকুতি পরিলক্ষিত হইত! যাত্রাপথে তাহাদের কণ্ঠে সানন্দে ধ্বনিত হইত 'জয় গঙ্গামায়ীকী জয়', 'জয় বাবা বিশ্বনাথজীকী জয়'। বদ্রী ও কেদার তীর্থ-দর্শনার্থীদের কণ্ঠেও শুনিয়াছি—'জয় বদ্রীবিশাল কী জয়', 'জয় বাবা কেদারনাথজীকী জয়।' তৎকালে যাত্রীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে ও তাহাদের কণ্ঠোচ্চারিত ভগবানের নাম-গুণগানে সারা রাস্তা মুখরিত থাকিত। বর্তমানে পরিবহনের সুব্যবস্থার ফলে দুর্গম তীর্থাদি দর্শন সহজসাধ্য হওয়ায় কৌতূহলী পর্যটকের মনোভাব লইয়াও বহুজন সেখানে যাইতেছেন।

এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কর্মবিহীন অবস্থায় নির্জন স্থানে সময় কাটাইতে হইলে, দৈনন্দিন জীবনের একটি বাঁধা-ধরা নিয়ম (routine) থাকা প্রয়োজন; নতুবা

সময়ের অপব্যবহার হইবার আশঙ্কা থাকে এবং জীবনও একঘেয়ে হইয়া উঠে। তাই সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠের মাধ্যমে ধ্যানাদিসময়-ব্যতিরিক্ত অন্য-সময়ের সদ্ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক যাহাতে মনকে লক্ষ্যবস্তুলাভে তৎপর ও অন্তর্মুখীন রাখা সম্ভব হয়। পূর্বোক্ত কুটীরের অপ্রশস্ত বারান্দায় উপবেশন করিলে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অগণিত নক্ষত্রখচিত মেঘমুক্ত নীলাকাশ ও তরঙ্গায়িত পর্বতমালার অপূর্ব-শোভা দৃষ্টিগোচর হয়। এখান হইতে তুষারশীর্ষসমুন্নত কেলস্তু পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক তীর্থযাত্রী এই কেলস্তু পর্বতকেই 'কৈলাশ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অদূরে ভাগীরথীর অপর পারে উন্নতশৃঙ্গ পাহাড়ের ক্রোড়শায়ী বৃক্ষবল্লরীবহুল মানা-গ্রামের অধিবাসিগণের ঘরে ঘরে যখন দীপমালা প্রজ্বালিত হইত, তখন সেই পল্লীতে দীপালির শোভা ফুটিয়া উঠিত। সান্ধ্যমুহূর্তে কুটীরের দক্ষিণভাগে অনতিদূরে পর্বতগাত্রে অবস্থিত কৈলাসাশ্রমে শিব-শঙ্করের আরাত্রিক আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত্রত্য সাধু-ব্রহ্মচারি-বৃন্দ শিবমহিম্নঃস্তোত্র সমবেত কণ্ঠে তাল-লয়-সহকারে গান করিয়া স্থানটি মুখরিত করিয়া তুলিতেন। মনে হইত যেন ত্রিদিবের দেবতা-বৃন্দ মর্ত্যধামে অবতরণ করিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের স্তব করিতেছেন। আরাত্রিকান্তে এই অঞ্চলটি পুনঃ গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া যাইত এবং সাধু-সন্ন্যাসিগণও স্ব স্ব কুটীরে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন।

(৩)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

এই পুণ্যতীর্থে অবস্থানকালে কয়েকটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এস্থলে উহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া সংক্ষেপে উহা লিপিবদ্ধ করিলাম :—

(ক) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য-কাহিনী

উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রী ৫৬ (ছাপ্পান্ন) মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই শীতপ্রধান স্থানেও সাধু-সন্ন্যাসী তত্রত্য কালকমলী-সত্র হইতে ভিক্ষাদি গ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরস্থ কুটীরে, কেহ বা গিরিদরীতলে অবস্থানপূর্বক সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করেন। এই দুর্গম প্রদেশে তীর্থ দর্শন, সাধু-সঙ্গ ও পুণ্যার্জন অভিলাষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে গ্রীষ্মকালে তীর্থযাত্রিগণও আগমন করিয়া থাকেন। এখানে বর্ষাকালে অত্যধিক বারিবর্ষণের ফলে, পর্বতগাত্র হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডও ভীষণ শব্দে এবং প্রচণ্ড বেগে নীচে নামিয়া আসে; তাহার ফলে সম্মুখে যাহা কিছু থাকে সবই গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। উত্তরকাশীতে থাকাকালে একদিন সংবাদ রটিল যে, জনৈক নিষ্ঠাবান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গঙ্গোত্রী হইতে সদ্যমৃত্যুর হাত হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে দৈবকৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন এবং তিনি আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। আমিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার এই আকস্মিক বৈরাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,—তিনি একদিন গঙ্গাতীরস্থ কালীকমলী ধর্মশালা হইতে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অন্য একটি স্থানে যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী উচ্চ পর্বতশিখর হইতে প্রচণ্ড বেগে পাথর, কর্দম প্রভৃতির ধস নামিয়া তাঁহার উপর পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে তিনি সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। মনুষ্যজীবনের এই অনিশ্চয়তা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে নির্বেদ

উপস্থিত হওয়ায় তিনি আর গৃহে না ফিরিয়া অবশিষ্ট জীবন এই পবিত্র তপোভূমিতে সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতে স্থিরসংকল্প করিয়াছেন।

জাবালোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বনাদ্বা। · যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ॥" ৪

-- ইহার তাৎপর্য এই যে, মন্দাধিকারীর পক্ষে ক্রম পর্যায়ে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থাশ্রম শেষ করিয়া অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করাই বিধেয়। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ- ইহার যে কোন আশ্রম হইতে তিনি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিতে পারিবেন। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মানুধ্যানের ফলে কি ভাবে সহসা চিত্তে শুভ সংস্কার জাগ্রত হইয়া উহা মানুষকে আত্মজ্ঞানানুশীলনের পথ নির্দেশ করিয়া দেয়, এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জীবনও ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(খ) রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা

উত্তরকাশীর মত নির্জন স্থানে যে-সকল বাঙ্গালী সাধু তপস্যাদি করিতে আসিতেন, তাঁহাদের ধ্যান-ভজনের সময় ব্যতীত অন্য অবসর-সময় কাটাইবার জন্য শাস্ত্রাদিপাঠের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পার্শ্ববর্তী কৈলাসাশ্রমে যে পুস্তকাগার ছিল, তাহাতে অধিকাংশই হিন্দীভাষাভাষীদের উপযোগী গ্রন্থাদি ছিল। বাংলা বা ইংরাজী পুস্তক সেখানে সংগৃহীত হইত না। যাহাতে বাঙ্গালী সাধুদের অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার হয় তজ্জন্য একটি পৃথক লাইব্রেরীর প্রয়োজন ছিল। নাগ-নাথজীর নাতিবৃহৎ আস্তানায় আমার অবস্থানকালে একটি লাইব্রেরীর সূত্রপাত হইয়াছিল। অন্যত্র স্থানাভাববশতঃ সাধু নাগ-নাথজীর কুটীরের প্রশস্ত বারান্দায় একটি ছোট আলমারীতে পুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা হইল। ধীরে ধীরে অনেক ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক সংগৃহীত হইল। এই গ্রন্থাগারের নাম দেওয়া হইল—'রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী' এবং নাগ নাথজীর আস্তানার নাম-করণ হইল 'শিবালয়'; কারণ, উক্ত আস্তানার একপ্রান্তে একটি উচ্চ প্রস্তরের বেদীতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। পরবর্তীকালে বেলুড় মঠের স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ মহারাজ যখন উত্তরকাশীতে তপস্যার্থে আগমন করেন, তখন তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যমে ঐ প্রাঙ্গণেই উক্ত গ্রন্থাগারটির জন্য পৃথকভাবে একটি কুটীর নির্মিত হয় এবং ক্রমশঃ উক্ত গ্রন্থাগার বৃহদাকার ধারণ করে। যাঁহারা এখনও উত্তরকাশীতে তপস্যার্থে গমন করেন, তাঁহারা এই লাইব্রেরী হইতে প্রয়োজন-মত সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা পুস্তকাদি পাঠ করিবার সুযোগ পান।

(৪)

গঙ্গোত্রী ও গোমুখী তীর্থে

আমি এখন উত্তরকাশীতে অবস্থানের শেষ পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। গঙ্গোত্রী ও গোমুখী তীর্থ-দর্শনেরও জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে গোমুখী-যাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রী ৫৬ (ছাপ্পান্ন) মাইল এবং গঙ্গোত্রী হইতে গোমুখী ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। তৎকালে শেষোক্ত ১৮ (আঠার) মাইলের মধ্যে কোথাও কোন পান্থশালা ছিল না। যাতায়াতের পথে বিশ্রাম ও রাত্রি যাপনের জন্য উত্তরকাশী হইতে একটি ছোট তাঁবু (tent , ও অন্যান্য প্রয়োজনায় দ্রব্যাদি

সংগৃহীত হইল এবং এই সকল জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য একজন বলিষ্ঠ পাহাড়ী কুলীও সংগ্রহ করিলাম। এই অভিযাত্রী দলে আমরা চারজন সন্ন্যাসী ছিলাম—স্বামী পরমানন্দ, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ, স্বামী হিতানন্দ (হিরণ্ময় মঃ) ও আমি। আমরা শেষোক্ত তিনজন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের। স্বামী পরমানন্দ দেওঘরের ব্রহ্মময়ী মায়ের শিষ্য। তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে অনেকদিন কর্মীহিসাবে ছিলেন। যে-সময়ের কথা বলিতেছি সে-সময় তিনি উজলীস্থ পরমশ্রদ্ধাপদ দেবীগিরি স্বামীজীর আশ্রমে থাকিয়া তপস্যাদি করিতেন। তিনি প্রায় প্রতিবৎসরই একবার করিয়া উত্তরকাশীর প্রসিদ্ধ বিদগ্ধ দক্ষিণদেশীয় সন্ন্যাসী স্বামী তপোবন মহারাজের সঙ্গে গোমুখী-দর্শনে যাইতেন। তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক (guide) হইলেন। এই অভিযাত্রী দলে এতদ্ব্যতীত সঙ্গে ছিল মহীশূর (Mysore) হইতে তপস্যার্থে সদ্য আগত রাঘবেন্দ্র রাও নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক। পূজ্যপাদ দেবীগিরি মহারাজের সাহায্যে আমরা তাঁহার সত্রে ভিক্ষা এবং কুটীরেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে আমরা উত্তরকাশী হইতে যাত্রা শুরু করিলাম। রাস্তায় কালীকমলী-ধর্মশালায় আহার ও রাত্রিযাপনাদি করিয়া তৃতীয় দিনে গঙ্গোত্রী আসিয়া পৌঁছিলাম। ধর্মশালায় পিশু নামক উকুনসদৃশ একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর দংশনের কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। যাহা হউক, গঙ্গোত্রী পৌঁছিয়া স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী নামধেয় জটাজুটধারী জনৈক প্রবীণ বাঙালী সন্ন্যাসীকে একটি গুহাভ্যন্তরে তপস্যায় নিযুক্ত দেখিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপাদি করিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলাম।

উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাস্তার বিভিন্ন স্থানে গঙ্গার ধারে বৃক্ষচ্ছায়ানিবিড় জায়গায় কুটীর বাঁধিয়া অনেক সন্ন্যাসীকেও তপস্যারত দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাঁহারা পার্শ্ববর্তী পল্লী হইতে মাধুকরী-ভিক্ষালব্ধ আহার্যদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। কখনও বা তীর্থযাত্রীরাও ভক্তিভরে ইঁহাদিগকে ভিক্ষাদি প্রদান করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেন।

তখনকার দিনে গঙ্গোত্রী হইতে গোমুখী পর্যন্ত কোন বাঁধা-ধরা রাস্তা বা পান্থশালা ছিল না। সকল তীর্থযাত্রীকেই গোমুখী পর্যন্ত জনমানবহীন বিপদসঙ্কুল এই দুর্গম গিরিপথে অতিকষ্টে খরস্রোতা গঙ্গার তট বাহিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে হইত। গঙ্গোত্রী হইতে প্রায় ছয় মাইল অতিক্রম করার পর, দ্বিপ্রহরে আহারাদির ব্যবস্থা হইল। আহার শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে সহসা একটি মেষশাবকের অস্ফুট-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই শাবকটি আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহা যে ভুটীয়া ব্যবসায়ীদের গড্ডালিকাযূথভ্রষ্ট একটি মেষশিশু, তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কারণ ভুটীয়ারা (ভুটানদেশীয় ব্যবসায়ীরা) মেষের পৃষ্ঠে চাল, ভেলীগুড় ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চামড়ার বস্তা সাজাইয়া ভারতের সমতল ভূমিতে আনয়নপূর্বক উহার দ্বারা ব্যবসায় করিয়া তাহাদের জীবিকার্জন করিয়া থাকে। দৃঢ় বিশ্বাস, সেইরূপ একটি দল হইতে বিচ্যুত হইয়া এই শাবকটি পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। সৌম্যদর্শন বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যুবক রাঘবেন্দ্র রাও শাবকটিকে স্কন্ধে করিয়া সুদীর্ঘ

পথ চলিবার সিদ্ধান্ত করিল এবং গঙ্গোত্রী প্রত্যাবর্তনের পর উহাকে মেষদলে মিলাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার অদমনীয় অথচ সহৃদয় ভাব-দর্শনে আমরা কোন বাধা প্রদান করিলাম না। শাবকটি তখনও তৃণাদি-ভক্ষণে অসমর্থ; তজ্জন্য তাহাকে প্রয়োজনমত ভাতের মণ্ড (gruel) নানা উপায়ে খাওয়াইয়া শেষপর্যন্ত জীবিত রাখা সম্ভব হইয়াছিল।

আমরা আরও ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ছায়াসমন্বিত একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে-স্থানটি ভূর্যবৃক্ষবহুল একটি সমতল ভূমি। পূর্বে পূর্বে যে-সকল তীর্থযাত্রী ঐ পথে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের রন্ধনান্তে পরিত্যক্ত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠাদির চিহ্নও সেখানে কিছু কিছু রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এই ভূর্যবৃক্ষের বল্কলই (bark) প্রাচীনকালে কাগজের পরিবর্তে গ্রন্থাদি লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। উক্ত বৃক্ষের স্থূল শাখা হইতে ঐ বল্কল বাহির করিয়া যাত্রীরা কখন কখন উহাই আহারের পাত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, আমরা তাঁবু খাটাইয়া জিনিসপত্র তন্মধ্যে রাখিলাম। চিরতুষারাস্তীর্ণ হিমালয়ের নৈকট্যবশতঃ এই স্থানের শৈত্যের পরিমাণ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা সহজেই অনুমেয়। অত্যধিক শৈত্যবশতঃ আহারান্তে নিদ্রা যাওয়া সম্ভব হইল না। অগত্যা ধুনি জ্বালিয়া ভগবানের স্মরণ মনন ও ভজনাদি করিয়া সেই বৃক্ষতলেই রাত্রিযাপন করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে উক্ত তাঁবুতে সেই মেষ-শাবক ও কম্বলাদি অন্যান্য জিনিস রাখিয়া কিছু রুটি ও হালুয়া সঙ্গে লইয়া গোমুখী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। সম্মুখে আর মাত্র ছয় মাইল পথ। কিন্তু উহাও যে কত দুর্গম তাহা বর্ণনাতীত। এই ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিতে ছয় ঘণ্টার মত সময় লাগিয়া গেল। প্রায় বেলা বারটার সময় শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে বহু ঈপ্সিত পুণ্যতীর্থ গোমুখীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। অনন্তুতুষারাবৃত গোমুখীর সেই নয়নাভিরাম মনোরম দিব্য দৃশ্য আজও মানস-নয়নে উজ্জ্বল বিভায় ভাসিয়া উঠে। হিমগিরির স্তূপীকৃত জমাট-হিমানীর গাত্রমধ্য হইতে ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ অবিশ্রান্ত ধারায় নির্গত হওয়ায় সেই স্থানটি গো-মুখাকৃতি ধারণ করিয়াছে এবং তজ্জন্যই সেই গহ্বরটিকে গোমুখী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বৃহৎ শিলা-খণ্ডসমূহও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গোমুখী হইতে প্রসৃত এই জলধারাই গঙ্গা নামে অভিহিত। উহা তাহার অগ্রগতি-পথে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। সুরধুনীর উভয় পার্শ্বে ধবলতুষার-মণ্ডিত সমুন্নত পর্বতশ্রেণী যেন পূতসলিলা গঙ্গা-দেবীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইবার জন্য নীরবে দণ্ডায়মান। যতদূর দৃষ্টি চলে সেই গোমুখী হইতে ধবল জমাট বরফ ছাড়া অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা সেই গোমুখী-তীর্থসলিল শিরে ধারণ করিয়া এবং পথে সংগৃহীত শুভ্র কাশফুল দিয়া গঙ্গাদেবীকে পূজা করিয়া ধন্য হইলাম। অতঃপর সেখানে বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যানজপাদি করিয়া আচার্য শঙ্কররচিত নিম্নোক্ত গঙ্গাস্তবটি পাঠ করিলাম—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবন-তারিণি
তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে মম মতিরাস্তাং
তব পদকমলে ॥ ১ ॥
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা
নিগমে খ্যাতঃ।

নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি
মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥
হরিপাদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে হিমবিধুমুক্তা
ধবলতরঙ্গে ।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া
ভবসাগরপারম্ ॥ ৩ ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে খণ্ডিতগিরিবর-
মণ্ডিতভঙ্গে ।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে পতিতনিবারিণি
ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৪ ॥
রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি
কুমতি-কলাপম্ ।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে ত্বমসি গতির্মম
খলু সংসারে ॥ ৫ ॥"

এইবার প্রত্যাবর্তনের পালা। আমাদের সঙ্গে আনীত আহার্যদ্বারা দ্বিপ্রহরের ভোজন সমাপ্ত করিলাম। ফিরিবার সময় রাস্তায় আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম,—পর্বত-গাত্রস্থ বরফ সূর্যতাপে বিগলিত হওয়ায় স্থানে স্থানে খরস্রোতা ঝরণার সৃষ্টি হইয়াছে। পর্বতারোহণ করিবার উপযোগী যষ্টি প্রত্যেকের হস্তে থাকা সত্ত্বেও উহা অতিক্রম করিতে আমাদের অনেককেই বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই ঝরণা অতিক্রম বিষয়ে অভিজ্ঞ আমাদের পথপ্রদর্শক (guide) স্বামী পরমানন্দজী আমাদের প্রত্যেককে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া এই আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আমাদের সকৃতজ্ঞ-ধন্যবাদার্হ। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই একটি অনুন্নত পাহাড়ের বাঁকে সহসা একটি মেষী দৃষ্ট হইল। ইহাকেই প্রাগুক্ত মেষ-শাবকের গর্ভধারিণী মনে করিয়া পরমানন্দ স্বামী উহাকে ধরিবার জন্য আমাদের নিষেধসত্ত্বেও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তিনি শুধু বলিয়া গেলেন,—'আমার জন্য ভাববেন না।' কারণ, ঐ সব স্থান তাঁহার বিশেষ পরিচিত। তাঁহার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও তিনি যখন ফিরিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া ক্ষুণ্ণমনে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে সময়মত পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই একটি বালুকাপূর্ণ স্থানে মানুষের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম উক্ত পদচিহ্ন পূর্বোল্লিখিত ভূর্যবৃক্ষ-স্থলাভিমুখী। আমাদের ভরসা হইল,—হয়ত পরমানন্দজী সেই অনুন্নত পাহাড়ের অপর দিক দিয়া আসিয়া পূর্বেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছেন। সন্ধ্যার ঘনছায়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতি গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গিয়াছে। বন-হরিণের দূরাগত কণ্ঠস্বর মধ্যে মধ্যে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। অনিশ্চিত—আশঙ্কাবিদ্ধচিত্তে গন্তব্যস্থলের নিকটবর্তী হইতেই দূর হইতে দেখিতে পাইলাম,—সেই ভূর্য-বৃক্ষতলে আগুন জ্বলিতেছে। আমরা দ্রুতপদে সে-স্থানে পৌঁছিয়া যখন দেখিলাম পরমানন্দজীই আমরা আসিবার পূর্বে সেখানে পৌঁছিয়া আমাদের জন্য জল গরম করিতেছেন, তখন আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—সেই মেষীকে অনেক চেষ্টা করিয়াও ধরিতে না পারিয়া উক্ত নীচু পাহাড়ের অপর দিক দিয়া তিনি গন্তব্যস্থলে অগ্রেই পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য আমরা শ্রীভগবানকে মনে মনে অসংখ্য প্রণতি জানাইলাম।

আমরা পূর্বের মত সেই বিপদ-সংকুল গঙ্গার তীর দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গোত্রী আসিয়া

পৌঁছিলাম। রাঘবেন্দ্র সেই মেষ-শাবককে বহন করিয়া আনিয়া ভুটীয়াদের গড্ডালিকা-দলের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাঘবেন্দ্র পরবর্তীকালে অন্যত্র সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক 'নারায়ণ স্বামী' নামে উত্তরাখণ্ডে সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল। সে কৈলাস-দর্শনের পথে ধারচুলা-নামক স্থানে একটি বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়া বহুদিন সেখানে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিল এবং কৈলাস-তীর্থ দর্শনার্থীদের অনেককেই পথিমধ্যে তাহার এই আশ্রমে বিশ্রাম করিবার ব্যবস্থা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিল। অতঃপর উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমাকালে অনেক ধর্মপিপাসু নরনারী তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শুধু ইহাই নহে, নারায়ণ-স্বামী অনেক জনহিতকর কার্যের জন্যও দেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিল। অনেক বৎসর পর আলমোড়াতে তাহার সঙ্গে দেখা হইলে; তাহার নিকট হইতে তাহার পরবর্তী জীবনের ঘটনাবহুল বিবরণ জানিয়া খুবই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম।

উত্তরকাশীতে থাকাকালে হঠাৎ সংবাদ পাইলাম—পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ১৯৩৪ খ্রীঃ ২০শে ফেব্রুআরী, মঙ্গলবার দিবস মহাসমাধিযোগে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরতরে মিলিত হইয়াছেন। মদীয় দীক্ষাগুরু পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর তিরোধানের পর যিনি অপার করুণাবশে আমাকে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রদান করিয়া চরমলক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রকৃত পন্থার সন্ধান দিয়াছিলেন, যাঁহার শক্তিশালী উৎসাহবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া এই সুদূর জনবিরল হিমালয়ক্রোড়ে নিরালম্বভাবে কিছু দীর্ঘকাল থাকিতে সাহসী হইয়াছিলাম, তাঁহার এই আকস্মিক তিরোধানবার্তা যে কত মর্মন্তুদ ও হৃদয়বিদারক, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

ইং ১৯৩৫ সাল সমাগত। যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবার্ষিকী মহাসমারোহে উদ্‌যাপনের জন্য পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠে বিরাট প্রস্তুতি চলিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'The Cultural Heritage of India' নামক একটি স্মারকগ্রন্থ (Souvenir) প্রকাশনেরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মঠ-মিশনের তদানীন্তন সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যে সহায়তার জন্য আমাকে সত্বর বেলুড় মঠে আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। আমি তাঁহার এই আদেশ শিরোধার্য করিয়া বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস

স্বামী চেতনানন্দ

প্রতিভা ভাবগঙ্গার গোমুখী। সে নিজের ভিতরেই আত্মগোপন করিয়া থাকে। উহাকে বাহির করিবার জন্য হাতুড়ির দরকার হয় না বা কোন সাধ্য-সাধনার দরকার হয় না। সে প্রকাশিত হয় আপনভাবে অনায়াসে অজান্তে। সেক্‌সপীয়রকে হ্যামলেট বা টেমপেস্ট লিখিতে দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু মিলটনকে লেখনী লইয়া বহুত জোর-জবরদস্তী করিতে হইয়াছিল। তাই সেক্‌সপীয়র অধিকতর উজ্জ্বল।

ঐ স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস। উভয়েই রামগান রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ গান এই জগতের সামগ্রী নহে। ঐ গানের সুর ও ভাব আসিয়াছে দূর হইতে—বহুদূর হইতে—কোন জ্যোতিঘন জ্যোৎস্নার দেশ হইতে -যেখানে পার্থিব মালিন্যের লেশমাত্র নাই। ঐ মহান সঙ্গীত নিরাশ প্রাণে আনিয়া দেয় আশা, নীরস হৃদয়ে আনিয়া দেয় ভালবাসা, এবং মানুষকে এ জগৎরূপ ডাইনীর কুহক হইতে বাঁচিবার পথ বলিয়া দেয়। কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস—এই দুই ভক্তকবির কাব্য-প্রতিভা ঐ মহান সঙ্গীতের দুইটি লহরী।

বাংলাদেশে সকলে এক ডাকে চিনতে পারে এমন কবি কে আছেন? রবীন্দ্রনাথ? মধুসূদন? কখনই নহে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র—সকলেই চেনে এমন কবি হইতেছেন কৃত্তিবাস। চন্দ্র-সূর্যের মত তিনি বাংলাদেশের সকল কোণের আঁধার দূর করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন: 'যে মহাকবির গানের নূতন সুর যোজনা করিতে যাইয়া কলিদাস পর্যন্ত বামনের চাঁদধরার চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করিয়া ভীত হইয়াছেন, যাঁহার কথা মহানাটককার ভবভূতি বিস্ময় ও ভক্তির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কীর্তন করিয়াছেন, যিনি ভারতের আদি কবি, শ্রেষ্ঠ কবি, ঋষি—সেই বাল্মীকি, কৃত্তিবাস না জন্মিলে সম্ভবতঃ বঙ্গের সর্বশ্রেণীর অনায়ত্ত, আকাশ-কুসুম হইয়া থাকিতেন। বাংলায় এ সুরধুনী-ধারা চিরদিনই কৈলাসবাসী কোন দেবতার জটাকলাপে আবদ্ধ হইয়া থাকিত। বাঙ্গালী গৃহস্থের ভাগ্যে সেই মন্দাকিনীর আস্বাদ হয়ত কখনই লাভ হইত না। কৃত্তিবাস স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে খাদ কাটিয়া সেই ধারা আমাদের দেশে আনিয়াছেন, তাই চাষার কুঁড়ে ঘরের পাশ কাটিয়া সেই ধারা যেমন ছুটিয়াছে, রাজ-প্রাসাদের পার্শ্বেও সেইভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। কৃষকবধূ সন্ধ্যার প্রদীপটি জ্বালিয়া সেই রসধারার কুলকুলধ্বনি শুনিতে দাঁড়াইয়াছে, রাজবধূও তাঁহার গবাক্ষের পার্শ্বে হইতে তেমনি আবিষ্ট হইয়া তাহা শুনিতেছেন।'

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট স্টেশনের সাড়ে সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ফুলিয়া গ্রাম। ঐ গ্রামে ১৪৩৩ খ্রীঃ (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের মতে) কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাস স্বীয় রামায়ণে বংশপরিচয় দিয়াছেন: 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥ মালিনী

নামেতে মাতা বাপ বনমালী। ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥' অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পর কৃত্তিবাস সভাপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরের নিকট যান এবং পাঁচটি শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। গুণী রাজা চমৎকৃত হইয়া তাহাকে উপঢৌকন দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসের কাব্য-প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে সরল বাঙ্গালা পদ্যে একখানি রামায়ণ লিখিতে অনুরোধ করেন। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের একস্থানে রহিয়াছে: 'শ্রীরামের আগে ষাটি হাজার বৎসর। অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥ বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ। লোকত্রাণহেতু রচিলেন রামায়ণ॥'

হিন্দী ভাষার সমগ্র রস ও মাধুর্য যেন তুলসী রামায়ণের ভিতর দিয়া উপছাইয়া পড়িয়াছে। লোকসাহিত্যের দরবারে তুলসী-রামায়ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অনন্য। হিন্দীভাষী ভারতবাসীকে তুলসীদাস রামভক্ত করিয়া দিয়াছেন আপন ভক্তিরস সিঞ্চন করিয়া। 'বিনু সতসঙ্গ ন হরিকথা, তেহি বিনু মোহ ন ভাগ। মোহ গয়ে বিনু রামপদ, হোই ন দৃঢ় অনুরাগ॥' অর্থাৎ সৎসঙ্গ ছাড়া রামকথা হয় না। রামকথা ছাড়া মোহ যায় না। আর মোহ না গেলে রামপদে গাঢ় অনুরাগ হয় না। তুলসীদাস গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন 'রাম-চরিতমানস' অর্থাৎ রামচরিত্ররূপ মানস-সরোবর। তাহাতে রামকথারূপ হংস বিচরণ করে। কৃত্তিবাসের ন্যায় তুলসীদাসের নামও রামায়ণ গ্রন্থের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। লোকে বলে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'তুলসী রামায়ণ'। উভয়েই নিজেদের নামের সঙ্গে রামের নাম মিশাইয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে হিন্দীভাষী অধিক, সেহেতু তুলসীর জনপ্রিয়তা কৃত্তিবাস হইতে অধিক।

উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার রাজপুর নামক গ্রামে সম্ভবতঃ ১৬৪৬ খ্রীঃ তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই তিনি মাতৃহীন হন; এক দাসী তাঁহাকে লালনপালন করে। এই দাসীও পাঁচ বছর পর গত হয়। তখন এক অপরিচিতা রমণী আসিয়া বালককে ভোজনাদি করাইয়া যাইতেন। লোকের বিশ্বাস ইনিই মা অন্নপূর্ণা। এইরূপে আরও দুই বৎসর অতীত হইল। ঐ কালে নরহরিজী নামক এক সাধু বালককে লইয়া অযোধ্যায় যান। সম্ভবতঃ ইনিই তুলসীদাসের গুরু ছিলেন। রামায়ণের গুরুপ্রণামে আছে: 'বন্দউ গুরুপদ কঞ্জ কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি'। সে যাহা হউক, তুলসীদাস সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ আছে। কথিত আছে তুলসীদাস বিবাহ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। স্ত্রীর দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া তাঁহার চৈতন্য হয় এবং বিরাগী হইয়া তিনি কাশীতে যান। মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন: 'আনন্দকাননে হ্যস্মিন্ জঙ্গমঃ তুলসীতরুঃ। কবিতামঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর-ভূষিতা॥' অর্থাৎ বারাণসীর আনন্দ-কাননে তুলসীদাস হইতেছেন একটি চলমান তুলসীতরু, এ তরুর কবিতা-মঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরকুলে ভূষিত। কাশীতে প্রথমে প্রেতাত্মার নির্দেশে ভক্ত হনুমানের সাক্ষাৎ এবং পরে হনুমানজীর উপদেশানুযায়ী রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেন—এ কাহিনী সর্বজনবিদিত। তুলসী-দাসের রামদর্শনের ছবিখানি আবেগে পূর্ণ, আবদারে কলকলিত এবং ভক্তিতে ভাস্বর। প্রথম দিন তো. ধনুর্বাণধারী মৃগয়াবেশধারী

অশ্বারোহী রাম-লক্ষ্মণকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু পরদিন হনুমানজীর নির্দেশে ব্যাকুল হৃদয়ে নির্নিমেষ নয়নে রামদর্শনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন ; ভগবান প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়া তুলসীকে বলিলেন, 'বাবা, আমাদের চন্দন দাও।' 'চিত্রকূটকে ঘাট পর ভই সন্তনকী ভীর। তুলসীদাস চন্দন ঘিঁসে তিলক দেত রঘুবীর॥' তুলসীদাস নয়নযুগল ভরিয়া ভগবানের রূপসুধা পান করিতেছেন। শ্রীরামচন্দ্র আবার চন্দন চাহিলেন। কিন্তু কে তখন সে কথা শোনে! তখন ভগবান নিজ হস্তে চন্দন লইয়া আপন ললাটে মাখিলেন, এবং তুলসীদাসের কপালেও মাখাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন তুলসীদাস চিত্রকূটে রামলীলারত রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দর্শন পান।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনায় ভক্তির সঙ্গে মনে হয় যশোলিপ্সাও ছিল। আর তুলসীর ছিল ভক্তির সঙ্গে আত্মনিবেদন। তুলসীর কপালে ভগবান স্বয়ং চন্দন লেপন করিয়াছেন ; আর কৃত্তিবাস যখন রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসেন তখন—'চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥' আবার অন্যত্র 'যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে। আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে॥'

কৃত্তিবাসের ভাব কোথাও বা স্বকল্পিত, কোথাও বা বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস বা বিভিন্ন পুরাণ হইতে গৃহীত। তাঁহার ভাষা সরল, মধুর ও প্রাঞ্জল। ঐ ভাষা ৫০০ বছরের অধিক প্রাচীন, সেই হেতু আধুনিকদের কাছে উহার কিছু কিছু শব্দ দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কৃত্তিবাসের কালে পদ্যই একমাত্র সাহিত্য ছিল এবং পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী রচয়িতারাই কবি ছিলেন। কৃত্তিবাস ঐ সকল ছন্দেই রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে উপাখ্যান-ভাগ বেশী। কারণ কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে মূলতঃ অবলম্বন করিলেও তিনি জৈমিনি ভারত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, পুরাণ, উপপুরাণ, কথকতা ও জনশ্রুতি হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। অগ্রে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা উহার উল্লেখ করিব।

উপাখ্যানের দিক হইতে তুলসীদাস কৃত্তিবাস হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার রামায়ণে গল্পাংশ খুব কম। যাহাতে রামপদে ভক্তি হয়, মানুষ নীতির পথ মানিয়া চলে—তুলসীদাস সেই দিকে জোর দিয়াছেন। রামায়ণ দৃষ্টে মনে হয় তুলসীদাস একটু আটপৌরে অর্থাৎ ঘরোয়া কথা দিয়া সাধারণ মানব-মনকে আকর্ষণ করিতে ব্যস্ত। অযোধ্যার রাজপুত্র-রাজবধূকে তিনি বসনভূষণে সাজাইয়াছেন বটে, কিন্তু এমন বাক্যের সংযোজনা করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় উহারা আমাদেরই ঘরের লোক। উদাহরণস্বরূপ দশরথ যখন রামকে খাইতে ডাকেন তখন সে সঙ্গীদের ফেলিয়া আসিতে চাহে না। কৌশল্যা ডাকিতে গেলে সে ছুটিয়া পালায়। ধূলিমাখা ছেলেকে রাজা হাসিয়া কোলে বসান। তারপর 'ভোজন করত চপল চিত, ইত উত অবসর পাই। ভাজি চলে কিলকত মুখ, দধিওদন লপটাই॥' অর্থাৎ চঞ্চল মনে খাইতে খাইতে একটু অবসর পাইলেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া সে পলায়, মুখে দইভাত লেপটাইয়া থাকে। এ দৃশ্য দেখিতে রাজবাড়ী যাইবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত দেশ জুড়িয়া ঘরে ঘরে এরূপ রাম আছে। এই জন্য তুলসীর এত আদর। কৃত্তিবাসের ন্যায় তুলসীও চলতি ভাষায় রামায়ণ রচনা

করিয়াছেন। তুলসীর ভাষা সহজ, কথা লৌকিক এবং ছন্দ—চৌপাই, দোহা, সোরঠা ও ছন্দ—এই চারিটি।

সংক্ষেপে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাসের জীবন-কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। রামচরিত-রচনায় বাল্মীকির ন্যায় তাঁহাদের মৌলিকতা নাই। বাল্মীকি ভাত রান্না করিয়াছেন, আর সেই রাঁধা ভাতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস নিজেদের রুচি অনুযায়ী ঘি, লবণ, ব্যঞ্জনাদি মিশাইয়া উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহাদের যশ অপহরণ করা যায় না। ইঁহারা বাল্মীকির ভাবধারার অনুবাদ বা গতানুগতিক অনুসরণ করেন নাই; বরং নিজেদের প্রতিভাবলে বাল্মীকির রোপিত বৃক্ষে বারিসিঞ্চন করিয়া পত্রে পুষ্পে ফলে সুশোভিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ও তুলসী-দাস উভয়েই যদিও লৌকিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন সংস্কৃত ভাষায়।

মূল রামায়ণে প্রবেশের পূর্বে আমরা অপর একটি তুলনা পরিক্রমা করিব। কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর মহাশয় তাঁহার রামায়ণে দেখাইয়াছেন কি ভাবে আমাদের রামায়ণের ছায়াপাত গ্রীককবি হোমারের মহাকাব ইলিয়াডে পড়িয়াছে:

রামায়ণে:	ইলিয়াডে:
লঙ্কাযুদ্ধ	ট্রয় যুদ্ধ
অযোধ্যা	স্পার্টা
রামচন্দ্র	মেনিলেয়াস
লক্ষ্মণ	পেট্রোক্লিস
সীতা	হেলেন
রাবণ	প্যারিস
ইন্দ্রজিৎ	হেক্টর
সুগ্রীব	ম্যাগামেম্নম্

শুধু বিদেশী মহাকাব্যের উপর নয় আমাদের বিখ্যাত মহাভারতের উপরও রামায়ণের রেখাপাত হইয়াছে। অর্জুনের সহিত লক্ষ্মণের অনেকটা মিল আছে। উভয়েরই মধ্যে আছে ভ্রাতৃপ্রেম, বীরত্ব ও বনবাস। রাম-যুধিষ্ঠির, বিভীষণ-বিদুর, রাবণ-দুর্যোধন প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। স্ত্রীচরিত্র-চিত্রণে রামায়ণ তুলনাহীন। সীতার কাছে দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী কেহই দাঁড়াইতে পারে না। আবার ঘটনা দৃষ্টেও উভয় মহাকাব্যে মিল আছে। উভয় মহাকাব্যই বিয়োগান্ত। সীতার জন্য রাবণবংশ ধ্বংস হইল আর দ্রৌপদীর জন্য কুরুকুল ধ্বংস হইল। উভয়ক্ষেত্রে বনবাস, দুই নায়িকাই অযোনিজা, চক্রভেদ ও ধনুর্ভঙ্গ করিয়া বিবাহ, নারীহরণ (রাবণ কর্তৃক সীতা, জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী), মুনিশাপে মৃত্যু (দশরথ ও পাণ্ডু) এইরূপ বহু অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে।

এবার আমরা মূল রামায়ণে প্রবেশ করিব। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সপ্তকাণ্ডে সর্বসমেত শ্লোকসংখ্যা ১৯,৫৫০। অতি সংক্ষেপে ঐ বিশাল গ্রন্থের সার বর্ণনা: 'আদিকাণ্ডে রামজন্ম সীতা-পরিণয়। অযোধ্যাকাণ্ডেতে রাম-বনবাস হয়॥ অরণ্যকাণ্ডেতে হয় জানকীহরণ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব-মিলন॥ সুন্দর-কাণ্ডেতে হয় সাগর-বন্ধন। লঙ্কাকাণ্ডে মহারণে রাবণ-নিধন॥ উত্তরকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ। মনোদুঃখে বৈদেহীর পাতাল-প্রবেশ॥ এই সুধাভাণ্ড সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ। কবিবর কৃত্তিবাস করেন রচন॥'

কৃত্তিবাসের আরম্ভটা বেশ কবিত্বপূর্ণ এবং চমকপ্রদ। দস্যু রত্নাকরের পাপের ভাগী তাঁহার পরিবারবর্গ হইল না। তখন তিনি

ছদ্মবেশী ব্রহ্মা ও নারদের নিকট হইতে 'মরা' (পাপের ফলে রাম-মন্ত্র-উচ্চারণে অক্ষম তাহেতু) মন্ত্র শ্রবণ করিয়া ষাট হাজার বৎসর উহা জপ করেন। বল্মীকের (উইমাটির ঢিপি) দ্বারা রত্নাকরের আবরণের বর্ণনায় কৃত্তিবাস যেন একটু অতিশয়োক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। বর্ণনা আছে—বল্মীকের কীটগণ রত্নাকরের সমস্ত মাংস খাইয়া ফেলিল; অবশিষ্ট রহিল কেবল অস্থি। ষাট হাজার বৎসর পরে ব্রহ্মা আসিয়া রত্নাকরকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু রামনাম শুনিতে পাইলেন। তারপর ঢিপির ভিতর মুনি বসিয়া আছেন জানিয়া, ব্রহ্মা ইন্দ্রকে সাত দিন ক্রমাগত প্রচণ্ড বারিপাত করিতে বলিলেন। তারপর ঐ ঢিপি ধুইয়া গেলে ব্রহ্মা ঐ অস্থি-সম্বল মুনির চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন: আজি হৈতে তব নাম 'বাল্মীকি' হইল। ঘটনাটা আধুনিক মানুষের কাছে আজগুবি বলিয়া ঠেকিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু রাম-নামে অসাধ্য সাধন হয়—একথা ভুলিলে চলিবে না। তাহা ছাড়া ইহা প্রাচীন ভারতের একখানি তপস্যার অনুপম ছবি।

আদিকবি বাল্মীকির জীবনবৃত্তান্ত গাহিয়া কৃত্তিবাস—রঘুবংশের বিবরণ, সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ, কপিলের অভিশাপে সগরের ষাট হাজার পুত্রের বিনাশ এবং পরে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গার মর্ত্যে আগমন—অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে কৃত্তিবাসের মত বংশপরিচয়ের ঘটা নাই; কেবলমাত্র বিশ্বামিত্র মিথিলায় যাইবার পথে জাহ্নবীতীরে রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে রঘুবংশের কাহিনী কিছু বলিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে পুরাণ ও কালিদাসের রঘুবংশকে অবলম্বন করিয়া দিলীপ, রঘু, অজ-ইন্দুমতী, দশরথের বিবাহ ইত্যাদি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আদিকাণ্ডে কৃত্তিবাস রাম, সীতা ও বানরগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন অভিনবভাবে। অনেক জায়গায় তিনি অলৌকিক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। রামচন্দ্রের দেবভাব দেখাইতে গিয়া তিনি প্রত্যক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারেন নাই। যেমন—'মধু-চৈত্রমাস, শুক্লা শ্রীরামনবমী। শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হ'লেন জগৎস্বামী॥ গর্ভব্যথা নাহি তায় নাহিক শোণিত। শুভক্ষণে শ্রীহরি হইলা উপনীত॥' সংস্কৃতে সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গলের দ্বারা কৃত খাত। ঐ খাত হইতে সীতার জন্ম বলিয়া নাম হইল সীতা (সীতামুখোদ্ভবাৎ সীতা)। ভগবান সশক্তিক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন—ইহাই রীতি। দেবগণ তেজসঞ্চার করিলেন বিভিন্ন বানরের ভিতর। ইন্দ্র-তেজে বালী, সূর্য-তেজে সুগ্রীব, ব্রহ্মা-তেজে জাম্বুবান, পবনের তেজে হনুমান, অগ্নির তেজে নীল, শিবের তেজে কেশরী, কুবেরের তেজে প্রমাথী, ধন্বন্তরির তেজে সুষেণ, চন্দ্র-তেজে দধিমুখ প্রভৃতি।

রাজা দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠের দ্বারা পুত্রদের নামকরণ করাইলেন। চারিবেদ আগম-পুরাণ বিচার করিয়া কৌশল্যার নন্দনের নাম 'রাম' রাখা হইল। ভূ-ভার বহন করিবেন বলিয়া কৈকেয়ীর পুত্রের নাম হইল ভরত। রামচন্দ্রের নামকরণের একটি প্রাচীন কাহিনী সুবিদিত আছে। বশিষ্ঠকে রাজা দশরথ এত নাম থাকিতে কেন 'রাম' নাম রাখা হইল উহার সার্থকতা দেখাইতে বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন যে 'রাম' নাম সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও শৈব মন্ত্রের সার। রা='নমো নারায়ণায়' এই প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্ত্র হইতে 'রা' বাদ দিলে

থাকে 'নমো নায়নায়' (ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে ণ, ন হইয়া যায়) ইহার অর্থ রূপ-রসাদি বিষয়কে নমস্কার। আবার ম='নমঃ শিবায়' এই প্রসিদ্ধ শৈবমন্ত্র হইতে 'ম' বাদ দিলে থাকে 'ন শিবায়'। ইহার অর্থ কল্যাণের জন্য নহে অর্থাৎ দুঃখের বা অমঙ্গলের জন্য।

তুলসীকৃত রামচরিতমানসের প্রথম কাণ্ডের নাম বালকাণ্ড; কিন্তু বাল্মীকি, কৃত্তিবাস প্রভৃতির রামায়ণে উহা আদিকাণ্ড নামে খ্যাত। তুলসীদাসের এই 'বালকাণ্ড' পদের মধ্যে নিজের আত্মভাব লুকাইয়া রহিয়াছে। তুলসী রাম-সীতার এক বালকপুত্র হইতে চাহিয়াছিলেন, হইয়াও ছিলেন। নিজের মনের কথা অরণ্যকাণ্ডে রঘুনাথের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন : যে ভরসা ত্যাগ করিয়া আমার ভজনা করে, আমি তাহাকে সর্বদা রক্ষা করি; যেমন মা ছেলেকে করে। যখন সন্তান বড় হয় তখন তাহার জন্য মায়ের আর পূর্বকার প্রীতি থাকে না। জ্ঞানী আমার প্রৌঢ় পুত্রের মত, আর অমানী দাস আমার বালক পুত্রের মত।

রঘুবংশের প্রারম্ভে মহাকবি কালিদাস আভিজাত্যপূর্ণ বিনয় দেখাইয়াছেন : 'মন্দকবি-যশঃপ্রার্থী', 'বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাই' ইত্যাদি বাক্যে। কিন্তু তুলসীর ভক্তি-বিনয় যেন হৃদয় মন্থন করিয়া বাহির হইতেছে : আমি রঘুপতির গুণগান করিতে চাই। আমার বুদ্ধি হালকা, আর রামচরিত্র ত অথই। আমার বুদ্ধি দরিদ্রের মত, আর ইচ্ছাটা রাজার মত। আমি চাই অমৃত, অথচ জগতে আমার ঘোলও জোটে না। তারপর তুলসীদাস আদিকবি বাল্মীকির পাদ বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন : 'বাল্মীকি মুনি প্রথমে হরির কীর্তি গান করিয়াছেন, সেইহেতু আমার পথ সুগম হইয়াছে। অতি অপার যে মহানদী তাহার উপর যদি নৃপ সেতু গড়িয়া দেন, তবে পরম লঘু পিঁপড়াও বিনাশ্রমে পার হইয়া যায়।' পণ্ডিতেরা 'উপমা কালিদাসস্য' বলিয়াছেন; কিন্তু উপমায় তুলসীদাস কম যান না। কালিদাসের উপমাগুলি বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলসানো, কিন্তু তুলসীর উপমা সরলতা ও সজীবতায় ভরপূর। রান্নার ভালমন্দ যথাযথ ফোড়োনের উপর নির্ভর করে। তপ্ত বালুর কড়া হইতে ধবল খৈগুলি যেমন লাফাইয়া বাহিরে পড়ে, তেমন রামকথার মাঝে মাঝে তুলসীর অপূর্ব শুচিশুভ্র ফোড়োনগুলি উপচাইয়া পড়িয়াছে। 'বাল্মীকি রামায়ণে খরের কথা থাকিলেও উহা খর বা কর্কশ নহে, উহা কোমল ও মৃদু। উহাতে দূষণের কথা থাকিলেও উহা দোষরহিত।'

রামচন্দ্রের সংস্পর্শে যাঁহারাই আসিয়াছেন, তুলসীদাস তাঁহাদেরই চরণবন্দনা করিয়াছেন। নিজ জীবনে 'রাম-নাম' কিভাবে বসান যায়, তাহার বিষয়ে অপূর্ব এক দোঁহা রচনা করিয়াছেন তুলসীদাস : রাম নাম মনি দীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার। তুলসী ভীতর বাহরহু জৌ চাহসি উঁজিআর॥ অর্থাৎ তোমার ভিতর বাহির যে দিকে তাকাও যদি উজ্জ্বল করিতে চাও তবে তুলসী, দেহের দেউড়ীস্বরূপ জিহ্বাতে রাম-নাম মণিদীপ ধর। রামনামের প্রভাবের শেষ নাই। রামনাম স্বয়ং রামচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রামচন্দ্র ভালুক-বানরের সাহায্যে সেতুবন্ধন করিলেন, সেজন্য তাঁহাকে কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। কিন্তু রামনাম লইতে সংসারসমুদ্র শুকাইয়া যায়। স্বয়ং রামও নিজের নাম-মাহাত্ম্য গাহিয়া শেষ করিতে পারেন না। এই নামের প্রভাবে অজামিলের মত পাপী, পিঙ্গলার মত গণিকা

এবং কচ্ছপ কর্তৃক ধৃত গজ নিষ্কৃতি পায়। এ নাম কল্পতরুর মত কল্যাণবহনকারী। এ নাম স্মরণ করিতে করিতে তুলসাদাস, যে পূর্বে ভাঙ্গের গাছ ছিল, সে তুলসী গাছ হইয়া গিয়াছে।

কথায় বলে 'ধান ভানতে শিবের গীত'; অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকার পরিপাটি। তুলসীদাস রামচন্দ্রের মহিমাকে সু-উচ্চে উঠাইবার জন্য শিব-সতীর আখ্যায়িকা বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়াছেন। তারপর রাবণের জন্মবৃত্তান্ত এবং মর্ত্যে তাহার অকথ্য অত্যাচার বর্ণনা করিয়া ভগবান বিষ্ণুকে দিয়া জন্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন। পবিত্র চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে ভগবান জন্মগ্রহণ করিলেন। ভাগবতের দেবকীর ন্যায় কৌশল্যাও বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপ দেখিলেন। কৌশল্যা ঐ রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'হে পুত্র, এই রূপ ত্যাগ কর। অতিশয় প্রিয় সদাচারসম্মত বাললীলা কর, যাহাতে পরম অনুপম সুখ পাওয়া যায়।' ভগবানের চারি অংশে অবতরণের ফলে অযোধ্যায় যে আনন্দোৎসব লাগিয়াছিল—তাহা বর্ণনাতীত। তুলসীদাস মজা করিয়া বলিয়াছেন যে সে সব কৌতুক দেখিবার জন্য সদাচলমান সূর্য চলিবার কথা ভুলিয়া অযোধ্যায় এক মাস রথ সমেত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বশিষ্ঠ চারিপুত্রের নামকরণের সার্থকতা দেখাইয়াছেন: ত্রিলোকের সুখধাম এবং অখিল লোকের বিশ্রামদায়কহেতু রাম, বিশ্বের ভর্তা ও পোষণকর্তাহেতু ভরত; স্মরণ করিলে শত্রুনাশ হয়, সেই হেতু শত্রুঘ্ন; এবং সুলক্ষণের নিবাসস্থান, সকল জগতের আশ্রয়স্থল বলিয়া লক্ষ্মণ।

বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখাইয়াছেন। ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি মুনির কাছে ৬৪ দিনে ৬৪ বিদ্যায় অধিকারী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র মাত্র ১৪ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যা লাভ করেন। কৃত্তিবাসের মতে 'সাত-বৎসরের রাম অযোধ্যানগরে। লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে॥' আর রামচন্দ্রের যখন সীতার সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স বার এবং সীতার পাঁচ। লোকে এবং শাস্ত্রে কথিত আছে ধর্মে বা তেজে উৎকর্ষতা বয়সের দ্বারা নিরূপিত হয় না। বিশ্বামিত্র বালক রাম-লক্ষ্মণকে যজ্ঞরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু দশরথ কপটতা করিয়া ভরত-শত্রুঘ্নকে দিলেন। পরে সত্য প্রকাশ পাইলে মুনির অভিশাপভয়ে রাম-লক্ষ্মণকে দিলেন। এখানে কৃত্তিবাস দশরথের বিমাতাসদৃশ আচরণ দেখাইয়াছেন।

সীতার বিবাহ-ব্যাপারে জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল। বাল্মীকি লিখিয়াছেন, 'বীর্যশুল্কেতি যে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা' অর্থাৎ আমার এই অযোনিজা কন্যাকে পেতে গেলে বীর্য-শুল্ক দিতে হবে। সীতার তুলনাহীন রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া কত রাজা আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন কি রাবণ, যিনি কৈলাস পর্বত ধরিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার বিশ হাতে তিনবার চেষ্টা করিয়াও হরধনু তুলিতে না পারিয়া পলায়ন করেন।

কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস রাম-সীতার বিবাহ ব্যাপারে স্ব স্ব দেশাচার ও লোকাচারের আশ্রয় লইয়াছেন। কৃত্তিবাসের বিবরণ পড়িলে মনে হয় যেন বাঙ্গালী বিবাহ দেখিতেছি এবং তুলসীদাসের বিবরণ দৃষ্টে মনে হয় যেন হিন্দুস্তানী বিবাহ চলিতেছে।

বিবাহের লগ্ন দেখা, গায়-হলুদ, ঢাক-ঢোল, কাঁসি বাঁশী, টোপর, বরণ, সিঁতেয় সিঁদুর, দূর্বা-ধান, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের পুরোহিতদের বংশাভিজাত্যকথন, ইত্যাদি বাঙ্গলা দেশের বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাম-সীতার বিবাহে কৃত্তিবাস নব-বরকনেদের লইয়া মেয়েদের ফষ্টিনাষ্টিটুকু বাদ দেন নাই। 'পরিহাস করে সবে রামের সহিত। তুমি যে জানকী-পতি এ নহে উচিত॥ এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল। সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল॥'

বিবাহ-ব্যাপারে কৃত্তিবাস কিছু নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। বশিষ্ঠ জ্যোতিষ-গণনার দ্বারা যে লগ্ন ঠিক করিলেন, সেই লগ্নে বিবাহ হইলে 'স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে।' এখন উপায়? দেবগণ দেখিলেন যে রাম-সীতার বিচ্ছেদ ছাড়া রাবণবধ সম্ভব নহে; তাই তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ঐ লগ্ন ভ্রষ্ট করিলেন। চন্দ্রকে নর্তক সাজাইয়া বিবাহবাসরে পাঠান হইল। চন্দ্রনৃত্য দেবকার্য সিদ্ধ করিল। 'অতীত হইল লগ্ন, সবে বিস্মরণ।' কৃত্তিবাসের বিবরণ হইতে মনে হয় বাংলাদেশে তখন বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সতীনের ঘর করা নারীর পক্ষে অসহ্য। পরশুরাম যখন রামচন্দ্রকে ধনুকে গুণ দিবার জন্য চ্যালেঞ্জ করিতেছেন, তখন সীতা ভাবিতেছেন: 'একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ। করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ॥ আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমুনি। না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী॥'

বালকাণ্ডে তুলসীদাস উপাখ্যানভাগের উপর এত বেশী জোর দিয়াছেন যে, রামচন্দ্রকে খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয়। যাহা হউক সংক্ষেপে বাললীলা বর্ণনার পর বিশ্বামিত্র মুনির সহিত রাম-লক্ষ্মণের যজ্ঞরক্ষা ও মিথিলায় গমন দেখানো হইয়াছে। এই যাত্রার পথে তুলসীদাস আমাদের প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ভারতের প্রাণকথা, পুরাণকথা, ইতিকথা, শৌর্যবীর্যের কথা, মহাপুরুষদের চরিতকথা, বিভিন্ন অধ্যাত্মবিদ্যার কথা প্রভৃতি বলিয়া চলিয়াছেন ঋষি বিশ্বামিত্র। আর দুইটি তরুণ মন কখনও গঙ্গাতীরে, কখনও তপোবনে বিশ্রামকালে, কখনও বা রাত্রে ঋষিকুটীরে শয়নকালে গোগ্রাসে গিলিয়া চলিয়াছেন ঐ সব ভারতকথা। আর আজ সেই ঐতিহ্যময় প্রাচীন ভারত দ্রুত বিদায় লইতেছে।

রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিদেহ নগরে পৌঁছিলেন। বিদেহ সম্বন্ধে তুলসীদাস লিখিয়াছেন, 'জহঁ বসন্তরিতু রহী লোভাঙ্গ' অর্থাৎ সেই অপূর্ব নগরীতে বসন্তঋতু লোভে থাকিয়া যাইত। লক্ষ্মণের নগর দেখিবার বাসনা হইল। রাম চলিলেন সঙ্গে। অযোধ্যার রাজপুত্র নগর দেখিতে আসিয়াছেন, চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। তুলসীদাস যে নিজের ইষ্টদেবকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? অপূর্ব ভঙ্গিতে সীতার সখীদের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন: 'বিষ্ণুর চারিটি হাত, ব্রহ্মার চারি মাথা, আর শিবের বেশ বিকট এবং মুখও পাঁচটা। অপর এমন কোন দেবতাই নাই যাঁহার সহিত রামচন্দ্রের সৌন্দর্যের তুলনা চলে।' নবদূর্বা-দলশ্যাম রামকে যে দেখিতেছে সেই মজিতেছে। সীতাসখীরা সেই রূপ দেখিয়া বিবশ হইয়া সীতাকে বলিতেছেন: সখি! সে রূপের কথা আর কি বলিব? "গিরা অনয়ন নয়ন বিনু বাণী"; অর্থাৎ বাক্যের ত চোখ নেই, আর

চোখের ত বাকশক্তি নেই। রামের রূপ-বর্ণনায় তুলসীদাসকে এই ভাবে 'নেতি-নেতির' আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

বিবাহের পূর্বে রাজকাননে রাম-সীতার পারস্পরিক সন্দর্শনকে লইয়া তুলসীদাস একটু রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাচীন যুগে বিবাহের ব্যাপারে দর্শন, পূর্বাভাস এবং পূর্বরাগ—এই তিন প্রকার ব্যবস্থা ছিল। রামচন্দ্র দেখিয়াছেন সীতার অপরূপ রূপ। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন নিজের মহান রঘু-বংশের কথা, নিজের পবিত্রতার কথা—'মোহি অতিশয় প্রতীতি মন কেরী। জেহি সপনেহু পরনারি ন হেরী॥' অর্থাৎ আমার হৃদয় সম্বন্ধে ত বড় বিশ্বাস যে, আমি স্বপ্নেও পরস্ত্রী দেখি নাই। কালিদাস কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে একটা সমাধান দিয়াছেন: 'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জন্মান্তরসৌহৃদানি।' অর্থাৎ যাহার প্রথম দর্শনে হৃদয়ে একটা গাঢ় ভাবের উদ্রেক হয়—উহা নিশ্চিতই পূর্বজন্মের সম্বন্ধের ফল। সুতরাং রামরূপী নারায়ণ যে সীতারূপী লক্ষ্মীকে চিনতে পারিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? রামচন্দ্র মনে মনে সীতার মুখের সহিত চাঁদের তুলনা করিয়াছেন এবং পরে আবার চাঁদের দোষ দেখাইয়া সীতার রূপের উৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন। বর্ণনাটি খুব সুন্দর: চাঁদ ত সীতার মুখের মত নয়। চাঁদের জন্ম সমুদ্রে, আবার বিষ উহার ভাই। দিনের বেলায় মলিন থাকে, আবার কলঙ্কও রহিয়াছে। চাঁদ বাড়ে কমে ও বিরহিণীকে দুঃখ দেয়। সন্ধি অনুসারে রাহু ইহাকে গ্রাস করে। চাঁদ চখার দুঃখদায়ক ও পদ্মফুলের শত্রু। চাঁদের কত দোষ। সীতার মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা অনুচিত ও হাস্যকর।

তুলসীদাস নিশ্চেষ্ট থাকিবার নন। তিনি ত কবি। আর রূপবর্ণনা ত কবির স্বভাব-সুলভ ব্যাপার। তাঁহার কথায়: সীতাকে বর্ণনা করিয়া, তাঁহার উপমা দিয়া কোন্ কবি কুকবি বলিয়া অপযশ লইবে? সংসারের স্ত্রীর কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি দেবদেবীর কথা ধরা যায়, তাহা হইলে সরস্বতী বাচাল, ভবানী অর্ধাঙ্গী, রতি স্বামিহীনা বলিয়া দুঃখী। আর হলাহল ও মদ হইতেছে লক্ষ্মীর ভাই (সমুদ্র-মন্থনকালে ইহারা লক্ষ্মীর সঙ্গে জাত), তাহার সঙ্গেই বা সীতার তুলনা কি করিয়া চলে? যদি অমৃত-সৌন্দর্য সমুদ্র হয়, পরম রূপময় লাবণ্য কচ্ছপ হয়, শোভা রশি হয়, সাজসজ্জা মন্থনদণ্ড হয়, আর কামদেব যদি নিজ পদ্মহস্তে মন্থন করেন, তাহা হইলে যদি সৌন্দর্য ও সুখের মূল শোভালক্ষ্মী উৎপন্ন হন, তবুও তাঁহার সহিত সীতাকে সমান বলিতে কবির সঙ্কোচ হইবে।

অন্যান্য রামায়ণে দেখা যায় সীতার বিবাহের পর পরশুরামের সঙ্গে রামের দেখা হয়; কিন্তু তুলসীদাস সে পর্ব আগেই সারিয়া লইয়াছেন। অহিংসার কাছে হিংসা কি ভাবে থাকিয়া যায়, তুলসী তাহার এক অপূর্ব চিত্র আঁকিয়াছেন। পরশুরামের সর্বগ্রাসী, সর্ব-বিধ্বংসী ভাবের কাছে রামচন্দ্রের ভালবাসা, বিনয়, শ্রদ্ধা, সন্তোষ, নিরভিমানিতা, আনুগত্য, মৃদুতা লক্ষণীয়। পরশুরাম বলিতেছেন: 'রাগে বুক পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু হাত উঠিতেছে না। আমার এই নৃপঘাতী কুঠার হত্যা করিতে চাহিতেছে না। বিধি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, আমার স্বভাব বদলাইয়া গেল।'

সীতার বিবাহ হইল। তুলসীদাস উহা বর্ণনা করিতে গিয়া যত ভাব ও ভাষা ছিল সব প্রয়োগ করিয়া বলিলেন: 'কবি উপমা না

পাইয়া হার মানিয়া এই কথা মনে মনে বলিল যে, ইহাই ইহার উপমা।' তোতা, ময়না প্রভৃতি পালিত পক্ষীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সীতা চলিয়াছেন শ্বশুরবাড়ী। 'বিকল মীনগণ জনু লঘু পানী'—অল্প জলে মাছেরা যেমন ছটফট করে বিদেহ নগরে সেই অবস্থা হইল। রানীরা সীতাকে কোলে লইয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন: 'সর্বদা স্বামীর প্রিয় হও। চিরায়ুষ্মতী হও।' সখীরা স্নেহ-ভরে মৃদুবাক্যে নারীধর্মের শিক্ষা স্মরণ করাইয়া দিলেন: 'শ্বশুর-শাশুড়ী ও গুরুর সেবা করিও। স্বামীর মনের ইচ্ছা বুঝিয়াই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিও।' তুলসীদাসের এই ছবিখানি আমাদের শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেখানে বিদায়-কালে শকুন্তলার হরিণশাবকদের প্রতি মিষ্ট আচরণ, লতাগুল্মাদির প্রতি সস্নেহ সম্ভাষণ তুলনাহীন। কণ্ব মুনি ত আবেগভরে বলিয়াই ফেলিয়াছেন: 'আমি বনবাসী তাপস, স্নেহবশে আমারই যখন এরূপ বিকলতা উপস্থিত হইল, যাহারা গৃহী, না জানি তাহারা নূতন তনয়া-বিচ্ছেদে কত কষ্টই ভোগ করিয়া থাকে।' শকুন্তলা কণ্বের পালিতা কন্যা; সীতাও জনকের পালিতা কন্যা। বিদেহ জনক জ্ঞানী বলিয়া সর্বকালে প্রসিদ্ধি আছে; তথাপি তিনিও জানকীকে বুকে ধরিলেন। জ্ঞানীরা সুখে-দুঃখে বিচলিত হন না; কিন্তু জনক বিচলিত হইলেন।

অযোধ্যাকাণ্ডে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস উভয়েই বাল্মীকির পথ ধরিয়াছেন। বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই। তবুও অযোধ্যাকাণ্ডে তুলসীদাস কৃত্তিবাস অপেক্ষা আরও গভীর ও প্রাঞ্জল। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, কৈকেয়ী-কুব্জার কুমন্ত্রণা, রামের বনবাস ও পরে চিত্রকূটে ভরতমিলন দেখাইয়াছেন সাধারণভাবে। এই কাণ্ডের শেষে কৃত্তিবাস একটা নূতন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংবৎসর পরে রাম-লক্ষ্মণ পিতৃ-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। সীতা তখন ফল্গু নদীর তীরে। এমন সময় দশরথ সীতাকে দর্শন দিয়া পিণ্ড ভিক্ষা চাহিলেন। সীতা ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গুনদী ও বটবৃক্ষকে সাক্ষী করিয়া স্বামীর অনুপস্থিতিতে পিণ্ডদান করেন এবং দশরথ তাহাতে তৃপ্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া যান। তারপর রামচন্দ্রকে সে বৃত্তান্ত বলায় তিনি উহার প্রমাণ চাহিলেন। সীতা সাক্ষীদের একে একে ডাকিলেন। বট বাদে সবাই সীতার পিণ্ডদানের কথা অস্বীকার করিল। তখন সীতা প্রথম তিনজনকে অভিশাপ দিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণকে বলিলেন: 'লক্ষ-তঙ্কার দ্রব্য যদি থাকে তব ঘরে। ভিক্ষার লাগিয়া যেও দেশ-দেশান্তরে॥' তুলসীগাছ যদিও শ্রীহরির আদরের ধন, তবু তাহাকে বলিলেন: 'অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি হবে। শৃগাল কুকুর মূত্র-পুরীষ ত্যজিবে॥' ফল্গুনদীকে শাপ দিলেন: 'অন্তঃশীলা হয়ে তুমি বহ সর্বকাল। তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুকুর-শৃগাল॥' তারপর বটকে অক্ষয় অমর বর দিয়া বলিলেন: 'তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমায় কেবল। শীতকালে উষ্ণ হবে, গ্রীষ্মেতে শীতল॥ পুনর্বার সীতা তারে দিলা এই বর। ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর॥ মনোহর সুশীতল রবে অনিবার। নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার॥ সুশীতল রাখিবে, যে যাবে তব তলে। সর্বদা আনন্দে রবে নিজ-পত্র-ফলে॥'

প্রবাদ আছে তুলসীদাস প্রথম জীবনে স্ত্রৈণ ছিলেন। সেহেতু তিনি কৈকেয়ী-দশরথের ঘটনাটা একটু দরদের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন : কৈকেয়ী যে ডালে বসিয়াছিল সেই ডাল কাটিল। স্ত্রীস্বভাব অগম্য, গভীর ও গোপন। আরসির উপর নিজের যে ছায়া পড়ে তাহাও যদি ধরা সম্ভব হয়, তথাপি নারীমন জানা সম্ভব নয়। আগুন কি না জালায়? সমুদ্রের ভিতর কি না প্রবেশ করিতে পারে? স্ত্রীলোক প্রবল হইলে কি না করে? জগতে কাল কি না নাশ করে? প্রাণের রঘুনাথকে বনবাসে পাঠাইতেছেন কৈকেয়ী; সেহেতু কোপনস্বভাবা কৈকেয়ীকে তুলসীদাস প্রচণ্ডভাবে ধিক্কার দিয়াছেন। এ ব্যাপারে কৃত্তিবাসও দশরথকে টিপ্পনী করিতে ছাড়েন নাই : 'কৈকেয়ী যুবতী-নারী, দশরথ বুড়া। বুড়ার যুবতী-নারী প্রাণ হৈতে বাড়া॥'

বনবাসকালে সীতা সঙ্গে যাইতে চাহিলে রামের নিষেধ সীতা মানেন নাই। সীতার যুক্তিগুলি অকাট্য, সুন্দর ও বাস্তব : আত্মীয়-স্বজন এবং সকল স্নেহের সম্পর্ক স্বামী না থাকিলে সূর্য অপেক্ষা বেশী তপ্ত লাগে। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য পতিহীনার নিকট শোকের হেতু; ভোগ রোগের মত লাগে, ভূষণ ভার বোধ হয়, সংসার যম-যাতনার মত লাগে।

রামচন্দ্রের নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইবার কালে পাটনীর উপাখ্যানটি মনে হয় তুলসীদাস অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে লইয়াছেন। রামচন্দ্র পার হইতে চাহিলে পাটনী করজোড়ে কহিল : 'প্রভু, তোমার মর্ম জানিয়াছি। সকলে বলে তোমার চরণকমলের ধুলায় এমন কিছু আছে যাহাতে মানুষ করিয়া দেয়। তোমার ছোঁয়াতেই পাথর সুন্দরী স্ত্রী (অহল্যা) হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাঠ ত পাথর অপেক্ষা শক্ত নয়। সুতরাং নৌকাখানাও মুনিপত্নী হইয়া যাইবে। এই নৌকাই আমার পরিবার পালন করে, অন্য জীবিকা আর আমি জানি না। প্রভু, যদি নিতান্তই পার হইতে চাও, তবে আমাকে তোমাদের পাদপদ্ম ধোয়াইবার আজ্ঞা দাও। পারের কড়ি চাই না।' এমন সরলতাপূর্ণ প্রেমগাথা কঠোর মানুষের প্রাণেও ভক্তির হিল্লোল না বহাইয়া যায় না। প্রাচীন যুগের আশীর্বাদগুলিও কতই না তাৎপর্যপূর্ণ! সতী সীমন্তিনী সীতার বনবাসকালে শাশুড়ীরা আশীর্বাদ করিতেছেন : 'যতদিন গঙ্গা-যমুনার জলস্রোত বহিবে ততদিন যেন তোমার এয়োতি থাকে।' চলার পথে গ্রামের স্ত্রীরা বলিতেছেন : 'যতদিন নাগের মাথার উপর পৃথিবী থাকিবে ততদিন যেন তুমি স্বামি-সোহাগিনী থাক।' (ক্রমশঃ)

[৩৫২ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

করে, তার সবটুকুই কি মিথ্যা ? উত্তর হলো—ভাষা ছাড়া অর্থাৎ বাক্য-বিনা এমনকি মন ব্যতীত বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার আলোকে সত্য যখন উদ্ভাসিত হয় তখন ঐ হাজার বছরের হাজার আলোচনা সত্যিই মিথ্যা—কারণ তারা আসলের আসল পরিচায়ক নয়। তবে ঐ পথে সত্যোপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ কিনা ব্যবহারিক বা অ-পারমার্থিক স্তরে এত সব ছোট বড় আলাপ আলোচনা, বিচার বিবেচনা সবকিছুরই মূল্য আছে—কারণ সত্যকে সম্পূর্ণভাবে জানাতে না পারলেও তাকে জানার পথে একটুখানি আলো নিয়ে এরা এগিয়ে আসে আমাদের কাছে। অন্তত: সত্য যে এসবের ধরাছোঁয়ার বাইরের বস্তু এই হুঁশিয়ারীটুকু এরা সত্যসন্ধানীকে দিতে পারে ; এটাই বা কম কি ?

আধুনিক যুগে ভাষার ইতিবৃত্ত ইত্যাদি যাচাই করে এর নবকলেবর প্রত্যক্ষ করে আমরা যত গর্বই করি না কেন, এই সিদ্ধান্ত কিন্তু অকার্যই থেকে গেল যে কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পার্থিব জগতে, কি অপার্থিব অতীন্দ্রিয় লোকে—ভাষা কোথাও বস্তুসত্তা বা সত্যকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। ভাষার এই অক্ষমতাই তার চারিত্রিক বিশিষ্টতা। এই আবিষ্কার ভাষার পক্ষে লজ্জার কারণ নয়—এটা আমাদেরই অজ্ঞতার পরিচায়ক। ভাষার দুর্বল বাহুবন্ধনে বস্তুসত্তাকে বেঁধে রাখতে গিয়ে আমরা বার বার ভুল করে আসছি অনেক দিন থেকে। এই ভুল আমাদের কখনই ভাঙবে না, যদি না কোন এক মঙ্গল মুহূর্তে বোধির বোধ এসে ভাষার আসন গ্রহণ করে।

"যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন।"

'যেতে নাহি পারি সেই পরব্রহ্ম পাশে
দূর হতে মন সহ বাক্য ফিরে আসে ;
আনন্দ-স্বরূপ তাঁর প্রত্যক্ষ করিলে
নাহি ভয় কোন ঠাঁই এ বিশ্ব নিখিলে।'

অনিকেতন

[কন্নড কবিতা : অনুবাদিকা—শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা]

ডক্টর কুভেংপু

হে মোর চেতন,
তুমি অনিকেতন হও !
রূপ রূপান্তরকে অতিক্রম করে,
নাম-বাসনার সকল উপাধিকে ত্যাগ করে,
তোমার হৃদয়কে স্বচ্ছ চিন্তায় উন্নত করো !
হে মোর চেতন,
তুমি অনিকেতন হও !

অসংখ্য মত-মতান্তরকে উপেক্ষা করে,
সকল তত্ত্বের সীমা অতিক্রম করে
সীমাহীন হয়ে উর্ধ্বচেতা হও !
হে মোর চেতন,
তুমি অনিকেতন হও !

গতি বন্ধ করো না কোথাও,
ঘর তুমি বেঁধো না কোথাও
তোমার অন্ত যেন না হয় কখনো ;
হে অনন্তমহিম !
হে মোর চেতন,
তুমি অনিকেতন হও !

অনন্তও স্বয়ং অন্তকে অতিক্রম করছে
অনন্ত নিত্যযোগী হচ্ছে,
অনন্ত তুমি অনন্ত হও :
হও, হও, হও, হও !
হে মোর চেতন,
তুমি অনিকেতন হও !

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার তুলনামূলক আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর পরিণত মানসে বিশ্বসভ্যতার পটভূমিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাদর্শগত পার্থক্য সম্বন্ধে একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য—"·প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হ'তে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।

"···আমাদের ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজিৎ একই কথা।

"আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য বিনা তা কেমনে হয়, বলো?"[১] ভারতীয় জীবনাদর্শের চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এর শেষ কথা মোক্ষ। সেটি মনে রাখলেই বোঝা যায় কেন প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থীমাত্রই 'ব্রহ্মচারী'। পরে অবশ্য ব্রহ্মচারী শব্দটি 'সাধক' শব্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। কিন্তু এদেশে বিদ্যার্থীর পরমলক্ষ্য যে অধ্যাত্ম-অনুভব, সেকথা মনে রেখেই ব্রহ্মচর্যের প্রতি এ-দেশীয় আচার্যদের এত গুরুত্বদান।

পাশ্চাত্যদেশে যাঁরা নানা উপলক্ষে যাতায়াত করেছেন, তাঁরা জানেন, এ-জাতীয় কোনো মনোভাব পাশ্চাত্যশিক্ষাদর্শের পিছনে নেই। তার কারণ, পাশ্চাত্যজীবনচেতনার মূলে এই জগৎ ও জীবন। মানবিকতাই প্রাচীন গ্রীক থেকে আধুনিক আমেরিকান বা রুশ তরুণের জীবনাদর্শ। দেশ হিসাবে আমেরিকা ঈশ্বর-অবিশ্বাসী নয়। কিন্তু যে-জীবনচেতনায় মানুষের পরম সার্থকতা ভগবানলাভে, সে চেতনা বিচ্ছিন্নভাবে আমেরিকার কিছু লোকের থাকলেও জাতির সামগ্রিক শিক্ষাদর্শনে তার কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় তা ছিল এবং আধুনিক কালের যে-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যসংযোগে বিশ্বাসী, (রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অন্যতম) তারাও এই ভারতীয় শিক্ষাদর্শনকে মূলতঃ স্বীকার করেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পেন্সার তাঁর Education (শিক্ষা)-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন—'What Knowledge is of most worth?'—স্বামীজীর অনুবাদে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?' যদি স্বামীজী নিজে এ প্রশ্ন তুলতেন, তাহলে পরা ও অপরা বিদ্যা দুয়েরই প্রয়োজন স্বীকার করলেও অধ্যাত্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যাই তাঁর দৃষ্টিতে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান'-রূপে নির্দিষ্ট হ'তো। কিন্তু স্পেন্সার ধর্ম বা ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে বিশেষ মাথা ঘামান নি, কারণ তাঁর জীবনচর্যা প্রধানতঃ ইহলোকমুখী। জীবন-যাপনের আদর্শ সম্বন্ধে স্পেন্সার মোটামুটি যে কয়ভাগে তাঁর চিন্তাধারাকে সাজিয়েছিলেন, তার প্রধানসূত্রগুলি এই—Our first step must obviously be to classify, in the

---

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য: পৃ: ১৯৬

order of their importance, the leading kinds of activity which constitute human life. They may be naturally arranged into :—1. Those activities which directly minister to self-preservation, 2. Those activities which, by securing the necessaries of life, indirectly minister to self preservation ; 3. Those activities which have for their end the rearing and discipline of offspring ; 4. Those activities which are involved in the maintenace of proper social and political relations ; 5. Those miscellaneous activities which fill up the leisure part of life, devoted to the gratification of the tastes and feelings.[২]

স্বামীজীর অনুবাদ—"মনুষ্যজীবন কার্যময় এবং আমাদের প্রথম কর্তব্য এই সকল কার্যকরী শক্তিকে শ্রেণীবিভক্ত করা।

১। যে সকল কার্যের দ্বারা আত্মরক্ষা হয়।

২। যে সকল কার্য অপরোক্ষভাবে জীবনোপায়সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা করে।

৩। যাহা দ্বারা সন্তানপালন সম্পন্ন হয়।

৪। যাহা দ্বারা সামাজিক অবস্থা যথাযথ সংরক্ষিত হয়।

৫। কতকগুলি মিশ্র কার্য—যাহারা জীবনের অবসরভাগ অধিকার করিয়া আমোদ এবং সুখেচ্ছা চরিতার্থ করাইয়া পর্যবসিত হয়।"[৩]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, স্পেন্সার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার সন্ধানী হয়ে মোটের উপর তাঁর সমকালে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় জীবনযাপনের আদর্শের কথাই ভেবেছেন, মানব-অন্তরের মহত্তম আকাঙ্ক্ষা বা ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব এক্ষেত্রে তাঁকে বিচলিত করে নি। কার্যকরী শক্তিগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করার ক্ষেত্রে সব কাজের আড়ালে যে মানুষের অন্তর্লোকের জিজ্ঞাসা—এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন অনুপস্থিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাচিন্তার এই আদর্শগত পার্থক্যটি আমরা অনেকসময় ভুলে যাই। সন্দেহ নেই, রামমোহনের সমকালে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের আগ্রহেই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপর নির্ভরশীল শিক্ষাচিন্তা মানব-অন্তরের গভীরতম সমস্যার ক্ষেত্রে নিরুত্তর। হৃদয়যন্ত্রের শারীরবিজ্ঞানগত পরিচয় আমরা যতই জানি না কেন, মানবহৃদয়রহস্যের কূল পাওয়া কোনো বিজ্ঞানীর সাধ্য নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসচেতন মননের অধিকারী এবং ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত জীবনে উপযোগিতাবাদে (utilitarianism) বিশ্বাসী স্পেন্সারের কাছে হয়তো এই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সীমা।

কিন্তু উত্তরকালে স্বামীজী যখন শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ-সাধনের (manifestion of the perfection already in man) কথা বলেন, তখন বেদান্তের আত্মতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত ভারতীয় শিক্ষাদর্শনের কথাই মনে পড়ে। 'ভাববার কথা'-গ্রন্থের 'জ্ঞানার্জন'-নিবন্ধে স্বামীজী বৈদান্তিক শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে স্বল্পকথায় বলেছেন—

২ Education : Spencer : 1st, Edn. p 9

৩ শিক্ষা : 'বসুমতী'-প্রকাশিত শ্রীশশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ : পৃঃ ১০

"...বৈদান্তিকেরা বলেন, জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধন— আত্মার প্রকৃতি; এই মানবাত্মাই অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাহাকে আবার কে শিখাইবে? কুকর্মের দ্বারা ঐ জ্ঞানের উপর যে একটা আবরণ পড়িয়াছে - তাহা কাটিয়া যায় মাত্র। অথবা ঐ 'স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান' অনাচারের দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ঈশ্বরের কৃপায় সদাচারের দ্বারা পুনর্বিস্ফারিত হয়।"[৪]

বেদান্তের বীজমন্ত্রস্বরূপ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"[৫] বা "অহং ব্রহ্মাস্মি"[৬]-জাতীয় আদর্শের কথা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। জাতীয় জাগরণের পটভূমিকায় স্বামীজী মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মার অনন্তশক্তিতে বিশ্বাসের অগ্নিমন্ত্র সঞ্চারিত করেছিলেন। প্রাচীন ঋষির এই আত্মতত্ত্বের অভিজ্ঞানই বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার মূল সূত্র। শিক্ষার এ সত্য যেমন ভারতের তেমনি বিশ্ববাসীর। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, স্বামীজীর আশীর্বাদে জাত 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রেরণামন্ত্র "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"[৭]—কঠোপনিষদের মহাবাক্য।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, লোকায়ত শিক্ষাদর্শের সঙ্গে বেদান্তভিত্তিক শিক্ষাদর্শের দুস্তর পার্থক্য কেমন করে দূর হবে? অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে এ পার্থক্য সত্য বলে মনে হ'লেও বেদান্তের গভীরে যাঁরা পৌঁছেছেন, তাঁদের কাছে এ পার্থক্য কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। স্বামীজীর ভাষায়—"অপরা ও পরা বিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত; আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত; একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষণ (difference) কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনভেদ; বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পরিব্যাপ্ত।"[৮]

উদ্ধৃত মন্তব্যের শেষ বাক্যাংশটি বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। স্বামীজীর মতে জ্ঞান এক, অখণ্ড। আত্মতত্ত্ব যদি এক ও অখণ্ড হয়, তাহলে আমরা 'জ্ঞান' বলতে যা বুঝি, তা আপাতদৃষ্টিতে পৃথক পৃথক মনে হলেও এক পরমজ্ঞানেরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার পটভূমিতে বেদান্তের আত্মতত্ত্ব ও কর্মে পরিণত বেদান্তের আদর্শ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"এই জগতে আমরা যে-সকল জ্ঞান লাভ করি, তাহারা কোথা হইতে আসে? উহারা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। কোন জ্ঞান কি বাহিরে আছে?—আমাকে এক বিন্দু দেখাও তো। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহা বরাবর মানুষের ভিতরেই ছিল। জ্ঞান কেহ কখনও সৃষ্টি করে নাই; মানুষ উহা আবিষ্কার করে, ভিতর হইতে উহাকে বাহির করে, উহা ভিতরেই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহা ঐ সর্ষপঞ্জীবের অষ্টমাংশের তুল্য ক্ষুদ্র জীবে ছিল- ঐ মহাশক্তিরাশি উহার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটি জীবাণুকোষের ভিতর সকল শক্তি, প্রখর বুদ্ধি কুণ্ডলীকৃত হইয়া অবস্থান করে; তবে

৪ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ : ৩৮

৫ ছান্দোগ্য উপনিষৎ : ৬।৮।৭ "শ্বেতকেতু, তুমিই সেই সৎ (ব্রহ্ম)"। তু "এক কথায় বেদান্তের উপদেশ— 'তত্ত্বমসি'।" (কর্মজীবনে বেদান্ত —প্রথম প্রস্তাব : বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড : পৃঃ ২২৩)

৬ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ : ১।৪।১০ "আমিই ব্রহ্ম"

৭ "ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে গিয়ে আত্মতত্ত্ব জানো।" কঠোপনিষৎ ১।৩।১৪

৮ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'জ্ঞানার্জন' : পৃঃ ৩৯-৪০

অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি, তাহা আছে। প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও উহা সত্য। আমরা সকলেই একটি জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু শক্তি রহিয়াছে, তাহা ঐ জীবাণুকোষেই কুণ্ডলীভূত হইয়া ছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত; রাশীকৃত খাদ্য লইয়া খাদ্যের এক পর্বত প্রস্তুত কর, দেখ তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়। আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল, অব্যক্তভাবে উহা ছিল নিশ্চয়ই; অতএব সিদ্ধান্ত এই—মানুষের আত্মাতেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র।"[9]

"ভাবিয়া দেখ, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে তুমি এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পারো যে, ইচ্ছা সর্বশক্তিমান? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও উন্নত করিবে।"[10]

"আমাদিগকে দেখিতে হইবে কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, গ্রামীণ জীবনে, জাতীয় জীবনে, প্রত্যেক জাতির পারিবারিক জীবনে কাজে পরিণত করিতে পারা যায়। কারণ, মানুষ যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাহাকে সাহায্য করিতে না পারে, তবে ধর্মের বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা জনকয়েক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট মতরূপেই থাকিয়া যাইবে। ধর্মের দ্বারা যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে হয়, তবে ধর্মকে এমন করিতে হইবে যে, মানুষ যেখানে যে-অবস্থায় আছে, সেইখানেই—দাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, অধঃপাতের গহ্বরে বা পবিত্রতার তুঙ্গশিখরে—সর্বাবস্থায় সমভাবে ধর্ম মানবজাতিকে সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে।"[11]

প্রাচীনকালের ইতিহাসে একাধিক সম্রাট রাজর্ষির কথা জানা যায়, জীবনের চরম কর্মব্যস্ততার মধ্যে যাঁরা ব্রহ্মতত্ত্বোপলব্ধি করেছিলেন এবং সে উপলব্ধি অন্যের হৃদয়েও সঞ্চার করেছেন। কুরুক্ষেত্রের রণকোলাহলের মাঝখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে জগতের মহত্তম ধর্মচিন্তার উদাহরণ স্থাপিত। সুতরাং ধর্মতত্ত্ব যে বাস্তবজীবনসম্পর্কবিচ্যুত শুধুমাত্র গিরিগুহা বা অরণ্য-আশ্রয়ী এমন কথা ভারতবাসীরা মনে করতেন না। কিন্তু কালক্রমে সে-আদর্শের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আমরা আবার ব্যবহারিক বিদ্যার নিজস্ব সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। তরুণবয়সে নরেন্দ্রনাথ তাই স্পেন্সারের 'এডুকেশন' শিক্ষা) গ্রন্থের অনুবাদক। (ক্রমশঃ)

৯ বাণী ও রচনা: ২য় খণ্ড: কর্মজীবনে বেদান্ত—৩য় প্রস্তাব: পৃঃ ২৭১-২৭২

১০ তদেব: কর্মজীবনে বেদান্ত—চতুর্থ প্রস্তাব: পৃঃ ২২৮

১১ তদেব: কর্মজীবনে বেদান্ত—প্রথম প্রস্তাব: পৃঃ ২২৯

রবীন্দ্রনাথের 'ধ্যান'

শিবদাস

নিত্যই তোমার ধ্যান করি, তোমাকে "চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি।" তোমাকে বরণ করি "বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া।" বিশ্ববিহীন বিজন ব'লে কোন স্থান তো আর হয় না—তোমাকে বরণ করি বিশ্বচিন্তাহীন মনে, 'তুমি' ছাড়া আর কোন কিছুর, কোন জাগতিক বস্তু বা বিষয়ের চিন্তাবিহীন মনে। সমগ্র মন একাগ্র করি তোমাতে ; এভাবে 'আবৃত্তচক্ষুঃ'[১] হওয়া ছাড়া তোমায় পাবার দ্বিতীয় আর কোন পথ তো নেই।

এ বিজনও অবশ্য ঠিক বিশ্বহীন নয়। এখানে 'তুমি' আছ, 'আমি'ও আছি আমার মনকে নিয়ে, তার চিন্তাকে নিয়ে (অবশ্য সে চিন্তায় তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই) -যা বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিহীন বিজন হল, যেখানে তুমি ছাড়া (বা মনবুদ্ধি প্রভৃতি বিশ্বের ভিতরকার বস্তুবিহীন আমি ছাড়া—দুই-ই এক,) দ্বিতীয় আর কোন সত্তাই নেই। সে বিজন হল, যেখানকার আভাসমাত্র পেলেও চিত্ত চিন্তায় তাকে রূপ দিতে পারে না, 'করে থাকে চুপ,' 'ছন্দ যায় থামি।'[২] ছন্দ, কথা, এসব তো হ'ল মনের বেড়ার মধ্যে যতক্ষণ রয়েছি, যতক্ষণ না তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারছি, ততক্ষণকার ব্যাপার। মন যখন একা একা কথা বলে বাগিন্দ্রিয়ের ব্যবহার না ক'রেই, বা কোন ছবি বা রূপ দেখে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই, অথবা একসঙ্গে দুই-ই করে, তখন তাকে বলি চিন্তা ; আর যখন সেই 'নাম-রূপ'কেই লেখায় বা বাক্যে প্রকাশ করি, তখন তাই-ই হয় কথা বা ছন্দ। নাম-রূপ ছাড়া চিন্তাই হয় না, বিশ্ব-বোধও জাগে না। নাম-রূপ যতক্ষণ আছে বিশ্ব ততক্ষণ থাকবেই। কাজেই মনে যতক্ষণ তুমি-আমি মাত্রও আছে, মন তোমাকে যে-কোন ভাবেই হোক 'দেখছে', তোমাকে নিয়ে মনে চিন্তার তরঙ্গ উঠছে, মন ছন্দ গাঁথছে, ততক্ষণ আমরা বিশ্ববিহীন বিজনে যেতে পারছি না। ততক্ষণ আমাদের সে ধ্যান সগুণ ব্রহ্মেরই ধ্যান—তাঁর কোন বিশেষ রূপেরই হোক, বিশ্বরূপেরই হোক বা সগুণ নিরাকারেরই হোক। এই সগুণ নিরাকারকে "প্রশান্ত চিরনিশিদিন" রূপেও বোধ হতে পারে, আবার করুণা প্রেম প্রভৃতির তরঙ্গময় ব'লে বোধ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এই ধ্যান 'তুমি' 'আমি' দুইকে লইয়া। সে দুই—তুমি আর আমি যে "একাকার," এবোধ সেখানে আছে, আবার দুয়ের পৃথক অস্তিত্ববোধও রয়েছে :—

"তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার—

---

১ 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।' (কঠোপনিষদ্, ২।১।১)
—ভগবান ইন্দ্রিয়গুলিকে হিংসা করেছেন, সেজন্য তারা বহির্বিষয়ই দর্শন করে, ভগবানকে দেখতে পায় না (ভগবান এভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে সৃষ্টি করেছেন যে সেগুলির দ্বারা আমরা বহির্বিষয়ই গ্রহণ করতে পারি, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না)। কোন কোন ধীর ব্যক্তি তাই অমৃতত্বলাভের ইচ্ছায় বিষয় হতে ইন্দ্রিয়গুলিকে সরিয়ে এনে, বিষয় গ্রহণে বিরত হয়ে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

২ রবীন্দ্রনাথ—'মুক্তবাতায়নপ্রান্তে' (আরোগ্য)

যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।"

তুমি চিন্তাতরঙ্গহীন চৈতন্যস্বরূপ, আমি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি মনের সঙ্গে—যাতে সর্বদা চিন্তাতরঙ্গ বা ভাবতরঙ্গ উঠছে, চিন্তা ছাড়া যার অস্তিত্বই নেই; কারণ, কারণ-শরীরে বীজাকারে থাকলেও তোমার প্রতিবিম্বই শুধু স্পষ্ট সেখানে। এ ধ্যানে যে "একাকার" বোধ তা স্পষ্টতই অদ্বৈত নয়, দুটি পৃথক সত্তার মিলন, পরস্পরের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই—কখনও নিজেকে তরঙ্গময় রেখে, কখনো বা তরঙ্গহীন অবস্থায় নিজের সব ঠাঁই জুড়ে তাঁকে প্রতিবিম্বিত রেখে।

এই ধ্যানের রেশই ওতপ্রোত রবীন্দ্রকাব্যে অধ্যাত্মচিন্তার প্রায় সর্বত্রই; বোধ হয় বলা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রধান সুর বিশিষ্টাদ্বৈত: 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'[৩] —'যেথা যাই আর যেথায় চাহিরে, তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে',[৪] 'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি'[৫] —

'জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির গৌরব,
একথা যদি না শিখিলে
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে॥'[৬]

রবীন্দ্রকাব্যে উচ্চস্তরের অধ্যাত্মচিন্তায় অধ্যাত্ম-হিমালয়ের এই শিখরটির ওপরই 'আমি' দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় সব সময়েই, যেখানে দাঁড়'লে বিশ্বকেও দেখা যায়; তবে আমরা সাধারণ অবস্থায় সেখানকার বস্তুগুলিকে যেভাবে পৃথক পৃথক সত্তা রূপে দেখি, 'নানা' রূপে দেখি, সেভাবে নয়, সেগুলির নামরূপের আবরণগুলিকে পৃথক বোধ হলেও দেখা যায় সেগুলির সত্তা একই, 'তুমি'; কদাচিৎ তা এ শিখর ছেড়ে ঊর্ধ্বগামী হয়ে সর্বোচ্চ শিখর 'নৈঃশব্দ্য-চূড়া'[৭] স্পর্শ করেছে, কদাচিৎ সে 'আমি'-র ধারা নামরূপে বিহায়'[৮] মিশতে চেয়েছে 'পরিপূর্ণচৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে,'[৯] যা যথার্থই 'বিশ্ববিহীন বিজন',—'নির্বিশেষম্‌', 'যেথায় পেয়েছে লয় সকল বিশেষ পরিচয়,' —'সদসদ্‌বিহীনম্‌,' 'নেই আর আছে এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,'—'অদ্বৈতম্‌'।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত—যে ভাব অবলম্বনেই হোক, ধ্যান মানেই হল বহির্বিশ্বে ছড়ানো মনকে সেখানে থেকে ফিরিয়ে এনে ভগবচ্চিন্তায় বা আত্মচিন্তায় (যা মূলতঃ একই কথা) একাগ্র করার চেষ্টা করা, অথবা মনকে একেবারে চিন্তাশূন্য করার, 'চুপ' করিয়ে দেবার চেষ্টা করা। তোমার ধ্যানে আমার প্রাণ স্থির হয়েছে—

---

৩ জগতে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, সবই ভগবানের দ্বারা আচ্ছাদন করবে (ভগবানই বিশ্বের সব কিছু জুড়ে আছেন, এরূপ জ্ঞান করবে।)

৪, ৬ রবীন্দ্রনাথ—'প্রবাসী' (উৎসর্গ)

৫ কঠোপনিষদ্‌, ২।১।১১। (শুদ্ধ) মনের দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। ব্রহ্মে বিন্দুমাত্র নানাত্ব (ভেদ) নেই। যে এখানে নানাত্ব দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (বারংবার জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকে।)

৭, ৯ রবীন্দ্রনাথ—'পথের শেষে' (জন্মদিনে)

৮ 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথাবিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষং উপৈতি দিব্যং॥' (মুণ্ডকোপনিষদ্‌, ৩।২।৮)। নদীগুলি যেমন প্রবাহিত হয়ে এসে সাগরে প'ড়ে (নিজেদের পৃথক পৃথক) নাম-রূপ হারিয়ে সাগরে মিশে যায়, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তেমনি নাম-রূপ হতে মুক্ত হয়ে পরাৎপর স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন (পরমাত্মার সহিত একত্ব অনুভব করেন)।

"উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত
একটি নয়ন-সম।"

—'যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে।' বায়ু-প্রবাহহীন স্থানে দীপশিখা যেমন স্থির হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি। বাসনাই হল বাতাস, যা মানসদীপকে চঞ্চল করে। আমার মন তো এখন কোন কিছুর জন্য লালায়িত নয়, "উদাস"।

মন যতই একাগ্র হয় ততই তার সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুভব করার ক্ষমতা বাড়ে; একাগ্র, স্থির মনেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপলব্ধি করার সামর্থ্য আসে, তার ক্ষমতা হয় অসীম। এখন তোমাতে একাগ্র আমার মনেরও দৃষ্টি তাই শুধু "উদাস" নয়, "অগাধ, অপার।"

কবি 'মন' বলেন নি, 'প্রাণ' বলেছেন। মন ও প্রাণ পৃথক সত্তা; উপলব্ধি মনেই হয়, প্রাণে হয় না। তবে আমরা অবশ্য মন ও প্রাণকে একই সঙ্গে, কখনো কখনো একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি। প্রাণ হ'ল শক্তি যা দেহযন্ত্রকে গঠিত, লালিত ও পরিচালিত করে। প্রাণ স্থির হলেই মন স্থির হয়; প্রাণের নিয়মনও তাই মনকে স্থির করার একটি উপায়। আবার জ্ঞান ভক্তি যে কোন ভাব অবলম্বনে মনকে স্থির করতে পারলে প্রাণও স্থির হয়ে যায়।

মন যত স্থির হয় ততই তা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে আপ্লুত হতে থাকে। আমাদের হৃদয়েই যে প্রেমসিন্ধু বিদ্যমান রয়েছে, ততই তা বোধ হতে থাকে। আর আমরা যে অনন্তের অধিকারী, তার আভাস পেতে থাকি তত বেশী ক'রে। তাই-ই তো আমি অনুভব করছি এখন:

"তোমার পাইনে কূল—
আপনার মাঝে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।"
"তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।"

এই পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলোকেই একদিন উদ্ভাসিত হয়ে থাকতো ভারতের তপোবন, ভারতের রাজাসন, ভারতের সর্বসাধারণের গৃহ-প্রাঙ্গণ; স্নিগ্ধ ক'রে রাখতো জাতীয় জীবনকে। জ্ঞানকে তুলনা করা হয় সূর্যালোকের সঙ্গে, ভক্তিকে চন্দ্রিমার সঙ্গে। আনন্দলোকে পৌঁছবার জন্য জ্ঞানপথে চলার অধিকারী অতি অল্প, ভক্তিপথই সর্বসাধারণের উপযোগী। এ 'ধ্যান' ভক্তিপথেরই শান্তভাবের ধ্যান বলে "পূর্ণিমা" কথাটি অধিকতর মাধুরীমাখা হয়েছে। এই পূর্ণিমালোকই ছড়ানো রবীন্দ্রকাব্যে আরও বহু স্থানে।

সত্য

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ দাস

সত্যিকারের পথ যে ওটা
সহজ এবং সরল,
নির্বিবাদে পেরিয়ে চলো
নেই ও পথে গরল।
সতিকারের পুকুর যে ঐ
স্বাদু জলের ঠাঁই,
খুশিমতো পান করে নাও
চিত্ত যতো চায়।
সত্যিকারের বাগান এটা
পুষ্পরাজির মেলা,
অবসরে বেড়াও হেথা,
করতে পারো খেলা।
সত্যিকারের পাগল ও যে
নিজের মনে ঘোরে ;
ওর কথাতে রাগ কোরো না
মান-অপমান ধ'রে।
সত্যিকারের মানুষ যে জন
আদর্শ নাও তার,
দেশের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ো
দেশকে করো সার।

মরীচিকার মোহে ভুলে
সত্যি ভেবে তাকে
তাহার পানে ছোট যদি
পড়বে দুর্বিপাকে।
সেয়ান-পাগল যে-জন,
করে স্বার্থত্যাগের ভান
তার কবলে পড়লে হবে
জীবন শতখান।
সত্যিকারের মানুষ কি না
জানার আগে ভাই
আদর্শ তার নিলে ভাগ্যে
দুর্দশা যে ভাই।

সমালোচনা

অনুবাদবিবেকানন্দম্ঃ Translation of Swami Vivekananda's Works. By Dr. Sitanath Goswami; —"Kalyani", 63/1A, Selimpur Lane, Calcutta 31 Price: Rs 7'00, P. 120.

স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি সংস্কৃত স্তোত্রাদি রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার কয়েকটি পত্র সংস্কৃতে রচিত। তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলিতেন—সংস্কৃতের অমৃতভাণ্ড জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। স্বাধিকারপ্রমত্ত দেশবাসীর কর্ণে তিনি বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের মন্ত্রই প্রদান করিয়াছেন।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় স্বামীজীর রচিত গ্রন্থ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', ও 'বর্তমান ভারত' তাঁহার প্রাণপ্রিয় দেবভাষায় অনূদিত হইয়াছে। গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁহার নিজস্ব মৌলিক রচনাবলীও তাঁহার অসামান্য মনীষার অভ্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান করে। 'বেদান্তদর্শনে পরমার্থতত্ত্ব', 'ভারতে গোরক্ষা' প্রভৃতি সুচিন্তিত গবেষণাগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠার আসন অর্জন করিয়াছেন। তৎসম্পাদিত আলোচনা-বহুল 'ঈশোপনিষৎ ও কেনোপনিষৎ' স্নাতক-শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অপরিহার্য নিত্যসঙ্গী। 'স্বামীজীর হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তা'র রচয়িতা বর্তমান লেখক যে স্বামীজীর রচনার সংস্কৃতানুবাদের পুণ্যব্রত গ্রহণ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোন হেতু নাই।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের প্রতি একটি ভীতি-বিমিশ্র অহেতুক ঔদাসীন্য আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। ডক্টর গোস্বামীর আলোচ্যমান অনুবাদের প্রতি দৃক্‌পাত করিলে সেই ভীতি লব্ধাবসর থাকিতে পারিবে মনে হয় না। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র জলদমন্দ্র অনুবাদের ভিতর দিয়াও সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছে:

"কোটীনাং ত্রিংশদ্ মানবপ্রায়াঃ খলু জীবাঃ বহুশতাব্দীপর্যন্তং স্বজাতীয়ানাং বিজাতীয়ানাং স্বধর্মিণাং বিধর্মিণাং চ পদভরৈর্নিতরাং নিষ্পীড়িতাঃ, দাসোচিতশ্রমসহাঃ, দাসবন্নিরুদ্যমাঃ, আশাহীনাঃ, অতীতহীনাঃ, ভবিষ্যদ্‌বিহীনাঃ, অধুনা যেন কেন প্রকারেণ প্রাণধারণমাত্রাভিলাষিণঃ দাসবদীর্ষ্যাপরায়ণাঃ, স্বজনোন্নতিমসহমানাঃ, হতাশবদ্ বীতশ্রদ্ধাঃ, বিশ্বাসহীনাঃ, শৃগালবন্নীচচাতুরীপ্রতারণাসহায়াঃ, স্বার্থপরতায়া আধারস্বরূপাঃ, বলবতাং পদলেহকাঃ, স্বাপেক্ষয়া দুর্বলানাং যমস্বরূপাঃ, নির্বলনিরাশোচিতকদর্যভীষণকুসংস্কারপূর্ণাঃ, নৈতিকপৃষ্ঠাস্থিহীনাঃ, পূতিগন্ধিমাংসখণ্ডব্যাপিকীটকুলানিব ভারতশরীরে পরিব্যাপ্তাঃ—ইত্যেব ইংরেজরাজপুরুষাণাং দৃষ্টাবস্মদীয়ং চিত্রম্।"—উদ্ধৃতিতে সযত্ননির্বাচিত অভিধানের দুরূহ একটি শব্দও নাই।

স্বামীজীর প্রজ্ঞালব্ধ ইতিহাস-বোধের আর একটি উদাহরণ—"পুরোহিতপ্রাধান্যেন সভ্যতায়াঃ প্রথমাবির্ভাবঃ, পশুত্বস্যোপরি দেবত্বস্যাদ্যো বিজয়ঃ, জড়স্যোপরি চেতনস্যাদিভূতোঽধিকারবিস্তারঃ, প্রকৃতেঃ ক্রীতদাসস্য জড়পিণ্ড-সদৃশস্য মনুষ্যদেহস্যাভ্যন্তরেঽস্ফুটতয়া যদধীশ্বরত্বং নিহিতং তস্য চ প্রাথমিকো বিকাসঃ। পুরোহিতঃ খলু জড়চৈতন্যয়োরাদিমো বিভাজকঃ, ইহপরলোকয়োঃ সংযোগস্য সহায়ঃ, দেবমনুষ্যয়োর্বার্তাবহঃ, নৃপতিপ্রকৃত্যোর্মধ্যবর্তী

সেতুঃ। বহূনাং কল্যাণানাং প্রথমাঙ্কুরস্তস্যৈব তপোবলেন, তস্যৈব বিদ্যানিষ্ঠয়া তস্যৈব ত্যাগমন্ত্রেণ তস্যৈব প্রাণসেকেন সমুদ্ভূতঃ, অতঃ সর্বেষু দেশেষু প্রথমা পূজা তেনৈব লব্ধা, অতএব চ তেষাং পুরোহিতানাং স্মৃতিরপ্যস্মৎসমীপে পবিত্রা।"

মূল গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা বহুস্থানেই সমাসবহুল ; অনুবাদে তাহাই অনেকাংশে অনুসৃত হইয়াছে ; তাহাতে ভাষায় বেশ একটি দৃপ্ত তেজ প্রকাশিত। 'ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বম্।' আবার সরল আটপৌরে কথাও অনুবাদে প্রতিফলিত : "ভৃষ্টানি দ্রব্যাণি সাক্ষাদ্‌বিষমেব। মোদকাপণং যমগৃহম্। ঘৃততৈলং গ্রীষ্মে দেশে যাবৎ স্বল্পং ভক্ষ্যতে তাবদেব কল্যাণম্। ঘৃতান্নবনীতং শীঘ্রতরং পচ্যতে। যন্ত্রপিষ্টে গোধূমচূর্ণে ন কিমপ্যস্তি, শ্বেতং তদ্ দৃশ্যত ইত্যেব। গোধূমস্য কৃৎস্নো ভাগো যত্র বিদ্যতে তাদৃশং গোধূমচূর্ণং সুখাদ্যম্।" "মনুষ্যো ভব, রামচন্দ্র! দ্রক্ষ্যসি যচ্ছিষ্টং সর্বং স্বত এব লীলয়াঽগমিষ্যতি। কুক্কুরবন্ মিথঃ সংঘর্ষং তং পরিত্যজ্য সদুদ্দেশ্যং সদুপায়ং সৎসাহসং সদ্‌বীর্যং চাবলম্বস্ব। জাতশ্চেত্তর্হি কঞ্চনাঙ্কং পাতয়িত্বা গচ্ছ।"

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে সংস্কৃত অনুবাদ-সাহিত্য ক্রমশই গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের জাতীয় সংবিধানেরও সংস্কৃত অনুবাদ হইয়াছে। সংস্কৃতে পত্র-পত্রিকার প্রকাশনও বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষা-মন্ত্রকের প্রেরণায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত দিবস উদ্‌যাপিত হইতেছে। এই সকল শুভ প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এই অতিসুপাঠ্য গ্রন্থখানি স্বতই অভিনন্দনীয়। বিশেষতঃ শিক্ষার্থিগণ যদি এইরূপ গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংস্কৃতভীতি দূরীভূত হইয়া প্রভূত কল্যাণ হইবে মনে করি। মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপদ-সংবলিত সুমুদ্রিত গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। **—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত**

আশ্রম (রজতজয়ন্তী সংখ্যা) —শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪পরগনা। প্রকাশক : স্বামী পুণ্যানন্দ। পৃষ্ঠা ১৪৪।

রহড়া বালকাশ্রমের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রজতজয়ন্তী সংখ্যার আত্মপ্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে আশ্রমের অগ্রগতি অব্যাহত—'আশ্রমিকী' শীর্ষক নিবন্ধটিতে ইহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি রচনা সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ—রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য : বিবেকানন্দ যুগ, রাজা রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ : বাঙালীর মনন-সমীক্ষা, শ্রীরামকৃষ্ণের সামগ্রিক অর্চনা, শাক্তকবি নজরুল ইসলাম, সৌন্দর্যবোধ ও শিক্ষা।

Ashram (Silver Jubilee Number) —Ramakrishna Mission Boys' Home, Rahara, 24 Parganas.

রহড়া বালকাশ্রমের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত ইংরেজী স্মরণিকার সম্পাদনা প্রশংসনীয়। প্রথমে রোঁমা রোলাঁর প্রবন্ধ 'The Pilgrim of India,' তৎপরে সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনের 'On Education,' ও শ্রীঅরবিন্দের 'Three Principles of True Teaching' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লইয়া মোট ২৩টি মনন-সমৃদ্ধ মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে বর্তমান-সময়োপযোগী চিন্তাধারা প্রতিফলিত। পরীক্ষামূলক বিশ্বসাক্ষর পরিকল্পনার বিষয়, বয়স্কশিক্ষাসমস্যা, বুনিয়াদী শিক্ষার কথা গভীরভাবে চিন্তা করা হইয়াছে।

[শেষাংশ ৩৮৭ পৃষ্ঠায়]

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বসিরহাট ও হাসনাবাদ ক্যাম্পে সমবেত পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বর্তমানে চল্লিশ হাজারেরও অধিক। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক তাহাদিগকে চাল, ডাল, পেঁয়াজ লবণ প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে। যাহারা অসুস্থ হইয়াছে, তাহাদিগকে বার্লি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

১৩.৬.৭০ পর্যন্ত বিতরিত দ্রব্যাদির পরিমাণ: চাল ২,১৬৪.৮৪ কুইন্ট্যাল; ডাল ২৭৪'৭৭ কুইন্ট্যাল, আলু ৭৪'৬১ কুইন্ট্যাল, লবণ ১৭২½ বস্তা, পেঁয়াজ ১৫৬½ বস্তা, বার্লি পাউডার ১৭৯ পাউণ্ড।

পুরুলিয়া আশ্রম কর্তৃক ৩০. ৫. ৭০ হইতে 'গবর্ণমেণ্ট টেস্ট রিলিফ স্কীম'-এ খরা-ত্রাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে; জলকষ্ট দূরীকরণের জন্য হাতোরাতে পুষ্করিণী খনন করা হইতেছে, এইকার্যে ১৪,২২০ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের অর্থসাহায্যে আরও দুইটি রিলিফ কার্য গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে একটি হাতোরায়, এখানে একটি রাস্তা তৈরি করা হইতেছে, এই কার্যে ১৫০জনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে; অন্যটি মালহোত্রায়, এখানে একটি বড় পুষ্করিণীর পাড় বাঁধিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই কার্যে ১২৫ জনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সাম্প্রতিক পুরুলিয়া পরিভ্রমণকালে মিশনের একটি টেস্ট রিলিফ ক্যাম্প পরিদর্শন করিয়াছেন।

গুজরাটে গড়ে দৈনিক ১,২০০ জন ক্ষুৎপীড়িতকে ডাল, চাপাটি, ঘোল ইত্যাদি দেওয়া হইতেছে। খাবদা, ধানেতি, রৎনার ও নালাপুরে দুঃস্থদের মধ্যে ৯০০০ মিটার কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে।

[৩৮৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাভাগবতম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ) — প্রকাশক: শ্রীনিখিলবন্ধু ভট্টাচার্য, সন্তোষপুর, কলিকাতা ৩২। পৃষ্ঠা ৩২। বিনামূল্যে বিতরিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাভাগবতে সংস্কৃত ৩৮টি শ্লোকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'দেবচরিত্র', ২৪টি শ্লোকে শ্রীশ্রীমা সারদার 'দেবীচরিত্র', স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ স্মরণে সংস্কৃত পদ্যাবলী ও ছন্দোবদ্ধ উপদেশ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত। বাংলা কবিতানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় স্তোত্রগুলি সর্বসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হইয়াছে। গ্রন্থশেষে বাংলা কবিতায় 'ভক্ত বন্দনা'টি সুন্দর। চিত্তাকর্ষক শ্লোকত্রয়ে রচিত 'ভক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলি' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল:

"ছন্দঃ প্রেমো ভাষা ভক্তিঃ ভক্তানাং
করুণাঽঙ্কতম্।
প্রেমাশ্রুসিক্ত্যাঙ্কেন ইদমর্ঘ্যং নিবেদিতম্॥"

ছাত্রদের কৃতিত্ব

গত (১৯৭০) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত কয়েকটি স্কুলের কয়েকজন কৃতী ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে প্রথম দশজনের মধ্যে স্থানলাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে :

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় : সাহিত্যে ১ম ; কৃষিতে ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এবং টেকনিক্যালে ১০ম স্থান।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম : সাহিত্যে ৮ম স্থান।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ : চারুকলায় ১ম, এবং কৃষিতে ২য় স্থান।

কার্যবিবরণী

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আশ্রমের ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মালদহে মঠকেন্দ্র স্থাপিত হয়, পরে জনহিতকর কর্মের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মিশন-শাখা খোলা হয়।

মঠকেন্দ্র : শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে নিত্য পূজার্চনা, আরাত্রিক, ভজন ও ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। একাদশীতে রামনাম এবং পূর্ণিমাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতনাম কীর্তন হয়। মহাপুরুষগণের জন্মতিথিতে উৎসবাদি হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের ত্যাগব্রতী কর্মিবৃন্দ গ্রামে গ্রামে যাইয়া সভা-উৎসবাদির মাধ্যমে ম্যাজিক ল্যানটার্ন সহযোগে ধর্মবিষয়ক ও শিক্ষাসংস্কৃতিমূলক বক্তৃতা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রতিবৎসর প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সব অনুষ্ঠানে শহরের ও গ্রামাঞ্চলের বহু নরনারী যোগদান করেন।

মিশন শাখা : মিশন শাখার কার্যধারা প্রধানতঃ শিক্ষা ও সেবা—এই দুই বিভাগে নিয়ন্ত্রিত হয়।

শিক্ষাবিভাগ : উত্তরবঙ্গ শিক্ষায় অনগ্রসর বলিয়া মিশন শাখায় শিক্ষাপ্রসারের কার্যই প্রধান স্থান পাইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে :

বিদ্যালয়	ছাত্রসংখ্যা	স্থান
উচ্চ মাধ্যমিক	৬৪৪ ছাত্র	আশ্রম-প্রাঙ্গণ
নার্সারী	১০৬ ছাত্র-ছাত্রী	"
নিম্ন বুনিয়াদী	২৬৬ "	"
"	১৪১ "	* মোহনপাড়া (অমৃতি)
প্রাথমিক	১৫০ "	রামকৃষ্ণপল্লী (রিফিউজি কলোনী)
"	৮১ "	* চিতকোল (গাজোল)
"	৫৬ "	নারায়ণপুর (পুরাতন মালদহ)
নৈশ বিদ্যালয়	৬০ ছাত্র	* মোহনপাড়া (অমৃতি)
" "	৪০ "	* চিৎকোল (গাজোল)
" "	৩০ "	চেংনাডাঙ্গা (বামনগোলা)
সারদা শিল্পনিকেতন	১৫ মহিলা	রামকৃষ্ণপল্লী
গ্রন্থাগার	৩০ পাঠক (দৈনিক গড়)	আশ্রম-প্রাঙ্গণ
বিবেকানন্দ শিশু সংঘ	মোট ২৭০ বালক-বালিকা	আশ্রম-প্রাঙ্গণ
" "	— "	সাহাপুর
" "	— "	মোহনপাড়া
ব্রহ্মানন্দ বিদ্যার্থী ভবন	৩৩ ছাত্র	আশ্রম-প্রাঙ্গণ

* চিহ্নিত স্কুলগুলি আদিবাসী ও অনুন্নতদের জন্য। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ২,৯৯১। ব্রহ্মানন্দ বিদ্যার্থী ভবনে কয়েকটি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে রাখা হয়।

ছায়াচিত্রে শিক্ষামূলক বক্তৃতা প্রদত্ত হয় আশ্রমে ১০টি এবং আশ্রমের বাহিরে ১৫টি।

মিশন শাখার সেবা বিভাগ :

হোমিও ঔষধ বিতরণকেন্দ্র	রোগীর সংখ্যা		
	নূতন	পুরাতন	মোট
রামকৃষ্ণ মিশন রোড (টাউন)	৪,৮৯১	৩৫,৬৬৭	৪০,৫৫৮
সাহাপুর হোম (পুঃ মালদহ)	১,১০৩	২,৩২১	৩,৪১৪
*চিংকোল (গাজোল)	১,১৪৩	৭,৪৯৯	৮,৬৪২
*দিগলভর (বামনগোলা)	১৯২	৩৫০	৫৪২

* আদিবাসী ও তপশীল জাতির জন্য।

আলোচ্য বর্ষে বন্যাত্রাণকার্যে ইংলিশ-বাজার, মানিকচক ও কালিয়াচক থানার গয়েশবাড়ী, সুজাপুর, মোথাবাড়ী, পঞ্চানন্দপুর, নাজিরপুর, মথুরাপুর, গোপালপুর, মিলকী, উত্তরচণ্ডীপুর, হীরানন্দপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চাল, যব, আটা, ছাতু, শিশুখাদ্য, ঔষধ, কম্বল প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছিল। বিতরিত চালের পরিমাণ ৪১০ কুইণ্টাল। ১০০ খানি পশমী কম্বল দুঃস্থগণকে দেওয়া হয়। এই বন্যার্তসেবা-কার্যে ৭০,০০০৲ ব্যয়িত হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৬শে হইতে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'কথামৃত' পাঠ, রামায়ণকীর্তন, ভজন, ভক্ত-সম্মেলন, নগরকীর্তন, ধর্মসভা, কথকতা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল : 'মা সারদাদেবী ও নারীর আদর্শ'। বক্তা ছিলেন স্বামী অনুপমানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল : 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ'। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তাদের ভাষণ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পূর্ব-দিনের বক্তাগণই এই দিন ভাষণ দেন। এই দিনের বিশেষ কার্যসূচী ছিল সকালে ও বিকালে ভক্তসম্মেলন।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ উৎসবের শেষ দিবস। এই দিন পূর্বাহ্নে পূজা পাঠ ভজনাদি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম' সম্বন্ধে সময়োপযোগী সুন্দর ভাষণ দেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ।

এই উৎসবে মালদহ শহরের এবং গ্রামাঞ্চলের বহু লোক সমবেত হন। কয়েক দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হইয়াছিল।

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৯ই মার্চ বাংলা ২৫শে ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম শুভ জন্মতিথি উৎসব বিশেষ পূজাপাঠ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় পাঁচশত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে মঠাধ্যক্ষ স্বামী যোগদানন্দ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণপুঁথি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে স্বামী যোগদানন্দ ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

সাধারণ উৎসব উপলক্ষে ১৬ই মার্চ হইতে ২০শে মার্চ পর্যন্ত ৫ দিবসব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৬ই মার্চ অপরাহ্নে ডঃ সুকুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পাঠ ও আবৃত্তি করেন আশ্রমের ছাত্রগণ। স্বামী

যোগদানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত রায়, অধ্যাপক সতীশ-চন্দ্র দাস, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য এবং প্রধান অতিথি ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী বর্তমান বিশ্বে স্বামীজীর আদর্শ এবং ভাবধারার উপর অলোকপাত করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। রাত্রে রামায়ণগান হয়।

১৭ই মার্চ সকালে পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ হয়। বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় স্বামী কালিকাত্মানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীবিশ্বজননী সারদাদেবীর জীবনের বিভিন্ন দিক ও নারী-সমাজের কর্তব্য সম্বন্ধে ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী, ব্রঃ বিদেহচৈতন্য, শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু শ্রীশ্রী-মায়ের জীবনী অবলম্বনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী যোগদানন্দ মায়ের জীবনী ও বাণীর দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে রামায়ণগান হয়।

১৮ই মার্চ অপরাহ্ণে ডঃ হরিনাথ দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্বামী যোগদানন্দ। অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী, শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার, শ্রীহট্টের শ্রীপূর্ণেন্দু দস্তিদার, প্রধান অতিথি ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন এবং সভাপতি মহোদয় অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন।

১৯শে মার্চ অপরাহ্ণে মানবজীবনে ধর্মের প্রভাব ও তৎসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবদান সম্বন্ধে বহুজনসমাবেশে অধ্যক্ষ শ্রীখগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আলোচনা হয়। সভার প্রারম্ভে মঠাধ্যক্ষ মিশনের কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

মিশন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক প্রাণ-কুমার ভট্টাচার্য তাঁহার লিখিত ভাষণের মাধ্যমে মিশনের কর্মপ্রসারে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। বক্তৃতা করেন অধ্যাপক প্রাণকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীবিমলেন্দু-বিকাশ রায়চৌধুরী (এডভোকেট), স্বামী যোগদানন্দ এবং প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন চাঁদপুরের শ্রীবিমলচন্দ্র বসু।

সভাপতি মহোদয়ও তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রী-ঠাকুরের এবং মিশনের আদর্শের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাত্রে পালাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩৫তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ মিশন আশ্রমের বিদ্যার্থীদের একান্ত আগ্রহে 'জ্ঞানানুশীলন' সাময়িক পত্রিকাটি বাহির করা হয় উৎসবের শেষের দিন।

২০শে মার্চ সকালে পূজা পাঠ ইত্যাদি এবং ভজনসঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর হইতে প্রায় ছয়-সাত হাজার নরনারীকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

গড়বেতা (মেদিনীপুর জেলা) শ্রীরাম-কৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে গত ১২ই জুন হইতে ১৬ই জুন পঞ্চদিবসব্যাপী এক মনোজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে।

বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভোগরাগাদি-সহ উৎসবের সূচনা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী আপ্তকামানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ ও স্বামী ভাবাতীতানন্দ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্যও ভাষণ দেন।

শ্রীসুকুমার দে ও সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য এবং গীতি-সুধাকর বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক 'রাম-রসায়ণ' সকলকে মুগ্ধ করে। প্রতিদিন বহু লোকসমাগম হয়। প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

স্বামী সুপর্ণানন্দের দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে, গত ১৯শে জুন রাত্রি ১২-৫৫ মিনিটের সময় স্বামী সুপর্ণানন্দ (সতীনাথ মহারাজ) কলিকাতার এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ৬৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ব্লাড-প্রেসার ও ডাইবিটিস্‌-এ তিনি দীর্ঘকাল ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেওয়ায় তাঁহাকে ভুবনেশ্বর হইতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে এবং পরে সেখান হইতে ১৭ই মে পূর্বোক্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

স্বামী সুপর্ণানন্দ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি স্বামী শিবানন্দজীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠ ও ঢাকা আশ্রমে কয়েক বৎসর কর্মিরূপে এবং পরে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের অধ্যক্ষরূপে সংঘের সেবা করিবার পর তিনি ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে স্বামী শঙ্করানন্দজীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত হন এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ পর্যন্ত ঐ কর্মে ব্রতী থাকেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দেই তিনি ভুবনেশ্বর মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলির প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন।

স্বামী সুপর্ণানন্দ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সুন্দর গাহিতে পারিতেন। তাঁহার দেহত্যাগে মিশন একজন একনিষ্ঠ সেবাব্রতীকে হারাইল।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে মিলিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পরমাণুর ফটো

সম্প্রতি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অ্যালবার্ট ক্রু পরমাণুর ফটো তুলিয়াছেন। ইলেক্ট্রণ-অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইয়া তিনি একাজে সফল হইয়াছেন। বিজ্ঞানজগতে এটি একটি বিরাট ঘটনা। পরমাণুর অস্তিত্ব ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জন ডাল্‌টন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার আগে কোন বৈজ্ঞানিকই পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। এই ইলেকট্রণ-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অবশ্য কিছুদিন পূর্বে খুব বড় আয়তনের অণুর ছবি তোলা সম্ভব হইয়াছে। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটিতে বস্তুকে পঞ্চাশ লক্ষ গুণ বড় দেখায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বের সব জড়পদার্থই শক্তি-বিধৃত কতকগুলি কণার সমষ্টিমাত্র। সবচেয়ে ছোট কণাগুলির নাম ইলেকট্রণ, প্রোটন, এবং নিউট্রণ প্রভৃতি। এক বা একাধিক প্রোটনকণা কেন্দ্রে থাকে (উহার সহিত নিউট্রণ প্রভৃতিও থাকিতে পারে) এবং উহার চারিদিকে প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেকট্রণ কণা ঘুরিতে থাকে, এবং সব মিলিয়া একটি মাত্র কণার মতো কাজ করে; ইহারই নাম পরমাণু। কয়েকটি একই জাতীয় (মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে), অথবা ভিন্নজাতীয় (যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে) পরমাণু মিলিয়া একটি অণু হয়।

এই পরমাণুগুলি এত ছোট যে আলোকের সাহায্যে খালি চোখে বা কোনও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাদের দেখা বা ক্যামেরায় ফটো তোলা সম্ভব নয়; যে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুর ছবি তোলা হইয়াছে, ইলেকট্রণের স্রোতের সাহায্য ছাড়া

সে যন্ত্রটি দিয়াও নয়। কারণ, কোন কিছু দেখিতে হইলে বা তাহার ছবি তুলিতে হইলে (বস্তুটি যদি নিজেই আলোক-বিকীরণকারী না হয়) বস্তুটি হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে বা ক্যামেরার লেন্সে আসিয়া পৌঁছানো প্রয়োজন। কিন্তু আলোক-তরঙ্গের ধর্ম হইল, নিজের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একতৃতীয়াংশের চেয়েও কম মাপের কোন বস্তুর উপর পড়িলে উহা আর নিয়মমতো প্রতি-ফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে না। আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে পরমাণু বহুগুণ ছোট, তাই আলোক কখনও তাহাতে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসে না; সেজন্য আলোকের সাহায্যে পরমাণু দেখা বা তাহার ছবি তোলা অসম্ভব, যত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যই সেই কাজে লওয়া হউক না কেন।

কিন্তু ইলেকট্রণতরঙ্গের মাপ আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়ে কয়েক হাজার ভাগ ছোট, পরমাণুর চেয়ে তো বটেই। আবার ইলেকট্রণ-কণাসমূহ যখন স্রোতের আকারে বিচ্ছুরিত হয়, তখন সেগুলি আলোকের মতোই ব্যবহার করে। কাজেই ইলেকট্রণকণার স্রোতকে পরমাণু হইতে প্রতিফলিত করিয়া এবং সংহত করিয়া বস্তুর প্রতিবিম্ব পাওয়া সম্ভব। ইলেকট্রণ-মাইক্রোস্‌কোপ যন্ত্রে তাহাই করা হয়। মাইক্রোস্‌কোপ শুধু প্রতিবিম্বের আয়তন বাড়াইয়া উহাকে খালি চোখে দেখিবার মত আয়তন দেয়। ডঃ ক্রু এই যন্ত্রের সাহায্যেই পরমাণুর ছবি তুলিয়াছেন।

উৎসব-সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংসদ—প্রতি-বৎসরের ন্যায় এবারও গত ৪ঠা এপ্রিল হইতে চারদিনব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহা উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৮ বৎসর যাবৎ এরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ৪ঠা এপ্রিল সকালে পূজা, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং ভজনাদি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ। দুপুরে ১,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরে রামনাম-সংকীর্তন ও বিল্বমঙ্গল যাত্রা হয়। ৫ই হইতে ৭ই এপ্রিল কঠোপনিষদ্‌ ব্যাখ্যা করেন স্বামী তীর্থানন্দ। বিভিন্ন দিনে স্বামী দেবানন্দ শ্রীরাম-কৃষ্ণ সম্বন্ধে ও প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা শ্রীশ্রীমা ও ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

নূতন পুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও ভজনাদির পর পল্লী-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভজনাদি হয়। দুরে 'কথামৃত' পরিবেশন করেন চারিগ্রাম শ্রীরাম-কৃষ্ণ আশ্রম। প্রায় নয়শত ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ মণ্ডল ও অন্যান্য ভক্তগণের ভক্তি-সঙ্গীত পরিবেশনের পর অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ এবং বক্তা ছিলেন শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল। সভাপতি মহারাজের ভাষণ সময়োচিত হইয়াছিল। সভান্তে স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেদের নাটকাভিনয় দ্বারা উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

পরলোকে নীহারবালা দেবী

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ (৫ই জুন, ১৯৭০) শুক্রবার রাত্রি ১২ ঘটিকায় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র-শিষ্যা নীহারবালা দেবী সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে চির শান্তি লাভ করুক।

ভ্রম সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা উদ্বোধনের ২৩৮ পৃষ্ঠায় ১ম কলম ৪র্থ লাইনে '২৪ পরগনার' স্থলে 'হুগলী জেলার' এবং আষাঢ় সংখ্যার ২৯৯ পৃষ্ঠায় ২য় কলম ১৮শ লাইনে 'দ্বিতীয়' স্থলে 'প্রথম' পড়িবেন।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

মেঘশ্যামং পীতকৌষেয়বাসং শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গম্।
পুণ্যাত্মানং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং বিষ্ণুং বন্দে সর্বলোকৈকনাথম্॥ ১
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমচ্যুতং বিভুং প্রভুং কারণং ভূতভাবিনম্।
ত্রৈলোক্যবিস্তারবিভাবভাবিনং হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতিং মহাত্মনাম্॥ ৩
নিত্যং শ্রীর্বিজয়ো নিত্যং নিত্যং কল্যাণমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥ ২০

— পাণ্ডব গীতা

মেঘের বরণ শ্যামল মোহন, হরিদ্বসনধারী,
রাজীবলোচন, পুণ্য, পাবন, ভববন্ধনহারী,
শ্রীবৎস আর কৌস্তুভ হার দেহশোভাধার যার,
বন্দনা তার, বিশ্বপিতার উচ্চারি বার বার॥

মনের অতীত, প্রকাশ-অতীত, অচ্যুত, প্রভু, হরি,
সৃষ্টির মূল, রয়েছে আকুল বিপুল ত্রিলোক ভরি
বৈভব যার, সে বিশ্বাধার ধাতার শ্রীপদখানি
মহাজীবনেরো যাহা আশ্রয়, আমারো শরণ মানি॥

নিতি কল্যাণ, নিত্য বিজয়, নিতি শুভ হয় তার
সদা ভগবান মঙ্গলালয় হৃদিমাঝে রয় যার॥

কথাপ্রসঙ্গে

গীতা—জাতীয় আদর্শের আলোকবর্তিকা

আদর্শ ও বাস্তব

আদর্শ কি তাহা বুঝিতে পারা সবসময় কঠিন কাজ নয়, কঠিন হইল জীবনে তাহা রূপায়িত করা। আদর্শ কি তাহা আমরা সকলেই বুঝি। তবে নিজ দুর্বলতার জন্য সবসময় উহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারি না। কিন্তু আমরা নিজের সেই অসামর্থ্যকে স্বীকার করিতে বা অপরের নিকট প্রকাশ করিতে চাই না ; বরং নিজের সেই দুর্বলতাকেই, আমি যাহা করিতেছি তাহাকেই আদর্শ বলিয়া জাহির করিতে চাই। এইটিই সর্বাধিক মারাত্মক জিনিস জীবনে চলার পথে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, আমরা অধিকাংশই চাই 'to idealise the real'—আমরা যাহা করি সেইটিকেই আদর্শ বলিয়া চালাইতে। যাঁহারা চান আদর্শকে জীবন-রূপায়িত করিতে, 'to realise the ideal', তাঁহারা সংখ্যায় কম। কারণ প্রথমটিতে প্রকৃতির স্রোতে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেই চলে ; দ্বিতীয়টিতে কিন্তু প্রকৃতির সহিত লড়াই করিয়া স্রোতের বিপরীত মুখে চলিতে হয়। সমাজসেবায়, রাষ্ট্রসেবায়, পারিবারিক জীবনে 'to idealise the real' করার লোকের সংখ্যা তাই অধিক। জনসেবা পরিচালনার বা নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনের দোহাই দিয়া, সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনের দোহাই দিয়া যখনই আমরা "হৃদয়-দৌর্বল্যের" বশবর্তী হইয়া ব্যক্তিগত বাসনা পূরণের পথে পা বাড়াই, তখনই আমরা এরূপ করি। পরিবারের সেবার, সমাজসেবার, দেশসেবার দোহাই দিয়া বস্তুতঃ আমরা তখন নিজেরই সেবা করি।

সাধারণ স্তরের লোকের ক্ষেত্রে সে সেবা হয় স্থূলভাবেই ; উচ্চ অধিকারীর ক্ষেত্রেও, যাঁহারা স্থূল ভোগ বা নামযশাদি ভোগের বাসনার বহু উর্ধ্বে তাঁহাদের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো উহা আসিতে পারে অতি সূক্ষ্মাকারে—কঠিনতম কর্তব্যসাধনের সময় হৃদয়ের কোমলতা বা মমতা-উদ্ভূত নিজ অনিচ্ছাকে আঁকড়াইয়া থাকিবার আকারে, সেই মমতা-দুর্বল অনিচ্ছুক 'আমির' সেবার জন্য যুক্তি-প্রদর্শনের আকারে। উহা অতি সূক্ষ্ম স্তরের হইলেও, এবং সাধারণের চোখে, আপাত-দৃষ্টিতে উহা উচ্চভাব বলিয়া প্রতীত হইলেও আসলে উহা 'to idealise the real' ছাড়া আর কিছুই নয়।

আদর্শ নির্বাচনে দ্বন্দ্ব

আদর্শের সেবা বা সমাজসেবা বা রাষ্ট্রসেবা প্রভৃতির নামে বস্তুতঃ নিজেরই সেবা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সকলেরই জীবনে কিন্তু দ্বন্দ্ব আসে না। জীবনের উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন ধারণাই নাই, অথবা সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, ভগবদ্‌বিশ্বাস প্রভৃতির কোন মূল্যই নাই যাঁহাদের কাছে, বাস্তবে ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত জীবনে এগুলির কোন উপযোগিতাই দেখেন না যাঁহারা, অথবা এগুলির বা লোক-কল্যাণেচ্ছার মুখোশ পরিয়া যাঁহারা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য লোক ঠকাইতে, এমনকি অপরের সর্বনাশসাধন করিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন না, তাঁহাদের জীবনে কোনদিনই ইহা লইয়া দ্বন্দ্ব আসিবে না। কেহ ভুল দেখাইয়া দিলেও না। একজন হৃদয়হীন

হত্যাকারীর যেমন আটকায় না নির্বিচারে হত্যা করিতে, একজন উচ্চাদর্শহীন হৃদয়হীন দেশনেতার যেমন আটকায় না ব্যক্তিগত স্বার্থ বা মতের প্রভাববৃদ্ধির জন্য নির্বিচারে অপর দেশের এমনকি স্বদেশেরও বহুজনের সর্বনাশ সাধন করিতে। কিন্তু যাঁহারা উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত, নিজেদের ভোগের জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য এমনকি সম্মানও চান না, এরূপ ব্যক্তিদের কাছে যখন কেবল আদর্শের বা কর্তব্যপালনের জন্যই এই-জাতীয় কাজ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে,—যাহা অতি গর্হিত কর্ম বলিয়া প্রতীত তাহাই যখন কর্তব্যরূপে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন দ্বন্দ্ব জাগে তাঁহাদেরই চিত্তে। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তব্য হইলেও তাঁহাদের মন উহা এড়াইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হয়, কতকগুলি মনগড়া যুক্তির সাহায্যে উহাকে অকর্তব্য বলিয়া দেখাইতে চায়।

এই দ্বন্দ্বই গীতার পটভূমি

এই মানসিক দ্বন্দ্বই, অতি অপ্রিয় কর্তব্য সাধনে অনিচ্ছুক মনের দুর্বলতাকে উচ্চ আদর্শ-রূপে ফুটাইয়া তোলার চেষ্টাই, 'to idealise the real'-এর প্রচেষ্টাই গীতার পটভূমি। তবে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শের একজন পূজারীর নিকটই, একজন অমিতবলশালী, নির্ভীক, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর, ভগবানলাভেচ্ছু অভিজাত রাজকুমারের নিকটই যাহা দুর্বলতা, যাহা আদর্শের দ্বন্দ্ব, তাহাই এখানে নির্বাচন করিয়াছেন মহাভারতকার। যে দুর্বলতাকে সাধারণ মানুষ ভুল করিয়া অহিংসা, ক্ষমা, করুণা বলিয়া ভাবিতে, অতি উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে করিতে পারে, তিনি নির্বাচন করিয়াছেন তাহাই। আর, গীতায় বিশ্লেষণ করিয়া উহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, লক্ষ্যের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইবার পথের উপর আলোকপাত সহায়ে দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ চিত্তকে "গতসন্দেহ" করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন বীরের মতো এ দুর্বলতাকে অতিক্রম করিয়া সেদিকে অগ্রসর হইতে।

গীতার পটভূমিতে কুরুপাণ্ডব-রণের প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে যোদ্ধবেশে সজ্জিত অর্জুন রথের উপর বসিয়া আছেন, যে রথের সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। অর্জুন অশ্রুসজলনয়ন, কম্পিতদেহ; তাঁহার হাত অবশ, হাত হইতে ধনু খসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাতরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতেছেন যে তিনি এ যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। শুধু এটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত নন তিনি, শ্রীকৃষ্ণের মতো ব্যক্তিকে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছেন তাহাই আদর্শ, এ যুদ্ধ করাটাই মহা অন্যায় কাজ। অর্জুনের মুখে এসময় একথা শুনিয়া, সারথির আসন হইতে পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণ রোষকষায়িত নয়নে অর্জুনের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, যেন 'হাতের চাবুক উঁচাইয়া' বলিলেন, "অর্জুন, তুমি যা বললে তা কোন নপুংসকের মুখে শোভা পায়, কোন আর্যসংস্কৃতিহীন লোকের মুখে শোভা পায়— তোমার মতো বীর আর্যের মুখে একথা শোভা পায় না।"

অর্জুনের দোষ কি? তিনি বলিয়াছিলেন, এ যুদ্ধ তো জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে, আচার্যের সঙ্গে, পিতামহের সঙ্গে; যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে ইহাদেরই হত্যা করিতে হইবে! এ কখনো ধর্মসম্মত কাজ হইতে পারে? এ তো মহা অধর্মের কাজ। ভাগ্য ভাল যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বক্ষণেই ইহা বুঝা গেল,

নতুবা কি মহা পাপেই না লিপ্ত হইতে হইত! বলিলেন, এ যুদ্ধ তিনি করিবেন না, এ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভাইদের, আচার্যের ও পিতামহের রক্তমাখা ভোগাবস্তু গ্রহণ করা অপেক্ষা বনে গিয়া ভিক্ষান্নে উদরপূরণও শ্রেয়ঃ।

শুনিলে মনে হয়, কী উদার, কী মহৎ হৃদয়ের কথা! কী বৈরাগ্যের বাণী! শ্রীকৃষ্ণের তো উচিত ছিল এই মনোভাবের জন্য অর্জুনকে বাহবা দেওয়া। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তো জানিতেন, অর্জুন সেকথা স্মরণ করাইয়াও দিয়াছিলেন যে, অর্জুনের জীবনের উদ্দেশ্য রাজ্য মান-সম্ভ্রম ভোগ নয়, এ রাজ্য তো তুচ্ছ, স্বর্গরাজ্যও চান না তিনি; তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য শ্রেয়োলাভ, ভগবানলাভ। অর্জুনের বর্তমান মনোভাব তো তাহার সহায়কই—ভগবানলাভেচ্ছু ব্রাহ্মণগণ, সন্ন্যাসিগণ তো এই পথই অবলম্বন করেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এত রূঢ়ভাবে বকিলেন কেন?

নেতাকে আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে

ইহার কারণ দুইটি—একটি সমষ্টিগত কল্যাণ- ও অপরটি ব্যক্তিগত কল্যাণমূলক। ভারতীয় জীবনাদর্শে দুটিকেই অপূর্ব সামঞ্জস্যে গ্রথিত করা হইয়াছে। প্রথম কারণ হইল অর্জুন যাহা করিতে চাহিতেছেন, সর্বসাধারণের কল্যাণকর আদর্শ তাহাতে স্থাপিত হইবে না। (সর্বজনপ্রসংশিত মহারাজ ধর্মাশোক এই ভুলই করিয়াছিলেন সর্বসাধারণের জন্য অহিংসার আদর্শ প্রচার করিয়া। যাহার ফলে 'দশ-বিশ লক্ষ জানোয়ারের' প্রাণ বাঁচিল বটে, কিন্তু জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল— হাজার বছর ধরিয়া ভারতে যে আসিল সেই-ই আমাদের পদদলিত করিয়া গেল।) আমি যখন জনগণের দৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন, জনগণের নিকট অজ্ঞাত, তখন 'আমি ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী যাহা খুশি তাহাই করিতে পারি তাহাতে ভাল-মন্দ যাহাই হউক আমার একারই হইবে। কিন্তু যখন আমি জনগণের নেতা, যখন আমার আচরণের প্রতি জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ, তখন সব কাজই আমাকে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া করিতে হইবে। কারণ আমি যাহা করিব অপরে তাহাই অনুসরণ করিবে, তাহাকেই আদর্শ ভাবিবে—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥" আমার পক্ষে যাহা কল্যাণকর, সর্বসাধারণের পক্ষে তাহাই ক্ষতিকর হইতে পারে। অর্জুন মহাবীর, অর্জুন নির্ভীক, অর্জুন নির্লোভ, হৃদয়বান, আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে অবস্থিত; তিনি ক্ষমার অধিকারী নিশ্চয়ই। কিন্তু এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কয়জনই বা পাওয়া যায়? যাহাদের অর্জুনের মতো যোগ্যতা নাই, তাহারা যদি অর্জুনের অনুকরণে অন্যায়কারীকে ক্ষমা করিতে যায়, তাহা তো ক্ষমা না-ও হইতে পারে; তাহা ক্ষমার, উচ্চাদর্শের মুখোশ-পরা কাপুরুষতা, ভীরুতা, দুর্বলতা হইতে পারে যাহা তাহাদের উন্নত না করিয়া অবনতই করিবে। বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাই হয়। তাছাড়া, অর্জুনের এই মনোভাবকে লোকে ভুলও তো বুঝিতে পারে, ভাবিতে পারে রণক্ষেত্রে আসিয়া দুর্যোধনের সমরায়োজন দেখিয়া অর্জুন ভয় পাইয়াছিলেন তাই যুদ্ধ করেন নাই।

ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য—অধিকারী ভেদে আদর্শ নির্ণয়

দ্বিতীয় কারণটি ব্যক্তিগত, অর্জুনের নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া। অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও কথাগুলি সর্বসাধারণের ধর্মজীবনপথে বিপুল আলোক

বিকীরণকারী। কোন্‌টি আদর্শ, কি কর্তব্য তাহা লইয়া অর্জুনের মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত। এ দ্বন্দ্ব যে সদ্য জাগিল তাহাও নয়। পাণ্ডবদের বনবাস হইতে ফিরিবার পর দুর্যোধন পূর্বের কথামতো পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরাইয়া দিতে না চাওয়ায় তাহার এই অন্যায় আচরণের প্রতিকারকল্পে যুদ্ধের কথা যেদিন হইতে উঠিয়াছে, সেদিন হইতেই এক সহদেব ছাড়া আর সব পাণ্ডবদের হৃদয়েই এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে—এ যুদ্ধ করার পক্ষে কারণ ও যুক্তি যত প্রবলই থাকুক, ভাইদের সঙ্গে, পিতামহ আচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা, বিশেষ করিয়া যে-যুদ্ধে কুরুকুল তো বটেই সমগ্র ভারতের রাজা ও বীরগণের এবং অসংখ্য সৈন্যের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী সে যুদ্ধ করা উচিত কি না? যুদ্ধের ভয়াবহ লোকক্ষয়কারী পরিণামকে এড়াইবার জন্য তাঁহারা সকলেই দুর্যোধনের এই অধুনাকৃত অন্যায়কে এবং পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর প্রতি পূর্বকৃত অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার অপমানকেও আজীবন সহ্য করিতে রাজী ছিলেন, তাঁহাদের পক্ষের কয়েকজনের অসম্মতি সত্ত্বেও। (এত অন্যায় করা সত্ত্বেও দুর্যোধনদের কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না,—ইহার প্রতিবাদে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ভারতের দুই মহীয়সী বীর নারী—কুন্তী ও দ্রৌপদী, এবং কনিষ্ঠপাণ্ডব সহদেব ও যদুবীর সাত্যকি। শেষ তিনজন নিজমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাইবার পূর্বের মন্ত্রণাসভায়; আর কুন্তীদেবী করিয়াছিলেন যখন শ্রীকৃষ্ণ শান্তিস্থাপনের শেষ চেষ্টা করিয়া হস্তিনাপুর হইতে ফিরিবার পূর্বে কুন্তী দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, তখন।) নিজেদের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক এই দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য, এই বিষম সঙ্কটে কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণের জন্য সকলেই অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন—তিনি যাহা কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া দিবেন, সকলেই তাহাই মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কথা বলিয়াছেন, ইহার পূর্বে অর্জুনকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আরো দুইবার অন্ততঃ সেই একই কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—কর্তব্য হইল যুদ্ধ করা। শ্রীকৃষ্ণের সে কথা মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও রণাঙ্গনে আসিয়া চোখের সামনে আত্মীয়দের দেখিয়া অর্জুন মমতাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্তকেই যুক্তি দিয়া খণ্ডন করিতে চাহিতেছেন। ইহা "হৃদয়দৌর্বল্য", অর্জুনের মতো অধিকারীর পক্ষে উচ্চতর জীবনলাভের পথে বাধা; এই মমতারূপ হৃদয়ের দুর্বলতাকে, এই মোহকেও কাটাইয়া আরো ঊর্ধ্বে তাঁহাকে উঠিতে হইবে, যদি তিনি শ্রেয়ঃ চান, জীবনের চরমলক্ষ্যে উন্নীত হইতে চান। যে দুর্বলতা অর্জুনকে যুদ্ধ হইতে বিরত করাইতে চাহিতেছে, তাহাই তখন ক্ষমার, নির্বেদের ছদ্মবেশে তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছে। স্বজনের প্রতি এই 'পক্ষি-সুলভ' ভালবাসা, বীর রমণী বিদুলার ভাষায় 'গর্দভীর নিজ সন্তানের প্রতি' ভালবাসা সাধারণের কাছে হৃদয়বত্তার, আদর্শের চাকচিক্যে মণ্ডিত হইয়া উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে হইলেও অর্জুনের পক্ষে উহাতে বিভ্রান্ত হওয়া শোভা পায় না—"নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥" সমগ্র গীতায় নানাভাবে ভগবান অর্জুনকে বারংবার চরমসত্যের সম্মুখীন করাইতেছেন, অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চ তত্ত্বগুলি বার বার বলিতেছেন, এবং বলিতেছেন, সেই সত্যলাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য জানিয়া নিজ সংস্কার-উদ্ভূত গুণের, নিজ প্রকৃতির

উপযোগী সত্যদ্রষ্টানির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করাই ভারতীয় জীবনাদর্শ। পূর্ব সংস্কারবশে কর্মাসক্তিহীন নির্বেদবান ভগবানলাভেচ্ছুর পক্ষে যে পথ, তাহাব যাহা কর্তব্য, কর্মাসক্তি লইয়া জাত অথচ ভগবানলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে সেই পথই কখনই সর্বাধিক উপযোগী হইতে পারে না. তাহার কর্তব্য ভিন্ন। একজন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের যাহা আদর্শ, তাহা কোন ক্ষত্রিয়ের আদর্শ হইতে পারে না। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—ভগবানলাভ হইলেও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্য পথ ভিন্ন ভিন্ন। শাস্ত্রে তাই কর্তব্যকে 'স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ' ভাগ করা হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্ম ও লব্ধ অনুভূতির সমষ্টিই আমাদের বর্তমান 'আমি', আমি যেরূপ চিন্তা করি, আমার যেমন রুচি,—আমার সংস্কার, প্রকৃতি বা ধাত—তাহা আমিই সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমারই পূর্ব পূর্ব জন্মের চিন্তা ও কর্মের সম্মিলিত ফল। আমিই যখন ইহা সৃষ্টি করিয়াছি আমিই তখন ইহা ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িতে পারি। এই গড়ার একমাত্র পথ "অভ্যাস", শুভসংস্কার সৃষ্টির পুনঃ পুনঃ প্রয়াস। আর, ইহা বলা বাহুল্য যে আমার স্বভাবের, আমার মানসিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো পথে যদি সে অভ্যাস করার সুযোগ থাকে, তাহাই আমার পক্ষে সর্বাধিক প্রশস্ত পথ। "স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ" কর্মবিভাগের মূল কথা ইহাই।

ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজ কর্তব্য কর্ম করাই আদর্শ

সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে আশ্বাসের কথা গীতায় পাই—আমাদের যাহার যাহা নির্দিষ্ট কর্তব্য, তাহা ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, তাহার মাধ্যমেই আমরা ভগবানলাভ করিতে পারিব, যদি চেষ্টা করি, যদি শুভসংস্কারসৃষ্টির জন্য অভ্যাস করি। অভ্যাসটি কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তোমার জন্য নির্দিষ্ট কাজ তো করিতেই হইবে, তবে কাজের মধ্যে সর্বক্ষণ ভগবচ্চিন্তা থাকে যেন—"মামনুস্মর যুধ্য চ!" বলিতেছেন, ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে, পূজা-জ্ঞানে কাজ করিতে পারিলে, "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম" করিতে পারিলে তাহাতে কর্মবন্ধন আসে না; তুমি তাহাই, "তদর্থং কর্ম", ঈশ্বরার্থে কর্ম কর। উহা দ্বারাই ভগবানলাভ হইবে—"স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" ভগবান লাভ করা মানে তো দেশ অতিক্রম করিয়া মন্দিরতীর্থাদিতে যাইয়া বাহিরে কোথাও তাঁহাকে পাওয়া নয়, আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই ভগবান রহিয়াছেন, আমাদের স্বরূপই তিনি, এই সত্য প্রত্যক্ষ করা; একাগ্রতা ও পবিত্রতা সহায়ে দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে নিজেকে পৃথক করিতে না পারিলে ইহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। কাজেই যাহা কিছু ইহার সহায়ক, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন তাহাই "যজ্ঞ", ভগবানের পূজা। শুধু কর্মযোগীদের ভগবানের প্রীত্যর্থে কাজ করাই নয়, জ্ঞানীরা যে আত্মচিন্তা করেন তাহাও যজ্ঞ, ভগবানের পূজা; যোগীদের মনঃ-সংযমও তাই, ভক্তদের জপও তাই। আসল কথা হইল এই পূজায়, এই যজ্ঞে মন, বুদ্ধি, হৃদয়াবেগ, কোন কিছুকেই 'আমার' বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকা চলিবে না, সবই আহুতি দিতে হইবে এই যজ্ঞানলে। নিজ অধিকার অনুসারে কৃত এই যজ্ঞশিখার উজ্জ্বল আলোকই গীতা বর্ষণ করিতেছে আমাদের সর্ববিধ জীবনাদর্শের উপর।

পথ না বিপথ ?

দেশে শিক্ষাবিস্তারের, সাহিত্যের সমৃদ্ধির, দেশাত্মবোধের জাগরণ ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্য যে সব বরেণ্য ভারতবাসী জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য, যাঁহারা শুধু দেশপূজ্যই নন জগৎপূজ্যও, আজ এদেশের একদল যুবক তাঁহাদের চিত্র ও মূর্তি বিকৃত করিয়া প্রগতি-পরায়ণতার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছে। তদুপরি চলিয়াছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর তাণ্ডবলীলা।

তাহাদের উদ্দেশ্য কি জানি না। তাহারা কি এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে উচ্ছেদ করিয়া সেখানে অন্য কোন সংস্কৃতিকে স্থাপন করিতে চায় ? তাহারা কি শিক্ষায়তনগুলিকে রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়াই উহার 'পবিত্রতা' রক্ষা করিতে চায় ? অথবা দেশে যাহারা পরিবর্তন আনিবে, ভবিষ্যৎ ভারতের পরিচালক হইবে, তাহাদের শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না ?

যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের এপথে চলার ফলে দেশের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি আমাদের মুখ চিরকলঙ্কিত রাখিয়াই সমাপ্ত হইবে অন্য দেশে হয়তো এভাবে সাংস্কৃতিক রূপান্তর আনা সম্ভব, কিন্তু ভারতে কখনো তাহা সম্ভব হইবে না। সাময়িক একটা বিপর্যয় আসিতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর জীবনাদর্শকে কোনদিনই তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি হইতে সরাইয়া অন্য কোন ভিত্তির উপর বসানো সম্ভবই নয়। এত দুঃখ দারিদ্র্য নির্যাতন সত্ত্বেও বিদেশী প্রচারকদের এতদিনের প্রচেষ্টায় কয়জন ভারতবাসীর মন হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি মুছিয়া ফেলা সম্ভব হইয়াছে ? বহু দুর্যোগের ঝড় সহ্য করিয়া যে জাতি হাজার হাজার বছর ধরিয়া নিজ সংস্কৃতিকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে, এভাবে তাহা মুছিয়া ফেলা কি সম্ভব ?

তাছাড়া, ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করিবার অপ-প্রচেষ্টা জগতে তো বহুবারই হইয়াছে, তাহা দ্বারা আমরা কয়জন মহামানবকে ইতিহাস হইতে, মানুষের মন হইতে মুছিয়া দিতে পারিয়াছি ? আর, ইহাও যেন স্মরণ রাখি, আজ আমরা যে মাথা তুলিয়া চলিতে বলিতে শিখিয়াছি, তাহা যাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইতেছে তাঁহাদেরই প্রচেষ্টার ফলে।

ভারত, বিশেষ করিয়া বাংলা আজ বিষম সঙ্কটের সম্মুখীন। এই সঙ্কট হইতে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি সচেতন হইতে হইবে, তাহারই মাধ্যমে যাহা কিছু করার করিতে হইবে ; ইহারই ফলে জাতির সমগ্র দেহ জুড়িয়া বিপুল শক্তির উন্মেষ সম্ভব। এই আত্মসচেতনতাই জাতির হাজার বছরের ঘুম ভাঙাইয়াছে ; আজ আবার ইহার অভাবই আমাদের বর্তমান সঙ্কটের কারণ। এই আত্মসচেতনতার অর্থ উচ্ছ্বাসবশে সাময়িকভাবে দুচারদিন কিছু করা নয়, নিজের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য অপরের উপর বৃথা দোষারোপ করাও নয় ; ইহার অর্থ জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আজীবন উহা আঁকড়াইয়া থাকা, ভাবকে স্থায়িভাবে জীবনে রূপায়িত করা। এরূপ যাঁহারা করিতে পারিয়াছেন,

ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে তাঁহারাই যুগে যুগে সমাজে কল্যাণমূলক বিপুল পরিবর্তন আনিতে পারিয়াছেন। জীবনই এই পরিবর্তন আনে, এবং ভারতের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, ভারতে সে পরিবর্তন চিরদিন আনিয়াছে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিভিত্তিক জীবন; এই কিছুদিন পূর্বের স্বাধীনতা-আন্দোলনও তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

ভারতের ভাগ্যবিধাতার, ভারতের 'চির সারথি'র নিকট প্রার্থনা, যুবশক্তির যে বিপুল অংশ দেশের কল্যাণেচ্ছু হইয়াও বিপথগামিত্বের জন্য অপচিত হইতেছে, তাহা যেন ঠিক পথে চালিত হইয়া দেশের যথার্থ কল্যাণে ব্যয়িত হয়, যাহার ফলে তাহারা দেশকে সর্ববিধ দুঃখদারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা হইতে মুক্ত করিয়া স্বমহিমামণ্ডিত রাখিয়াই সেখানে ভোগ ও অধিকারসাম্য স্থাপনপূর্বক সমগ্র ভারতকে, জগৎকে পথ দেখাইতে পারে; যে পথ মানুষের বুদ্ধি, হৃদয় ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষে সমভাবে মণ্ডিত সাম্য স্থাপনের পথ, কেবল মানবিক বুদ্ধিদীপ্ত পিপীলিকা- বা মধুমক্ষিকাসমাজের ন্যায় সমাজ গঠনের পথ নহে।

"এখন বুঝতে পারছো তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখিটি কোথায়? – ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়েও এখনো বেঁচে আছে। ··যে নদীটা পাহাড় থেকে ১,০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে?··· যদি এ দশ-হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলে মরে যাবে বই তো নয়।"

"এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয়তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী চেতনানন্দ

কৃত্তিবাস অরণ্যকাণ্ডে গতানুগতিকভাবেই প্রবেশ করিয়াছেন। মায়ামৃগ ধরিতে রামের গমন; পরে মায়াবী মারীচের ডাকে সীতাকে রাখিয়া রামের সাহায্যে গমনকালে লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডী দিয়া রাখিয়া যান। এ গণ্ডী দেওয়ার ব্যাপার বাল্মীকি বা তুলসীদাসে নাই। তুলসীদাস আবার এখানে অধ্যাত্ম-রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন। তুলসীদাস চাহেন না তাঁহার ইষ্টদেবী সীতাকে রাবণ স্পর্শ করুক। তাই লক্ষ্মণের অগোচরে সর্বজ্ঞ ভগবান রামচন্দ্র প্রকৃত সীতাকে অগ্নির কাছে গচ্ছিত রাখিলেন এবং পরে ছায়াসীতাকে লক্ষ্মণের হেফাজতে রাখিয়া মায়ামৃগ ধরিতে গেলেন। এখানে তুলসীদাস রামচন্দ্রের মানুষভাব দেখান নাই।

সীতাহরণকালে কৃত্তিবাস আর এক নূতন শক্তিশালী পক্ষীর নাম করিয়াছেন। তাহার নাম সুপার্শ্ব। ইনি সম্পাতির পুত্র এবং জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র। রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুকে বধ করিয়া যখন লঙ্কার দিকে দ্রুত যাইতেছিলেন তখন সুপার্শ্ব তাঁহাকে রথ সমেত গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করে। কিন্তু 'রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী। ভাবে নারীহত্যা করি হব কি নারকী॥' তারপর রাবণ কোন মতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ছাড়া পান। কৃত্তিবাস আর একটি নূতন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, চক্রবাক ও চক্রবাকীর প্রতি রামের অভিশাপ। রাম যখন 'সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি। সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী' হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন চক্রবাক রামচন্দ্রকে ধিক্কার দিয়া বলে, 'এক নারী দুই-জনে রাখিতে না পারে। নারীর উদ্দেশে তাই হৈলা দেশান্তরে॥' রামচন্দ্র ক্রোধে দিলেন দারুণ অভিশাপ। 'স্ত্রীর সঙ্গে বসি মোরে কৈলা উপহাস। স্ত্রীর গর্ব রতি-রস আজি হোক নাশ॥ রজনীতে আহার করিবে দুই-জনে। কেহ কারে না চিনিবে আমার বচনে॥' রামচন্দ্রের নিকট হইতে চরমবিচ্ছেদের অভিশাপ পাইয়া পক্ষী ক্ষমা চাহিল। রাম বলিলেন যে দ্বাপর যুগে তোমার এ অভিশাপ খণ্ডন হইবে।

তুলসীদাসের অরণ্যকাণ্ডে আছে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের উপাখ্যান। মূর্খ জয়ন্ত রামের প্রভাব না জানিয়া কাকের রূপ ধরিয়া সীতার অঙ্গ বিদ্ধ করিল। রক্ত বাহির হইলে রাম জানিতে পারিলেন। তিনি ধনুকে খড়ের বাণ লাগাইয়া জয়ন্তের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। মন্ত্রপূত বাণ জয়ন্তের পিছনে ছুটিল। জয়ন্ত প্রাণভয়ে পলাইল। দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত তাহাকে রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। তারপর নারদের পরামর্শে জয়ন্ত রামের শরণ লইল। রাম তাহার একটা চোখ নষ্ট করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যমুনি কাকের এই দৃষ্টান্ত লইয়া ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ অধ্যায়ে এক অপূর্ব দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন: বিবেকীর বুদ্ধি অবিরোধিবিষয়সুখে ও স্বরূপানন্দে কাকাক্ষির ন্যায় ক্রমান্বয়ে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে গমনাগমন করে। কাকের দুইটি চক্ষু বা অক্ষিগোলক

থাকিলেও প্রবাদ আছে রামের ইষীকাস্ত্রবাতের ফলে দৃষ্টি একটি মাত্র রহিয়া গেল। তাহা ক্রমান্বয়ে বামনেত্রে ও দক্ষিণনেত্রে যাতায়াত করে। দর্শনকালে কাকের গ্রীবাভঙ্গদ্বারা ইহা অনুমিত হয়।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পম্পা সরোবরের নৈসর্গিক বর্ণনা তুলনাহীন ভাবে আঁকিয়াছেন আদিকবি বাল্মীকি। মনুষ্যমনের উপর নৈসর্গিক শোভা কী বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কালিদাসের ঋতুসংহারে। বারো মাসের দুই দুই মাস লইয়া সম্পূর্ণভাবে পৃথক পৃথক সম্পদে সুসম্পন্ন ছয়টি ঋতুর বিকাশ এই ভারতবর্ষে ছাড়া অন্যত্র তেমনটা নাই। অন্যান্য দেশের গ্রন্থাদিতে ঋতুগুলির নাম ও বর্ণনা আছে, কিন্তু প্রকৃতির স্বকীয় চিত্রপটে উহাদিগকে এমন আক্ষরিকভাবে দেখা যায় না।

পম্পার শোভা রামচন্দ্রের সীতাবিরহের সেই তীব্র জ্বলুনির উপর সাময়িকভাবে একটু প্রলেপ দিয়াছে—ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। পম্পার সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে রামচন্দ্রের কতকগুলি অবিস্মরণীয় কাহিনী। এগুলি লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে। আদিকবি বাল্মীকি, কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস সেগুলি পরিবেশন করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র একদিন সরোবরতীরে তীর পুঁতিয়া রাখিবার কালে একটি ভেক বিদ্ধ হয়। রক্ত দেখিয়া রামচন্দ্র তাহাকে শব্দ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে ভেক বলিল: 'রাম, যখন অপরে মারে তখন বলি—"হে রাম, তুমি রক্ষা কর।" এখন স্বয়ং রামই মারিতেছেন —কাহার আর সাহায্য চাহিব?' আর একটি কাহিনী: একটি তৃষ্ণার্ত কাককে জলপান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে রাম লক্ষ্মণকে পাঠাইলেন। লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তরে কাক বলিল: 'আমি অহর্নিশ রামনাম জপ করি। যদি জলপান করিতে যাই, তবে ত ঐ সময়টুকু আমার রামনাম হইবে না।' আর একটি চমকপ্রদ কাহিনী: রামচন্দ্র একদিন পম্পা-তীরে লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'লক্ষ্মণ দেখ, ঐ বকটি কি ধার্মিক! চুপ করে বসে আছে।' রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া একটি ছোট মাছ বলিয়া উঠিল, 'হে রাম, তুমি কাহাকে ধার্মিক বলিতেছ? উঃ! তুমি ত জান না, সে আমার সমস্ত বংশ শেষ করিল।' সহবাসের দ্বারাই সহবাসীর চরিত্র জানা যায় (সহবাসে বিজানীয়াৎ চরিত্রং সহবাসিনাম)।

রামচন্দ্র পম্পা হইতে গেলেন ঋষ্যমূক পর্বতে। সেখানে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা হইল। তারপর বালীবধ। বালীবধের পর বালীপত্নী তারা স্বামীশোকে মুহ্যমানা হইলেন। শাস্ত্রে অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, কুন্তী ও মন্দোদরী—এই পাঁচজন নারীকে খুব উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। স্বামীবিরহে কাতর তারা রামকে দিলেন দারুণ অভিশাপ: 'আমি যদি সতী হই ভারত-ভিতরে। কান্দিবে সীতার তরে চির-দিন ধরে॥ এই শাপ দিনু আমি, না হবে খণ্ডন। সীতার কারণে রাম, হবে জ্বালাতন॥' কৃত্তিবাস এখানে মৃত্যুপথযাত্রী বালীর মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। বালী তারাকে অভিশাপ দিতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন: 'বিধির নির্বন্ধ ছিল রামের কি দোষ।'

রাম সুগ্রীবকে রাজপদে এবং বালীপুত্র অঙ্গদকে যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। বর্ষা ঋতুতে যুদ্ধযাত্রা সম্ভব নয়, তাই রামচন্দ্র মাল্যবান পর্বতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন শরৎ ঋতুর জন্য। বাল্মীকির বর্ষা ও শরৎ বর্ণনা খুবই সুন্দর ও কাব্যিক। কালিদাসের ঋতুসংহারের বর্ষা ও শরতের সঙ্গে উহার বহু

সৌসাদৃশ্য আছে। তবে পার্থক্যের মধ্যে কালিদাসের বর্ণনা ভাল ভাল ভোগসামগ্রীর ফর্দমালা আর বাল্মীকির বর্ণনা সুন্দর সাবলীল। মনে হয় আদি কবি রামচন্দ্রের বিরহযন্ত্রণাকে উপজীব্য করিয়া প্রকৃতিতেও শোক-চিত্র ফুটাইয়াছেন। শরতের আগমনে সুগ্রীবকে সীতা-উদ্ধারে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া মুহ্যমান রামকে লক্ষ্মণ বলিতেছেন, 'আপনার শোক আপনার সমাধি নষ্ট করিতেছে।' আর সমাধিহীন মানুষ তো বাত্যাবিতাড়িত মেঘের ন্যায়।

ইহার পর লক্ষ্মণের তিরস্কারে সুগ্রীবের চৈতন্য হইল। চতুর্দিকে সীতার অন্বেষণে বানরসৈন্য প্রেরিত হইল। এখানে কৃত্তিবাস তদানীন্তন ভারতের ভৌগোলিক সীমার দিগ্‌-দর্শন করিয়াছেন। সুগ্রীব সীতা-অন্বেষণার্থে পূর্ব দিকের বর্ণনা দিয়াছেন: গঙ্গা, সরযূ, গোমতী, সরস্বতী, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদী; মলয়, কোকনদ, পাণ্ডব, মগধ, বঙ্গ, মন্দরপর্বতে অবস্থিত কিরাতদেশ, কর্ণাট, শাকদ্বীপ, ক্ষীরোদ-সাগর, শ্বেতগিরি, কালোদক পর্বত, লোহিত পর্বত, উদয়গিরি প্রভৃতি। পশ্চিম দিকের বর্ণনা: সিন্ধুনদ, মলয়দেশ, কাবেরীর তীর, হিঙ্গুলিয়া গিরি, চন্দ্রবান গিরি বরাহ পর্বত, সুমেরু পর্বত প্রভৃতি। উত্তর দিকের বর্ণনা: হিমালয় গিরি, কৈলাস পর্বত, অলকাপুরী, বিমলানদী, ত্রিশৃঙ্গ পর্বত, জম্বুদ্বীপ, পর্বত, মন্দর পর্বত, কৌশিকী নদী, দ্রোণগিরি, পুণ্যদা নদী, হেম গিরি প্রভৃতি। দক্ষিণদিকের বর্ণনা: কৃষ্ণা, নর্মদা, গোদাবরী, অশ্বমুখ গিরি, বিন্ধ্যপর্বত, মলয় পর্বত, মহেন্দ্র পর্বত, মৈনাক পর্বত, ঋষভ পর্বত, স্বর্ণলঙ্কাপুরী, যমপুরী প্রভৃতি।

প্রান্ত দিকের বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে দিয়াছেন সুগ্রীব। ঐ সব গিরি, উপত্যকা ও নদীর মাহাত্ম্য বলিয়াছেন। কোথায় কি পাওয়া পাওয়া যায়, কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানাইয়াছেন এবং শেষে বলিয়াছেন যে একমাসের মধ্যে সীতার খবর না আনিতে পারিলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। লঙ্কা দক্ষিণ দিকে তাই যোগ্য হনুমান, অঙ্গদ, জাম্বুবান প্রভৃতি পাঁচজনকে দক্ষিণদিকে পাঠান হইল।

হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন এবং সীতান্বেষণে লঙ্কাপুরী তন্ন তন্ন করিয়া যখন অকৃতকার্য হইলেন তখন তিনি বিরাট মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাঁহার মনে হইল প্রজ্বলিত চিতায় প্রাণবিসর্জন দিব কিংবা সাগরকূলে অনশনে দেহত্যাগ করিব অথবা বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক বনে বনে কাটাইব। চিরকুমার কর্তব্যপরায়ণ, বুদ্ধিমান হনুমান আবার ভাবিলেন যে রাজপুত্রদ্বয় ও বানর-বাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে। রামচন্দ্র বলিয়াছেন: 'যিনি প্রভুকর্তৃক দুষ্কর কার্যে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগের সহিত তাহা সম্পূর্ণ করেন, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ।' বহুলোকের শান্তি-সুখ আমার উপর নির্ভর করিতেছে—এই বোধ হনুমানকে নৈরাশ্যের ঝটিকা হইতে মুক্ত করিল। যখন বাহুশক্তি বিফল হয় তখন মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে। বাল্মীকি-রামায়ণে হনুমানের এ ভাবটি অনুপম। 'এই স্থানেই আমি ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্বক সংযতাহারী হইয়া প্রতীক্ষা করিব।' তারপর রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি এবং নিজ প্রভু সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। তাপসবৃত্তি ও আত্মশক্তির বিকাশের ফলে তিনি অশোকবনে সীতাকে দেখিতে পাইলেন। কৃত্তিবাস হনুমানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন: 'যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই

কামে। দোষ হবে প্রভু তব কল্পতরু নামে॥' হনুমান যখন লঙ্কা দগ্ধ করেন তখন তাঁহার লাঙ্গুলের অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য সাগরের জলে গিয়া পড়িলেন। কিন্তু উহাতে জ্বালা না কমায়— 'সীতা বলে, সুধামৃত দেহ হনুমান। এখনি অগ্নির জ্বালা হইবে নির্বাণ॥ নির্বাণ হইল জ্বালা, পুড়ে গেল মুখ। জ্ঞাতিবর্গ হাসিবেক, সে যে বড় দুখ। সীতা বলে জ্ঞাতি-বর্গ কেহ নহে ছাড়া। মম বাক্যে সকলেই হবে মুখপোড়া॥' বানরজাতির মুখপোড়ার ইতিকথা বিবৃত করিলেন কৃত্তিবাস।

রামচন্দ্রের সাগরবন্ধনকালে কৃত্তিবাস এক স্বতন্ত্র পথে গিয়াছেন, কারণ বাল্মীকি-মতে সাগর বলিয়াছেন, 'বিশ্বকর্মাপুত্র নল পিতৃবরে সর্ববস্তু নির্মাণের সামর্থ্য পাইয়াছে। পিতার ন্যায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহী বানর আমার উপর সেতু নির্মাণ করুক—আমি তাহা ধারণ করিব।' সাগরের পরামর্শে রাম নলকে সাগর-বন্ধনের ভার দিলেন, কারণ তাহার উপর ব্রহ্মার আশীর্বাদ ছিল: 'আমি বর দেব তোরে শোন রে বানর। তুই ছুঁলে জলে যেন ভাসয়ে পাথর॥' নল রামকে বলিল: 'এক মাসে বাঁন্ধি দিব শতেক যোজন। গাছ-পাথর আনি দিক যত কপিগণ॥' কাজ করিতে গেলে উৎকৃষ্ট কর্মীর মনেও অজ্ঞাতে একটু অভিমান আসিয়া থাকে। কৃত্তিবাস মানুষের এই মনো-বৃত্তির এক অপূর্ব চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হনুমান বিরাট বিরাট পাথর মাথায় বহন করিয়া নলকে দিতেছিলেন, আর সে বাম হস্তে লইয়া সেতু বাঁধিতেছিল। হনুমানের মনে অভিমান হইল। কী আমাকে তাচ্ছিল্য। সে নলের শক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য গন্ধ-মাদন ভাঙ্গিয়া লোমে লোমে পাথর বাঁধিয়া হুংকার দিয়া দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকার করিয়া নলের উপর পড়িতে উদ্যত হইল। নল রামের শরণ লইল। রাম তখন পথ আটকাইলেন এবং হনুমানের অভিমানকে শান্ত করিয়া দিলেন।

কৃত্তিবাস সেই বিখ্যাত কাঠবিড়ালীর উপাখ্যানটি বাদ দেন নাই। কাঠবিড়ালীর দল আসিল রামকার্য করিবার জন্য। 'লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে। অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে॥ ফাঁক যত ছিল, তাহা মারিল বিড়ালে।' বীর হনুমান যাতায়াতের বিঘ্ন দেখিয়া ঐ কাঠবিড়ালগুলিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিলেন। তাহারা গিয়া রামের কাছে নালিশ করিল। 'হনুমানে ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম। কাষ্ঠ-বিড়ালের কেন কর অপমান॥ যেমন সামর্থ্য যার বান্ধুক সাগর। শুনিয়া লজ্জিত হৈল পবন-কোঙর॥' তারপর সহৃদয় রঘুনাথ কাঠবিড়ালের পিঠে হাত বুলাইয়া দেওয়াতে তাহারা রাম-কর-কমলাঙ্কিত প্রীতির পরশ-রেখা স্মৃতিস্বরূপ বংশানুক্রমে বহন করিয়া চলিল।

কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ডে তুলসীদাস খুবই সংক্ষিপ্তভাবে রামগাথা সারিয়াছেন। কৃত্তিবাস উপাখ্যানের পর উপাখ্যান বলিয়া চলিয়াছেন, আর তুলসীদাস সেখানে বাল্মীকির রামচরিতের উপর দিয়া দাগা বুলাইয়া চলিয়াছেন। অবশ্য স্বাভাবিক ভাবে নিজের রচনাশৈলীও দেখাইয়া-ছেন। তুলসীদাসের রামায়ণ তো কেবল রাম-রাবণের গল্প নয়, ভক্তের উদ্ধার পাইবার সোপান।

পম্পার তীরে ছোট ভাই লক্ষ্মণকে রঘুনাথ ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলিলেন। তুলসীদাসের উপমার শ্রেষ্ঠতা আমরা পূর্বে অনেক বলিয়াছি। পম্পার প্রতিটি বর্ণনার সঙ্গে মানুষের জীবনের বর্ণনা দিয়াছেন তুলসীদাস। বালীবধের পর রাম শরৎ ঋতুর জন্য পর্বতে অপেক্ষা করিতে-

ছিলেন। বাল্মীকি ও কালিদাসের ঋতুবর্ণনার কিঞ্চিৎ আভাষ আমরা পূর্বেই দিয়া আসিয়াছি। এখন ঋতুবর্ণনায় তুলসীদাসের রচনার একটু উল্লেখ করিতেছি। বর্ষা সম্বন্ধে—'রাম বলিলেন, হে লক্ষ্মণ দেখ, বৈরাগ্যব্রতপালনকারী গৃহীর বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়া যেমন অবস্থা হয় ময়ূরগুলিরও মেঘকে দেখিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে। পণ্ডিত বিদ্যা পাইলে যেমন অবনত হয়, মেঘ তেমন মাটিতে নামিয়া আসিতেছে। সাধু যেমন খলের কথা সহ্য করে, পর্বত তেমন বৃষ্টির আঘাত সহ্য করিতেছে। ক্ষুদ্র নদী উপছাইয়া চলিয়াছে, যেমন অল্প ধন হইলে খল উন্মত্ত হইয়া যায়। জীব যেমন মায়ায় জড়াইয়া মলিন হয়, তেমনি জল মাটিতে পড়িয়া ঘোলা হইতেছে। হরিকে পাইলে ভক্ত যেমন নিশ্চল হয়, নদী সমুদ্রে পড়িয়া তেমনি নিশ্চল হইতেছে।' শরৎ সম্বন্ধে—'শরৎকালে রাত্রে চাঁদ রৌদ্রের তাপ দূর করিয়া দেয়, যেমন সাধুদর্শন পাপ দূর করে। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলে যেমন হয়, পদ্ম ফোটায় সরোবরের শোভা তেমনি হইয়াছে। জ্ঞানী যেমন ধীরে ধীরে মমতা ত্যাগ করে, নদী, সরোবর তেমনি করিয়া ধীরে ধীরে শুকাইতেছে।' ঋতুবর্ণনায় তুলসীদাসের এরূপ প্রচুর উপমা রহিয়াছে। লোভে পড়িয়া অনেকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকের বিরক্তি ভয়ে সব দিতে পারিলাম না বলিয়া আফসোস রহিয়া গেল। এ তুলনারাশি তুলসীর নিজস্ব।

সুগ্রীব তাঁহার সীতান্বেষণকারী বানরসেনাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন: 'মন, বাক্য ও কর্মদ্বারা যত্ন করিয়া সেই বিচারই করিবে যাহাতে রামচন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হয়। রোদ পোহাইতে হয় পিঠ দিয়া, এবং আগুন সম্মুখে রাখিয়া পোহাইতে হয়। আর প্রভুর ভজনা করিতে হয় সকল ছল ত্যাগ করিয়া।' সমুদ্রলঙ্ঘনকালে জাম্বুবান হনুমানকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে প্রিয়, জগতে এমন কি কঠিন কাজ আছে যাহা তোমার দ্বারা হয় না। "রাম কাজ লগি তব অবতারা" অর্থাৎ তোমার জন্ম রামের কাজের জন্যই।' ভগবৎকৃপায় হনুমানের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইল। তিনি পর্বতপ্রমাণ হইয়া হুংকার দিয়া হেলায় সাগর লঙ্ঘন করিলেন। পথিমধ্যে সাগরোত্থিত মৈনাক পর্বত ক্ষণেকের জন্য সেখানে বিশ্রাম নিতে বলিলে আদর্শ কর্মবীর হনুমান উত্তর দিলেন, 'রামকাজু কীন্হে বিনু মোহি কহাঁ বিশ্রাম' অর্থাৎ রামের কাজ শেষ না করা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম কোথায়? কী সুন্দর উত্তর! বাল্মীকি-রামায়ণে আছে, 'প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা ন স্থাতব্যমিহান্তরা।' কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষার জন্য এবং মানীকে মান দিবার জন্য হনুমান মৈনাককে একটু স্পর্শ করিয়া রামকার্য সিদ্ধ করিতে নক্ষত্রবেগে ছুটিলেন।

তুলসীদাস অনেক সময় নিজেকে আড়ালে রাখিতে ব্যস্ত। হনুমানের লঙ্কাদাহ এবং পরে মেঘনাদ কর্তৃক বন্ধন সম্বন্ধে শিব-পার্বতীর কথোপকথন উত্থাপন করিয়াছেন। শিবের উক্তি: 'যাঁহার নাম জপ করিয়া জ্ঞানী মানুষেরা ভববন্ধন কাটে, তাঁহার দূত বাঁধা পড়িল। ইহার মানে, প্রভু নিজের কার্যের জন্য তাহাকে বাঁধাইলেন। আগুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, হনুমান তাঁহারই ভক্ত, সেজন্যই হনুমান পোড়ে নাই।' হনুমান রামের অভিজ্ঞান অঙ্গুরী সীতাকে এবং সীতার অভিজ্ঞান চূড়ামণি রামকে দিলেন। দূত হনুমান বন্দীদশাপ্রাপ্ত সীতার কাহিনী, নানা জ্বালা-যন্ত্রণার কথা রামকে বলিলেন আর নিবেদন করিলেন সীতার আত্মকথা: 'হে নাথ, তোমাকে ছাড়িয়াও যে আমার প্রাণ যাইতেছে না, তাহা আমার চোখ দুইটির দোষ।

তোমার বিরহ হইতেছে আগুন, আমার শরীর হইতেছে তুলা, আর শ্বাস হইতেছে বাতাস। মুহূর্তেই শরীর জ্বলিতে পারে। চোখ তাহার নিজের হিতের (তোমাকে দেখিবার) আশায় জল ঢালিতে থাকে। সেইজন্য বিরহ-আগুনে দেহ জ্বলিতেছে না।' হনুমান যে সীতার বার্তা যথাযথভাবে রামকে নিবেদন করিতে পারিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে তুলসীর কাব্যিক প্রতিভা।

এ পৃথিবীতে অহংশূন্য মানুষেরাই প্রকৃত কর্মযোগী। রামচন্দ্রের প্রশংসার উত্তরে হনুমান বলিলেন : 'প্রভু, বানরের বড় বাহাদুরী এই পর্যন্ত যে, সে ডাল হইতে ডালে যাইতে পারে। আমি লাফাইয়া সমুদ্র পার হইয়া স্বর্ণপুরী জ্বালাইয়াছি, রাক্ষস মারিয়া বন উজাড় করিয়া দিয়াছি—এ সব তোমার শক্তিতে। আমার কোনও কৃতিত্ব নাই। সৎসঙ্গ বর্ণনার ব্যাপারে তুলসীদাস উদার, অকৃপণ। বিভীষণ যখন রাবণের পদাঘাত খাইয়া রামের দলে চলিয়া আসিলেন, তখন শঙ্কর বলিলেন : সাধু অবজ্ঞা তুরত ভবানী। কর কল্যাণ অখিল কৈ জানী॥ অর্থাৎ পার্বতী, সাধুর অবজ্ঞা তাড়াতাড়ি বিশ্বের কল্যাণের হানি করে। ফুলের মালা গাঁথিবার কালে মাঝে মাঝে জরি বা মণি বসাইলে উহা যেমন চিকচিক করিয়া শোভা বর্ধন করে তেমনি তুলসীদাস রাম-সীতার কথা গাঁথিতে গাঁথিতে কখনও হর-পার্বতী, কখনও ভুষণ্ডী (কাক) ও গরুড়ের কথোপকথন তুলিয়া ধরিয়া উহা সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

লঙ্কাকাণ্ড সুবিশাল। 'রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব' অর্থাৎ রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধেরই মত। তাহার অন্য উপমা হইতে পারে না! কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস উভয়েই যুদ্ধবর্ণনা দিতে কোথাও কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহাদের অতি উদার ভাবের ফলে কল্পনা লাগাম ছিঁড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে বলেন্দ্রঠাকুর মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন : সে কালে জমকালো অসম্ভব বর্ণনা ফ্যাশান ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার নহিলে লোকে সহজে আকৃষ্ট হইত না। যোজন হস্ত, দ্বিযোজন পদ তখনকার লোকের কল্পনায় অভ্যস্ত ছিল। সম্ভব-অসম্ভবের প্রতি এখনকার মত লক্ষ্য থাকিলে অনেক কেতাবেরই যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতে পারিত না। মানব অপেক্ষা দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, ঘোটকবদন, লম্বোদরবর্গের সেকালে প্রভুত্ব খাটিত। এখন কল্পনা সংযত হইয়া আসিয়াছে—অসংযত অসম্ভব কল্পনার দিনকাল গিয়াছে।

সেতুবন্ধের পরে রামচন্দ্র শিবপূজা করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। চতুর্দিকে ভালুক ও বানরসৈন্যের সমাবেশ হইল। অঙ্গদ দূতরূপে রাবণসভায় প্রেরিত হইলেন। ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না। শুরু হইল যুদ্ধ। ইন্দ্রজিতের নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণ বন্দী হইলেন। তারপর বিনতানন্দন গরুড় আসিয়া তাঁহাদের মুক্ত করেন। রাম বর দিতে চাহিলে—'গরুড় বলেন বাঞ্ছা আছে এই মনে। দ্বিভুজ মুরলীধর দেখিব নয়নে॥ শ্রীরাম বলেন হব সেরূপ কেমনে। ধনুর্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে॥' রামের আপত্তি ছিল যে ঐরূপ ধরিলে কপিগণ, বিশেষতঃ ভক্ত হনুমান মনে কষ্ট পাইবে। কারণ যাহাদের ইষ্টনিষ্ঠা থাকে, তাহারা নিজের ইষ্টকে কখনও অন্যরূপে দেখিতে চায় না। তাই বিনতানন্দন পক্ষ বিস্তার করিলে—'ভকত-বৎসল রাম তাহার ভিতরে। দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধরে॥ ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।' ভক্তের

চোখ এড়ানো অত সহজ নয়। হনুমান সব দেখিলেন। তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল এই বিখ্যাত শ্লোক: 'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥' অর্থাৎ শ্রীনাথ বা বিষ্ণু ও জানকীনাথ উভয়েই এক, পরমাত্মা। তবু আমার যথাসর্বস্ব সেই কমললোচন রামচন্দ্র। বাল্মীকি-রামায়ণে গরুড়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই দর্শনের উল্লেখ নাই। ইহা কৃত্তিবাসের নিজস্ব।

প্রথম যুদ্ধের দিন রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলেন না, কারণ তাহাতে যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। 'আজি তোরে মারিলে বিপদ ঘুচে যাবে। জ্ঞাতি-বন্ধু-আদি তোর অনেক বাঁচিবে॥ একলক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি। একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥' কী বিরাট গোষ্ঠীর বর্ণনা দিলেন কৃত্তিবাস। রাবণ একবার শিবের দ্বারী বানরমুখো নন্দীকে টিটকারি করায়—'নন্দী কহিলেক আমি শিবের কিঙ্কর। মোরে উপহাস কর দুষ্ট নিশাচর॥ কপিমুখ দেখি তুই কৈলি উপহাস। এই মুখে হবে তোর সবংশে বিনাশ॥' সেই অভিশাপ কার্যে ফলিতে চলিল।

রাবণবধের পূর্বে কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ বধ হইল। বিভীষণের পুত্র তরণীসেনের কাহিনী কৃত্তিবাসের নিজস্ব। ধার্মিকপুত্র তরণীসেন আসিল যুদ্ধক্ষেত্রে। 'অঙ্গে লেখা রাম নাম রথ চারিপাশে। তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে॥ দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়া জানে। হইয়া ধার্মিক বক আসিয়াছে রণে॥' যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের প্রতি তরণীর স্তব এবং কোমলহৃদয় রঘুনাথের অশ্রুসিক্ত ছবিখানি অপূর্ব। তরণীর বাসনা ছিল রামচন্দ্রের হাতে মরণ। তাই আবার নিজ মূর্তি ধরিয়া শুরু করিল যুদ্ধ। দুর্ধর্ষ বীর তরণীসেন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে শিখাইয়া দিলেন, একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া উহার মরণ হইবে না। রাম সঙ্গে সঙ্গে সেই বাণ ধনুতে জুড়িয়া তাহাকে বধ করিলেন। 'দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে। তরণীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলে॥' পিতা হইয়া ধর্মের জন্য পুত্রকে বধের তৎপরতা—কৃত্তিবাসের এ কাহিনী ধর্মের আদর্শকে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। যেমন করিয়াছিল মহাভারতে গান্ধারীর 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' বাণী।

কৃত্তিবাসের কল্পনার বাহাদুরী আছে। রাবণের শক্তিশেলে মূর্ছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে বাঁচাইতে হনুমান ঔষধ আনিতে গন্ধমাদন পর্বতে গমন করেন। আবার এদিকে দুপুররাত্রে রাবণ সূর্যকে উদয় হইতে আদেশ দিলেন। ঐ শক্তিশেলে এমন নিয়ম ছিল যে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণের প্রাণ শেষ হইবে। সেই উদয়গামী সূর্যের প্রতি হনুমান ধাওয়া করিয়া তাঁহার রথের ঘোড়া প্রভৃতি নষ্ট করিয়া মিতালি করিলেন। ভানু-হনুর মিতালি ও কোলাকুলি এবং পরে হনুর বগলের নীচে ভানুর অবস্থান—সেই চরম দুর্যোগের মুহূর্তে হাস্যরসের হিল্লোল তুলিয়াছে।

আর একটি ঘটনা মহীরাবণ কর্তৃক মায়াবলে রামলক্ষ্মণহরণ। হনুমান শতযোজন লেজ দিয়া দুর্গ তৈরী করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে রাখিলেন। বিভীষণ রহিলেন ঐ গড়ের প্রহরী। মহীরাবণ মায়াবলে বিভীষণের রূপ ধরিয়া রাম-লক্ষ্মণকে পাতালে লইয়া যান। অবশেষে হনুমান সেখানে গিয়া মহীরাবণ এবং

তাহার সদ্যোজাত সন্তান অহিরাবণকে বধ করিয়া রামলক্ষ্মণকে বাঁচাইয়া লইয়া আসেন। তারপর শুরু হইল রাবণবধের পরিকল্পনা। রাবণবধের জন্য দেবীর অকাল-বোধন, ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ ও পূজা শুরু হইল। একশত আট পদ্ম আনিলেন হনুমান। পুষ্পাঞ্জলি দিবার কালে একটি কম পড়িল। 'নীল কমলাক্ষ মোরে বলে সর্বজনে। এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে॥' ইহার আর প্রয়োজন হইল না। দেবী স্বয়ং দর্শন দিয়া অভীপ্সিত বর দান করিলেন।

লঙ্কাকাণ্ডে কৃত্তিবাসের নূতন নূতন উপাখ্যানের শেষ নাই। হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ অন্য কোন রামায়ণে দেখা যায় না। কথিত আছে রাবণের প্রতি শিবের বর ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে—'হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যাবে যবে। শঙ্কর কুড়ায়ে লয়ে অঙ্গে জোড়া দিবে॥' ঘরসন্ধানী বিভীষণ বলিলেন, রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে। একমাত্র মন্দোদরী জানে উহা কোথায়। হনুমান ব্রাহ্মণের বেশে চলিলেন এবং জ্যোতির্বিদ্যার ছলনা করিয়া স্ফটিকের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া সেই মৃত্যুবাণ আনিলেন। ত্রেতাযুগে রাবণবধ করিয়া ভূভার হরণ করিলেন স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র। মন্দোদরীর বিলাপে ব্যথিত রামচন্দ্র তাহাকে 'জন্মায়তী' বর দিয়া ফেলিলেন। স্বামীহীনা নারী কি করিয়া ঐ বর পাইবে? তাই রামচন্দ্র আশীর্বাদ করিলেন, 'শুন মোর বাণী—গৃহে যাও রাণি—দুঃখ না ভাবিও চিতে। রাবণের চিতা—রহিবে সর্বথা—চিরকাল থাক আয়তে।' তাই প্রবাদ আছে যে রাবণের চিতা এখনও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। চিতা নিভিলে তবে ত বৈধব্যের প্রশ্ন। 'নারীরাই অধিক নারীবিদ্বেষী'—এ প্রবাদ রামায়ণেও দেখা যায়। মন্দোদরী আদর্শ সতী নারী হইয়াও শাপ দিয়াছেন সীতাকে: 'তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী। পুরী-সহ রাবণে নাশিয়া কোপাগুনে। আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে॥ এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ। বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ॥'

সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া রামচন্দ্র চলিলেন অযোধ্যায়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে অভিশাপোক্তির ছড়াছড়ি। পদ্মানদীর প্রতি গঙ্গার অভিশাপ, দশরথের প্রতি অন্ধকমুনির, বামদেবের প্রতি বশিষ্ঠের, ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফল্গুর প্রতি সীতার, রামের প্রতি তারার, চক্রবাক-চক্রবাকীর প্রতি রামের, সীতার প্রতি মন্দোদরীর, রাবণের প্রতি নলকুবেরের ও নন্দীর অভিশাপ। তখনকার যুগে মনে হয় ভুল করিলে আর মার্জনা ছিল না। মানুষ ছিল বাক্‌সিদ্ধ। আর অভিশাপই ছিল ভুলের দণ্ড।

লঙ্কাকাণ্ডে তুলসীদাস কৃত্তিবাসের মত উপাখ্যান বা বর্ণনার বাহুল্য দেখাইতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার রামচরিতের উদ্দেশ্য ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তিবারি সিঞ্চন! তাই প্রতি কাণ্ডের পরিসমাপ্তিতে তুলসীদাস লিখিয়াছেন, 'ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ-বিধ্বংসনে বিমলবিজ্ঞানবৈরাগ্যসন্তোষসম্পাদনো নাম তুলসীকৃত' ইত্যাদি।

লঙ্কাকাণ্ডে তুলসীদাসের আরম্ভটা অনেকটা ম্যাজিকের মত। রামচন্দ্র দক্ষিণদিকে মেঘ ও বিদ্যুৎ দেখিলেন এবং মৃদু-মধুর মেঘধ্বনি শুনিলেন। বিভীষণ বলিলেন: প্রভু, মেঘ ও বিদ্যুৎ নয়। লঙ্কার হর্ম্যশীর্ষে মেঘরঙের ছাতার নীচে রাবণের নৃত্যগীতের ঘটা

চলিতেছে। মন্দোদরীর কানের দুল হইতে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতেছে। দর্পহারী রামের বাণ রাবণের মাথার মুকুট ও মন্দোদরীর কানের দুল কাটিয়া আবার তূণে ফিরিয়া আসিল।

অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণের সভায় পাঠান হইল। বহু বাদানুবাদের পরে ত্রিভুবনজয়ী রাবণ সাধারণ মানুষ রামের ভয়ে ভীত নয় বলায় অঙ্গদ বলিল: ওরে চরিত্রহীন মূর্খ, রাম মানুষ কেমন করিয়া হইল? কামদেব কি সাধারণ ধনুকধারী? গঙ্গা কি সাধারণ নদী? কামধেনু কি সাধারণ পশু? কল্পতরু কি সাধারণ গাছ? অন্নদান কি সাধারণ দান? অমৃত কি সাধারণ রস? গরুড় কি সাধারণ পক্ষী? চিন্তামণি কি সাধারণ পাথর? বৈকুণ্ঠ কি সাধারণ লোক? রামভক্তি লাভ কি সাধারণ লাভ? রামচন্দ্র মানুষ নন—একথা বুঝাইতে যত উপমার দরকার তুলসী সব যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। যে হরি ও হরের নিন্দা শোনে, তাহার গোবধের পাপ হয়। রামনিন্দা শুনিতে না পরিয়া দূত অঙ্গদ ক্রোধে রাবণের চারিখানি মুকুট কাড়িয়া লইয়া রামচন্দ্রের নিকট ছুঁড়িয়া মারিল। পরে রাম উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অঙ্গদ বলিল: 'প্রভু, উহা মুকুট নয়, রাজার চারিটি গুণ। বেদে বলে—সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ—এই চারিগুণ রাজার হৃদয়ে থাকে। এই চারিটি হইতেছে নীতিধর্মের পা। মনে মনে ইহাই জানিয়া গুণগুলি ধর্মভ্রষ্ট রাবণকে ত্যাগ করিয়া আপনার কাছে আসিয়াছে। তুলসীদাসের ব্যাখ্যাগুলির বেশ একটা মৌলিকতা আছে।

শক্তিশেলে মূর্ছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণের জন্য রামের হাহুতাশ খুবই মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলসী ব্যক্ত করিয়াছেন। রামের উক্তি: 'ভাই, পাখাহীন পাখী, মণিহীন সাপ ও শুঁড়হীন হাতীর যে অবস্থা হয়, মূর্খ বিধাতা যদি আমাকে বাঁচাইয়া রাখে তবে তোমা বিনা আমার অবস্থাও তেমনি হইবে। স্ত্রীর জন্য ভাই হারাইয়া অযোধ্যায় কোন মুখে যাইব?' তুলসীদাস তাঁহার প্রভুকে সাধারণ মানুষের মত দুর্বলভাবে প্রকাশ করিতে চাহেন না। তাই শিবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন: 'উমা, রঘুরাজ এক ও অখণ্ড, তবুও ভক্তবৎসল রাম মানুষের অবস্থা দেখাইতেছিলেন।'

নরম ধাকের মানুষ তুলসীদাসের যুদ্ধ বর্ণনা খুব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে নাই। এক্ষেত্রে কৃত্তিবাস তুলসীদাসকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। রাবণ যখন রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন তখন বিভীষণ রথহীন রামচন্দ্রকে বলিলেন, 'বিনা রথে তুমি বীর রাবণকে কেমন করিয়া জিতিবে?' প্রত্যুত্তরে রাম বলিলেন; 'সখা শোন, যাহাতে জয় হয় সেই রথ আমি আনিয়াছি। সে রথের চাকা হইতেছে শৌর্য; উহার ধ্বজা ও পতাকা হইতেছে সত্য, সদাচার ও বলবান বিচারশক্তি; ইন্দ্রিয়সংযম ও পরহিত উহার ঘোড়া; ক্ষমা ও কৃপা হইতেছে লাগাম; ঈশ্বর-ভজন চতুর সারথি; বৈরাগ্য ঢাল; সন্তোষ তলোয়ার; দান কুঠার; বুদ্ধি প্রচণ্ড শক্তি বা শেল; শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কঠিন ধনুক; পবিত্র স্থির মন তূণীর; শান্তি, অন্তরিন্দ্রিয়সংযম ও বহিরিন্দ্রিয়-সংযম নানা বাণ; ব্রাহ্মণ ও গুরুর পূজা অভেদ্য বর্ম। ইহাদের মত জয়ের উপায় আর দ্বিতীয় নাই। সখা, যাহার এইপ্রকার ধর্মময় রথ, তাহাকে জয় করিতে পারে এমন শত্রু কোথাও নেই।' তুলসীদাস এক অপূর্ব রথরূপক উপস্থিত করিলেন। এইরূপ দৃঢ়রথে আরূঢ় ব্যক্তিই একমাত্র অজেয় সংসাররূপ শত্রুকে জয় করিতে পারে। এ

ধরণের রথ-কল্পনা কঠোপনিষদেও আছে।

যাহা হউক, রামচন্দ্রকে পায়ে হাঁটিয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সারথি মাতলি সহ নিজের রথ পাঠাইয়া দিলেন। শুরু হইল তুমুল রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণের বৃথা আস্ফালন ও দুর্বাক্যের উত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন 'বড়াই করিয়া যশ নাশ করিও না। সংসারে তিন রকম লোক আছে—গোলাপ, আম ও কাঁঠালের মত। এক ফুল দেয়, অপর ফুল ও ফল দুইই দেয়, আর এক কেবলই ফল দেয়। একজন বলে, একজন বলে ও করে, আর একজন কেবলই করে, বলে না।' যুদ্ধক্ষেত্রে এ ধরণের নীতি-উপদেশ শুনিয়া রাবণ প্রথমে হাসিয়া আবার পরক্ষণেই ভীষণ গর্জন কবিয়া বজ্রের মত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যুদ্ধে মায়াবী রাবণের মায়াজাল মায়াধীশ রামচন্দ্র ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে লাগিলেন। 'রঘুপতি সর সির কটেহু ন মরঈ' অর্থাৎ রঘুপতির শরে রাবণের মাথা কাটে, কিন্তু রাবণ মরে না। এ কাহিনী শুনিয়া সীতা ত্রিজটাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল: 'রাবণের বুকে বাণ লাগিলে সে মরিত। তাহার হৃদয়ে সীতা বাস করিতেছেন বলিয়া প্রভু তাহার বুকে বাণ মারিতেছেন না। আর সীতার হৃদয়ে রামের বাস এবং রামের ভিতরে রহিয়াছে গোটা বিশ্বভুবন। যদি সেখানে বাণ লাগে তবে সকলের নাশ হইবে। তবে মাথা কাটায় রাবণের যখন ধ্যান ভঙ্গ হইবে তখনই বিজ্ঞ রাম রাবণের বুকে বাণ মারিবেন।' অদ্ভুত কল্পনা তুলসীদাসের। তিনি নিজে আর যুদ্ধ বর্ণনা না দিয়া শেষনাগ, সরস্বতী, বেদ ও কবিদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

রাবণের নাভিতে ছিল অমৃতকুম্ভ। বিভীষণ রামকে বাণদ্বারা ঐ অমৃত শুকাইয়া ফেলিতে বলিলেন। ফলে বধ হইল দশগ্রীব রাবণ। অরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্র প্রকৃত সীতাকে অগ্নির কাছে গচ্ছিত রাখিয়া মায়ামৃগ ধরিতে যান—ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সীতাকে এখন কলঙ্ক অপনোদনের জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে রাম আদেশ করিলেন। পবিত্রতার আগুনে সদাবেষ্টিত সীতাকে প্রভু রামচন্দ্র ভৌতিক আগুনের মধ্য হইতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা কবিলেন। লেলিহান অগ্নি অকলঙ্কিনী সীতার সতীত্বকে আরও উজ্জ্বল করিয়া বিদায় লইলেন। তারপর শুরু হইল অযোধ্যায় ফিরিবার পালা।

উত্তরকাণ্ডে কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে অনুসরণ করিলেও কোথাও কোথাও 'জৈমিনি ভারত' হইতেও গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাণ্ডে অগস্ত্য ঋষি পুরাণকথা বলিয়াছেন। অতি সুন্দর সে-সব কথা। কৃত্তিবাসের রামায়ণে নানা ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে; তবুও উহার মূল ভাবটি কোমলতা, মৃদুতা ও মধুরতার দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভারতের মাটি বড়ই নরম ও স্নিগ্ধ। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—এঁদের কথাই তো ভারত-কথা; এঁদের চিত্রই তো ভারত-চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, হৃদয়ে করুণা, সহানুভূতি ও নয়নে ভক্তির অশ্রু—ভারতবাসী তাহাকেই হৃদয়ে বরণ করে, প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস ভারতের এই মর্মকথা জানিতেন বলিয়া তাঁহার কথা মর্মে প্রবেশ না করিয়া যায় না।

উত্তরকাণ্ডের প্রারম্ভে কৃত্তিবাস অগস্ত্য ঋষির দ্বারা এক অপূর্ব কথা শোনাইলেন। 'চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন। চৌদ্দবর্ষ স্ত্রীর মুখ না করে দর্শন॥ চৌদ্দবর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে। ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই

জন পারে॥' অযোধ্যার রাজসভায় সকলে হতবাক্ হইয়া গেল। রামচন্দ্র বলিলেন, 'আমি ত লক্ষ্মণকে নিজ হাতে ফল দিয়াছি, সঙ্গে সীতা ছিল; সুতরাং ইহা কি করিয়া সম্ভব?' লক্ষ্মণকে সভায় ডাকা হইল। তিনি রামচন্দ্রকে কহিলেন, 'আপনি "ধর" বলিয়া ফল দিতেন, খাইতে ত বলেন নাই। সীতা-হরণ কালে আপনার হয়ত মনে আছে আমি সীতার পরিত্যক্ত হার চিনিতে পারি নাই, কিন্তু নূপুর চিনিতে পারিয়াছিলাম। আপনি ও সীতা যখন কুটিরে নিদ্রিত থাকিতেন, তখন ধনুর্বাণ হাতে প্রহরীরূপে থাকিতাম। নিদ্রা-দেবী আমার কাছে আসিলে আমি তীর দিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিলাম চৌদ্দ বৎসর পরে আসিতে।' এ পৃথিবীতে কোন বিরাট কর্ম করিতে গেলে কী বিরাট আত্মত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন—তাহাই দেখাইয়াছেন কৃত্তিবাস। উপবাস বা ব্রত, ব্রহ্মচর্য বা সংযম, নিদ্রাজয় বা তামসপ্রবৃত্তির উচ্ছেদের মধ্যেই রহিয়াছে বিজয়ের সম্ভাবনা।

লক্ষ্মণের ত্যাগের প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ আর একখানি ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন তাঁহার 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে: 'লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু সীতার জন্য উর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; উর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে উর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।...পাছে সীতার সহিত উর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বল মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠ-পার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই?'

সীতার বনবাস-বৃত্তান্ত কৃত্তিবাস বেশী করিয়া গাহিয়াছেন। বিচ্ছেদ-বেদনা মানব-মনকে সহজেই অভিভূত করিয়া ফেলে। নির্বাসিতা সীতার হাহুতাশ অত্যন্ত কঠিন হৃদয়েও দোলা না দিয়া যায় না। বাল্মীকির তপোবনে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া লইয়া যে বিস্তৃত যুদ্ধকাহিনী কৃত্তিবাস রচনা করিয়াছেন—অন্য কোন রামায়ণে ঐরূপ দেখা যায় না। একদিকে দুইটি কিশোর বালক—লব-কুশ—অপর দিকে শত্রুঘ্ন ও অযোধ্যার অজস্র চতুরঙ্গ সেনা। শত্রুঘ্নের পতনের পর যুদ্ধে আসিলেন ভরত ও লক্ষ্মণ এবং তাঁহাদের পতনের পর আসিলেন স্বয়ং রামচন্দ্র। কী অদ্ভুত রোমহর্ষক যুদ্ধ দেখাইয়াছেন কৃত্তিবাস। রাবণবিজয়ী পরাস্ত হইলেন আপন পুত্রদের কাছে। সীতা জানিতেন না লব-কুশ কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে সীতা আশীর্বাদ করিয়া বলিতেছেন: 'কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী। তো-সবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি॥' যুদ্ধরহস্য সীতা বুঝিলেন, লবকুশ যখন হনুমান ও জাম্বুবানকে বাঁধিয়া আনিল। সীতা শুনিলেন রামের পতনকথা। ছুটিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। জ্বালিলেন আগুন প্রাণাহুতির উদ্দেশ্যে। বাল্মীকি আসিয়া পড়ায় সব বিপদ কাটিয়া গেল। সবাই পুনর্জীবিত হইলেন।

বিচ্ছেদের পর মিলন মধুময় লাগে। কেবল-মিলনের ভিতর সুখ থাকিতে পারে কিন্তু উহাতে মাধুর্য বা গরিমা নাই। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরেই মিলনসুখ বেশী অনুভূত হয়। রাম-সীতার

ক্রমাগত বিচ্ছেদ ভক্তহৃদয়ে ভগবৎ-বিরহের ভাব জাগাইয়া দেয়। একটির পর একটি পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত। আন্তরিকতার উপর বিন্দুমাত্র সন্দেহ দারুণ মর্মবেদনার কারণ হয়। অপবাদে লাঞ্ছিতা সীতা স্বামীর কাছে শেষ আক্ষেপ করিলেন: 'জন্মে জন্মে প্রভু, তুমি হয়ো মোর পতি। আর কোন জন্মে মোর করো না দুর্গতি ॥'

সীতার পাতালপ্রবেশ পর্বে কৃত্তিবাসের এই উক্তি আমাদের বেদুইন কবি বেন ইদ্রিশের রচিত কবিতাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবি ইদ্রিশ ছিলেন অমৃতলোকে বিশ্বাসী। তাই তাঁহার রচনায় ফুটিয়াছে এক অপূর্ব স্বর্গীয় প্রেম। ঐ প্রেমের নাম 'বেদুইন প্রেম।' এ জগতে মিলন না হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রেম ত বিফল হইবার নয়। সীতার হৃদয়ের প্রেম তাঁহাকে অমরত্ব দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে পৃথিবী হইতে বৈকুণ্ঠে। শ্রীরামচন্দ্রও নরদেহ ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন। 'সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে। লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে ॥' এই মিলনই চরম মিলন, পরম মিলন।

উত্তরকাণ্ডে তুলসীদাস একদম স্বতন্ত্র। তিনি চিরাচরিত বাল্মীকির উপাখ্যানের দিকেই গেলেন না। রাবণ মরিল। মনোরাজ্যে দুষ্টের মৃত্যু হওয়ায় রামরাজ্য বসিল। আবার এদিকে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলে সেখানে যে রামরাজ্য বসিল তাহাও হৃদয়ের রামরাজ্যের জুড়ী হইল। তুলসীদাস এই সব কাহিনী নিজে না শোনাইয়া শিব-পার্বতী এবং কাক ভুষণ্ডী ও গরুড়ের মারফত শোনাইয়াছেন। তুলসীদাস সীতার বনবাস দেখান নাই। প্রাণের রঘুবীরকে কষ্ট দিতে তিনি চাহেন না—তাই মনে হয় দেখান নাই। আবার একটি মত আছে —বাল্মীকি-রামায়ণে সীতার বনবাস পর্বটা প্রক্ষিপ্ত; ঐজন্যও হয়ত তুলসীদাস ওদিক দিয়া যান নাই। তিনি রামরাজ্যের অধিবাসী হইতে ব্যস্ত। তাহার মতে একমাত্র ভক্তি হইতেছে ঐ রাজ্যের প্রবেশের পাঞ্জা বা ছাড়পত্র।

রামরাজ্যের অপূর্ব বর্ণনা দিয়া কাকভুষণ্ডী গরুড়কে বলিলেন: 'রামরাজ্যে রাজার হস্তস্থিত দণ্ড গিয়া সন্ন্যাসীর হাতের লাঠি হইল। কারণ সেখান হইতে সমস্ত অপরাধ চিরদিনের জন্য বিদায় লইল। রাজার ভেদনীতি অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যের ঝগড়া বাধাইয়া শাসন করার নীতিও উঠিয়া গেল। ভেদ তখন গেল নর্তকদের সমাজে; সুরতালের জন্যই ভেদ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পররাজ্য জয়ের আর প্রয়োজন হইল না। কারণ রামরাজ্যে পরই কেহ রহিল না—জয় করিবে আর কাহাকে? জয় করিবার কাজ রহিল মাত্র নিজের মনকে। এই হইল রামরাজ্য।

তুলসীর উত্তরকাণ্ডের অধিকাংশ কাকভুষণ্ডী ও গরুড়ের কথোপকথনে পূর্ণ। রাম-লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া গরুড়ের মনে সন্দেহ জাগিল—এ কী ব্যাপার! যাঁহার নাম জপ করিয়া মানুষ ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তুচ্ছ রাক্ষস সেই রামকে নাগপাশে বাঁধিল! বিভ্রান্ত গরুড় সন্দেহ নিরসনের জন্য ছুটিল প্রথমে নারদের কাছে, তারপর ব্রহ্মা ও শিবের কাছে। শিব তাহাকে পরম রামভক্ত ভুষণ্ডীকাকের কাছে পাঠাইলেন। স্বয়ং বিষ্ণুবাহন পক্ষিরাজ গরুড় একটা নগণ্য কাকের কাছে সেই রামতত্ত্ব শুনিতে লাগিলেন। ভুষণ্ডী অনেক কিছু বলিয়া শেষে মন্তব্য করিল: হে খগপতি, এখন আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই বলিতেছি যে, হরিভজন ছাড়া ক্লেশ যায় না। রামকৃপা ভিন্ন রামের প্রভুত্ব জানা

যায় না। না জানিলে বিশ্বাস হয় না, আর বিশ্বাস না হইলে প্রীতিও হয় না। প্রীতি ছাড়া ভক্তি হয় না, আর হরিভক্তি বিনা কি সুখ হয়? নিজের সুখ উপস্থিত না হইলে কি মন স্থির হয়? হে পক্ষিরাজ, রামের কৃপা ছাড়া স্বপ্নেও মন শান্তি পায় না। অতএব 'অস বিচারি মতি ধীর ত্যজি কুতর্ক সংশয় সকল। ভজহু রাম রঘুবীর করুণা কর সুন্দর সুখদ॥' অর্থাৎ ইহা বুঝিয়া কুতর্ক ও সংশয় সকল ত্যাগ করিয়া হে স্থিরবুদ্ধি, তুমি সুখদায়ক, সুন্দর, করুণাময় রঘুবীর রামচন্দ্রের ভজনা কর। ইহা কেবল ভক্তশ্রেষ্ঠ ভুষণ্ডীকাকের কথা নয়, তুলসীদাসেরও মনের কথা।

লোকে প্রবাদ আছে, যে ঋণ অপরিশোধ্য, উহার উল্লেখ দ্বারা ঋণ-ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে। কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর মহাশয়ের সম্পাদিত কৃত্তিবাস রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াছি। কবিভূষণের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বহু অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দিয়াছেন। তুলসীদাসের রামায়ণে আমার মত স্বল্প হিন্দী জানা লোকের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে ধরিয়া রামচরিত-রূপ মানসসরোবর পার হইয়াছি। অমঙ্গলের মধ্যেও ভগবান আছেন—এ কথা অল্পবিশ্বাসী মানুষ বুঝিতে পারে না। দাশগুপ্ত মহাশয় স্বদেশী আন্দোলন কালে জেলে না গেলে এ গ্রন্থ রচনা হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার আত্মকথা: 'এবারকার জেলে জেলখানার গোশালার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। গোশালার তিন বেলার কাজ করিয়া যে সময় বাঁচিত, তাহা রামায়ণ-অনুবাদ কাজে লাগাইতাম।' দীর্ঘকাল ব্রত উদ্‌যাপনের পর ব্রত প্রতিষ্ঠার দিন খুব আনন্দ হয়। দুই বিরাট কলেবরযুক্ত গ্রন্থ পরিক্রমার পর সেই কথা মনে হইতেছে।

তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়া ছুটী পান নাই। কারণ যুগে যুগে তাঁহাদের রামগান করিয়া মানুষকে মুক্তির কথা শোনাইতে আসিতেই হইবে। রামচরিত কীর্তন ছাড়া তাঁহাদের আর কাজ নাই। যুগে যুগে রাবণ দেখা দিতেছে, যুগে যুগে রাম আসিয়া তাহাকে বধ করিয়া বিভীষণকে রাজ্য দিতেছেন। দিন দিন মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ে অন্যায়-রাবণ দশ মাথায় দশ ইন্দ্রিয় লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। রাম সেই দশ মুণ্ড কাটিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করাইয়া রাবণকে নিজের বশে আনিয়া ভক্তের হৃদয় পবিত্র করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে রাবণ হৃদয়ে বসিয়া সীতা হরণ করিতেছে। সীতাকে তো সে অপবিত্র করিতে পারে না, সত্যকে মলিন করিতে ইচ্ছা থাকিলেও পারে না, নিজেই মলিন হয়। রাম আসিয়া রাবণ মারিয়া সীতার উদ্ধার করেন ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। সেই ট্রাডিশান সমানেই চলিয়াছে।

রামকথার ইতি নাই। হে সজ্জন পাঠক, কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস দুইজনেই সুর করিয়া রাম-গান শোনাইবার জন্য ডাকিতেছেন। কৃত্তিবাস বলিতেছেন: 'রাম-নাম জপ ভাই, অন্য-কর্ম মিছে। সর্ব-ধর্মকর্ম রাম-নাম-বিনা মিছে॥' তুলসীদাস বলিতেছেন: 'রামহিঁ সুমিরিয় গাইয় রামহিঁ। সন্তত সুনিয় রামগুণ গ্রামহিঁ॥' অর্থাৎ রামকেই স্মরণ করিবে, রামকেই গাহিবে, সর্বদা রামের গুণগ্রাম শুনিবে। হে পাঠক, ক্রমাগত শুনিতে থাকুন। যদি মনে করেন রামায়ণের ওসব আষাঢ়ে গল্প শুনিয়া কি হইবে? দোহাই! না শুনিয়া বলিবেন না কি হইবে। যখন ঐ দুই সাধক-কবি শুনিতে ডাকিতেছেন, তখন একবার শুনিয়াই দেখুন।

বর্তমান শিক্ষা ও তাহার প্রভাব

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন দত্ত

প্রকৃত শিক্ষার অর্থ কি? এ বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথার সত্যতাই উপলব্ধি করি যে, জ্ঞান মানুষের মনের ভিতর সূক্ষ্ম অজ্ঞতার আবরণ দিয়া ঢাকা থাকে, সেই আবরণকে একটু একটু করিয়া ভেদ করিয়া ভিতরের পূর্ণতাকে যখন মানুষ প্রকাশ করে, তখনই সে শিক্ষিত হয়। মানুষের দেহ, মন ও বুদ্ধির সমান বিকাশের প্রয়োজন। সুস্থ শিক্ষার জন্য সর্বাগ্রে ছাত্রদের দেহমনকে শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় এবং প্রয়োজনবোধে সদ্‌গ্রন্থপাঠ হইতে খেলাধূলা ব্যায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে শরীর গঠন ও মন শক্ত করিতে হয়। মনকে একাগ্র করিতে পারিলেই মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। মনঃসংযোগ অভ্যাসের দ্বারা মনের সব শক্তিকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো বুদ্ধির বিকাশ ও বিস্তৃতিরই ব্যবস্থা আছে, মনের উন্নতির কোন ব্যবস্থাই নাই।

আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা লইয়া নানা প্রকার আলাপ আলোচনা চলিতেছে, এবং এবং এই বিষয়ে আমরা এখনো কোন সুফলপ্রদ স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি নাই। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছে, বর্তমান ছাত্রসমাজই তাহার পরিচায়ক। অন্য বিষয় ছাড়িয়া দিলেও একথা নিশ্চিত করিয়াই বলা যায় যে জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতি কিছুই তাহারা এই শিক্ষার মাধ্যমে পায় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাবিষয়ে বহু চিন্তা করিয়া ছিলেন, এবং বহু পূর্বেই এই বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে, বৃটিশরাজের তত্ত্বাবধানে যে শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে. সে শিক্ষার দ্বারা জাতির কোন বিশেষ উন্নতি সম্ভব হইবে না, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কেরানি ও অফিসারের সৃষ্টি হইবে, এবং তাহাদের দ্বারা দেশের কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাও বলিয়াছিলেন যে, দেশের ছাত্রসম্প্রদায়কে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারিলে কিংবা এই শিক্ষার ব্যবস্থানীতি পরিবর্তন না করিলে দেশের যথার্থ উন্নতি সুদূরপরাহত। শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিতে গিয়া তিনি ছাত্রদের স্বাধীনতা ও আত্মশক্তির বাধাহীন বিকাশের কথা চিন্তা করিয়াছেন। প্রত্যেক শিশুর তথা শিক্ষার্থীর ভিতরে যে প্রতিভা ও কর্মশক্তি এবং তাহাদের সহজাত প্রবণতা আছে, তিনি বলিয়াছেন, তাহার বিকাশ নির্ভর করে একটি উপযুক্ত পরিবেশের উপর। বলিয়াছেন, উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে সেই প্রতিভা ও কর্মশক্তির যাহাতে পূর্ণ বিকাশ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথেই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান থাকা চাই-ই। তাহা না থাকিলে শিক্ষা যথাযথভাবে হওয়া সম্ভব নয়। বলিয়াছেন, শিক্ষায় ধর্ম যেন অন্ন, আর সব যেন ব্যঞ্জন। অর্থাৎ

মানুষটিকে আগে খাঁটি করিয়া গড়িতে হইবে, নতুবা সে লব্ধ বিদ্যার অপব্যবহার করিতে পারে। স্বামীজীর এই কথার তাৎপর্য আজ কারো পক্ষে না বোঝার কারণ নাই। ছাত্রকে শিক্ষাদানে শিক্ষকদের দায়িত্বও বিরাট; তাঁহাদের কেবল বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র বা বাঁধা ছকে ছাত্রকে পাঠ দেওয়া ও লওয়ার যন্ত্রমাত্র হইলে চলিবে না। তাঁহাদের প্রধান কার্য হইবে প্রত্যেক ছাত্রের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। যে কথাটির ব্যবহার এখন হাস্যোদ্রেকই করে, সেই 'শিক্ষায়তনের পবিত্রতা'কে আক্ষরিক অর্থে মূর্ত করিয়া তোলা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে যাহাতে চরিত্রবলের এবং তাহাদের অন্তরে জাতীয়তা-বোধের গৌরব জাগ্রত হয়, তাহার জন্য আমাদের জাতির কীর্তিমান পুরুষদের মহৎ জীবনাদর্শের গৌরবময় ইতিহাস ও জাতির সাংস্কৃতিক পটভূমির চিত্র তুলিয়া ধরা। ইহারই ফলে ছাত্রসম্প্রদায়ের মনে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিবে, তাহারা আদর্শ মানুষ হইবার চেষ্টা করিবে, তাহারা নূতন ও পুরাতনের ভাল জিনিসগুলি চিনিয়া সেগুলির সমন্বয়সাধন করিতে পারিবে।

আমাদের দেশ যেজন্য একদিন মহান ছিল, দেশের সভ্যতা উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে বিষয়ে যদি শিক্ষার্থিগণ শিক্ষা না পায়, তবে তাহাদের আচরণ কখনো পরিবর্তিত হইবে না, তাহাদের সেরূপ মহান আদর্শ ও চরিত্র গঠনে ইচ্ছাও জাগিবে না। ছাত্রদের আদর্শ শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে আমাদের দেশেরই মহামানবদের কর্ম-জীবনের ও মহান আদর্শের ছবি।

আজ কাল দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী মুখস্থ করিয়া কোন প্রকারে পরীক্ষায় পাশ করে। অনেকে আবার সেটুকু পরিশ্রমও করিতে চায় না। চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ তাহারা পায় না। বৃটিশ আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহাই প্রায় এখনো রহিয়াছে; সেই শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শ মানুষ গড়িয়া উঠা তো দূরের কথা, ছাত্রদের মনে নানা প্রকার জাতীয়আদর্শবিরোধী ভাব গড়িয়া উঠিতেছে, যাহার ফল আজ 'নীতির নবমূল্যায়ন' অর্থে নীতিহীনতা। একদল মানুষ আজ দৃষ্টিহীন, একদল হিংস্রতা ও ভাঙ্গনের নেশায় উন্মত্ত। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও আমরা জাতীয় বিবেককে অতন্দ্র রাখিতে পারি নাই। নানাদিক হইতে উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও নানা নীতিহীনতা, দুর্নীতি ও বিবেকহীনতা প্রকট হইতেছে; আবার অন্যদিকে আমাদের সর্বসাধারণের উন্নতিসাধনে অপারগতার জন্য গণচিত্তের বিক্ষোভ। এ অবস্থা আজ গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই নৈরাশ্যের মূল কারণ সুশিক্ষাবিস্তারের অভাব। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ গভীর চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, সর্বাগ্রে চাই শিক্ষা; যতদিন পর্যন্ত দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার না হইবে, যতদিন পর্যন্ত তাহারা ভালভাবে খাইতে পরিতে না পাইবে, এবং যতদিন পর্যন্ত তাহাদের যত্ন লওয়া না হইবে, ততদিন পর্যন্ত দেশ উন্নত হইবে না। আজ ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে ন্যস্ত, এদেশের জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, আমাদের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় থাকিবে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য

সম্বন্ধে শিক্ষার স্থান এবং সেই সঙ্গে থাকিবে বিদ্যার্থীদের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করিবার প্রয়াস। জনসাধারণকে জাতীয় শিক্ষা দিতেই হইবে, কারণ জনসাধারণই সমস্ত শক্তির উৎস। তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিলে দেশেরই সমূহ ক্ষতি।

ভারতকে আজ জাগিতে হইবে, তাহার নিজস্ব আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক জীবন লইয়া, কেবল নিজের কল্যাণের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য। কারণ, এক-পৃথিবী গঠন আজ একান্ত কাম্য, যাহাতে মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারে এবং মানবসভ্যতা যাহাতে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিতে পারে, বিশ্বপ্রেমকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে। একমাত্র ভারত, একমাত্র ভারতই আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিক উন্নতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া জগতের সম্মুখে সে উদাহরণ স্থাপন করিতে পারে।

আজ আমাদের জনগণের বস্ত্রাভাব ও অন্নাভাব নিবারণের জন্য নিজেদেরও স্বেচ্ছায় স্বল্প অন্নবস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, অভিজাত শ্রেণীর ঘৃণাস্পদ, অস্পৃশ্য জনগণকে নিজের বুকে টানিয়া লইবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবেই; কিন্তু ইহার জন্য ধর্মকে বাদ দিয়া বা বাদ দিতে শিখাইয়া নয়, ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়াই। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে সেই 'ভারতের অর্ধনগ্ন ফকির'-এর কথা, যিনি ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত দেখা করিবার সময়ও স্বদেশের নিপীড়িত, অত্যাচারিত, দুঃস্থ, জনগণের একজন বলিয়া নিজেকে গৌরবের সহিত পরিচিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যেন 'কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত' হইয়া জগতের সম্মুখে সদর্পে বলিয়াছিলেন, "ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর," অথচ যিনি ধর্ম, সত্য, সংযম এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসকে জীবনের সর্বস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজনীতি পরিবর্তনশীল, কিন্তু খাঁটি মানুষ সর্বযুগে একই। আজ ভারত, তথা সমগ্র মানবসমাজকে এবং মানবসভ্যতাকে বাঁচাইতে হইলে এই ধরণের, আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক অথচ জাগতিক প্রয়োজন সাধনে প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল জীবনাদর্শের প্রয়োজন, যাহা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভ স্বরূপ হইবে। প্রকৃত পক্ষে আজ আমরা সভ্যতার এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, যখন মানুষ প্রকৃতির এতদিনকার চিহ্নিত সীমারেখা অতিক্রম করিয়া তাহার অলৌকিক বুদ্ধি ও কুশলতার বলে মহাকাশে পাড়ি দিতে পারিতেছে, এবং প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তিকে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আবার এই কালেই বিশ্বপ্রেমের বাস্তব রূপায়ণের প্রয়াসের সঙ্গেই মানুষের প্রতি মানুষের প্রবল অত্যাচার, অবিচার, নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনা এবং ক্ষুধিতদের হাহাকার গগন স্পর্শ করিতেছে, যাহার কোন তুলনা পাওয়া যাইবে না অতীতের ইতিহাসে। ইহার প্রতিকারকল্পে জগৎ আজ নানা রকম মতের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। আজ বিভিন্ন দেশ ও জাতি সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে এক সম্বন্ধে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সকলের সমস্যা ও তাহার সমাধানের চিন্তা সকলকেই স্পর্শ করিতেছে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক আমরা আজ এমন এক কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যখন নৈরাশ্যে ও হতাশায় আমরা অন্ধ। আজ আমরা পুরাতনের মূল্যবোধে আস্থা হারাইয়াছি এবং নূতন কিছুও ঠিক মতো গড়িতে পারিতেছি না। মানুষে মানুষে সহজ

সম্পর্কটুকু আমরা হারাইয়াছি, প্রত্যেকটি মানুষ পরস্পর হইতে এমন অসহায়ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যেন মহাসাগরের ব্যবধান। এই সাগরের ব্যবধান আজ কিভাবে ঘুচিবে এবং কিসের মন্ত্রে ঘটিবে আমাদের সেতুবন্ধ, এবং কোন্ মন্ত্রে মানবসমাজ কল্যাণমুখী ও সুখী মানব-সমাজে পরিণত হইবে, এই প্রশ্ন আজ মানব-সভ্যতারই প্রশ্ন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে বহু মানব, বহু-যুগমানব নানা পরিস্থিতিতে আবির্ভূত হইয়াছেন কল্যাণের বাণী, মৈত্রীর বাণী ও প্রেমের বাণী লইয়া। কিন্তু সর্বকালেই তাঁহাদের বাণী আমরা প্রথম প্রথম উপেক্ষা করিয়াছি, কিছুকাল গ্রহণ করিয়া পরে ভুলিয়া গিয়াছি। সেই বাণী লইয়াই আজ আবির্ভূত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। সভ্যতার ইতিহাসে মূল ভূমিকা যাহাদের, সেই তরুণসম্প্রদায় আজ সর্বাধিক বিভ্রান্ত এবং এই বিভ্রান্তিকে পুঁজি করিয়াই দেশে দেশে চলিয়াছে উগ্র ক্ষমতার লোভ ও ব্যক্তিস্বার্থের লোভ, যাহার ফলে এই তরুণ-সম্প্রদায় আজ প্রকৃত শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত। ফলে এই শ্রেণীর তরুণসম্প্রদায়ের ভিতর পুঞ্জীভূত হইয়াছে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, অপ্রেম, ক্ষোভ ও আক্রোশ। আজ তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈরাশ্যের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক সমস্যাগুলি দায়ী নিশ্চয়ই। কিন্তু মূল কারণ আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক শিক্ষা, যাহা মানুষকে অন্তর্মুখী করে, যাহা স্থিরচিত্তে সমস্যাসমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার সামর্থ্য দেয় তাহার অভাব। জনসাধারণের চারিত্রিক উন্নতির উপর নির্ভর করে জাতীয় চরিত্র। আজ যদি আমরা দেশের উন্নতি চাই, তবে সকলকেই সর্বাগ্রে চরিত্রগঠন করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সাহস, শক্তি ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি লইয়া জাতির আদর্শ—ত্যাগ ও সেবার প্রতি একনিষ্ঠ হইতে হইবে। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতাই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, জাতীয়জীবনের মূল সুর, সুতরাং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম আনিতে হইবে আধ্যাত্মিকতার প্লাবন যাহা স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে দেশের প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করিয়া তরুণ ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে স্বামী বিবেকানন্দের কালজয়ী বাণী, যে বাণী যুবক ও তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিবে তাহাদের দেশের কল্যাণের জন্য আত্মনিবেদনের এক মহান আদর্শে। দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যাহারা দারিদ্র্যের অভিশাপে, অশিক্ষার অন্ধকারে আজও ডুবিয়া আছে, অপর সকলের মতো মানুষ হইয়াও যাহারা নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নয়, তাহাদের কল্যাণই তো দেশের কল্যাণ, তাহাদের সেবাই তো দেশের সেবা। আজ তরুণ ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় আদর্শ ও নিঃস্বার্থ সেবার ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যুবসমাজের অপচীয়-মান প্রাণশক্তিকে কাজে লাগাইতে হইবে। আদর্শের অভাবে দিশাহারা ও ভ্রান্ত আদর্শে বিপথগামী যুবসম্প্রদায়ের ভিতরও রহিয়াছে যৌবনের অদম্য প্রাণশক্তি, উৎসাহ। প্রয়োজন শুধু উহাকে যথার্থ কল্যাণপথে পরিচালিত করা। যুবসম্প্রদায় চিরদিনই একটি আদর্শ চায়। তাহাদের সামনে আমরা জাতীয় আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারি নাই—পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেও নয়, জীবনের মাধ্যমেও নয়। আজ দুইটিই করিতে হইবে আমাদের। আমরা যদি তাহা করিতে পারি, তবেই ইহারাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও আধুনিক সব কল্যাণকর ভাবগুলির সংযোগসেতু নির্মাণ করিয়া ভারত ও জগৎকে বাঁচাইতে পারিবে।

প্রাণপুরুষ

'বৈভব'

জন্মহীন !
আজ তব শুভ জন্মদিন !
তোমারি তো জনম লাগিয়া
দুর্যোগের রজনী জাগিয়া
যুগ যুগ ধরে—অত্যাচারী কংসের কারায়
স্তব্ধ রুদ্ধ অন্ধকারে অসহ জ্বালায়
আছিল প্রতীক্ষারত সর্বংসহা ধরণী জননী !
মাঝে মাঝে ওই যেন ওঠে ঝনঝনি
দুঃসহ শিকল-ভার—
বহিতে পারে না আর,
তাই বুঝি কোমলা দেবকী
ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে কণ্টকি ।
শৃঙ্খলিত বসুদেব
শান্তরোষে ডাকে উর্ধ্বপানে—
'সময় হয়েছে পূর্ণ ?
এসো নামি —পৃথিবীর টানে !'
দিব্য জ্যোতির্ময় ।
শিশু ? শিশু এ তো নয়—
এ যে হাসিয়া হাসিয়া
ধ্যানের মূরতি সম আসিছে ভাসিয়া
সাধক-নয়নে,
যেথা পুঞ্জীভূত ব্যথা । যুগ-প্রয়োজনে
কান্নার সাধনা আজ উঠিল ফলিয়া
শত যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত আঁধার জঞ্জাল
কারাকক্ষে উঠিল জ্বলিয়া ।
ধরণীর চক্রবাল রক্তরাগে উঠিল ঝলিয়া !
—আসিয়াছে প্রাণের পুরুষ ।
আকাশেতে দিল দেখা আশার প্রত্যূষ !
আনন্দের দিব্য অরুণিমা—
নবীন গরিমা !

জননীর বক্ষ হ'তে
ছিন্ন মুকুলের মতো
ভাসিয়া চলিলে স্রোতে —
কর্মফলে ?
কিম্বা লীলাচ্ছলে—গোকুলের কোলে
শৈশবেই শুরু তব দুঃখময় খেলা :
জন্ম হ'ল রক্ষী-ঘেরা রাজার কারায়
বাড়িতে লাগিল বেলা—
রাজার প্রাসাদ হ'তে বহুদূরে
অতি দীন গোয়ালার পুরে
যেথা সবে আপনা হারায়—
জীবন যৌবন লয়ে করে হেলা ফেলা !
নন্দিত সে নন্দালয়ে হে আনন্দময়—
রাজার তনয় ।
খেলিলে রাখাল সাথে রাখাল হইয়া
ধবলী শ্যামলী আর যমুনা লইয়া ;
কভু চরাইয়া ধেনু,
কভু বাজাইয়া বেণু—সখারূপে
মূরলী-সঙ্কেতে—কভু চুপে চুপে
ডাকিলে আপনজনে আপনা বিলাতে—
মিলিতে মিলাতে
তোমার অরোধ্য মহা প্রেম-আকর্ষণে—
বৃন্দাবন-বনে ।
সরলা সে মহাভাগা গোপবালাগণ
তেয়াগিয়া কুলমান
নিবেদিল তনু মন প্রাণ
চরণে তোমার ।
প্রিয়তম জীবন-আধার,
হৃদয়ের ধন চিনিল তাহারা—

তাই তারা পাগলের পারা
সকল বাঁধনহারা।
তাহাদের শতকোটি জীবনের
সকল সাধনধারা—
ধ্যান জ্ঞান কর্ম প্রেম—
তোমাতেই লভিয়াছে শেষ পরিণাম;
তুমি পূর্ণ পরিতৃপ্ত চিরপূর্ণকাম!
তারা, সংসারের রুদ্ধদ্বার খুলি,
আপনার পতিপুত্র ভুলি
তোমারি অলংঘ্য টানে
তোমারেই করেছে বরণ,
হে চির-শরণ।

তোমারে ঘিরিয়া তারা
নাচিয়াছে জ্ঞানহারা—
অনুরাগে অভিমানে করিয়াছে সর্বস্ব অর্পণ।
তুমি দেখা দিলে শেষে
অন্তরে অপূর্ববেশে—কি জানি কেমন
সেই তব অতীন্দ্রিয় প্রেম-আস্বাদন।
তোমার সে বিশ্বগ্রাসী প্রেমবহ্নি মাঝে
সকলের সর্বকামনার করিলে হবন!
মুক্ত করি দগ্ধকামে
মুগ্ধ করি জিনিলে তাহায়,
দিলে তারে দিব্যভাবে নূতন জীবন,
মদনমোহন।
তাই আজো—
যত প্রাণে যত প্রেম প্রীতি ভালবাসা—
যত প্রাণে যত কিছু আকাঙ্ক্ষা ও আশা
—প্রিয়তম নয়ন-দীপ্তিতে,
প্রেমময় প্রাণের তৃপ্তিতে
তুমি আসি আগে ধরা দাও—
তবু তুমি রহ অদর্শন।

এ তোমার অপরূপ লীলার বিস্ময়
বুঝি ইহা বুঝিবার নয়!

তবু তব শুদ্ধপ্রেম-মাধুরী-লীলায়
সংসারের ঘরে ঘরে আনন্দ বিলায়,
ভাই বন্ধু সখা সখী—
স্নেহ প্রেমে মাখামাখি—
শিশু সাথে মায়েরে মিলায়,
তোমারি সে লীলার ছায়ায়
এ সংসার হেসে ভেসে যায়।
—তারি প্রতিধ্বনি
সাধক কবির কণ্ঠে
যুগ হ'তে যুগান্তরে ওঠে রণরণি।
বৈষ্ণব কবিতা—
তোমারি জীবনরসে ছন্দিতা নন্দিতা—
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে মহাপ্রেমসমুদ্রের পানে,
সংসারের বাসনা কামনা
সমলিন ধূলিকণা
ধুয়ে লয়ে চলে তার টানে।

শতভাবে দেখা দিলে—
ধরা দিলে তুমি,
সকলের তৃষিত হৃদয় চুমি
মিটাইলে সবার পিপাসা;
তবু কারো মিটে নাই আশা—
সে বুঝি বা মিটিবার নয়,
হে চির বিস্ময়।

আপনার জননী কাঁদায়ে—
শত শত গোপিকারে মা-ডাকে মোহিলে—
কাহারো বা পিপাসা বাড়ায়ে
বক্ষ হ'তে তুমি কাড়ি নিলে
কোটিজন্ম-সাধনার
সঞ্চিত সুধার ধার—বাৎসল্য রসের—
—সুমধুর পরিণতি দেহের মনের!
অনন্ত সে ধরা দিল সাস্ত হয়ে
মা যশোদা বাঁধিল তাহায়!

যার লাগি কত ভক্ত কত দিন রাত—
কত কষ্ট সয়ে—করে প্রাণ পাত,
যার লাগি তারা শুধু কাঁদিয়া কাটায়,
সেই তোরে—
জননী যশোদা দেখি
বাঁধিয়াছে শত স্নেহডোরে।
শুনি তুই চোর—
কারো ননী, কারো মণি,
কারো আঁখিলোর—
কাহারো বা মন বক্ষ চিরে
হরিয়া লয়েছ হরি—দাও নাই ফিরে।

হায়, ফুরাইয়া যায়—
মিটিল না কত সাধ আশা
পূরিল না কত ভালবাসা।
তবু হায়—সব আজ শেষ হয়ে যায়।
এসেছে অক্রূর—
যেতে হবে দূর মধুপুর।
সত্য কি ছাড়িয়া যাবে
এই বৃন্দা লীলা-সুমধুর ?
হে চির নিষ্ঠুর।
ওগো দয়াহীন, মায়াহীন, সর্বস্ববিলীন।
ভুলিয়া চলিলে সব মুহূর্তের মাঝে
বিসর্জিয়া প্রেমমূর্তিখানি মধু যমুনার জলে।
নির্মম পাষাণ তুমি, আসক্তিবিহীন—
প্রতিমূর্তি গীতার তোমার।
যার ধর্মে যার মর্মে
আছে শুধু অনন্ত অপার—
সকলের সম অধিকার—
প্রাণ ঢেলে মন ঢেলে ভালোবাসিবার।
হায় হায় নাই নাই—এতটুকু নাই
প্রাণ ধরে এতটুকু ফিরে চাহিবার!
নীরব নিষ্ঠুর সম গেলে চলে
ফিরে চাহিলে না—দেখিলে না।

কে বা পিছে রহিল বাঁধিতে—
শতবর্ষ বিরহের সাধন সাধিতে!
তুমি হে হৃদয়ময়—হে হৃদয়হীন,
কারে বাঁধিলে না,
কর্ণে শুধু বলে গেলে 'ফিরে আসিবে না';
মর্মে তার প্রতিধ্বনি :
বৃন্দাবন পরিত্যজি কোথা যাইবে না!
ওপারেতে দেখি তব
কর্মময় মূর্তিখানি রাজে—
চিরশান্ত, অশান্ত সে সংসারের মাঝে।

মথুরায় দ্বারকায়
রাজায় রাজায়—
কত না সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব—মহাদর্পী-দলে
নামাইলে সিংহাসন হ'তে ভুজবলে ;
কত কংস জরাসন্ধ ভয়ে টলমলে।
কেহ বা কহিল মন্দ, কেহ বসাইল মনোরথে,
বরমাল্য জয়মাল্য দিল তব গলে।

তুমি কিন্তু চির ধীর স্থির।
অটল অচল কর্মবীর—
আসমুদ্র হিমাচল উত্তর দক্ষিণ
পূর্ব হতে পশ্চিমের পানে—নিদ্রাতন্দ্রাহীন
মথিয়া চলেছ তুমি সারা পুণ্যভূমি—
কর্তব্যের সুকঠোর আমোঘ আহ্বানে
দুরন্তের অন্তের বিধানে!
চূর্ণ শত স্বপ্নমায়া শূন্য বৃন্দাবন,
কত রাজা কত রাজ্য কত সিংহাসন
ভাঙিল গড়িল তব অঙ্গুলি-হেলায়
এই তব নবতম জীবন খেলায়—
দিনেকের শান্তি নাই, নাই অবসর ;
ওগো বীরবর,
ভারতের হে প্রাণপুরুষ,
বিনাশিতে যুগের কলুষ

আপনার জীবন আগুনে—
পবিত্র করিতে পৃথ্বি
স্থাপন করিতে এক
শান্তিময় ধর্মরাজ্য জগত মাঝারে—
ভিখারীরে রাজা করি,
ভিক্ষুবেশে সাজালে রাজারে!
সারাটি জীবন দেখি,
সিংহাসন লয়ে তব কত ধূলাখেলা
তবু—
সিংহাসনে উঠিলেনা কভু—যেন মাটিঢেলা;
তুমি যোগী, রাজরাজ,
সর্বত্যাগী, তাই সর্বপ্রভু।

তারপর ঘনায়ে আসিল মেঘ—
বাড়িতে লাগিল বায়ুবেগ,
ঘন ঘন বিজলী চমকে—
ভারতের আকাশেতে
বহে ঝঞ্ঝা থমকে থমকে!
সেই দিন সে যুগ-সন্ধ্যায়—
ভারতের আকাশেতে
জ্বলে যায় শতসূর্য প্রায়—
শত রাজা শত যোদ্ধা শত অক্ষৌহিণী
ধ্বংস উন্মুখিনী।
আসন্ন মহাপ্রলয়!
'রক্ষা কর, রক্ষা কর'—হাঁকে জীবচয়!
সারা পৃথ্বী ভয়-কণ্টকিত—
কে রোধিতে পারে এই মৃত্যু অবহিত?
নাই নাই কোন আশা—কোন ভাষা নাই।
যুগান্তে এ প্রলয়ের প্রয়োজন—
আয়োজন তাই।

শত নিরাশার মাঝে তরী
দুলে দুলে যায় ডুবে বুঝি
সেখানেও দেখি তুমি,
হে ধীর কাণ্ডারী বীর চলিয়াছ যুঝি!
একাকী ধরিয়া হাল
শতছিন্ন উড়াইয়া পাল—
ধ্বংস জানি অতি সুনিশ্চিত।

তাই দেখি দর্পী রাজা দুর্যোধন
অপমান করিল তোমায়—
অতি দীন দূতবেশে যবে তুমি
উপনীত কৌরব-সভায়।
শান্তির লাগিয়া তব কত চেষ্টা—
যুদ্ধের বিরোধী,
তবু সবে বলে হায়—তোমায় সম্বোধি,
'কুরুক্ষেত্র ঘটাইলে তুমি,
কুলশূন্য বীরশূন্য হ'ল পুণ্যভূমি'—
সেই ঘোর অশান্তির লাগি
তোমারেই করে তারা দায়ী!
রিক্তহস্তে সিক্তপ্রাণে
ফিরে এলে তুমি শান্তি মাগি
হে চিরউপায়ী,
আজ তুমি নিরুপায় শান্তি-স্থাপনায়!

যবনিকা উঠিল আবার। শেষ দৃশ্যপট!
ওই যেন আজো দেখা যায়—
দাঁড়ায়েছে দুইধারে কাতারে কাতার!
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
মারণ-মুখিনী।
গভীর বিষাদবায়ু করে থম থম,
গম্ভীর প্রলয়-মেঘ করে জম জম,
শান্ত স্থির নিষ্কম্প নীরব
রথরথী গজ-বাজী সব।
তার মাঝে ধীরে—অতি ধীরে
প্রবেশিলে কুরুক্ষেত্র-রঙ্গমঞ্চ 'পরে
কপিধ্বজরথে, শ্বেত-অশ্ব-বল্গা ধরি করে
অস্ত্রহীন অতিদীন সারথির বেশে
অর্জুনের রথে।

কিন্তু তার মনোরথে ?
তুমি তার গুরু, তার সখা—
তুমি তার সারথি সুন্দর
চির মনোহর।

ক্লীবতাকে দূর করি তার—
দেখাইতে বিজয়ের পথ,
চালাইতে জীবনের রথ—
দিলে তুমি দেখা—সখা ও সারথিরূপে
অতি চুপে চুপে।
যেই করে যে অধরে একদিন বৃন্দাবন-বনে
বেজেছিল মুরলী মধুর
মিলনের সঙ্কেত-নিঃস্বনে,
সেই করে সে অধরে
কুরুক্ষেত্র সমর-অঙ্গনে
রুদ্ররোলে ফুকারিয়া উঠিল রে আজ—
ওকি অগ্নিময় বাজ!
উড়াইয়া ধ্বংসের নিশান
ঈশান বিষাণ
—প্রলয়ের পাঞ্চজন্য—
বাজিলরে কার জন্য!
বিদীর্ণ করিয়া বক্ষ মাতাইল বীরের পরাণ।
যুগান্তের প্রলয়-লীলায়
বহ্নি ফুটে বাহিরায় শিলায় শিলায়।

স্তব্ধ করি যুদ্ধোত্থিত
সেই ঘোর প্রলয়-কল্লোল
গীতাসিংহনাদ তুমি করিলে গর্জন।
টুটে যায় মোহনিদ্রা—
সে আঘাত ক্লীবতার বিষম অঙ্কুশ,
হে কালপুরুষ।
ভুলায়ে কি শক্তিবলে মোহিনীমায়ায়
মাতাইলে সবে
সৃজন পালন ভুলি প্রলয়-আহবে ?

সেই ঘোর রণ-উন্মাদনা—
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—তারি মাঝে
অবোধ্য অশ্বের বল্গা
সবিক্রমে এক হাতে টানি
শান্তভাবে অন্য হাতখানি
অর্জুনেরে পরশিয়া রাজে।
চূর্ণ করি তার শত হীন অবসাদ;
দূর করি ক্লীবের বিষাদ—
উৎসাহিত করি কহে :
"মাতো এই মরণের মহা-মহোৎসবে।
ওই দেখ, উন্মুক্ত স্বর্গের দ্বার—
ডাকিতেছে বারংবার।
দাও দাও সাড়া দাও—বলো 'যাই যাই'।
এই এক পথ আছে, অন্য পথ নাই।
যুদ্ধ ছাড়ি যশোহীন মৃত্যুর জীবন—
সে নহে তোমার মতো বীরের কখন।"
দেখাইলে জ্ঞানময় মূরতি তোমার
গুরুরূপী করুণার অনন্ত আধার।
ঘুচাইলে সব অন্ধকার—
শুনাইলে চির সত্য
জ্যোতির্ময় আত্মতত্ত্ব :
'কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি?
এই দেখ, আমি মারি—আমি সব করি।'
দেখাইলে অপূর্ব সে বিশ্বরূপ দিগন্ত ব্যাপিয়া
অসীম সুন্দর, তবু সীমার লাগিয়া
কাঁপে প্রাণ ভয়ে অনুরাগে ;
অরূপের পারে তাই রূপ ফিরে জাগে।

গীতার সে বজ্রধ্বনি মহাসিংহনাদ—
সেই সৈন্য-সিন্ধুবক্ষ তরঙ্গিয়া করিল উন্মাদ।
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সে মহা আহবে
মাতিল বীরেন্দ্রবৃন্দ
মরণের মহামহোৎসবে।
কী কল্লোল কলরোল

প্রলয়ের তীব্র জলোচ্ছ্বাস।
বিষাক্ত করিছে বায়ু
প্রধূমিত নিশ্বাস প্রশ্বাস।
সে উন্মত্ত চাঞ্চল্যের মাঝে
মরুভূর নিস্তব্ধতা রাজে—
দেখি তুমি অতি শান্ত, অতি ধীর স্থির।
অনন্ত প্রশান্তি মাঝে
অবিশ্রান্ত কর্মময়—তুমি কর্মবীর।
আজো যেন কানে বাজে :
কর্ম কর, যুদ্ধ কর, সহ্য কর হে প্রিয় অর্জুন,
অতিক্রমি কর্ম জ্ঞান
লঙ্ঘি চল সত্ত্ব রজোগুণ।
আর, কিছু যদি নাই পারো
সর্বধর্মকর্ম কর আমাতে অর্পণ,
একান্ত এ নির্ভরতা—
এই সাধ্য, এই তো সাধন ॥

সব শান্ত, সব শেষ,
শুধু হাহাকার—
শুধু কানে আসে—সকরুণ রোল—
বিধবার অভিশাপ—
বিষাক্ত নিশ্বাসে জলিয়া পুড়িয়া যায়
সমর-বাড়বানলে যাহা অবশেষ।
সেই মহাযুগান্তের যত পাপ তাপ
আপনার পানে তুমি
নিলে টানি—সব অভিশাপ।
নবতম শান্তিরাজ্য স্থাপন-কল্পনা—
তাহারি রচনা
এখনও রয়েছে বাকী জীবনের কাজ ;
হে নির্লিপ্ত রাজরাজ,
তাই তুমি চলিলে আবার
শেষ তব বিজয়াভিযানে,
সাথী তব চিরসখা—
দক্ষিণ বাহুর মতো অর্জুন সুজন।

ভারতের পূরবে পশ্চিমে
উত্তরে দক্ষিণে
সর্বত্র উড়ায়ে তব বিজয়-নিশান
ফিরে এলে শুভদিনে
করিবারে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান—
শেষ ব্রত তব জীবনের ;
যুধিষ্ঠিরে প্রতিষ্ঠিত করি সিংহাসনে
দিলে তারে রাজধর্মজ্ঞান !
মানব-বিধানে তুমি
বেঁধে দিলে ভারতের সীমায় সীমায়
এক শান্তি-ধর্মরাজ্যপাশে
ধ্বংসশেষে স্বীয় মহিমায়
নব গরিমায়।
হে যুগমানব,
তার প্রাণে অভিষিক্ত করি গেলে তব
অফুরন্ত প্রাণবারি হে প্রাণপুরুষ !

কত কাল গেছে কাটি সে প্রত্যূষ—
সে এখন অন্ধকারে
বিস্মৃতির পাষাণ-শিলায়—
তোমার সে অপরূপ অমানুষী মানুষী লীলায়
কেহ বলে কবির কল্পনা
অর্ধনগ্ন ঋষিদের বাতুল রচনা।
আমি দেখি ভারতের বুকে
আজো জেগে আছে—
তোমার সে শেষ-দেওয়া প্রাণের স্পন্দন—
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে যুগ হতে যুগান্তর পানে।
যতনে জড়ায়ে বুকে
সেই সুখে, যাহা সে পেয়েছে তব কাছে—
তাই লয়ে চলিয়াছে, তাই লয়ে রচিয়াছে
মাঝে মাঝে এই মর্ত্যে অমর-নন্দন।
আরো জানি,
চলিছে চলিবে চিরকাল—তব পুণ্যটানে—
তব নামে—তব লীলাতানে

তব জয়গানে
ভরিয়া এ ভারত-আকাশ
ছড়ায়ে পড়িবে ধীরে—
সে ভাঙিবে বিশ্বের বন্ধন !
সারা বিশ্বে বাঁধা হবে এক প্রেমপাশ
তারি লাগি তোমারি প্রকাশ।
তোমারি সে সুর
স্পন্দিত নন্দিত আজো, করে ভরপুর
এ শান্ত সুদুর !
তোমার সে ঊষারাগে
আজো দেখা যায়
যুগান্ত-সন্ধ্যায়
পশ্চিমের সকরুণ প্রমত্ত লীলায়—
ঊষার সে প্রতিচ্ছায়া অনুরাগ-ফাগে
সন্ধ্যার গগনে—
সৃষ্টির সে শেষমায়া—প্রলয় লগনে
বিদায়ের ক্ষণে।

*

পুনশ্চ প্রভাস তীরে—ধ্বংসের লীলার
মাঝে—দেখি তুমি
চিরশান্ত চির নির্বিকার।
আপনারি সৃষ্টিধ্বংসে আপনিই হাসো—
তুমি কাল। ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপে আসো।
তুমি কৃষ্ণ, কি সুন্দর ; নবতম সৃজন লাগিয়া
ধ্বংসের প্রলয়-রাত্রি
রহ একা নীরবে জাগিয়া।

*

আরো এক নবতম বিকাশের লাগি,
এ ধরা অধীর—
ধরা দাও ধরা দাও—হে প্রাণপুরুষ
প্রাণময় বীর।
ধরণীর ব্যাকুল আহ্বান—
আর বার কবে পুন
টলাইবে তোমার পরাণ
কবে পুন ধরা দিবে হে প্রিয় নিঠুর—
মাধ্যন্দিন যুগের প্রভায়
প্রমত্ত এ পৃথিবীর কৌরব-সভায়—
কবে সবে চিনিবে তোমায়—
সেই তুমি—তুমি কৃষ্ণ,
তুমি তার প্রাণের ঠাকুর !

*

কালচক্র ঘুরে আসে—
ফিরে আসে কুরুক্ষেত্র—আসন্ন প্রলয় !
পৃথিবী ভরিয়া আজো সেই হাহাকার
অবিচার অত্যাচার—পূর্ণ কারাগার ;
কণ্টকিত সর্ব মন—
হে দর্পী তাপন
কোথা তুমি আজ ?
ওগো রাজরাজ।
সময় হয়েছে পূর্ণ ?
আর বার এস পুন
ওই শুন প্রলয়ের রবে—
আবার মাতিছে বিশ্ব ধ্বংস-মহোৎসবে।

*

সারা বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ—এবার তোমার
বিশ্বসাম্য তরে তব এবার প্রকাশ !
ত্যাগ প্রেম করুণার ধারা
বরষিয়া হউক এবার
বিশ্ব-সাম্যরাজ্য সংস্থাপন—
সুন্দর শোভন
অপূর্ব বিকাশ—স্বপ্নময় সে শুভ ঊষায়—
সেখানে মানুষ হবে প্রকৃত মানুষ,
হে প্রাণপুরুষ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মানবজীবনকে স্পেন্সার যে পাঁচটি কার্যকরী শক্তির দ্বারা ভাগ করেছেন, তার প্রথমটি 'আত্মরক্ষা মূলক। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা অর্থে প্রধানতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা বোঝালেও ব্যাপক অর্থে জীবনের সর্বপরিস্থিতির উপযুক্ত হওয়াই উদ্দিষ্ট। এ বিষয়টি নিয়ে স্পেন্সার তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে (শারীরিক শিক্ষা) বিশদ আলোচনা করলেও প্রথম অধ্যায়েই কিছু প্রণিধানযোগ্য কথাও বলেছেন।

স্পেন্সারের মতে আত্মরক্ষার আয়োজন স্বয়ং প্রকৃতিই অনেক পরিমাণে করে থাকেন। "...... সুখের বিষয় যে, শিক্ষার সর্বোচ্চ অঙ্গ আত্মরক্ষা প্রকৃতি আমাদের হস্তে সম্পূর্ণ ন্যস্ত করেন নাই।"[১] একটি ছোট্ট শিশুও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মায়ের কোলে মুখ লুকোয় অপরিচিত কোন মানুষ বা প্রাণী থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। "প্রকৃতি এই প্রকারে প্রথম শিক্ষায় আমাদের সহায় হওয়াতে এ বিষয়ে আমাদের যত্নের অল্পই আবশ্যক। আমাদের উচিত কেবল দেখা যে, এই প্রাকৃতিক শিক্ষা কোন প্রকারে ব্যাহত না হয়। অনেক অল্পদর্শী শিক্ষক এবং পিতা-মাতা সন্তানকে সকল প্রকার ক্রীড়া হইতে বিরত রাখিয়া প্রাকৃতিক শিক্ষার ব্যাঘাত করিয়া এমন অবস্থা করিয়া তুলেন যে, ভবিষ্যতে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সেই সকল সন্তান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।"[২]

শীতাতপ, ক্ষুধাতৃষ্ণা—এসবই প্রকৃতি আমাদের নানা সংকেতের মাধ্যমে জানান দিয়ে থাকে। তবু, অনেকসময়ই এদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ার ফলে অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ তো প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। তার কারণ শারীরশিক্ষার প্রতি আমাদের শিক্ষা-দাতাদের মনে মনে একটু অবজ্ঞার ভাব রয়ে গেছে। আসলে ব্যাধির প্রতিকার করতে যে উদ্যম দেখা যায়, যাতে ব্যাধি আদৌ না হয়, সে বিষয়ে সে উদ্যমের শতাংশের একাংশও দেখা যায় না। অসুস্থতা থেকে মুক্ত হওয়া যত সহজ, অসুস্থতার পরে সেই পূর্বজীবনীশক্তি ফিরে পাওয়া তত সহজ নয়। সুতরাং সব শিক্ষার গোড়ায় রয়েছে দেহগত সমুন্নতি। স্পেন্সার তো স্পষ্ট বলছেন—"যদি প্রচুর স্বাস্থ্য ও তদানুষঙ্গিক উন্নত মানসিক প্রবৃত্তি সুখোৎ-পাদনের প্রধান সহায় হয়, তাহা হইলে যে শিক্ষা উক্ত বিষয় পরিরক্ষণ করে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, শরীর, বিদ্যা, স্বাস্থ্য এবং মানব-জীবনের দৈনিক ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা দেয়, তাহা সকল ন্যায্য শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান অঙ্গ।"[৩] "We infer that as vigorous health and its accompanying high spirits are larger elements of happiness than any other things whatever, the teaching how to maintain them is a teaching that yields in moment to no other things whatever. And therefore we

---

১, ২ শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত : 'বসুমতী' প্রকাশিত শ্রীশশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ : পৃ : ১৪-১৫

৩ তদেব : পৃ : ১৮

assert that such a course of physiology is needful for the comprehension of its general truths, and their bearing on daily conduct is an all-essential part of rational education."[৪] স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের এ বক্তব্য সম্বন্ধে আগেই আমরা বিশদ আলোচনা করেছি।

স্বামীজীর অনুবাদের আর একটু অংশ উদ্ধৃত করে আমরা স্পেন্সারের শিক্ষা বিষয়ক প্রথম সূত্রের আলোচনা শেষ করি—"পুত্র কি প্রকারে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের লোকদিগের কুসংস্কারের বিষয় শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে তাঁহাদের (অভিভাবকদের) কত যত্ন! অথচ আপনার শরীর কি প্রকারে চালিত, পুষ্ট ও রক্ষিত হইতেছে, তাহা শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত অনুপযুক্ত মনে করেন।"[৫]

সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে উদ্ধৃত মন্তব্য এখানেও প্রয়োগ করা চলে। স্পেন্সার যে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রাধান্য চেয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপর। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসার আমাদের শিক্ষিত সমাজকে এ বিষয়ে কতটা সতর্ক করতে পেরেছে, তা সন্দেহের বিষয়।

স্পেন্সার আমাদের কার্যকরী শক্তিগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করবার সময় দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন—"যে সকল কার্য অপরোক্ষভাবে জীবনোপায়-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা করে।"[৬] সমসাময়িককালের বৈজ্ঞানিক উন্নতি-অনুযায়ী স্পেন্সার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আমাদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে কীভাবে সহায়তা করে তার আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূতত্ত্ববিদ্যা, 'বিয়লজি' (Biology) বা জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান—এ সমস্ত বিষয়ের চর্চা তখনকার ইংল্যাণ্ডে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে অতি অল্পই দেখা যেত। অথচ জীবিকা ও জীবনের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ের জ্ঞানেরই প্রয়োজনের দিক থেকে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।[৭] উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন্সার ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-চিন্তায় বিজ্ঞানের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সে প্রাধান্য কিন্তু এখনও সে দেশে দেখা দেয়নি। বিজ্ঞানকে জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ জেনেও সকলেই বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে ঝুঁকতে পারে না। মানবমানসের প্রকৃতিগত তারতম্য এবং জীবনোপলব্ধির বিভিন্ন স্তরকে কেবল উপযোগিতার মানদণ্ডে বিচার করা চলে না। তবু নবযুগের শিক্ষা-পরিকল্পনায় স্পেন্সারের অনুবাদক স্বামী বিবেকানন্দও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানশিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দিতে চেয়েছিলেন। চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মকে স্বামীজী একই সত্যের বিভিন্ন দিকরূপে নির্দেশ করলেও ভারতবর্ষের বর্তমান প্রয়োজনে বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা স্বামীজী নানাভাবেই নানা জনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' ও 'স্বামীজীর কথা' বই দুইটিতে লিপিবদ্ধ মন্তব্য-গুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকরী শক্তির তৃতীয় সূত্র স্পেন্সারের মতে "যাহার দ্বারা সন্তানপালন নিষ্পন্ন হয়।'[৮] এক্ষেত্রে স্পেন্সার তাঁর সমকালীন শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে একটু

৪ Education : Spencer : 1st. Edn. p 16-17

৫ শিক্ষা : পৃ : ১৯

৬ তদেব : পৃ : ১০

৭ তদেব : পৃ : ১১-১৯

৮ শিক্ষা : পৃ : ১০

পরিহাসচ্ছলে বলেছেন, "We come now to the third great division of human activities—a division for which no preparation whatever is made. If by some strange chance not a vestige of us descended to the remote future save a pile of our school-books or some college examination-papers, we may imagine how puzzled an antiquary of of the period would be on finding in then no sign that the learners were ever likely to be parents. I perceive here an elaborate preparation of many things ; especially for reading the books of extinct nations and co-existing nations (from which indeed it seems clear that these people had very little worth reading in their own tongue) ; but I find no reference whatever to the bringing up of children. They could not have been so absurd as to omit all training for this gravest possibilities. Evidently, then, this was the school-course of one of their monastic orders."[৯]

স্বামীজীর অনুবাদ—"এক্ষণে মানবীয় কার্যের তৃতীয় বিভাগ দেখা যাউক। মনে করুন, কোন ঘটনাবশতঃ আমাদের আধুনিক অবস্থার সমস্ত চিহ্নই বিনষ্ট হইয়াছে। কেবল রাশীকৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মনে করুন, সেই সময়ের একজন পুরাতত্ত্ববিৎ ঐ প্রকার কতকগুলি পত্র পাইয়া পত্রের সমসাময়িক লোকদিগের শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রশ্নাবলী দেখিয়া ভাবিবেন যে, "দেখিতেছি, বহুবিধ প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষা-শিক্ষার বিবিধ প্রকার আয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু সন্তানপালন সম্বন্ধে তো কোন শিক্ষাই দেখিতেছি না—অতএব বোধ হয় যে, এই সকল পত্র ইহাদের কোন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের হইবে।"[১০]

স্পেন্সার পরিহাসচ্ছলে যে প্রশ্ন তুলেছেন, সে প্রশ্ন আধুনিক কালের শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে Home Science বা Domestic Hygiene-জাতীয় কিছু ব্যবস্থা থাকলেও পুরুষ-ছাত্রদের ক্ষেত্রে সন্তানপালন সম্বন্ধে কোনো স্তরেই কোনো আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব মায়ের চেয়ে বাপের কিছুমাত্র কম নয়।

সন্তানের শারীরিক বা মানসিক কোনো স্তরই অবহেলার যোগ্য নয়। স্পেন্সার প্রশ্ন করেছেন, অঙ্কে অনভিজ্ঞ লোক যদি ব্যবসা শুরু করে, তাহলে লোকসমাজে তার আচরণ হাস্যকররূপে দেখা দেয় কি না। অথচ সংসার-সমাজে সন্তানপালন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকেরাই সন্তানদের লালন-পালনের ভার নিতে বাধ্য হন। ফলে পিতামাতার ভূমিকায় অধিকাংশ অপটু গৃহস্থ সন্তানদের জীবনে অশেষ দুর্গতির কারণ হয়ে থাকেন।

ব্যক্তিগত জীবনে নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) পিতা বিশ্বনাথ ও মাতা ভুবনেশ্বরীর কাছে তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষা-বিষয়ে নানাভাবে ঋণী। দেহাবসানের আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব লিখে

৯ Education : Spencer : p 25

১০ শিক্ষা : পৃ : ২৭-২৮

জানিয়েছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দেবে।' অবশ্য সে শিক্ষা সাধারণ অর্থে সন্তানপালনের শিক্ষা নয়। তবু, শিশুকে যে আশৈশব শ্রেষ্ঠ ভাবের দ্বারা ইতিমূলক (positive) শিক্ষা দিতে হবে—একথা স্বামীজী রাণী মদালসার গল্পের দ্বারা বুঝিয়েছেন। আপন শিশুসন্তানদের দোল দেবার সময় রাণী মদালসা শোনাতেন, তুমি সেই পরম সত্য—'ত্বমসি নিরঞ্জন।'[১১] এই ভাবাদর্শগত শিক্ষার বাইরে প্রতিদিনের জীবনচর্যায় শিশুপালন সম্বন্ধে স্বামীজী বিস্তৃতভাবে কিছু লিখে যেতে পারেননি।

সন্তানের শিক্ষা-সম্বন্ধে অসচেতন জনক-জননীর উদ্দেশে স্পেন্সারের ভর্ৎসনার অনুবাদে স্বামীজীর নৈপুণ্য হয়তো অনেকটাই এ বিষয়ে তাঁর ও স্পেন্সারের মতৈক্যের দরুন—"হায়! হায়! জগতে যত দুর্বলতা, যত ভীরুতা, যত দারিদ্র্য, যত পাপ বর্তমান, প্রায় সেই সমস্তেরই কারণ তোমরা মূর্খ পিতামাতা! কি গুরুতর ভার তোমাদের উপর বিন্যস্ত, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না! তোমরাই তো সন্তানের ভাবী জীবন! তোমরাই তো তাহার জীবনের নেতা! চিন্তাবিহীন মূর্খ পশুর ন্যায় বিলাস চরিতার্থ, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে সকল মনুষ্য সন্তানোৎপাদন করিতেছে, তাহারা ভবিষ্যৎ কি একবারও ভাবিবে না? আপনাদিগের অন্ধতায় মনুষ্যবংশে পুরুষানুক্রমে কত শত শারীরিক, কত শত মানসিক ব্যাধি প্রবিষ্ট করাইতেছে, একবারও কি তাহা দেখিবে না?"[১২]

বর্তমানে যখন শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র ও শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে দেশবাসী চিন্তিত তখন ছাত্রদের অভিবাবক—বিশেষতঃ পিতামাতার ভূমিকা সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা প্রয়োজন। পিতামাতার যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র শিক্ষকদের উপরে নির্ভরতা আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টির অপূর্ণতার ফল। আদর্শ জনক-জননীর সন্তানেরাই বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা আশুতোষ হয়েছেন। (ক্রমশঃ)

১১ ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা: ভারতে বিবেকানন্দ: বাণী ও রচনা: ৫ম খণ্ড: পৃ: ১৩৪-১৩৫

১২ শিক্ষা: পৃ: ৩০

স্বয়ম্ভু শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু

শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা হইয়া উঠিল না। খোড়ো চালাঘরে পাঠশালার পাঠ শেষ করিতে না করিতেই তাঁহার মনে এমন সব প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল যাহার উত্তর না ছিল কোনো পাঠ্যপুস্তকে, না কোনো পণ্ডিতের বুদ্ধিতে। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁহার শিশুমনই সেসব প্রশ্নের উত্তর দিল। কেন লেখাপড়া শিখিব?—খাইয়া-পরিয়া বাঁচিবার একটা উপায় হইবে বলিয়া। কিন্তু উহাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? শুধু খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই জীবন? জীবনের আসল উদ্দেশ্য কি এপথে সিদ্ধ হইবে? না। এই সিদ্ধান্তে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ লেখাপড়া শিখিবার জন্য কোনো উৎসাহ-ই বোধ করিলেন না। এ সব প্রশ্ন যে পৃথিবীর আর কোনো ছাত্রের মনে এ বয়সে কখনো উদিত হইতে পারে না, তা নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আর সকল পড়ুয়ার পার্থক্য এই যে, অন্য সকলেই বেকায়দা প্রশ্নকে এড়াইয়া জিজ্ঞাসু মনের সঙ্গে কাজ চালাইবার মত একটা আপস রফা করিয়া জীবনের অসঙ্গতিকে গোঁজামিলে ঢাকিয়া ঢুকিয়া কোনোমতে আপনার কাজ গুছাইতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাহা করিতে চাহিলেন না। এই ধরনের শিক্ষার পথে তিনি এক পাও অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। শৈশবেই তিনি জীবনের শেষ উদ্দেশ্যকে খুঁজিতে লাগিলেন।

সংখ্যার উপর সংখ্যা রাখিয়া নামতা কষিয়া হিসাবের অঙ্ক সাজাইতে তাঁহার মনে ধাঁধাঁ লাগিয়া যাইত। জীবনের প্রত্যূষকাল হইতেই তাঁহার সুকোমল অন্তর সকল হিসাবের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত হিসাব-বহির্ভূত জগতের প্রান্তে গিয়া উপনীত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে স্কুল, পাঠ্যপুস্তক পণ্ডিতমশায় এবং পড়ুয়াদল তাঁহার জীবন হইতে চিরতরে সরিয়া গেল—তিনি প্রায়-নিরক্ষর রহিয়া গেলেন। আঠারো শো ছাপান্ন খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে পূজকের কাজ গ্রহণ করেন তখন তিনি তরুণ যুবক, উদ্ভিন্নযৌবন, বয়স বিংশতি বৎসর। তাঁহার দেহ সুগঠিত, বাহু আজানুলম্বিত, মুখমণ্ডল সরলতার স্নিগ্ধ লালিত্যে ঢলঢল—অথচ বিদ্যাশিক্ষার পুঁজি ঐ পাঠশালার গণ্ডী অতিক্রম না-করা পর্যন্ত। জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকুমার এই বিদ্যাহীন বালকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেন। ক্রূর কুটিল ঘাতপ্রতিঘাতের গ্লানিভরা এই পৃথিবীতে সে কেমন করিয়া বাঁচিবে, কঠোর প্রতিযোগিতার হানাহানিতে রক্তাক্ত আমাদের এই সমাজে কোথায় তাহার স্থান, কোথায় সে দাঁড়াইবে, কি করিয়া খাইবে—পিতৃসম জ্যেষ্ঠ সহোদরের পক্ষে এ চিন্তা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো উদ্বেগ ছিল না।

নানা দায়ে পড়িয়া জগতের মানুষকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়। জ্ঞানলাভ করিয়া মনের নানা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার দায়, নামযশপ্রতিষ্ঠা-লাভের দায়, গাড়ী ঘোড়া করিবার দায় বা নিছক পেটের দায়—যে সব দায় ঘাড়ে লইয়া মানুষ স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বা টোল তোলপাড় করিবার

কাজে লাগিয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তো ইহার কোনোটির কাছেই ঘাড় পাতিলেন না। ফলে, আমাদের বিদ্যার জগৎ তার প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি অভিমান ও গর্ব লইয়া যতই মাতামাতি করুক, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তার কোনোই জোর খাটিল না। সহোদর রামকুমার চিন্তিত হইলেন। পাড়াপ্রতিবাসী আত্মীয়েরাও হয়ত দুঃখ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন হৃদয়বান তীক্ষ্ণধী বালক কেন যে লেখাপড়ায় পরাঙ্মুখ হইয়া নিজের ভবিষ্যতের প্রতি এমন উদাসীন হইয়া রহিলেন তাহার কারণ সকলের কাছেই অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা তো হইল-ই না—দশজনের মধ্যে থাকিয়া দশজনের সঙ্গে কাজকর্ম করিয়া যে বিষয়বুদ্ধি হয় তাহাও হইল না। বড়ো মানুষ, কৃতী মানুষ—বিষয়-সম্পদ নাম-যশের চূড়ায় বসিয়া যাঁহারা সমাজের দিক নির্ণয় করেন এবং যাঁহাদের সঙ্গ পাইলে আমরা নিজেদিগকে ধন্য মনে করি তেমনি সব মানুষ দেখিলে তিনি ভয়ে লুকাইতে চাহিতেন। এ হেন মানুষকে সমাজ কোন দৃষ্টিতে দেখিবে? কোনো সমর্থ তরুণ যুবক লেখাপড়া বিসর্জন দিয়া সমাজসংসারের মানুষের সঙ্গ পরিহার করিয়া পূজক ব্রাহ্মণের কাজ করিতেছে দেখিলে আজ সমাজে তাহার যে মূল্যায়ন হইবে, একশতাধিক বৎসর পূর্বে সমাজে কি তাহার মূল্যায়ন খুব বেশী ছিল? কিন্তু লোকের কোন কথা, তাহাদের দৃষ্টির কোন গ্লানি শ্রীরামকৃষ্ণের মনকে স্পর্শও করিতে পারিল না। তিনি ধীরে ধীরে আপনার ভাবের অতলে তলাইয়া গেলেন।

অর্থাৎ মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা—কোনোটিই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কোনো কাজে আসিল না। প্রচলিত সকল বিদ্যা ও সকল সংস্কার বর্জন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যে সেদিন আমাদের চোখে অশিক্ষিত, অসামাজিক রহিয়া গেলেন, সমগ্র মানবজাতির সৌভাগ্যের পক্ষে ইহার যে কি প্রয়োজন ছিল, কত দুরবগাহ, কত গভীর ছিল ইহার তাৎপর্য—আজ ধীরে ধীরে তাহা জগতের মানুষের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার জগৎ আলোড়িত করিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় চলিতেছিল। নূতন বিজ্ঞানচেতনা এবং বুদ্ধিশীলতা নিরঙ্কুশ আনুগত্যের দাবী উত্থাপন করিয়া মানুষের আধ্যাত্মিকতার সহিত প্রবল দ্বন্দ্বে মত্ত হইয়া উঠে। ঝটিকাপ্রবাহে কত কুসংস্কার কোথায় উড়িয়া গেল। অগ্নিদাহে কত দুর্বল বিশ্বাসের স্তম্ভ ধ্বসিয়া গেল। নানা সংশয়, নানা সন্দেহ, নানা যুক্তি তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে কত বিক্ষত করিয়া তুলিল। প্রশ্ন উঠিল, ক্ষীণকলেবর জটাচীরধারী সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ, যে অস্থিচর্মসার হইয়াও আপনার উপলব্ধ সত্যকে অবিনাশী ঘোষণা করিয়া আনন্দের আবেশে জগৎ-প্রান্তে নিঃসঙ্গ একাকী বসিয়া, সে কি এখনো জীবিত? ধর্ম এবং নব্যবিজ্ঞানের প্রবল দ্বন্দ্বে দিশাহারা হইয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেহ বা পাশ্চাত্য-প্রথাবলম্বনে জাতীয় প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কেহ বা বিপদ না বুঝিয়া নির্বিকার ছিলেন, কেহ বা ভয়-চকিত হৃদয়ে দিন যাপন করিতে ছিলেন। তখন কেহই জানিতেন না যে দক্ষিণেশ্বরে ভাগরথী-তীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক নূতন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে—প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারের কোনো রঙে রঞ্জিত হয় নাই, এমন

একটি নিরপেক্ষ মুক্ত মন ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে। সেজন্য মা কালীর এক তরুণ পূজারী আপনার সর্ব-প্রভাবমুক্ত নিষ্কলুষ হৃদয় পাতিয়া দিয়াছেন। সত্যকে যাচাই করিবার এক অতি প্রাচীন অথচ অতি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেন শুরু হইয়াছে। এক নূতন শক্তি সকলের অগোচরে আপনা হইতে গড়িয়া উঠিতেছে—অকর্ষিত মৃত্তিকায় যার জন্ম, মুক্ত আকাশের আলোতে যার পরিপুষ্টি, যা কারো হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নয়, কারো অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত নয়, কারো মতবাদে প্রভাবিত নয়।

সেদিনকার দার্শনিক পণ্ডিতের বাদবিসংবাদ-মুখরিত তর্কের জগৎ এবং বৈজ্ঞানিকের নানা-সূত্রবিজড়িত বস্তুপুঞ্জময় 'যন্ত্রবৎ' পদার্থজগৎ উভয়ের প্রতিই দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যলাভের জন্য হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অন্তর্জগতের গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সেখানে কত কি ঘটিতে থাকিল—তাহার খবর কতটুকু আর আমাদের জানা আছে? এইকালে দীর্ঘ বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার অন্তর্জগতে যে সব ক্রিয়াকলাপ চলিয়াছিল, তাহারই কিছু প্রতিচ্ছবি বস্তুজগতে অভিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। তখন যাঁহারা তাঁহার চারিপাশে ছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ এই সব প্রতিচ্ছবি দেখিয়া হতাশ হইয়াছেন, কেহ শিহরিয়া উঠিয়াছেন, আবার কেহ বা অমৃতলোকের আভাস পাইয়া রোমাঞ্চিতও হইয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন দিনের পর দিন কিসের অন্বেষণে তাঁহার অন্তর যেন দ্বিধায় কম্পমান, গভীর গোপন হৃদয়-বেদনা-ভার বুকে লইয়া তিনি যেন উদ্‌ভ্রান্ত, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কখনো কম্পিত, কখনো স্ফীত, বক্ষস্থল আরক্তিম, শরীর উত্তপ্ত, বদনমণ্ডল জ্যোতির্ময়। তিনি কখনো পিশাচবৎ, কখনো বা বালকবৎ। কখনো বসিয়া আছেন যেন নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা, কখনো আনন্দের ধারা ছুটিয়া চলিয়াছে যেন বর্ষার দুকূলপ্লাবী গঙ্গাপ্রবাহের মতো। কখনো তাঁহার দিব্য অঙ্গ হইতে বস্ত্রখণ্ড স্খলিত, কখনো তিনি উন্মাদ বলিয়া উপহসিত, কখনো বা জীবনমরণের মিলন-রেখার উপর দাঁড়াইয়া। সত্যলাভের জন্য জীবনের কৈশোরকালেই এই পৃথিবীর ভোগসুখ, নামযশ, প্রতিষ্ঠার দুর্দমনীয় আকর্ষণ যিনি নিঃশেষে ত্যাগ করিয়াছিলেন, এইবার তিনি একদিন ইহজীবনের শেষ আশ্রয় প্রাণটুকু পর্যন্ত পণ রাখিয়া পরম অভিমানভরে ভব-তারিণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। যে সত্য না থাকিলে বস্তুজগৎ অর্থহীন, জীবন উদ্দেশ্যহীন, এই বিশ্বপ্রকৃতি প্রলাপের ফেনপুঞ্জমাত্র, সেই সত্য আপন স্বরূপে যদি উদ্‌ঘাটিত না-ই হইল, তবে এ জীবন রাখিয়া লাভ কি? ইহার এখনই অবসান হউক। সর্ববন্ধনছিন্ন সর্বকলুষ-মুক্ত অকপট হৃদয়ের স্থিরসংকল্পের নিকট সহসা মনবুদ্ধির, স্থানকালের বেড়া ভাঙ্গিয়া গেল, প্রবহমান স্থূল জগৎ যেন সহসা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, নিমেষে লুপ্ত হইয়া গেল—শ্রীরামকৃষ্ণ "এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রের ঊর্মিমালা"-র দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলেন, সে চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রে মিলিয়া গেলেন।

কিন্তু এ সকলি অক্ষরের পর অক্ষর সাজাইয়া আমাদের ভাষায় আমাদের বুঝিবার মতো একটি বর্ণনামাত্র। আসলে কি ঘটিয়া-ছিল, সেই চেতনাসাগরের তলদেশে যাঁহারা নামিয়াছেন, তাঁহারাই শুধু তাহা অনুভব করেন। অনুভব করেন, কিন্তু ভাষায় আমাদের বুঝাইতে পারেন না। আভাসে যেটুকু বোঝানো

সম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখেই তাহা বলিয়াছেন। সে বাণী হইতে আমাদের বোঝা, সে যেন কোন আবৃত স্থানের ঘটনার বাহিরে দাঁড়াইয়া বাহিরে উহার ফলাফলের যেটুকু প্রকাশমান সেটুকু দেখিয়াই ভিতরের ঘটনাসম্বন্ধে অনুমান করা।

ফলাফল খতাইলে দেখা যায় অন্তর্জগৎ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আমাদের স্থূল জগতে নামিয়া আসিলেন তখন তাঁহার দিব্যজীবন হইতে আনন্দলোকের সুধা ঝরিয়া পড়িতেছে। অনাবিল আনন্দের শিহরণে মানুষের দগ্ধ প্রাণ আবার মঞ্জুরিত হইয়া উঠিল। বেদবেদান্তের দুরূহ তত্ত্ব নূতন আলোকে প্রকাশিত হইতে লাগিল। শাস্ত্রের যে উক্তি মানুষের বুদ্ধিতে এতদিন খাপ খায় নাই, তাহা এখন মিলিয়া যাইতে লাগিল। যে জড়বাদ প্রবলহস্তে ধর্মের ভিত্তি টলাইয়া দিতেছিল, তাহার হস্ত শিথিল হইয়া আসিল। নানা তত্ত্বের বিরোধ মীমাংসিত হইল—নানা মত, নানা পথ, যেগুলিকে এতদিন বিভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখী বলিয়া মনে হইতেছিল, সেগুলিকে একই লক্ষ্যাভিমুখী বলিয়া বোঝা গেল। জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী তর্কের যে ধূম্রজাল উঠাইয়াছিলেন তাহা ছিন্ন করিয়া নূতন জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যতই দিন যাইতেছে ততই সেই আলো উজ্জ্বলতর, এবং অধিকতর পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

আজিকার এই জগৎ বিজ্ঞানচেতনাসমৃদ্ধ যুক্তিবাদীর জগৎ—বিচারশীল বুদ্ধির জগৎ। তাই যুক্তি বুদ্ধি বিচারশীলতার নানা মাপকাঠি দিয়া আধুনিক জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। নানা পরীক্ষকের মূর্তিতে সে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছে, যাহার মধ্যে সর্বপ্রধান, সর্বাধিক কঠোর পরীক্ষক নরেন্দ্রনাথ। সকল পরীক্ষার শেষে আধুনিক জগৎকে অকপটে স্বীকার করিতেই হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য—একটি অলৌকিক ঘটনা যাহা আমাদের যুক্তি বুদ্ধির সঙ্গে মিলিয়া গেলেও, বাস্তব বিচারের গভীর সীমা পর্যন্ত উহার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিলেও সে সীমা ছাড়াইয়া বহু বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। এ যেন বোঝা যায় না অথচ মনপ্রাণ বিগলিত হয়,—ধরা যায় না অথচ মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

আমরা শুনিয়াছি বেদ অলৌকিক—অপৌরুষেয়, অর্থাৎ অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি, কোন মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, অথবা মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত (invented) নয়। তবে কোথা হইতে সেই জ্ঞানের উদ্ভব? সত্যদ্রষ্টাগণ বলেন, ভগবানই সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারী। ভগবানের সঙ্গে যাঁহারা মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাই এ জ্ঞান আমাদের দ্বারে আনিয়া দিয়াছেন। তাই এই জ্ঞানরাশি সর্বকালে সর্বধর্মের সার্বজনিক ভিত্তিভূমি। কোন্ অনাদি অতীতে সেই জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশে উৎসারিত হইয়াছিল এবং সূক্ষ্ম যোগজ শক্তি-সম্পন্ন ঋষিগণকর্তৃক বিধৃত হইয়া শিষ্যপরম্পরায় মানুষের মাঝে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছিল। দীর্ঘদিন মানুষ এই অনাদি অপৌরুষেয় জ্ঞানের কথা শুনিয়া আসিয়াছে কিন্তু জ্ঞান কেমন করিয়া অপৌরুষেয় হইতে পারে এবং তাহার প্রমাণ-ই বা কি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বুঝি সকল সংশয় মোচন করিয়া সেই প্রমাণকে প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই দীর্ঘ দিবস অন্তে পবিত্র জাহ্নবীর পূর্বউপকূলে আবার সেই অনাদি বেদজ্ঞান অন্যনিরপেক্ষ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে আপনা আপনি

উৎসারিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘকালের ব্যবধানে মানুষ যখনই ভুলিয়া যায়, তখনই এরূপ ঘটনা ঘটে। এই প্রায়-নিরক্ষর ভবতারিণীর পূজারী ব্রাহ্মণ কারো শিষ্য নয়, কারো ছাত্র নয়, কারো হাতে-গড়া মানুষ নয়—জগজ্জননী হইতে উৎসারিত জ্ঞানের সংহত মূর্তি—স্বয়ম্ভূ শ্রীরামকৃষ্ণ। এই জ্ঞান বিতরণের সময় নিজ ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানের রাশ ঠেলিয়া দিতেন মা স্বয়ং।

সার্থক বাণী

শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা

যত না সুন্দর হোক সেই বাণী
ব্যর্থ হবে সব
যদি নাই অনুরূপ ক্রিয়া,
ব্যর্থ যেন
গন্ধহীন পুষ্প মুকুলিত।

সুন্দর বাণী
সর্বথা সফল আর সার্থক হয়
যদি থাকে
অনুকূল কর্মেতে সংযুত,
সফল হয় যেন
সুন্দর পুষ্প সুরভিত।

* 'ধম্মপদ' অবলম্বনে

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বেলুড় মঠ
২৬ আশ্বিন, সোমবার
(1925)

কল্যাণীয়া মায়ী,

আজ তোমার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার দিদির পত্র পাইয়াছি। ঠিকানা দেয় নাই সেইজন্য তাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। খুকীমায়ীর পত্র পাইয়াছি, ঠিকানা দিয়াছিল, আমি তাকে উত্তর দিয়াছি। এখানকার সকলে ভাল আছেন। আমিও ভাল আছি। আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে ও সকলকে জানাবে। খুব সম্ভাবনা ২রা কার্ত্তিক সোমবার এখান হইতে রওনা হইব, ৩রা কার্ত্তিক নারায়ণগঞ্জ। আজ সকাল হইতে বৃষ্টি হইতেছে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

ঢাকা মিশন
মঙ্গলবার, ৭ই পৌষ
(1925)

কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী,

মায়ী, আমি তোমার পত্র ঢাকাতে আসিয়া পাইয়াছি ও তোমাদের কুশল সংবাদে সুখী হইয়াছি। বালিয়াটীতে মাসখানেক ছিলাম। এখানে গত শুক্রবার রাত্রে আসিয়াছি। সময় সময় সর্দ্দি লাগে জলের উপর যাওয়া আসা—সেইজন্য।

গত রবিবার তোমার বাবা এইখানে বৈকালবেলা আসিয়াছিলেন। তোমাদের বাড়ীর ও খুকীরা সব ভাল আছে জানিবে।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জন্মোৎসব ২৬শে পৌষ। সেই অবধি ঢাকাতে থাকিব। তার পর নারায়ণগঞ্জ ও সোনার গাঁ আশ্রম হইয়া বেলুড় মঠে চলিয়া যাইব। ইচ্ছা মাঘ মাসেতে কলিকাতা যাইব।

মায়ী, আশা করি শারীরিক ভাল আছ। যদি সুবিধা হয় তো কারো সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠ দেখে আসবে। আহিরীটোলা থেকে যাতায়াতের একখানা নৌকা হইলে ভাল হইবে। বেশি হাঁটতে হইবে না। নৌকার ভাড়া দক্ষিণেশ্বর অবধি, সম্ভাবনা ১৷৷০ কি ২৲ টাকার মধ্যে হইবে।

আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানিবে। সকলকে জানাবে। কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

The Ramkrishna Mission Sebashram
Narayanganj
২২শে মাঘ (1926)

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী,

মায়ী, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত ও সুখী হইলাম। সোনার গাঁ তোমার দিদির পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাকে আমি উত্তর দিয়াছি। কয়েকদিন হইল এখানে আসিয়াছি। আমার শরীর বড় অসুস্থ। ঢাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের দিন সকালে তথায় যাইব এবং বৈকালে চলিয়া আসিব এরূপ ইচ্ছা। মায়ী, তুমি ভুলে যাও কেন? পূর্ব পূর্ব পত্রে তোমায় কত লিখিয়াছি তোমার উপকারের জন্য। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতিকারপূর্বকম্। মায়ী জানিয়া রাখিবে নায়েতে কালপাশ কাটে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য আর এক জনকে দিয়া লিখাইলাম। আমার অসুখের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিব।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা সকলকে জানাবে এবং জানিবে। সাক্ষাৎ মত সকল বলিব।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

অদ্বৈতাশ্রম
১৮২/A, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মঙ্গলবার, ১:ই ফাল্গুন
(1926)

কল্যাণীয়া মায়ী,

আমি আজকাল পূর্বাপেক্ষা ভাল আছি। এখন কয়েকদিন এইখানেই থাকিব, পরে বেলুড় মঠে যাইব। ডাক্তার বলিয়াছেন শীঘ্রই সমস্ত সারিয়া যাইবে। চিন্তার বিষয় কিছু নাই। গত রবিবার বেলুড মঠে উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। এক লক্ষর উপর লোক হইয়াছিল। গান, বাজনা, কালীকীর্তন হইয়াছিল। একএক বারে লোক খাইতে বসিয়াছিল ৪।৫ হাজার। ইষ্টিমার বড়বাজার হইতে বেলুড় মঠে সমস্ত দিন, রাত্র ৮।৯ পর্যান্ত চলিয়াছিল। আনন্দের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গেল। আমাকে এখন খাইতে দেয় রুটি ও দুগ্ধ; ভাত, ডাল, মিষ্ট জিনিষ নয়। সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে ও কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

অবতারবাদ ও নরেন্দ্রনাথের মানসিক বিবর্তন

শ্রীরাধাশ্যাম দাস

নরেন্দ্রনাথ দত্ত তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, যারা তখন হেনরি ডিরোজিও এবং পাদ্রী আলেকজেণ্ডার ডাফের নেতৃত্বে Young Bengal নামে খ্যাত তাদের, এবং পাশ্চাত্য জগতের বিখ্যাত দার্শনিকদের লেখার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেও সত্যের সন্ধান পাননি। অশান্ত মন, সত্যলাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো তাঁকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাধকদের সঙ্গে পরিচয়লাভের পরও আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কোন সন্ধান না পেয়ে, ব্যাকুলতা ও অশান্তি আরও বেড়ে গেল।

এমন সময় একদিন প্রফেসর উইলিয়ম হেষ্টির কাছে কবি W rdsworth-এর mysticism ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে শুনলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—সমাধিমান পুরুষ তিনি। তারপর পরিচয় ঘটলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর একটা অজানা বস্তুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে পরিণতির দিকে ক্রমে টেনে নিয়ে গেল। তবু একটা সিদ্ধান্তে কিন্তু তাঁর মন ছিল সন্দেহের দোলায় দোলায়িত। মানুষের মধ্যে ভগবান জন্মলাভ করেন, একথা বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সম্মত হয়নি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন বটে—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"; তবু তৎকালে নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসক নরেন্দ্রনাথ যুক্তি দিয়ে সেকথা গ্রহণ করতে পারছিলেন না। ভগবান মানুষরূপ ধরে আসেন, একথা বিশ্বাস করা কি করে সম্ভব? তিনি তো নিরাকার, অদ্বিতীয়, অবাঙ্‌মনসোগোচর, কাজেই—

"সাকার সম্বন্ধে প্রভু কন নিরবধি।
নরেন্দ্র তাহাতে হন ততই বিরোধী॥
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অখিল-ঈশ্বর।
অতি তুচ্ছ পঞ্চভূত খাঁচার ভিতর॥
কখন সম্ভবপর হইতে না পারে।
মানুষে ঈশ্বরজ্ঞান জ্ঞানহীনে করে॥"[১]

বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠ, পাশ্চাত্য মনীষীদের মতামত প্রভৃতিও আসল বস্তুর কোন সন্ধান দিতে সক্ষম হোল না।

এমনিভাবে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া ক্রমে বৃদ্ধি পেলো। পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হয়ে, কেবলমাত্র তাঁরই উপাসনা ও ধ্যান করবেন, এ মর্মে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার-পত্রে তিনি সই করেও দেন। একদিন নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, সহপাঠী ও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রাখালচন্দ্র (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে দেবীবিগ্রহকে প্রণাম করছেন। সত্যপরায়ণ নরেন্দ্রনাথ উহাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে রাখালচন্দ্রকে তীব্র অনুযোগ করে বললেন—"ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া পুনরায় মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করায় তোমাকে মিথ্যাচারে দূষিত হইতে হইয়াছে।"[২] দক্ষিণেশ্বরে এলেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে অষ্টাবক্রসংহিতাদি গ্রন্থ পাঠ করতে দিতেন। নরেনের চোখে ঐ গ্রন্থাদি নাস্তিক্যদোষে দুষ্ট বলে মনে হোত।

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি—পৃ: ৩২৮

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, নরেন্দ্রনাথ ও দিব্যভাব—পৃ: ১৩৪

তিনি স্পষ্টই বলতেন—"ইহাতে আর নাস্তিকতাতে প্রভেদ কি? সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে? ইহা অপেক্ষা আর অধিক পাপ কি হইতে পারে? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্মমরণশীল যাবতীয় পদার্থ সবই ঈশ্বর—ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর কথা অন্য কি হইবে? গ্রন্থকর্তা ঋষি-মুনিদের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। নতুবা এমন সকল কথা লিখিবেন কেন?"[৩] নরেন্দ্রনাথ এ তত্ত্ও মানেন না, আবার মানে না যে ঈশ্বর মনুষ্যদেহ লইয়া অবতীর্ণ হন। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা যে শেষোক্তটি সম্বন্ধে গিরিশের সঙ্গে নরেনের বিচার হয়, কারণ গিরিশের পূর্ণ বিশ্বাস ঈশ্বর অবতার হয়ে আসেন। গিরিশের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের এ প্রসঙ্গে অনেক কথা হোল। নরেন্দ্রনাথ বললেন "ঈশ্বর অনন্ত, তিনি সকলের ভিতরেই আছেন—শুধু একজনের ভিতরে এসেছেন এমন নয়। তিনি আবাঙ্-মনসোগোচর ইত্যাদি।"[৪] তারপর ঘোরতর তর্ক; Infinity তার কি অংশ হয়? আবার Hamilton, Herbert Spencer, Tyndal, Huxley কে কি বলে গেছেন ইত্যাদি প্রসঙ্গও হোল। নরেন্দ্রনাথের অবতারবাদে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। তবু দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। অদ্বৈততত্ত্ব মানেন না, অবতার মানেন না, মা কালীকেও মানেন না। তবু ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসার বিরামও নেই। একদিন ঠাকুর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'মাকেই যখন মানো না, তখন কেন এখানে এস?'—নরেন বললেন, 'এখানে আসতে হলে মাকে মানতেই হবে নাকি?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখ, কিছুদিনের মধ্যে মাকে শুধু মানা নয়, মায়ের নাম শুনলেই চোখে জল আসবে।' —"Why do you come here, if you do not want to acknowledge my Mother?" Ramkrishna asked him, "Must I acknowledge Her, if I come?" replied Naren. "Well," said the Master, "several days hence you will not only accept Her, but you will weep at the mention of Her name."[৫]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়লাভের পর নরেন্দ্রনাথ শুনলেন - "বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, Science সব খড়কুটো বোধ হয়।"[৬] আরও শুনলেন—"যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, 'আলু নাও, পয়সা দাও।'"[৭] আবার "হালদারপুকুরে বড় মাছ আছে, পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছের খানিকটা একবার দেখা গেলো। মাছটা ধপাং করে উঠলো। যখন দেখা গেল, তখন আরও আনন্দ।"[৮] "সিদ্ধি সিদ্ধি বললেই কি নেশা হয়? গায়ে মাখলেও নেশা হয় না,

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, নরেন্দ্রনাথ ও দিব্যভাব—পৃঃ ১৩৫

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—১।২৩২

৫ The Life of Ramakrishna—Romain Rolland

৬ 'কথামৃত'—১।২২২

৭ ঐ —১।২২৩

৮ ঐ —৪।৩২৮

কুলকুচো করলেও কিছু হবে না। সিদ্ধি এনে বেঁটে খেলে তবে নেশা হয়।"[৯] শুনলেন, ডুব দাও; ওপর ওপর ভাসলে বস্তুলাভ হয় না; ভগবান লীলা করার জন্যে জন্ম গ্রহণ করেন ক্ষুদ্র জীব তা বুঝতে পারে না, ইত্যাদি। ঠাকুর একদিন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সেই অনন্তের আভাস দেবার জন্য বললেন—"সেখানে যেতে পথের দু'ধারে থোলো থোলো রাম, থোলো থোলো কৃষ্ণ ঝুলছেন। এক এক কৃষ্ণের থোলোতে এত কৃষ্ণ আছেন, এক এক রামের থোলোতে এত রাম আছেন যে গণনাতে অনন্ত। একটি থোলোর একটি কৃষ্ণ এসে বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন। একটি থোলোর একটি রাম এসে অযোধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।… ভগবান একাধারেও যেমন অনন্ত, অনন্তাধারেও তেমনি অনন্ত।"[১০]…"হতভাগ্য জীব এমন দিশেহারা, এমন কানা, এমন বধির যে, সে গিলটীর কামকাঞ্চন ছাড়া সাক্ষাৎ কাঁচা সোনা ভগবানের দিক দিয়েই যাবে না, সে রূপই দেখবে না, তাঁর কথাই শুনবে না। জীব একান্ত বেবাগ হলে দয়ার সাগর স্বয়ং মূর্তি ধরে মানুষের মত হয়ে বাগ মানাতে আসেন; তবু কি চোখ দিয়ে দেখে? ভগবান দয়ার ভরে অস্থির; সুতরাং তাঁকে নিজের দায়ে জীবের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বাগ মানাতে যেতে হয়, তখন জীব ভগবানকে পাগল জ্ঞানে উড়িয়ে দেয়।"[১১] সে সময় ঠাকুর যা কিছু দর্শন করেন, প্রত্যক্ষ করেন, নরেন্দ্রনাথের হিসাবে তা সবই অবাস্তব, কল্পনামাত্র। শুধু ঠাকুরের মাথার খেয়াল।

এর পরই পুঁথির রাজ্য ছেড়ে অনুভূতির রাজ্যে হোল নরেন্দ্রনাথের ক্রমপদক্ষেপ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় ক্রমে ক্রমে যোগিরাজ নরেন্দ্রনাথের আমূল পরিবর্তন সংসাধিত হোল মনোরাজ্যে ও জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥"

এ কথা ক্রমে বাস্তবরূপে প্রতিভাত হতে লাগল নরেন্দ্রনাথের মাঝে। "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" এবং "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ" আর শাস্ত্রবাক্যরূপে পুঁথিতে সীমাবদ্ধ না থেকে আত্মপ্রকাশে "মধুক্ষরণ" করতে শুরু করলো—যদিও নরেন্দ্রনাথের 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র, সর্বং চ ময়ি পশ্যতি' ভাবে ভাবিত হতে সময় লেগেছে প্রায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানের শেষ পর্যন্ত। মাকালীর দর্শন লাভ এবং নির্বিকল্প সমাধিরও পর তাঁর এসেছে অবতারবাদে পূর্ণ বিশ্বাস।

১৮৮৫ খৃঃ ৭ই মার্চ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের মধ্যে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন—"এখানে অপর লোক নাই, তোমাদের একটা গুহ্য কথা বলছি। সে দিন দেখলাম খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এল, এসে বললে "আমিই যুগে যুগে অবতার।"[১২] দেখলাম "পূর্ণ আবির্ভাব—তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।" এর পরও পূর্ণ বিশ্বাস হতে প্রায় বৎসরাধিককাল লেগেছে। তখনও সন্দেহের পূর্ণ অবসান হয়নি। কোথায় যেন তখনও একটু সন্দেহ বাসা বেঁধে রয়েছে। সত্যি কি শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার? ভগবান কি মনুষ্যদেহ

৯ 'কথামৃত'—৪।২৫১, ১।১৯৪

১০ শ্রীরামকৃষ্ণমহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১০৬

১১ শ্রীরামকৃষ্ণমহিমা—অক্ষয়কুমার সেন পৃঃ ১০০-১০১

১২ 'কথামৃত'—৩।১৭৫

ধারণ করে ঠিক মানুষের মত ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করেন? রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণায় আমাদেরই মত কাতর হন? এ সন্দেহেরও অবসান হোল শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পূর্বে।

১৮৮৬খৃঃ ১৫ই মার্চ কাশীপুর বাগানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে চিকিৎসার্থ আছেন। কথা বলতে কষ্ট হওয়াতে কখনও আস্তে আস্তে কখনও বা ইসারায় কথা কইছেন। সেখানে নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, মাষ্টার, লাটু, সিঁথির গোপাল ও ডাঃ মহেন্দ্র সরকার উপস্থিত আছেন। পূর্ব-রাত্রে দেহের অবস্থা খারাপ হওয়ায় ভক্তবৃন্দ বিষাদগম্ভীর মুখে চুপ করে আছেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণ কিয়ংক্ষণ পরে বললেন—"তিনি মানুষ হয়ে—অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।" আবার বললেন—"বাউলের দল হঠাৎ এলো—নাচলে গান গাইলে আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো-গেলো কেউ চিনলে না।"[১৩] নরেনকে লক্ষ্য করে বললেন, "আচ্ছা আমার কি ভাব?" "দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছু।" "কি বুঝলি?" নরেন্দ্রনাথও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"যা কিছু অর্থাৎ যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে।"[১৪]

অহেতুক কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে ডাঃ সরকারকে লক্ষ্য করে সস্নেহে বললেন—

"বিশেষিয়া কন প্রভু ডাক্তারের প্রতি।
সপ্রেম সম্ভাষ ভাষে বিনয় সংহতি॥
এতকাল সম্ভোগিলে বহু পরিমাণ।
টাকাকড়ি প্রতিপত্তি অতুল সম্মান॥
এইবার দাও মন ঈশ্বরচরণে।
উদ্দীপনা হেতু তুমি আসিও এখানে॥"[১৫]

ভক্ত-ভগবানে এমনি কথাবার্তা চলছে। কিয়ৎক্ষণ পর ডাঃ সরকার চলে যাবার উদ্যোগ করতেই গিরিশবাবু প্রবেশ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদধূলি মাথায় নিলেন। তখন ডাঃ সরকার গিরিশবাবুকে ঈশ্বরের পূজা মানুষের মধ্যে করার প্রতিবাদ করায় উভয়ের মধ্যে কথাকাটাকাটি চলতে থাকে। তখন নরেন্দ্রনাথ আর চুপ করে থাকতে পারেননি। ভগবানের অবতারতত্ত্বে তিনি তখনো বিশ্বাস করেন না। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কি চক্ষে দেখেন তা প্রকাশ করলেন—ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের মতো :—

"বিস্ময় আহ্লাদ কুতূহল সমন্বিত।
ইহাকে আমরা দেখি ঈশ্বরের মত॥
সে কেমন বুঝাইতে কহিলেন পিছে।
উদ্ভিদ শ্রেণীর মধ্যে হেন বস্তু আছে॥
যেই বস্তু দরশনে বুঝা নাহি যায়।
উদ্ভিদ বলি কি আমি প্রাণী বলি তায়॥
তেন নরলোক দেবলোকের মাঝারে।
হেন বস্তু আছে মোরা পাই দেখিবারে॥
যাঁর গুণ ধর্ম দৃষ্টে বুঝা বড় ভার।
নর কি ঈশ্বর নাম কিবা দিব তাঁর॥"[১৬]

নরেন্দ্রনাথ বহুদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শুনেছেন যে, যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ হয়ে এসেছিলেন, তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে এসেছেন। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। কাশীপুর উদ্যানে রোগের যন্ত্রণায় ঠাকুর অস্থির, ভাতের তরল মণ্ডও গলাধঃকরণ হচ্ছে না, তখন একদিন

---

১৩ 'কথামৃত'—৩।৩৫৯
১৪ ঐ ৩।৩৬২

১৫ 'পুঁথি' পৃঃ ৫৮৯
১৬ 'পুঁথি'—পৃঃ ৫৯০

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট বসে আছেন, আর ভাবছেন এ যন্ত্রণার মধ্যে যদি তিনি বলতে পারেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার, তাহলে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে বিস্ময়ে অভিভূত করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন —"এখনো অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"[১৭] নরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত হলেন। পরবর্তীকালে এই নরেন্দ্রনাথই (তখন স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে শুধু অবতার নয়, "অবতারবরিষ্ঠ" বলে ঘোষণা করেছেন।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ হয়েছেন বিবেকানন্দে রূপান্তরিত। তাঁর আমেরিকায় অবস্থানকালে ইংরেজীতে তাঁর ভক্তিযোগ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি অবতার সম্বন্ধে বলেছেন, "... .. These teachers of all teachers represent God himself in the form of man. They are much higher; they can transmit spirituality with a touch, with a wish, which makes even the lowest and most degraded characters saints in one second,"......"They are the teachers of all teachers; the highest manifestation of God to man, we cannot see God except through them. We can not help worshipping them, and they are the only beings we are bound to worship."[১৮] ঈশ্বরই অবতাররূপে আমাদের কাছে আসেন। যদি ঈশ্বরদর্শন করতে আমরা চাই তাহলে অবতারপুরুষের মধ্যেই তাঁকে দর্শন করব। যতক্ষণ আমাদের মনুষ্যদেহ ততক্ষণ আমরা ঈশ্বরের যদি পূজা করি, তবে একমাত্র অবতারপুরুষেরই করতে হবে। হাজার লম্বা কথা কও ঈশ্বরের মনুষ্যরূপ ব্যতীত চিন্তাই হয় না। তাই চিকাগোতে স্বামীজী Lecture on Hinduism এ বললেন—"My brethren, we can no more think about anything without a meterial image than we can live without breathing." ঈশ্বরই অবতাররূপে আমাদের কাছে আসেন। ঈশ্বর আমাদের মধ্যেও আছেন কিন্তু অবতার-পুরুষের মধ্যেই তাঁর বেশী প্রকাশ। যেমন আলোর স্পন্দন সর্বত্রই আছে তবুও বড বড দীপ জেলেই অন্ধকার দূর করতে হয়। ১৯৮০ খৃঃ Californiaতে Los Angeles নামক স্থানে স্বামীজী "Christ the Messenger" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি সেখানে ভগবানকে দর্শন করতে হলে যে মানুষের মধ্যেই দর্শন করতে হবে সে সম্বন্ধে বলেন—"The vibration of light is everywhere, omnipresent, but we have to strike the light of the lamp before we can see the light. The Omnipresent God of the Universe cannot be seen until He is reflected by these giant lamps of the earth,—the Prophets, the man-gods, the Incarnations, the Embodiment of God."[১৯]

ঠাকুর বলতেন, "ভগবানকে মানুষের মধ্যে মনুষ্যদেহ ধারণ করে এসেই ধর্মস্থাপন করতে হয়।" আমেরিকা গিয়ে কামকাঞ্চনে আকণ্ঠনিমগ্ন আমেরিকাবাসীদের স্বামীজী শোনালেন যীশুর বাণী "He that hath seen me hath seen the Father; believest

১৭ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, পৃঃ ১।১৪৭

১৮ C. W. Swami Vivekananda—4127

১৯ C. W. Swami Vivekananda—4I135

thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you I speak not myself; but the Father that dwelleth in me, he doeth the works."[২০] পূর্ববর্তী অবতারপুরুষগণের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে স্বামীজী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করলেন অবতারবরিষ্ঠ বলে। তিনি তাই বললেন "Such a man was born and I had the good fortune to sit at his feet for years···. He was a strange man—this Ramakrishna Paramhansa···Let me now only mention the great Sri Ramakrishna, the fulfilment of Indian sages, the sage for the time, one whose teaching is just now, in the present time, most beneficial...The son of a poor priest today is worshipped literally by thousands in Europe and America and tomorrow will be worshipped by thousands more."[২১]

বেদান্তবাদী নরেন্দ্রনাথ অবতারবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ দিব্য সাহচর্যে। "সম্ভবামি যুগে যুগে" আর শুধু গীতার কথাই ছিল না, জীবন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে—Who was the embodiment of Kali the Mother. স্বামীজী প্রথম দিকে শুধু এই মা কালীর মন্দিরে প্রণাম করাই নয়, মন্দিরে যাওয়াটাকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না। এদিকে আবার ঠাকুর—

"যখন যে ভাগ্যবান প্রভু দেখিবারে।
আসিতেন ভক্তিসহ দক্ষিণ সহরে॥
প্রায় অধিকাংশে বলিতেন ভগবান।
শ্রীমন্দিরে কর অগ্রে মায়েরে প্রণাম॥"[২২]

তা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ প্রতিমায় বিশ্বাস করতেন না। শুধু তাই নয়, তিনি মা কালীর প্রতি বরং অশ্রদ্ধার ভাবই পোষণ করতেন। 'মা কালীকে আগে যা ইচ্ছে তাই' বলতেন। তাই ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—"তুই আর এখানে আসিস না।"[২৩] কিন্তু সে পটপরিবর্তন কবে হয়ে গেছে। এখন ঠাকুরই মা কালী।

---

২০ New Testament, St. John

২১ C. W. of Swami Vivekananda—3/267-68

২২ 'পুঁথি'—পৃ: ২৩৬

২৩ 'কথামৃত'—৪,৬৬

সমালোচনা

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ : জীবন ও বাণী : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩; পৃঃ ৭৮+৮; মূল্য দুই টাকা।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-শতবর্ষ-জয়ন্তী প্রকাশনের অন্যতম অঙ্গরূপে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত। এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ আশ্রম সরল সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ এই মহাপুরুষের বহিঃপ্রকাশের চেষ্টামাত্রশূন্য নির্জন তপস্যার কিছু পরিচয় বহন করছে; আবার বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের রূপকল্পে বিজ্ঞানানন্দ-জীবনসাধনার আর এক পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের (Science) প্রত্যক্ষ চর্চায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দই সবচেয়ে অগ্রণী, আবার পরমসত্যস্বরূপ যে বিজ্ঞান, শ্রীরামকৃষ্ণ-আশীর্বাদপূত জীবনে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহৎ অধিকারী। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদ তাঁর জীবনে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যোপলব্ধির পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। প্রাচীন ও আধুনিকের এক অপূর্ব সমন্বয়মূর্তি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এই ছোট্ট জীবনী-গ্রন্থখানিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার নির্মল পটভূমিকায় স্থাপন করে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর কল্লোল সঞ্চার করেছেন—সাহিত্যকৃতির দিক থেকে এ সত্যিকার বিস্ময় ও আনন্দের কথা। আমরা আশা করব, অদূর ভবিষ্যতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করে শ্রদ্ধেয় লেখক বাংলাসাহিত্যের জীবনীশাখাটি আরো সমৃদ্ধ করে তুলবেন। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমে সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরে বিজ্ঞানানন্দজীর বাণী-সংকলন—এ দুয়ের বিন্যাসে গ্রন্থপরিকল্পনা সার্থক। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সত্ত্বেও একান্ত বহিরঙ্গ প্রকৃতিকে জয় করাই যে মানব-জীবনের সার্থকতা নয়, যথার্থ প্রকৃতি-জয় যে ভারতের অধ্যাত্মসাধনার অন্তর্লোকেই নিহিত, সেকথাটি পূর্বজীবনে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের ছাত্র, পরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জীনিয়ার এবং সর্বশেষে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—এই বিচিত্র জীবনধারায় প্রবাহিত শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদের জীবনে সুপ্রমাণিত। যাঁরা তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখার সৌভাগ্য পেয়েছেন, তাঁরাই জানেন তাঁর শালপ্রাংশু মহাভুজ বিরাট দেহে কী বিপুল ও গভীর অধ্যাত্মশক্তি ও প্রশান্তি নিহিত ছিল। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে তাঁর জীবনী সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে সমভাবে আকর্ষণীয়।

প্রকাশক জেনারেল প্রিণ্টার্স তাঁদের সুরুচি-সম্মত প্রকাশনার আর একটি সুন্দর উদাহরণ স্থাপন করেছেন। নয়নাভিরাম প্রচ্ছদটি শিল্পী শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তীর শিল্পপ্রতিভার যোগ্য প্রতিনিধি। প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা—স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর অনূদিত সূর্যসিদ্ধান্ত, (যেটি একদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল), রামায়ণের অনুবাদ বা অন্যান্য রচনাবলী একত্রে 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-গ্রন্থাবলী' রূপে প্রকাশের পরিকল্পনা কি তাঁরা করেছেন? মনে হয়, এ বিষয়ে অবিলম্বে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। —**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তিন খণ্ডে) —স্বামী বাসুদেবানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ-বাসুদেবানন্দ সঙ্ঘ, ৬৪এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ তিন খণ্ডের পৃষ্ঠা যথাক্রমে: ৬৮৮, ৬০১ ৫৩৪ এবং সমবেত মূল্য ত্রিশ টাকা।

অত্যন্ত জনপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ ভগবদ্গীতা। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, গীতা—এই ত্রয়ীকে বলা হয় প্রস্থানত্রয়; ইহাই বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতা 'স্মৃতিপ্রস্থান'-নামে প্রখ্যাত।

আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আলোকে গীতার অনুপম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করের গীতাভাষ্যই সর্বোৎকৃষ্ট ও সুসঙ্গত বলিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বহুকাল পূর্বে রচিত এই ভাষ্যে দেখা যায় আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকও প্রতিফলিত। সত্যদ্রষ্টা আচার্য সূক্ষ্মদূরদৃষ্টিবলে ও প্রজ্ঞাসহায়ে যে-সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেগুলি অতি-আধুনিক প্রজ্ঞাবানেরও বিস্ময় উৎপাদন করে।

স্বামী বাসুদেবানন্দ আচার্য শঙ্করের ভাষ্যকে ভিত্তি করিয়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য: গীতার মূল শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ, মূল শাঙ্কর ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, ভাষ্য-বিভাগ, বিস্তৃত তাৎপর্য-নির্ণয়, শাস্ত্রদৃষ্টি তথা আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা শঙ্কর-বিরোধী ভাষ্যসমূহের খণ্ডন এবং শাঙ্কর ভাষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন।

এই গ্রন্থে ভগবদ্গীতার শাঙ্কর ভাষ্যের সুষ্ঠুভাবে যেরূপ বিভাগ করা হইয়াছে, সেরূপ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। এই ভাষ্যবিভাগে এবং ভাষ্যের উদ্দেশ্য- ও তাৎপর্য-প্রদর্শনে লেখক অসাধারণ মননশীলতা ও অনুধ্যানের পরিচয় দিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যের সুদীর্ঘ এবং যুক্তি-সমৃদ্ধ জটিল দুর্বোধ্য স্থানগুলি প্রজ্ঞার আলোকে যেভাবে সহজবোধ্য হইয়া উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণকে চমৎকৃত করিবে। স্থানে স্থানে লেখকের নিজস্ব যুক্তিগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; শাস্ত্রীয় রূপক-বিশ্লেষণের অভিনব প্রণালী দার্শনিক চিন্তাজগতে আলোক সম্পাত করিতে সমর্থ। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মহান্ ভাবের আলোকে লেখকের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সমুদ্ভাসিত।

এই বৃহৎ গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায় পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে দশম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সংযোজিত। তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাইয়াছে চারিটি পরিশিষ্ট। প্রথম পরিশিষ্টে 'বিষয় ও বিবৃতি সূচী' - আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে যে সব বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন এবং গীতাব্যাখ্যাকালে লেখক যে-সব বিষয়ের বিবৃতি দিয়াছেন, সেগুলির সূচী। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে 'পদসূচী'—মূল গীতার প্রত্যেকটি শব্দ কোন্ অধ্যায়ের কোন্ শ্লোকে পাওয়া যাইবে তাহার বর্ণানুক্রমিক সূচী। তৃতীয় পরিশিষ্টে গীতার অন্তর্গত শ্লোক-গুলির বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ পরিশিষ্টে ষড়্দর্শনের এবং বৌদ্ধমত প্রভৃতির জ্ঞাতব্য বিষয় ও পারিভাষিক শব্দ-গুলি দেওয়া হইয়াছে। আচার্য শঙ্করের ভাষ্য বুঝিতে হইলে অন্যান্য মতবাদ সম্বন্ধেও উপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ শাঙ্কর ভাষ্যে পূর্বপক্ষে অন্যান্য মতবাদের উল্লেখ প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। চতুর্থ পরিশিষ্টের শেষে মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ দুইখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রদত্ত

হইয়াছে : (১) ভগবান শঙ্করাচার্য-বিরচিত 'পঞ্চীকরণসূত্রম্', (২) শ্রীকৃষ্ণযজ্বকোবিদবিরচিত 'মীমাংসাপরিভাষা'। চতুর্থ পরিশিষ্টটি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা পাইবার যোগ্য।

মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ গ্রন্থের উপযোগী। বঙ্গভাষায় শাঙ্কর ভাষ্যের এই গ্রন্থ মূল্যবান সংযোজনরূপে গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত্যপূর্ণ সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি গ্রন্থাগারের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবে।

ঋগ্বেদ: (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—পরিতোষ ঠাকুর ও শ্রীঅমরকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। ২৯, সদানন্দ রোড, কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮০ + ৪৪ ; মূল্য প্রতি খণ্ড ৩্।

ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ্ বেদ। বেদ-সম্বন্ধে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সুচিন্তিত অভিমত সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "শাস্ত্র-শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্ম-শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিপদবাচ্য ; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত। 'সত্য' দুই প্রকার—(১) যাহা মানবসাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য ; (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। 'বেদ' নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে-পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তি-দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম বেদ।"

ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব—এই চারি বেদের মধ্যে ঋক্ বেদের নাম প্রথম উল্লিখিত। আমরা জানিয়া আনন্দিত বেদগ্রন্থমালা সিরিজে প্রথমে ঋগ্বেদ প্রকাশিত হইতেছে। ভারতীয় চিরন্তন ভাবধারার সহিত সম্যক্ পরিচিত হইতে হইলে ঋগ্বেদের অনুশীলন অপরিহার্য। সুধী সম্পাদকদ্বয় 'বেদার্থমঞ্জুষা' নাম দিয়া ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের অষ্টম মন্ত্র পর্যন্ত আলোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত। প্রথমে ঋক্-মন্ত্র, পরে মন্ত্রের পদবিভাগ, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শব্দার্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ায় বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকগণেরও অনেকাংশে সহজবোধ্য হইবে বলা যায়। মূলগ্রন্থের সঙ্গে বৈদিক শব্দকোষ সংযোজিত হওয়ায় পাঠের অনেক সুবিধা হইয়াছে। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। বাংলা ভাষায় বেদের সূক্তগুলির সুন্দর অনুবাদ দুর্লভ বলিলেই হয়, এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে সে অভাব দূর হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

এই বৎসরের প্রথম হইতেই যে উদ্বাস্তুদের আগমন শুরু হইয়াছে, এবং এখনও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে, তাঁহাদের সেবায়। হাসনাবাদ ও বসিরহাটে রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাকার্য চালাইতেছেন। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে হাজারের উপর শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক গত এপ্রিল মাস হইতে জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই বিপন্ন নর-নারায়ণদের সেবাকার্যে ৫,৩০৮ কুইন্ট্যাল ৩০ কেজি চাল, ৬১৮ কুঃ ডাল, ৭৪ কুঃ ৬১ কেজি আলু, ১৫৯ কুঃ পেঁয়াজ, ৩৭ কুঃ লবণ, ৩২৫ পাঃ বার্লি, ৪৫ কেজি গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে।

সরকারের পক্ষ হইতে অন্যত্র পুনর্বাসনকেন্দ্রে ও অস্থায়ী শিবিরে লোক-অপসারণের কাজ দ্রুতগতিতে চলিতেছে। বর্তমানে (১৫ই জুলাই) হাসনাবাদ ও বসিরহাটে শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫৫,০০০ জন।

কার্যবিবরণী

বোম্বাই খার-এ (Khar, Bombay-52 AS) অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী (মার্চ হইতে এপ্রিল) প্রকাশিত হইয়াছে।

এই কেন্দ্রের কার্যধারা প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত : (১) আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিমূলক, (২) শিক্ষাবিষয়ক, (৩) চিকিৎসা-সম্বন্ধীয়, (৪) জনহিতকর ও সেবামূলক।

মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমে দৈনিক পূজা, উপাসনা ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আশ্রমের ত্যাগব্রতী সাধুগণই আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে ধর্মালোচনা করেন। একাদশী তিথিতে নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন হয়।

১৯৬৭ ও ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব মহানন্দে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই কেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা প্রথম আরম্ভ করা হয় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে নানা অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আশ্রমে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রাবাসে ৮০ জন করিয়া ছাত্র রাখা হইয়াছিল। গুজরাট, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের ছাত্র ভরতি করা হয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৫,৯৯৬। পাঠাগারে ১৩৭ খানি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। পাঠকগণ পুস্তকাবলী ও পত্র পত্রিকার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করেন। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৩,৬২৬ খানি পুস্তক গ্রাহকগণ পড়িতে লইয়া যান।

গত ৪ঠা মে হইতে ১৮ই মে, ১৯৬৮ পর্যন্ত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য অল্পকালস্থায়ী এক গ্রীষ্ম-নিবাসের (Summer Retreat) ব্যবস্থা

করা হয় ; ইহাতে মহারাষ্ট্র, মহীশূর, দিল্লী ও গুজরাট হইতে কলেজের ছাত্রেরা যোগদান করে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে 'মানুষ তৈরী', 'চরিত্রগঠন' প্রভৃতি বিষয়ে ৩৯ জন ছাত্র ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। ডক্টর পি. বি. গজেন্দ্রগদকর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-দিবসে ভাষণ দেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়টি আশ্রমেই অবস্থিত। এখানে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে। অ্যালোপ্যাথিক সেকশনে সার্জিক্যাল, প্যাথলজিক্যাল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, দন্ত প্রভৃতি বিভাগ অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ২,১১,২০৯ ও ১,৭৭,৬৩৫ জন রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বোম্বাই কেন্দ্র সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসর ধরিয়া বোম্বাই নগরীতে এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে জনসাধারণের সেবায় অকুণ্ঠভাবে নিরত রহিয়াছে। এই কেন্দ্র কর্তৃক এযাবৎ ২৬টি সেবাকার্য (Relief) বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেশে যখনই কোন দৈবদুর্বিপাক যথা—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটে তখনই এই কেন্দ্র হইতে যথোপযুক্ত সেবাকার্যের ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি কচ্ছে ও সুরাটে অনুষ্ঠিত সেবাকার্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, ইহাতে দশলক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই হইতে ১৭ই মে পর্যন্ত যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৫তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১৫ই মে তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন শ্রীনিরঞ্জনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুর জেলার সাবজজ শ্রীশীলব্রত বড়ুয়া। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র পাণ্ডে। স্বামী কালিকাত্মানন্দ উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। স্বামী যোগদানন্দ, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য, পণ্ডিত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়, শ্রীকান্তিনারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী তরুলতা সেন প্রবন্ধ পাঠ করেন। আরাত্রিকের পর শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোষের পরিচালনায় ভক্তি-মূলক সংগীতানুষ্ঠান হয়। ১৬ই মে তারিখে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫টায় শ্রীশীলব্রত বড়ুয়া মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পূর্বদিনের বক্তাগণ এবং অধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস বিশ্বসমস্যা-সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। আরাত্রিকের পর বেতারশিল্পী শ্রীব্রজগোপাল দাসের পরিচালনায় ভক্তি-মূলক সংগীত অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই মে তারিখে সংগীত, পাঠ ও স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। ঐদিন প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ

করেন। বিকাল ৪টায় পদাবলী-কীর্তন পরিবেশন করা হয়। আরাত্রিকের পর স্থানীয় বডি বিল্‌ডিং ক্লাবের যুবকগণ ও আশ্রম-ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ কর্তৃক ব্যায়ামকৌশল ও যোগাসন প্রদর্শিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পরে সংগীত-শিল্পী শ্রীসতীশ সরকারের পরিচালনায় শহরের বিশিষ্ট শিল্পিগণ কর্তৃক ভক্তিমূলক সংগীত অনুষ্ঠিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

ডিব্রুগড়: বিগত ২৮শে জুন স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকের প্রতিবেদনে প্রকাশ, সেবাসমিতি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর তিথিপূজা ছাড়া স্বামী সোমানন্দের তত্ত্বাবধানে স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের জন্য একটি ছাত্রাবাস ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করিতেছেন। বিগত বৎসরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৬,৯৬৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৭ই হইতে ২৩শে জুন ১৯৭০ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব বিশেষ ভাবগাম্ভীর্য ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

১৭ই জুন স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দের উপনিষদ্-পাঠ উৎসবের উদ্বোধন করে। স্থানীয় ইন্‌ডিয়া ক্লাবে উক্ত ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট শ্রীএইচ. কে. বরঠাকুর, আশ্রমপ্রাঙ্গণে ডিগবয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভূঁঞা এবং তুলিয়াজান অয়েল অডিটরিয়ামে অয়েল ইণ্ডিয়ার টেকনিক্যাল ম্যানেজার শ্রী সি. আর. জগন্নাথনের সভাপতিত্বে তিনটি জনসভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভাত্রয়ে ক্রমান্বয়ে 'বহুত্বে একত্ব', 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষা' এবং 'ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রভাব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী অজ্জানন্দ ও স্বামী প্রণবাত্মানন্দ। উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সৌম্যানন্দ।

কলিকাতা শ্রীসারদা মঠের ডিব্রুগড শাখার পরিচালিকা প্রব্রাজিকা শুদ্ধপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা বরদাপ্রাণা আশ্রমপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একটি মহিলাসভায় ভাষণ দেন।

তদুপরি উৎসবের অন্য আকর্ষণ ছিল রেডিও-শিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ গাঙ্গুলী গীতিসুধাকরের রামায়ণ-গান এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দের ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা।

২১শে জুন রবিবার সারাদিনব্যাপী আনন্দ-উৎসবের অঙ্গ ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ভজন-সঙ্গীত। নামসঙ্গীতে যোগদান করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ এবং বামন গাঁও (তুলিয়াজান)-এর কীর্তনীয়া দল। ঐ দিন প্রায় চার হাজার নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

প্রতিদিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র ধর্ম-পিপাসু ভক্তের আগমন ও আনন্দোৎসবে

যোগদান উক্ত অনুষ্ঠানকে বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে।

শ্যামপুকুর (কলিকাতা ৪) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপে গত ১৯শে হইতে ২১শে জুন বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন-কীর্তন, ধর্মসভা, কথকতা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর প্রতিষ্ঠার ৪র্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন অপরাহ্ণে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সান্ধ্য ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, প্রধান অতিথি স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী ক্ষমানন্দ, স্বামী অমলানন্দ এবং স্বামী জীবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথকতা করেন। সান্ধ্য ধর্মসভায় সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও উদ্বোধক শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। তৃতীয় দিন শ্রীমতী কান্তিলতা দেবী শ্রীশ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে কথকতা এবং শ্রীধীরেন্দ্র-নাথ ঘটক ও সম্প্রদায় দশমহাবিদ্যা গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। মণ্ডপের সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল তৃতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৫শে ফাল্গুন সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথিপূজা ও উৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উষাকীর্তন, মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগাদি, ধর্মসভা, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ-দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সংঘের উদ্যোগে গত ২২শে মার্চ কসবা চিত্তরঞ্জন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতি স্বামী নিরূত্তানন্দ ও অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত সুচিন্তিত ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর অবদান ব্যাখ্যা করেন।

উৎসবে প্রায় ৫০০জন ভক্তকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব গত ১লা জুন পূজা-পাঠ, প্রসাদবিতরণ ও ভক্তসম্মেলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন বিকাল ৫টায় শ্রীমনোরঞ্জন আচার্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি' পরিবেশন করিবার পর স্বামী আপ্তকামানন্দ ও স্বামী বিশোকাত্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী আলোচনা করেন।

পরলোকে সুশীলকুমার রায়

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত, ভাটপাড়ার 'বড় ললিত' নামে পরিচিত ৺ললিতমোহন রায়ের পুত্র বারাসত আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ উকীল সুশীলকুমার রায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৬ বৎসর বয়সে গত ২৫শে জুন সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পিতার নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি যৌবনে পূজনীয় মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গলাভের এবং তদানীন্তন প্রবীণ সাধুদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।



দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।২১

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

জপো জল্পশ্ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনা
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমশনাদ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামস্‌সংবেশস্‌সুখমখিলমাত্মার্পণদৃশা
সপর্যাপর্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্ ॥ ২৭

—সৌন্দর্যলহরী

আমি যদৃচ্ছাতে যা কিছু কই তোমারি জপ হয় যেন তাই,
আমি যখনি হাত ঘুরাই যেন মুদ্রা হয় তা তোমার পূজায় ॥

আমি যেথায় ফিরি সবই যেন প্রদক্ষিণ হয় তোমায় ঘিরে,
যেন 'আহার করি মনে করি আহুতি দিই' জননীরে।
(যেন এ দেহে মোর সকল কাজই অঞ্জলি হয় তোমার পূজায় ॥)

যেন 'শয়নে মোর প্রণাম জ্ঞান' হয় মা তোমার শ্রীচরণে।
রূপাদি সব বিষয় পেয়ে যে সুখ জাগে আমার মনে
আমি ভাবি যেন সে সব কিছুই আহুতি দিই তোমার তরে
আমার আমি সে তো তুমিই—এ জ্ঞান-যাগে উজাড় ক'রে।
(যেন নিঃশেষে এ চিত্তখানি ফুরিয়ে যায় ও রাঙা পায় ॥)

কথাপ্রসঙ্গে

মহাশক্তি শ্রীশ্রীদুর্গা

শক্তি

মানুষের মনে যেদিন প্রথম জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল এ জগৎকে কে সৃষ্টি করিয়াছে, আমাদের জীবনের ও জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী কাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এবং তাহার মনে এ প্রশ্নের যে প্রথম উত্তর প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই উত্তরই তাহার সুদীর্ঘকালের সত্যান্বেষণের পর শেষ উত্তর—শক্তি।

এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজিতে যুগে যুগে অন্তর্জগতের গহন হইতে গহনতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন বহু সাধক ও সত্যদ্রষ্টা। এই পথ ধরিয়াই তাঁহারা সৃষ্টিরহস্যের মূলে পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসিবার পর এই উত্তরই দিয়াছেন; তখন শুধু স্রষ্ট্রী বা নিয়ন্ত্রীরূপে নয়, বাহ্য ও অন্তর্জগতে, সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে তাঁহারা ওতপ্রোতও দেখিয়াছেন এই শক্তিকে। আবার, এই প্রত্যক্ষ-করা সত্যঘোষণার বহু হাজার বছর পরে জড়বিজ্ঞানীরা অন্যপথ ধরিয়া, স্থূলপদার্থের বিশ্লেষণসহায়ে বিশ্ব ও জীবনের উপাদান- ও নিমিত্তকারণ খুঁজিতে বাহির হইয়া এখন পর্যন্ত যতখানি দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদেরও উত্তর একই —শক্তি।

এই শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অবশ্য এই সব সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিতে পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু উহা অচেতন স্থূল 'এনার্জি'-ই হউক, বা মনবুদ্ধি অপেক্ষাও বহু সূক্ষ্ম কোন সত্তা হউক, অচেতন হউক বা চেতনার প্রতিভাসযুক্ত বা চেতনারই আর এক রূপ হউক, ব্যক্ত হউক বা অব্যক্ত হউক, চরম সত্যের সঙ্গে উহা ভিন্ন বা অভিন্ন বা অনির্বচনীয় যাহাই হউক, যতক্ষণ সৃষ্ট জগৎ রহিয়াছে এবং যতক্ষণ যত সূক্ষ্মরূপেই হউক আমি তাহার দর্শকরূপে রহিয়াছি, ততক্ষণ সে শক্তির অস্তিত্ব যে আছেই, এ বিষয়ে সকলেই একমত। এই শক্তিকেই আমরা আমাদের ধারণাগম্য বিভিন্ন নামের বা নাম-রূপের আধারে রাখিয়া মায়া, প্রকৃতি, সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জগজ্জননী প্রভৃতি বলিয়া থাকি।

বেদের ব্রহ্মই তন্ত্রে জগন্মাতা

এই শক্তি ও তাহার সৃষ্টিই কি চরম সত্য, না তাহা এসবেরও পারে? বেদের মতো তন্ত্রও বলেন চরম সত্য সৃষ্টির অতীত। বেদান্তে উহার নাম ব্রহ্ম; তন্ত্র বলেন উহা শক্তিরই স্বরূপ। বলেন, শক্তি 'সাকারাপি নিরাকারা' (মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।৩৪)—'সাকারও, নিরাকারও'। তন্ত্র এই নিরাকার শক্তিকেই, বেদান্তে যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয় তাহাকেই সাকারা 'মা' বলিয়া আরাধনা করিতে শিখাইয়াছেন, চরমে মায়ের নিরাকার স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্যই। নিরাকারকে তো আর চিন্তা করা যায় না, সাধক প্রথমে তাঁহাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাইবে কিরূপে? অরূপা মা তাই সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেই রূপধারণ করেন—'সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী'। এই 'রূপধারিণী' মাকে সাধক ভালবাসিতে পারে, পূজা করিতে, ধ্যান করিতে পারে। এই আরাধনার ফলে ক্রমে মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর করিয়া সৃষ্টির সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরে প্রবেশ করিতে করিতে

শেষে এমন একজাগায় আসিয়া উপনীত হয়, যেখানে সে নিজে ও মা ছাড়া আর কিছুই থাকে না ; থাকিলেও দেখে মা-ই সে-সব হইয়া রহিয়াছেন। সেখান হইতে মা তাঁহাকে 'অরূপের ঘরে' লইয়া যান, যেখানে মন-বুদ্ধিও থাকে না, মা ও ছেলের পৃথক অস্তিত্বও আর থাকে না, সবই এক অরূপ সত্তা হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীদুর্গা বেদমূলা

তন্ত্রে জগজ্জননী মহাশক্তিকে যে-সব বিভিন্ন মূর্তিতে আরাধনা করা হয়, শ্রীশ্রীদুর্গা তাহার অন্যতম। জগৎকারণকে তন্ত্রোক্ত মাতৃরূপে কল্পনার, এমনকি দুর্গামূর্তিরও মূল পাওয়া যায় আমাদের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার প্রাচীনতম বিবরণ যাহাতে বিধৃত, সেই বেদের মধ্যেই।

বেদের মধ্যে আবার প্রাচীনতম ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে দেখা যায় বিশ্বের নিয়ন্তার সন্ধানে মানুষ প্রথমে শক্তির কথাই ভাবিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, যে-শক্তি তাপরূপে বিকশিত হইতেছে, যে-শক্তির প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ হইতেছে, যে-শক্তিপ্রভাবে সমুদ্র শান্ত থাকে বা উত্তালতরঙ্গময় হয়, যে-শক্তি অগ্নিরূপে প্রকাশিত, যে শক্তি দিবারাত্রিরূপে পরিবর্তন ঘটাইতেছে ইত্যাদি—সেই শক্তিগুলিই নিজ নিজ পৃথক অধিকার লইয়া বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ঐ শক্তিগুলিকে অবশ্য শক্তিমান মিত্র, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, উষা, রাত্রি প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল। ইহা স্বাভাবিকই—শক্তি বিমূর্ত হইলেও কোন নামরূপবিশিষ্ট দেবদেবী-রূপ আধারে উহাকে ভাবিবার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই ; বরং বলা যায়, ভাবিতে হইলে যে-আকারেই হউক এরূপ করা ছাড়া আমাদের অন্য উপায়ও নাই—আকর্ষণ-বিকর্ষণশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি কোন্ বিমূর্ত শক্তিকে আমরা বাস্তব বা কল্পিত কোন আধার ছাড়া ধারণা করিতে পারি? জগন্নিয়ামক শক্তিকে প্রথমে বহু ও বিভিন্ন শক্তিমান দেবদেবীরূপে কল্পনা করিলেও একটি মূল শক্তিই যে বিভিন্ন শক্তিরূপে বিকশিত হইয়া জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে, এ ধারণা ক্রমে ঋগ্বেদে রূপ লইয়াছিল—'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥' (১।১৬৪।৪৬)—ইহাকেই (অগ্নিকে বা সূর্যকে) বলা হয় ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, ইনিই সেই গরুড়পক্ষী ; সত্তা একই, বিপ্রগণ তাহাকেই বহুভাবে বলেন। এ ধারণার আরও স্পষ্ট রূপ—'এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ। একৈবোষা সর্বমিদং বি ভাতি একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্॥' (৮।৫৮।২) —এক অগ্নি বহুভাবে প্রদীপ্ত, এক সূর্য বিশ্বে প্রভূত (বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন রূপে দৃষ্ট), এক উষা এই সব কিছুকে প্রকাশিত করিতেছেন ; সেইরূপ একই এই সব কিছু হইয়াছেন। এই 'এক'কে ঋগ্বেদে দেবী অদিতি-রূপেও কল্পনা করা হইয়াছে। বলা যায়, পরবর্তীকালে তন্ত্রের যে মহাশক্তি জগন্মাতা, যিনি 'জগন্মূর্তিঃ', 'দেবজননী', 'জগদ্ধাত্রী', 'সাকারাপি নিরাকারা' দুর্গা, তাঁহারও মূল নিহিত ঋগ্বেদের এই 'অদিতি'র মধ্যেই : 'যাহা কিছু জন্মিয়াছে, যাহা কিছু জন্মাইবে, সবই অদিতি। স্বর্গ অদিতি, অন্তরীক্ষ অদিতি ; মাতা, পিতা, পুত্র অদিতি ;' 'সমস্ত দেবতা অদিতি' (১।৮৯।১০)। 'অদিতি জ্যোতির্ময়ী, জগদ্ধাত্রী' (১।১৩৬।৩)। অদিতি শব্দের অর্থ (সায়ণভাষ্যে) অখণ্ডনীয়া—যাহার খণ্ড হয় না ; এখানে ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তির অভেদত্বেরও আভাষ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে একথা

স্পষ্টাক্ষরেই বলা হইয়াছে : চরমসত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ঋষি অম্ভৃণের কন্যা 'বাক্' ঘোষণা করিতেছেন, 'আমি সর্বজগতের অধীশ্বরী। আমি জানিয়াছি, আমি ব্রহ্মস্বরূপা'। 'আমিই বিশ্বের উৎপত্তিস্থল, আমিই বিশ্বরূপে বর্তমান' (১০।১২৫।৩,৮)। আবার, অনেকে মনে করেন, সিংহবাহনা অসুরদলনী দুর্গার মূলও রহিয়াছে ঋগ্বেদে, একদা সিংহরূপধারিণী 'বাক্' দেবী ও রণপ্রিয়া 'সরস্বতী' দেবীর মধ্যে।

বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্ অংশে 'দুর্গা' এবং 'উমা' নামও পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে, 'আমি তপস্যা-প্রদীপ্তা অগ্নিবর্ণা দুর্গাদেবীর শরণ লইলাম' (১০।১।৬৫), 'অম্বিকাপতি, পশুপতি, উমাপতিকে নমস্কার (১০।১৮।১), (দুর্গাগায়ত্রী) 'তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ' (১০।১।৭) প্রভৃতি। কোনোপনিষদে আছে, দেবতাদের হিতকল্পে ইন্দ্রের জ্ঞানগোচর হইবার জন্য অরূপ ব্রহ্ম প্রথমে জ্যোতির, পরে 'হিমালয়দুহিতা উমা'র রূপ ধারণ করিয়াছিলেন (৩।১২)।

দুর্গাপূজা

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, মেধা ঋষি সুরথ ও সমাধির নিকট দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন, 'তিনি আরাধিতা হইলে মানুষকে ইহলোকের ভোগ, স্বর্গ, মোক্ষ, সবই প্রদান করেন।' ঋষির কথা শুনিয়া সুরথ ও সমাধি মাটির প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গার আরাধনা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট বর লাভ করেন। সে আরাধনা 'পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নিজগাত্রের রক্ত দিয়া বলি' নিবেদন করিয়া পূজামাত্র নয়—'তিন বৎসরকাল কখনো উপবাসী, কখনো স্বল্লাহারী, তাঁহার চিন্তায় একাগ্রমনা ও সংযতচিত্ত থাকিয়া তাঁহারা কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন।' এই সংযম ও একাগ্রতার সাধনাই, তপস্যাই শক্তিপূজার, আমাদের অন্তরস্থ মহাশক্তিকে প্রসন্ন করিয়া জাগাইবার একমাত্র উপায়, শক্তি আরাধনার মূল কথা। শক্তির উদ্বোধন ছাড়া জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। আমরা শক্তি-আরাধনার এই মূল কথা ভুলিয়াছি বলিয়াই প্রতি বৎসর শত শত প্রতিমায় দুর্গাপূজা করা সত্ত্বেও শক্তির প্রসন্নতা-লাভে বঞ্চিত রহিয়াছি। অসংযম ও চিত্তের অস্থিরতাকে কমাইবার চেষ্টা না করিয়া পূজায় কেবল বাহিরের ঘটা করিলে, তাহার নাম আমরা যাহাই দিই, তাহা দুর্গাপূজা হয় না। আজ শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে দুর্গামাতার চরণে প্রার্থনা করি : মা! যে মন্দিরে একদিন শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতির তপস্যাপূত বীর হৃদয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হইবার জন্য তোমার আরাধনা করিয়াছিল, তোমার সেই ভারত-মন্দিরে আবার সেরূপ আরাধনার ভাব সন্তানদের হৃদয়ে জাগাইয়া দাও। তুমিই তো বুদ্ধিরূপে সকলের অন্তরে রহিয়াছ, তোমার ইচ্ছাই তো বাস্তবরূপ ধারণ করে—'মুহূর্তে যা হতে পারে দুর্নিবার ঘটনাপ্রবাহ।'

"মানুষ সর্বকালে যতটুকু শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যে-কোনও শক্তির যে পরিমাণে উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে পাইয়াছে।"

—'ভারতে শক্তিপূজা'—স্বামী সারদানন্দ

ভারতের যুবসম্প্রদায়ের প্রতি

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

স্বাধীনতালাভের সময় থেকে সারা দেশে যুবকদের মধ্যে আমাদের জাতিকে পুনর্গঠিত করার জন্য প্রবল উৎসাহ জেগেছে। এটা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, কাজে নামার আগে ভবিষ্য ভারত কি রকম হবে সে সম্বন্ধে ধারণা খুব পরিষ্কার থাকা চাই-ই। যেমন, কোন চিত্রকর ছবি আঁকার ইচ্ছা হওয়া মাত্র ক্যান্বিশে রং মাখাতে আরম্ভ করে না। এ পদ্ধতিতে ভাল ছবি আঁকা যায় না। চিত্রকর যা আঁকতে চাচ্ছে সে-সম্বন্ধে আগে তাকে ভালভাবে চিন্তা করতে হবে, সে-বিষয়ে মনে একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে। তারপর মানসপটে যা অঙ্কিত হয়েছে তাই-ই ফুটিয়ে তুলতে হবে ক্যান্বিশের ওপর। কোন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী তৈরি করার ব্যাপারেও একই কথা। সে প্রথম বুঝতে চায় বাড়ীটি কি ধরনের হবে—স্কুল, বা হাসপাতাল, বা আফিস হবে সেখানে, না বসবাস করা হবে? সেটি জেনে নিয়ে তারপর সে প্রয়োজনানুরূপ নক্সা আঁকতে বসে, নক্সায় বাড়ীর সব খুঁটিনাটি আঁকে। নির্মাণের কাজে হাত দেয় তার পর। তোমাদেরও তেমনি আগে ভবিষ্য ভারত সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিতে হবে, তারপর জাতিগঠনের কাজে নামবে।

ভারতকে কি একটা প্রবল সামরিকশক্তি-সম্পন্ন জাতিরূপে গড়ে তুলতে চাও? আমার বিশ্বাস তোমরা তা চাও না; কারণ কোন সামরিকশক্তি-সর্বস্ব জাতি দীর্ঘজীবী হয় নাই। হিটলার ও মুসোলিনীর ভাগ্যই দেখ না। তাহলে কি ভারতকে আমেরিকার মতো সমৃদ্ধ শিল্পোন্নত এবং কৃষিতে অতি-অগ্রসর জাতিরূপে গড়ে তুলতে চাও?

আমাদের জাতি দরিদ্র, জনসাধারণকে ভরণ-পোষণ করার জন্য আমাদের সম্পদ চাই। কিন্তু কেবল অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করলেই কি আমাদের সমস্যার সমাধান হবে? ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা বা অন্যান্য উন্নত জাতিগুলির মানসিক শান্তি ও আনন্দ আছে কি? না, তা নেই। সেখানকার যুবজীবনের দিকে তাকাও না—প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত হয়েও একদল ছেলে-মেয়ের মন ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যে ভরে গেছে, তারা ভাবছে জীবনে কিছুই পাওয়ার নেই; ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। তাদের অনেকে খুবই ধনী, কিন্তু জীবনের কোন লক্ষ্য খুঁজে না পেয়ে তাদের অনুভূতিতে এক ধরনের ভয়াবহ উদ্দেশ্যহীনতা বাসা বেঁধেছে।

আমাদের সামরিক শক্তি চাই আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য, প্রতিবেশী জাতিকে লুণ্ঠন করার জন্য নয়। আমাদের সম্পদ চাই আমাদের দরিদ্র জনগণের ভরণ-পোষণের জন্য, কিন্তু অতি-সমৃদ্ধিশালী হওয়টাই আমাদের জাতির আদর্শ হতে পারে না। এ-দুটি ছাড়া আরও কিছুর প্রয়োজন আছে—শক্তি ও সম্পদের সঙ্গে যা আমাদের শান্তিও দেবে; সেটি কি?

আমি তোমাদের বলব, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পড; পড়ে দেখ অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, কণিষ্ক এবং অন্যান্যদের যুগে ভারত শক্তিতে, সম্পদে, সুখে কত উন্নত ছিল! স্পষ্টই বোঝা

যায়, বৈদিক যুগে ও বৌদ্ধযুগে আমাদের কতকগুলি মহান আদর্শ ছিল, আর সেগুলিই অতীতে ভারতকে এত মহান করতে পেরেছিল। কিন্তু পরে এই অধঃপতন ঘটল কি ভাবে? এই অধঃপতনের কারণ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। কাজেই যে আদর্শগুলি আমাদের জাতিকে উন্নত করেছিল, ভবিষ্য ভারত-গঠনের কাজে সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে; যা আমাদের অধঃপতনের কারণ সেগুলিকে ত্যাগ করতে হবে; আর তার সঙ্গে নিতে হবে শিল্প ও বিজ্ঞান – যা নতুন, যা আগে ছিল না।

আজকাল বিজ্ঞানের কথায় আমাদের অগাধ বিশ্বাস; আমরা বলে থাকি, 'এটা বিজ্ঞান-সম্মত নয়, কুসংস্কার।' কিন্তু অতীত ভারতে ভাল জিনিস কিছু ছিল কি না যা গত তিন হাজার বছর ধরে আমাদের জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে—তা জানার জন্য চেষ্টামাত্র না করে, তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাশ্চাত্য আদর্শগুলির পিছনে ছোটাটাই কি বিজ্ঞানসম্মত, যে আদর্শগুলি এখনো কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণই হয় নাই, যেগুলির বয়স বড়জোর দু'শো বছর, কোন কোনটি তো এই সেদিনের? এ সব আদর্শ পাশ্চাত্য জাতিগুলির সমস্যার সমাধান করেছে কি? দেখে তো তা মনে হয় না। তাহলে এ-আদর্শের পিছনে ছোটা কেন?

যুব বন্ধুগণ! আমরা মানুষ। ভগবান আমাদের বিচারশক্তি দিয়েছেন তা ব্যবহার করার জন্য। অতএব যে-কেউ এসে জোর দিয়ে কিছু বলা মাত্রই বিচার না করে আমরা পশুপালের মতো চালিত হব কেন? কাজেই আমার পরামর্শ হল, আমাদের অতীতের, এবং বর্তমান যুগেরও সব তথ্য, সব সংবাদই তোমরা সংগ্রহ কর, সেগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা কর, তারপর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কর। উচ্ছ্বাসের দ্বারা চালিত হোয়ো না।

সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক প্রয়োজন হল চরিত্রের। চরিত্রবল ছাড়া কোন মহান লক্ষ্য-লাভ হয় না। মহাত্মাজীর দিকে তাকাও; দেখ, কিভাবে নিজ চরিত্রবলে তিনি জাতিকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং ইংরেজদের ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। কামান, পারমাণবিক বোমা, এসব কিছুই তিনি ব্যবহার করেননি। কাজেই ভারতকে উন্নত করতে হলে আগে নিজেদের চরিত্র গঠন কর, তারপর তোমাদের বিচারশক্তি ব্যবহার করে স্থির কর কি রকম ভারত তোমরা গড়তে চাও; তারপর স্থিরসংকল্প হয়ে, এমনকি জীবন পণ করেও কাজে নাম।

পূর্বোক্ত তথ্যসংগ্রহের কাজে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থগুলি তোমাদের দিঙ্‌নির্দেশ করবে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও মহিমার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটাবে।*

---

* 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ (এপ্রিল, ১৩৭০) প্রকাশিত মূল প্রবন্ধ 'Exhortations to the Youth of India' হইতে অনূদিত।—সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী

আর্ণল্ড টয়েনবী

আচরণে প্রকাশিত ব'লে—যা বলেছেন তা ক'রে দেখিয়েছেন ব'লে—শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনন্য। সে বাণী হল হিন্দুধর্মেরই চিরন্তন বাণী। হিন্দুধর্ম বা অন্য কোন ধর্মই যে সত্যের একমাত্র প্রতিরূপ বা মুক্তির একমাত্র পথ নয়—এ মত একমাত্র হিন্দুধর্মই পোষণ করে ব'লে ঐতিহাসিক পর্যায়ের ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম তুলনারহিত। স্বামী ঘনানন্দ এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হিন্দু দৃষ্টিতে উচ্চতর পর্যায়ের সব ধর্মমতই সত্য, সবই ভগবানলাভের যথার্থ পথ, এবং সবগুলিই মানবজাতির কাছে সমভাবে অপরিহার্য; কারণ সেগুলির প্রত্যেকটিই বিভিন্নভাবে একই সত্যের সন্ধান দেয়, এবং প্রত্যেকটিই বিভিন্ন পথে মানবসাধনার একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। কাজেই প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক মূল্য আছে, যা অপর কোনটির ভেতর পাওয়া যাবে না।

একথা জানা ভাল, কিন্তু জানাটুকুই যথেষ্ট নয়। ধর্ম শুধু বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় নয়। ধর্ম এমন একটা বিষয় যা উপলব্ধি করতে হয়, জীবনে রূপায়িত করতে হয়;—আর এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্যতাকে বিকশিত করে তুলেছিলেন। তিনি পর পর প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন ও ধর্মমতে, আবার ইসলাম এবং খৃষ্টমতেও সাধন করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর ধর্মসাধনা ও উপলব্ধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছিল যে, ততটা বোধ হয় এর আগে ভারত বা অন্য কোন দেশে আর কখনো ধর্মজগতের আর কোন মহাপুরুষের বেলা হয়নি। জগন্মাতা-রূপী সাকার ঈশ্বরের প্রতি তাঁর যে ভক্তি, তা তাঁর 'নিরাকার চৈতন্যের' উপলব্ধির পথে—আধ্যাত্মিক চরম সত্যের সঙ্গে নিজের পূর্ণ একত্বানুভূতির পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে এবং যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন, সেখানে সে সময় তাঁর ও তাঁর বাণীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। হিন্দু ধর্ম-ঐতিহ্যের পরিবেশে লালিত নন এমন কারো পক্ষে এ বাণী প্রচার করা অসম্ভবপ্রায় ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি যে-জগতে জন্মেছিলেন তা তাঁর জীবৎকালেই এই সর্বপ্রথম আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বজোড়া একত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'তে শুরু করেছিল। আজও আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের এই যুগসন্ধির অধ্যায়েই বাস করছি; কিন্তু ইতিমধ্যেই এটা পরিষ্কার হ'য়ে আসছে যে, প্রাশ্চাত্য-প্রারম্ভ এই অধ্যায়টিকে ভারতীয় পরিসমাপ্তি লাভ করতেই হবে, যদি মানবজাতির আত্মধ্বংসে সে অধ্যায়টির সমাপ্তিকে রুখতে হয়। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যা বস্তুতান্ত্রিক স্তরে পৃথিবীকে এক করেছে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য নৈপুণ্য শুধু তো দূরত্বকে লুপ্ত করে নাই; দূরত্ব কমিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষকে যখন পরস্পরের ওপর সরাসরি আঘাত হানার মতো অবস্থায় এনে ফেলা হয়েছে, অথচ যখন পর্যন্ত তারা পরস্পরকে বুঝতে ও ভালবাসতে শেখে নাই, এমন এক সময়েই তাদের হাতে বিপুল-বিধ্বংসী অস্ত্রসমূহও সে তুলে দিয়েছে। মানব-ইতিহাসের এই চরম

বিপজ্জনক মুহূর্তে ভারতীয় পন্থাই মানবজাতির মুক্তির একমাত্র পথ। মহারাজ অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আচরিত ধর্মসমন্বয়ের প্রমাণ—এসবের ভেতর যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব আছে, তাই ই একপ্রাণতার বিকাশের মাধ্যমে মানবজাতিকে একপরিবারভুক্ত করা সম্ভব করে তুলতে পারে; এই পারমাণবিক যুগে আমাদের আত্মঘাতী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার এইটাই একমাত্র পথ।

বর্তমান পারমাণবিক যুগে এই ভারতীয় পন্থা অনুসরণের জন্য সমগ্র মানবজাতির নিকট একটা উপযোগবাদী প্রেরণা আছে। আর কোন উপযোগবাদী প্রেরণা এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী, বেশী সম্মানার্হ হতে পারে না। মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষাই এখন সঙ্কটাপন্ন। তথাপি, সর্বাধিক শক্তিশালী ও সর্বাধিক সম্মানার্হ উপযোগবাদী প্রেরণা বলেই রামকৃষ্ণ, গান্ধী ও অশোকের উপদেশে গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'তে ও তদনুসারে চলতে হবে,—তাঁদের উপদেশ-গ্রহণের কারণরূপে এটা গৌণ। এর মুখ্য কারণ হল—এ উপদেশ যথাযথ; যথাযথ, কারণ তা আধ্যাত্মিক সত্যের যথার্থ-উপলব্ধি-প্রসূত।*…

[৩০ অগস্ট, ১৯৬৯]

* স্বামী ঘনানন্দ-লিখিত 'Sri Ramakrishna and His Unique Message' গ্রন্থের প্রাক্কথন হইতে অনূদিত।—সঃ

শ্রীদুর্গা-করাবলম্বস্তোত্রম্

স্বামী হর্ষানন্দ

দুষ্টৈর্নিহত্য মহিষাদি সুরারি-বর্গৈ-
র্গাঢ়ং নিপীড়িততনুং সুরসৈন্যবৃন্দম্।
যৈরষ্টহস্তকমলৈঃ পরিপাসি তৈঃ স্ম
দুর্গেঽম্ব দেবি মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১

নক্তংদিবং হৃতবিবেকমহাধনস্য
মোষৈঃ শিবে বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়ৈঃ।
স্তুত্যাঙ্ঘ্রিপদ্মযুগলে সুরসৈন্যপালে
দুর্গেঽম্ব দেবি মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ২

হে মাতঃ দেবি দুর্গে! মহিষাসুরাদি দুষ্ট শত্রুগণ কর্তৃক দলিত সাতিশয় জর্জরিতদেহ দেবসৈন্যদলকে তোমার কমলনিভ যে অষ্টহস্তে তুমি রক্ষা করিয়াছিলে, তোমার সেই হস্তের আশ্রয় আমাকে দাও। ১॥

হে শিবে, দেবসৈন্যপালিকে! স্তুতিযোগ্য তোমার পাদপদ্মযুগল। ইন্দ্রিয়নামা বলবান দস্যুগণ রাত্রিদিন আমার বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিতেছে। হে মাতঃ দেবি দুর্গে! তোমার হস্তের আশ্রয় আমাকে দাও। ২॥

'এবংপ্রভাবা সা দেবী'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের শেষ অধ্যায়। শ্রোতৃদ্বয় —রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধিকে ঋষি বলিতেছেন, এই তো এতক্ষণ ধরিয়া মহামায়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম তোমাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য। বস্তুতঃ মহামায়ার শক্তি বুঝিবার জন্য রোমাঞ্চকর বর্ণনার প্রয়োজন হয় না, যদি শ্রোতার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। ধারণার ক্ষমতা যাহার সূক্ষ্ম সে দেখিতে পায় জগৎ-সংসারের প্রত্যেকটি ব্যাপারের মধ্যে একটি দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা রহিয়াছে এবং এই প্রহেলিকার নায়িকা হইলেন এক সর্বব্যাপিনী চৈতন্যশক্তি। সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা হাসি-কান্না রোগ-স্বাস্থ্য জীবন-মৃত্যু আপদ-বিপদ জ্ঞান-অজ্ঞান ভালবাসা-ঘৃণা জোড়ে জোড়ে এই ধরনের অভিব্যক্তি দিয়া তিনি সৃষ্টি চালাইতেছেন। ইহাই সংসারের নিয়ম। কেন এই নিয়ম সে প্রশ্ন করিবার অধিকার মানুষের নাই। যদি এই নিয়ম ভাল না লাগে তো সৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাও। উহার নাম মুক্তি। মুক্তিলাভ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। আর যদি এই দ্বন্দ্বময় প্রহেলিকার সহিত প্রেমবদ্ধ হইয়া সৃষ্টিরই মধ্যে থাকিতে চাও তো থাকো, আমার কিছু বলিবার নাই। ঐ অবস্থার নাম বন্ধন। যে মহাশক্তির কথা বলিতেছিলাম তিনি বন্ধন ও মুক্তি দুইটিরই বিধাত্রী। ঋষি বলিতেছেন—

জগৎসংসারের প্রত্যেকটি ব্যাপারের মধ্যে মহামায়ার শক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনা তোমাদের নাই। সেই জন্য তাঁহার শক্তির বাহ্য বিকাশ কতকগুলি কাহিনীর মাধ্যমে তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি—যুগে যুগে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার বিশেষ আবির্ভাবের কাহিনী। তোমরা শুনিলে কি করিয়া এক যুগে তিনি মধুকৈটভ নামক অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন, আর একযুগে মহাদুর্গার রূপ লইয়া মহিষাসুরের ত্রিলোক-সন্তাপকর দম্ভকে নিবারণ করিয়াছিলেন, আবার অপর এক সময়ে কাম, মোহ, বিদ্বেষ ও মোহের প্রতীক শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয় কিভাবে দেবী মহামায়ার বিচিত্র প্রভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 'এবংপ্রভাবা সা দেবী'। সেই দেবী মহামায়ার এইরূপই প্রভাব। অঘটনঘটন-পটীয়সী তিনি। এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার শক্তির এলাকার মধ্যে নয়।

চণ্ডীগ্রন্থের প্রারম্ভ মানুষের জীবনে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের কারণ কি এই প্রশ্ন লইয়া। সুরথ ও সমাধি উভয়েই অন্তর্দ্বন্দ্বে জরজর। ঋষির নিকট তাঁহারা এই দ্বন্দ্বের সমাধান চাহিয়াছিলেন। কেন যাহা চাই তাহা পাই না, যাহা পাই তাহা রাখিতে পারি না? কেন সুচিরপোষিত ভালবাসা নিমেষে বিষ হইয়া উঠে, বিশ্বাস ও সততা ছলনা ও নিষ্ঠুরতা দ্বারা প্রতিহত হয়? সকালের ফুল কেন সাঁঝে ঝরিয়া যায়, পরিষ্কার আকাশকে কেন হঠাৎ কালো মেঘ ছাইয়া ফেলে?

সুরথ ও সমাধির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ঋষিকে ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতে হইয়াছিল। উপায়ান্তর ছিল না। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাইতে হয়। সংসারনিয়ন্ত্রী

মহামায়ার প্রভাব বাহিরে বুঝিতে পারিলে পরে সেই প্রভাবকে অন্তর্জগতে ধরা যায়। অতএব ঋষিরুবাচ :—বিষ্ণু ঘুমাইয়া আছেন। ব্রহ্মা বিপদে পড়িয়াছেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে দুই কৃতান্তসদৃশ দৈত্যের আবির্ভাব। শক্তিশালী দুই অসুরের ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া ব্রহ্মা কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। বিষ্ণুর ঘুম ভাঙানো তাঁহার কর্ম নয়। অতএব বিপদে পড়িলে শিশু যা'হা করে অতিবৃদ্ধ প্রজাপতি ব্রহ্মা লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাই করিলেন। মা মা—মা বলিয়া ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে লাগিলেন। রক্ষা কর, মা। রক্ষা কর, মা। বিষ্ণু ঘুমাইতে পারেন কিন্তু জগদ্বিধাত্রী মহাজননীর ঘুমের অবসর কোথায়? ব্রহ্মার ডাক শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। যে সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া তিনি বিষ্ণুকে ঘুম পাড়াইয়াছিলেন উহারই উলটা স্পর্শে তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়া বলিলেন, যাও লড়াই কর। অসুর দুটি বড় উৎপাত করিতেছে, উহাদিগকে বিনষ্ট কর। হাড়ের মালা যাঁহার গলার ভূষণ, 'মারো কাটো' বলিতে তাঁহার মুখে আটকায় না। আটকাইবেই বা কেন? জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই যে তাঁহার চোখে সমান।

বিষ্ণু লড়িতেছেন, মধুকৈটভ হাঁপাইতেছে। দেবী কিন্তু হাসিতেছেন। বিষ্ণু যখন আর পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন চির-বালিকা মায়ের মনে একটু খেলা জাগিয়া উঠিল। তিনিই মনবুদ্ধিরূপিণী। মধুকৈটভের মনের মধ্যে ঢুকিয়া উহাদের মন গুলাইয়া দিলেন। উহারা প্রতিদ্বন্দ্বী নারায়ণকে বলিয়া উঠিল, 'বর চাও।' কি বর চাহিতে হইবে তাহা দেবী বিষ্ণুর কানে কানে বলিয়া দিলেন—'আমার হাতে তোমাদের মৃত্যু।' মধুকৈটভদমনের বিচিত্র কাহিনী! এমনই মহিষাসুরবধের, শুম্ভনিশুম্ভধ্বংসের রোমাঞ্চকর সংবাদ। এই সব শুনিলে দেবী মহামায়ার সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী সর্বতো-ব্যাপ্তা শক্তিকে বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় কি?

ঋষি কিন্তু দেবীর বিশেষ লীলাত্রয় বর্ণনা করিবার আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিঃ,' জগৎসংসারে তাঁহার প্রভাব অবিচ্ছিন্নভাবে সর্বদাই সক্রিয়। যাহার চোখ খুলিয়াছে সে দেখিতে পায় যে এমন বস্তু নাই যাহা মায়ের সত্তায় অস্তিত্ববান নয়, এমন ঘটনা নাই যাহা মহামায়ার শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না; এমন কাল নাই, এমন নিয়ম নাই যাহা কালাতীতা সর্বনিয়মাতীতার হাতছানিতে অনাবর্তিত।

"জলে স্থলে আকাশেতে যে দিকেতে চাই
সেইখানে মা দাঁড়িয়ে আছেন,
দেখতে আমি পাই
(আবার) মনের মধ্যে দয়া মায়া
চিন্তারূপে মা আমারি।
আমার কেমন মা তা কেমন করে
বলতে গো পারি।"

বিস্ময়, বিস্ময়, বিস্ময়। অনন্ত আকাশে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রের মেলা—সাগরমেখলা পৃথিবী—পৃথিবীপৃষ্ঠে অসংখ্য আকার-প্রকারের জীব-দেহে বিচিত্র প্রাণ-প্রবাহ—মানুষ—মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উল্লাস-বেদনা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য দর্শন ধর্ম—আমাদের পৃথিবীর মতো সম্ভবতঃ আরও অসংখ্য পৃথিবী—এরই মতো হয়তো আরও অনেক বিশ্ব—অণু-পরমাণুর জগৎ—অকল্পনীয় সূক্ষ্মতা। কোথায় মা দাঁড়াইয়া নাই? কোথায় মহামায়ার নিত্যলীলার পরিনির্বাহ হইতেছে না? বিবেক বৈরাগ্য উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে 'এবংপ্রভাবা সা দেবী'—ঋষির এই উক্তির

ভূয়িষ্ঠ সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। বাংলার সাধক গাহিয়াছেন—

শ্যামা মা কি কল করেছে,
কালী মা কি কল করেছে।
চৌদ্দপোয়া কলের ভিতর
কত রঙ্গ দেখাতেছে।
আপনি থাকি কলের ভিতরি,
ঘুরায় ধরে কলডুরি
কল বলে আপনি ঘুরি,
জানে না কে ঘুরাতেছে।
যে কলে জেনেছে তারে,
কল হতে আর হবে না তারে
কোনও কলের ভক্তিডোরে
আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।

সাধক দেখিতেছেন মহামায়ার অত্যদ্ভুত বিভূতি আমাদের দেহের মধ্যেই সমধিক প্রকাশিত। দেহযন্ত্রের প্রত্যেকটি স্পন্দন যন্ত্রী চৈতন্যময়ীর সত্তার দরুন ঘটিলেও যন্ত্র আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যন্ত্র আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ক্ষুদ্র আমিই কর্তা। ইহারই নাম অজ্ঞান। সাধনার দ্বারা এবং জগজ্জননীর কৃপায় এই ভ্রম যদি কাটিয়া যায় তখন আমরা আমাদের দেহের মধ্যে চৈতন্যময়ীকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার পশ্চাতে, প্রত্যেকটি চিন্তা-আবেগের মধ্যে আমরা তখন চৈতন্যের স্ফূর্তি ধরিতে পারি। তখন মা আর লুকাইয়া থাকিতে পারেন না। নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মায়াতীত স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকট করিয়া আমাদের 'ভক্তিডোরে' বাঁধা থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে এইভাবে প্রার্থনা করিতে শিখাইতেন—মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরনী; যেমন চালাও তেমনি চলি। নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। আমরা যখন মহামায়াকে কেনোপনিষদের ভাষায় আমাদের চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন বলিয়া ধারণা করিতে পারি তখন আমরা মায়ের নিত্যসান্নিধ্য লাভ করিয়াছি। রূপ এবং অরূপ, সসীম এবং অসীম, মায়িক এবং নির্মায়িক ইহাদের হেঁয়ালি তখন আমাদের নিকট কাটিয়া গিয়াছে।

মুণ্ডক উপনিষদ্ প্রথমে এক অধ্যায়ে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির বর্ণনা করিলেন। জলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে যেমন অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চের সবকিছু উদ্ভূত হয়। সাগর, নদী, অরণ্যানী, পর্বত, ভূলোক, দ্যুলোক, জীবের প্রাণ মন ইন্দ্রিয়নিচয়, অসংখ্য জীব, কর্মবিধান, নীতি, সমাজশৃঙ্খলা—সবই সর্বকারণ ব্রহ্মের অভিব্যঞ্জনা। পরবর্তী অধ্যায়ে উপনিষদ্ সাধককে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে দেহ-প্রাণমন-সংঘাতের মধ্যে ধারণা করিবার উপদেশ দিতেছেন—

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম।
মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম।

(মুণ্ডক উঃ ২।২।১)

"আমাদেরই হৃদয়গুহায় সেই মহত্তম সর্বাশ্রয় জ্যোতির্ময় ব্রহ্মচৈতন্য বিরাজ করিতেছেন।"

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্ বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥

(মুণ্ডক উঃ ২।২।৮)

"তিনি মনের মধ্যে ঢুকিয়া আছেন, প্রাণ ও সূক্ষ্ম দেহকে চালাইতেছেন, আবার অন্নময় স্থূলদেহের পরিপুষ্টি তাঁহা হইতেই। আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ তাঁহাকে বিবেকিগণ

তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি করেন।"

মুণ্ডক উপনিষদ্ যাঁহাকে এই অধ্যায়ে সগুণ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তিনিই চণ্ডীগ্রন্থে চৈতন্যময়ী মহামায়া।

'এবংপ্রভাবা সা দেবী'। প্রথমে বাহিরে, পরে অন্তরে তাঁহার প্রকাশকে ধারণা করিতে হইবে। এই ধারণা যত পরিপক্ব হয় ততই আমাদের অলীক ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় আমাদের 'কাঁচা আমি' ক্ষীণ হইতে থাকে। আমরা বলিতে শিখি—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের শেষে ঋষি শ্রোতৃদ্বয়কে সেই উপদেশই দিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলেন—'তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।' হে মহারাজ, সেই ভোগমোক্ষদায়িনী সংসার-চালিকা পরমেশ্বরীর শরণ লও। তিনি প্রসন্ন না হইলে উপায় নাই। ভোগে আসিবে শত বাধা, অপবর্গের পথও কণ্টকিত থাকিবে। তিনি যদি তুষ্ট হন তো পর্বতপ্রমাণ বাধা সহজেই ধূলিসাৎ হয়, ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন এক নিমেষে পরিণত হয় প্রাণজুড়ানো সুস্বপ্নে, নিবিড় মেঘ ফাঁড়িয়া চকিতে দেখা দেয় সূর্যালোক, কূলহীন দরিয়ায় দিশাহারা নৌকা হঠাৎ ডাঙ্গা খুঁজিয়া পায়।

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

সকল ভূতের মধ্যে বিষ্ণুমায়া-রূপে যিনি সংস্থিত থাকিয়া সকলকে চালাইতেছেন তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার।

এই শরতে

শ্রীঅপূর্বকুমার কুণ্ডু

আজ শরতের কমলবনে কার ও পায়ের চিহ্ন আঁকা,
মিষ্টি রোদের আলোতে আজ কার সে মধুর পরশ মাখা।
কার খুশিতে শিউলি বনে
ঘুরছে ভ্রমর আপন মনে,
কে আসে আজ বাংলা দেশে কাশের চামর দুলিয়ে দিয়ে।
ফুটছে শালুক রং ঝরানো কোন সে খুশির আবেশ নিয়ে।

কার ছোঁয়াতে রঙীন হল সবার হৃদয় এক নিমেষে,
অনেক পাবার আনন্দে আজ সবার হৃদয় উঠছে হেসে।
উদাস বাউল একতারাতে
তুলছে যে সুর নিজের হাতে,
সেই সুরেরই ঝরনাধারায় আগমনীর উদ্বোধনে।
নতুন করে শংখ বাজুক একসাথে আজ সবার মনে।

পুণ্যগন্ধা পৃথিবী

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কবে একদিন ১৫।১৬ বছর আগে কথকতা শুনতে গিয়েছিলাম এক জায়গায়—সেদিন সেখানে গীতার বিভূতি-যোগের ব্যাখ্যা হচ্ছিল। হঠাৎ কানে এলো, পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাম্। বক্তা ব্যাখ্যা করছেন। সহসা যেন মন ইন্দ্রিয় চোখ কান একসঙ্গে কি একটা আশ্চর্য রূপবোধ করলো. সর্বেন্দ্রিয়ময় রূপজগৎ চোখের সামনে ভেসে এলো। অকারণ আনন্দের, অবোধ্য অর্থবোধের একটা আলোর ঝলক দৃষ্টি-স্পর্শ-অনুভবের জগতের ছায়ায় হঠাৎ যেন কে ছড়িয়ে দিল চোখের সামনে। পূজা-আহ্নিকের সময় ধর্মগ্রন্থহিসেবে পডবার সময় তো কত বারই পডেছি। কিন্তু সেদিনকার সেই শোনায় যে আশ্চর্য অনুভূতি ও পৃথিবীর মহিমাবোধ তা পড়ার সময়তো অনুভব করিনি। (তাই কি শাস্ত্র বলেন আবৃত্তির মহিমা আলাদা; বুদ্ধির জগতের দুয়ার অতিক্রম করে সে মহিমা।)

মনের চোখের সামনে ভেসে এলো ফেরার পথে রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে আবৃত জানা ও অজানা গাছ লতা পাতা,—যা শহরের পথে নেই! মনের পথে তার অনুভূতি। পায়ের নীচের পথে, শহরের বালি কাঁকর ধুলো খোয়ার নিচে পুণ্যময়ী পৃথিবীর স্পর্শ গন্ধ? না, সেও মনে মনেই জাগল। ভেসে এলো কবে কোন্ গ্রামের বাড়ীর প্রাঙ্গণের ভোরের শিশিরে ভেজা মাটিতে পাওয়া শিউলী কামিনী ভুঁইচাপা দোপাটি কৃষ্ণকলি ছড়ানো সিক্ত মাটির পুণ্যগন্ধ। কতকাল আমার দেখা সেই পুণ্যগন্ধময়ী, পুণ্যস্পর্শময়ী পৃথিবীকে এবারে নতুন করে আশ্চর্য হয়ে মনে মনেই দেখতে পেলাম যেন।

মনে হ'ল আমি তো দেখেছিলাম সবই তাদের—ছোট থেকে বড হয়ে খেলার দিনে, সুখের দুঃখের হাসিকান্নার দিনেও; দেখেছিলাম পাহাডে পথে চলতে, নদী-সাগরের জলে স্নান করতে; পায়ে পায়ে পায়ের তলায় প্রাঙ্গণে প্রান্তরে, দুপুরের স্তব্ধতায় সন্ধ্যার শান্তিতে—সেই পুণ্যভূমির সিক্ত ভেজা ভেজা গন্ধ, হয়ত রুক্ষস্পর্শ গন্ধও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এই পুণ্যগন্ধা ধরিত্রী যে এত সুরভিত এত মনোহর স্পর্শে গন্ধে রূপে, তা তো ঐ শ্লোকটি শোনার আগে কখনো ভাবতে জানতাম না। এত রূপও দেখতে পেতাম না! কত কবির কত কাব্য তো পডেছি। পড়েছি,

'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না।'

কিন্তু আধ লাইনের এই শ্লোকে পৃথিবীর এত ঘনসন্নিবিষ্ট রূপ স্পর্শ গন্ধের মহিমা উপলব্ধি হয়, তা জানা ছিল না।

* *

জীবনযাত্রায় এর অনেক আগেই পথে নেমেছিলাম। পথ আর ঘর প্রায় সমানই হয়ে গিয়েছিল তখন থেকে। কত না তীর্থে তীর্থে পথের আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছিলাম, এই কথকতা শোনার পর তার আগে-না-জানা মনোহর রূপ চোখের সামনে জেগে উঠল। মনে হ'ল তাই বুঝি পৃথিবী মানুষকে বার বার পথে পথে এত ডাক দেন। তাই বুঝি এত তীর্থ আমাদের দেশে দেশে—

তার স্পর্শ গন্ধ নিয়ে, তার অব্যক্ত আহ্বান নিয়ে, তার রূপ নিয়ে। যে রূপ চোখেও দেখা যায়, আবার মনেও দেখা যায়। মনই তো আস্বাদ করে। চোখ আদি তো ইন্দ্রিয়ের বাতায়নমাত্র। এই শোনার পর থেকে চোখ দেখে মনের চোখে। মাটির গন্ধ ছোট শিশুদের মত হাতের ছোঁয়ায় ছুঁই। পায়ের তলায় সোঁদা সোঁদা গন্ধের আনন্দ জাগে। বাতাসে প্রসন্নতা। ফুল ফল গাছ পাতায় চেতন অবচেতন জীবনে, এই দেহ-ধারণের দুঃখসুখময়, কখনো বিরাগবিতৃষ্ণাময় জীবনেও ঐ আশ্চর্য পুণ্যময়ী পুণ্যগন্ধার দেহ-সৌরভ যেন দুর্গাপূজার ধূপ ধুনা পুষ্প পত্রের সৌরভের মত মনকে অভিভূত করে, এক মহা-মহিমময় অনুভূতিতে উপলব্ধিতে নিয়ে যায়।

* *

একসময়ে বদরিকাশ্রমের পথে গিয়েছিলাম। পায়ে চলার পথেই। যানবাহনে নয়। একদিকে ভীমশৃঙ্গময় উত্তুঙ্গ পাহাড়ের শ্রেণী—দেবদারু আর নানা রকমের গাছ গুল্ম লতা ফুলে ফলে ভরা; অন্য দিকে কখনো নীচে কখনো কাছে পাশেই অলকানন্দা মন্দাকিনী নানা নামে নানা ভঙ্গীতে কখনো উচ্ছল উদ্দাম কখনো শান্ত স্রোতে বয়ে চলেছেন।

মন থমকে চেয়েছে চলার পথেই, যেন ঐ গন্ধ স্পর্শ রূপ কুড়িয়ে নেবে। মেখে নেবে গায়ে। যদিও তখনো ঐ শ্লোকটির টুকরোটিকে রূপে গন্ধে রসে অনুভব করিনি। এ অনুভূতি পরে এসেছে স্মৃতির পথে। যেন পৃথিবীশ্বর তাঁর পুণ্যগন্ধা পৃথিবীর সুরভিকে মানুষের অঙ্গে গায়ে মেখে মিশিয়ে নিতে বলছেন। তারপর আসবে তাঁর মনভোলানো মনোহর রূপ দেখার পালা। 'আগে শোনো শাস্ত্রবাণী'। 'শোনো শোনো'র আহ্বান।

আরো পথ আরো তীর্থ—গঙ্গা যমুনা কাবেরী গোদাবরীপথের, সাগর-সমুদ্রের, সাগরসঙ্গমের—ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে দেহমন; পৃথিবীর স্পর্শ সত্য, না মানুষের অনুভবই সত্য?—দুইকে পৃথক করতে পারিনি। মনে হয়েছে সেই কবিতাই—

হে পুণ্যগন্ধময় পৃথিবীশ্বর—
'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না।'

আর মনে হয়েছে কাকে চায় মন, কাকে চেয়েছি, তাও তো জানি না। সেই তিনি কোথায় আছেন—কোথায় থাকেন তাও জানি না। সে কি আমাদের বাসনা বেদনা আশা হতাশায় মলিন পৃথিবীতে উপলব্ধ হয়?

তারপর মনে পড়ে সেই পরম বাক্য, তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত। তাঁর অনেক রূপময় সেই মহিমার আর এক মহারূপ পুণ্যগন্ধা পৃথিবী। যে পৃথিবী মনুষকে কোলে ধরে আছেন, তাঁকে ও নিজেকে জানার জন্য। সেইখানেই তাঁকে পাওয়া যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তিপঞ্চকম্

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ

সর্বাবতারবর্ষায় সারদাবল্লভায় চ।
শ্রী রামকৃষ্ণদেবায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ১
সর্বার্থসাধিকে দেবি শ্রীরামকৃষ্ণবল্লভে।
শ্রীসারদে জগন্মাতর্নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২
ঠাকুরস্যৈবাত্মমূর্তেঃ সকাশাৎ শ্রীনরেন্দ্রতঃ।
ঠাকুরস্যোত্তমাভক্তিং শিক্ষেরন্ সর্বমানবাঃ ॥ ৩
ভজনং রামকৃষ্ণস্য জানন্তি তস্য পার্ষদাঃ।
নিত্যসিদ্ধগণা এব নান্যভক্তা মনাগপি ॥ ৪
যতস্তদতিদুর্বোধ্যমতিগুহ্যং ভবাপহম্।
বিশুদ্ধং দুর্লভং দীপ্তং যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥ ৫

পৃথিবীতে যে-সকল অবতার হইয়াছেন তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি সাক্ষাৎ ভগবতী সারদাদেবীর পতি, ষড়ৈশ্বর্য-বিভূষিত স্বয়ং ভগবান। সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে কোটি কোটি নমস্কার করি। ১

ধর্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্বর্গফলদায়িনী শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধাঙ্গিনী জগন্মাতা সারদাদেবীকে অসংখ্য প্রণাম করি। ২

ঠাকুরেরই অন্যরূপে প্রকাশস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত নরনারীই ঠাকুরের বিশুদ্ধা বা সর্বোত্তমা ভক্তি শিক্ষা করিবেন। ৩

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধন-ভজন তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণই জানেন। তাঁহাদের ভাবানুগ না হইলে ভক্তমানসে শ্রীরামকৃষ্ণভাবের যথাযথ ধারণা সম্ভব নয়; ৪

কারণ, সেই ভজনতত্ত্বটি অতি গুহ্য, অতি দুর্বোধ্য, জন্মমরণাদি সংসার-তাপনাশক, বিশুদ্ধ, দুর্লভ ও ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ; সেই তত্ত্বটি জানিলেই অমৃতত্বলাভের অধিকারী হওয়া যায়। ৫

লেখকের বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও তাঁহার আশীর্বাদলাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৯৪ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। তিনি কিছুদিন পূর্বে সংস্কৃত ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্" গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—সঃ

রাজা মহারাজ — স্মৃতিকথা

স্বামী পুণ্যানন্দ

সে ১৯২১ সালের কথা। তখনও মঠে যোগদান করিনি, পাঠ্যাবস্থা। সুদূর মফস্বল শহর থেকে কলকাতা এসেছি। আসবার পূর্বে পূজ্যপাদ স্বামী আত্মানন্দজী (শুকুল মহারাজ) সস্নেহ নির্দেশ দিয়েছেন মঠে রাজা মহারাজকে দেখে আসতে। সেই নির্দেশ আমার নিকট আদেশের মতো। সুতরাং সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও বেলুড় মঠের দিকে রওনা হলাম। মধ্যাহ্নকাল। কুঠিঘাটে নেমেছি, ওপারে বেলুড় মঠ। কি আগ্রহ, কি ঔৎসুক্য নিয়েই না সেদিন মঠের দিকে অনিমেষনয়নে তাকিয়ে ছিলাম। কত শ্রদ্ধা, কত ভালবাসা, কত কল্পনা। যথাসময়ে অপর পার থেকে খেয়া নৌকা এসে গেল। নৌকাতে বসে বারবার মনে হতে লাগল, এই সেই মঠ যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর সদা বিদ্যমান। ঠাকুর বলেছিলেন স্বামীজীকে, 'তুই আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেখানে রাখবি, আমি সেখানেই থাকবো।' আর স্বামীজীও 'আত্মারামে'র কৌটা কাঁধে করে এনে এখানে বসিয়েছেন। মনে হ'ল অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচর ও আদরের মানসপুত্র রাখাল, স্বামীজীর 'রাজা', ভক্তের 'মহারাজ' পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দর্শন করবো। সেই বিখ্যাত কথাটি মনে পড়লো, "যে আমার পুত্রকে দেখেছে, সে আমাকেই দেখেছে।"

পুরাতন ঠাকুরঘরে প্রণামাদি সেরে স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজীর (তখন ব্রঃ ত্যাগচৈতন্য) সাহায্যে মঠবাড়ীর দ্বিতলে উঠে এলাম। গঙ্গার দিকে বারান্দায় দক্ষিণাস্য হয়ে মহারাজ একখানি আরামকেদারায় বসেছেন, দুইদিকে সুদর্শন সেবকদ্বয়; গায়ে গলাকাটা পাঞ্জাবী। অতি মৃদুস্বরে কথা বলছেন। অনিমেষনয়নে চেয়ে আছি, এই শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র। স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়নি। শুনেছি, সেই সিংহগ্রীব পুরুষসিংহ মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মানুষের হৃদয় জয় করতে পারতেন। রাজা মহারাজকে দর্শন করেও মনে হয়েছিল কি বিরাট ব্যক্তিত্ব। যেন হিমালয়ের তুঙ্গতা এবং বিশালত্ব তাঁর মধ্যে বিধৃত। স্বামীজী বলেছিলেন,—"রাজা একটা দেশ শাসন করতে পারে।" মহারাজকে দেখে স্বামীজীর উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করলাম।

বারান্দায় অনেক ভক্ত বসেছিলেন। মহারাজের সান্নিধ্যে সকলেই পুলকিত, পরিতৃপ্ত। দেবদর্শনের আনন্দ অনুভব করছেন সবাই। অনেক রকম কথাই হচ্ছিল। মহারাজও মাঝে মাঝে কথায় যোগ দিচ্ছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছিল তাঁর মন যেন কথার মধ্যে নেই, এই জাগতিক পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে যেন কোন্ অসীম অনন্ত আনন্দলোকে বিচরণ করছে। মধ্যে মধ্যে গড়গড়ায় তামাক টানছেন, কিন্তু প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এক দিব্যজ্যোতি। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠিকই বলেছিলেন: সন্ন্যাসী দেখবি তো স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখে আয়।

প্রতীক্ষা শেষ হল। সময় হয়েছে। ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লাম। অতি সুমধুর কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথেকে আসছ?" উত্তর দিলাম। বললেন, "কোন বাড়ীতে গেলে বাড়ীর যিনি বড় তাঁর সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে হয়। মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের দাদা, তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ?" ত্রুটির কথা স্বীকার করলাম। বললেন :—"যাও দেখা কর।" এমনভাবে কথা কয়টি বললেন যে আজ জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হয়েও সেই মধুর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাচ্ছি। সেই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি, সে কমনীয় কান্তি আজও যেন চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। উত্তর কালে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণই এ ক্ষুদ্র জীবনের সম্বল হবে—একি তারই ইঙ্গিত?

অতিথি-ভবনের নিম্নতল, যেখানে বর্তমান মঠাধ্যক্ষ বাস করেন, সেখানে মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন। গিয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন রাজা মহারাজকে প্রণাম করেছি কি না। আমার উত্তর শুনে বললেন : "তবেই হয়েছে, আর কাউকে প্রণাম করতে হবে না।" গুরুভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কি শ্রদ্ধা, কি ভালবাসা। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানেরা শ্রীশ্রীমহারাজকে এই দৃষ্টিতেই দেখতেন। স্বামীজী বলেছিলেন, 'আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

আবার ফিরে এসেছি গঙ্গার দিকের দ্বিতলের বারান্দায়। এবার মহারাজ যেন একটু সাধারণ ভূমিতে নেমে এসেছেন। একজন ভক্তকে বলছেন :—'আজ চচ্চড়ি বেড়ে হয়েছিল, খাবে একটু?' সামনে উপস্থিত পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজকে বললেন ভক্তটিকে একটু চচ্চড়ি দিতে। তিনি উত্তরে বললেন,—'ভাত নেই।' মহারাজ আনন্দের সঙ্গে বললেন,—'হলোই বা।' শেষ কথাটি 'হলোই বা' আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও কানে বাজছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ কি একটা কাগজ নিয়ে সেখানে এলেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহারাজ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বহুদিন পূর্ব হতেই শুনে আসছি; কোথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা জানি না, অন্তত: দেখিনি। বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব হচ্ছে। নবমীপূজা। সঙ্ঘজননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা মঠে আসবেন পূজা দর্শন করবার জন্য। ভোর হতেই মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমহারাজ একেবারে বালকভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। কত আশার তপস্যা, কত প্রতীক্ষার সাধনা আজ সার্থক হতে চলেছে। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে একদিন যেমন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বালকভাবে রাখালরাজ লীলা করেছেন, অনেকটা সেই ভাব। মহারাজ ছিলেন গুরু-গম্ভীর, অত্যন্ত রাশভারী লোক। কিন্তু আজ আর সে ভাব নেই—একেবারে বালক। তাড়াতাড়ি ঈষদুষ্ণ গরম জলে স্নান সেরে একখানি মাদ্রাজী কাপড় পরেছেন। কোমরে জড়িয়েছেন একখানি সুন্দর মাদ্রাজী চাদর। নিজে সব তদারকি করছেন—কোথায় মঙ্গলঘট বসানো হবে, কোথায় মাঙ্গলিক চিহ্ন দেওয়া হবে। আর মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা' বলছেন। একবার মঠের দক্ষিণের ফটকে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন—ভাবে বিভোর, মুখে শুধু 'মা' 'মা' ধ্বনি। এদিকে মা আহিরিটোলার ঘাট থেকে স্টীমারে গঙ্গা পেরিয়ে সালকিয়ার ঘাটে এসেছেন এবং সদলবলে ঘোড়ার গাড়ীতে বেলুড় মঠাভিমুখে রওনা হয়েছেন। শ্রীশ্রীমহারাজের নির্দেশে সাইকেলের ডাক

বসানো হয়েছে—একজন করে সংবাদ নিয়ে আসছে গাড়ী কতদূর এলো। সবাই ব্যস্ত সন্ত্রস্ত—দেবী-অভ্যর্থনার আয়োজনে কোথাও কোন ত্রুটি না থেকে যায়। অবশেষে গাড়ী এসে দাঁড়ালো মঠের দক্ষিণ ফটকে। শ্রীশ্রীমহারাজ নিজে অগ্রগামী হয়ে গাড়ী নিয়ে এসে মঠপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী প্রতিমা দর্শন করবার পর, প্রথমে মহারাজ, পরে অন্যান্য সকলে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলেন। মা কিছুক্ষণ পূজাদি দর্শন করে মহাপুরুষ মহারাজের পুরাতন ঘরে এসে উপবেশন করলেন। আরম্ভ হ'ল কালীকীর্তন। জমজমাট ভাব। ভাবে বিভোর শ্রীশ্রীমহারাজ গুরুভাই- এবং শিষ্যগণপরিবৃত হয়ে সেই কীর্তনানন্দে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। শুধু মধ্যে মধ্যে পুলক শিহরণ হচ্ছে। কীর্তনের শেষভাগে গান আরম্ভ হ'ল—'যাই চলো সে নগরে, যেথায় দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।' চারদিকে ভাবের বন্যা বয়ে চলেছে। শ্রীশ্রীমহারাজ হঠাৎ দণ্ডায়মান হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁকে নৃত্য করতে দেখে ভাবে বিভোর অন্যান্যরা তাঁকে ঘিরে নাচতে শুরু করলেন। সম্মুখে শ্রীশ্রীভগবতীর প্রতিমা, পার্শ্বে গঙ্গা, আর উপরে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীমা, মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখালরাজ—ব্রজের রাখাল—ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করছেন, ঠিক যেমন ভাবে নৃত্য করতেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বর্গসুধানির্ঝ'র যেন ধরায় অবতরণ করেছে। সে অপূর্ব নৃত্য দর্শন করতে যে যেখানে ছিল সব ছুটে এসেছে, যে পারে নৃত্যে যোগদান করছে, যে পারে না দূরে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে। বহুক্ষণ এভাবে অতিবাহিত হবার পর একজন গুরুভাই মহারাজকে ধরে ফেললেন। তিনি জানতেন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, রাখাল যদি ভাবমুখে জানতে পারে সে কে, তবে এ শরীর সে ত্যাগ করবে। তাই এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভাববিহ্বল হলেই অন্যান্য গুরুভাইরা তাঁকে সাধারণ জগতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করতেন। মহারাজকে নিয়ে আসা হ'লো মঠবাড়ীর সিঁড়ির বামদিকে ছোট ঘরটিতে। তাঁর প্রিয় তামাক দেওয়া হ'লো, পুড়ে ছাই হ'লো, মহারাজ নল মুখেও দিলেন না। শিহরণ, কম্পন প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার শরীরে সব বর্তমান। চারদিকে লোকের ভীড়। মুখে কথা নেই, শুধু মধ্যে মধ্যে কাতরকণ্ঠে 'মা' 'মা' রব। ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর শ্রীশ্রীমাকে পাশের বাড়ীতে সংবাদ দেওয়া হ'লো। মা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে একটি ছোট রেকাবিতে কয়েকটি সন্দেশ নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আদর করে সন্তানকে বললেন—"রাখাল, খাও বাবা।" মাকে দেখে মহারাজ বালকের মতো হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। মায়ের চোখেও জল। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! মা নিজে একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে আদরের সন্তানকে প্রসাদ দিলেন এবং উপস্থিত সেবকদের সত্বর মহারাজকে কলকাতায় বলরাম মন্দিরে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হ'লো।

কিছুদিন পরে মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—মহারাজ তো ভাব চেপে রাখতে পারেন, কখনও বহিঃপ্রকাশ হতে দেন না, তবে সেদিন কেন এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। স্নেহময়ী জননী অশ্রুনয়নে বললেন, 'আমি যখন উপরে বসেছিলুম, দেখলুম ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যেমন রাখালের হাত ধরে কীর্তনে নাচতেন তেমনি করে একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে চেয়ে

নৃত্য কচ্ছেন। তখনই বুঝেছিলুম রাখাল বহুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে এই ভাবে নৃত্য করে তাঁর অদর্শনের বিরহ সহ্য করতে পারবে না। এই বিরহ-যন্ত্রণা তার পক্ষে অসহ্য হবে। তাই হয়েছিল। তাই তাকে রজোগুণ-প্রধান কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছিলুম।'

কীর্তনগানের একটি লাইন মনে পড়লো—'যাকে দেখলে পরাণ নেচে ওঠে, হরিনাম আপনি ফোটে, এমন মনের মানুষ মিলে কই।' সেই মনের মানুষই সেই শুভ সন্ধ্যায় মিলেছিল। সত্যই মনে হয়েছিল, 'পাই যদি সেই মনের মানুষ আদর করে বুকে লই।' রাজা মহারাজ সে তো অন্তরের অন্তঃস্থলে রাখবার জিনিস। একটি দিন মাত্র তাঁকে দেখেছি, তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনেছি। আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী অতীত হবার পর সেই দিনটি আজও আমার জীবনে চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়। মনে হয়, আবার যদি সেই দিনটি ফিরে আসে।

তোমার প্রসন্ন আলো

শ্রীশান্তশীল দাশ

সব আলো একে একে যদি নিভে যায়,
তুমি থাক' দীপ্যমান আমার অন্তরে ;
সেইখানে তুমি শুধু, সেই নিরালায়
একান্ত আপন হয়ে সে-আসন 'পরে।

তুমি তো আলোকময় চির অনির্বাণ :
বাহিরের আলো সে তো বড় ক্ষণিকের ;
জ্বলে নেভে—সে-আলোকে তৃপ্ত নহে প্রাণ,
তোমার প্রসন্ন আলো সে চিরদিনের।

সে-আলোয় স্নাত হয়ে তোমার চরণে
দেব আমি অশ্রু-অর্ঘ্য নিঃশব্দে নীরবে ;
সর্বকোলাহলমুক্ত সে-হৃদি গহনে
তোমার আরতি-মন্ত্র উচ্চারিত হবে
মনে মনে ; বাহিরে সে চির অপ্রকাশ—
তোমার প্রসাদদীপ্ত সে দিব্য আকাশ।

'তপো ব্রহ্মেতি'

ডক্টর রমা চৌধুরী

"তপস্যা"! এই একটিমাত্র সুন্দর সুমিষ্ট কথার মধ্যেই নিহিত হয়ে রয়েছে যুগযুগান্ত-ব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সাধনা ও আরাধনা, ধর্ম ও দর্শনের মূলমন্ত্র। সেজন্য পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তপস্যাকেই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে চিরকাল গ্রহণ করা হয়েছে। এই কারণে, ভারতদর্শনপ্রাণ উপনিষদ্-সমূহে তপস্যাকেই বরণীয়তম মোক্ষসাধনরূপে বন্দিত করা হয়েছে :—

"পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার।
অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।
তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।
তপো ব্রহ্মেতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা— ॥"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ॥ তৃতীয়বল্লী ॥)

বরুণপুত্র ভৃগু পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন 'ভগবন! আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।' বরুণ বললেন, তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানতে চেষ্টা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।' ভৃগু তপস্যা করলেন। তপস্যা করে তিনি—

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।—

—জানলেন ক্রমান্বয়ে যে অন্নই ব্রহ্ম, প্রাণই ব্রহ্ম, মনই ব্রহ্ম, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, আনন্দই ব্রহ্ম।

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৪।২২)

'ব্রাহ্মণগণ তাঁকে বেদবচন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনশনব্রত দ্বারা জানতে ইচ্ছা করেন। তাঁকে জেনেই মানব মুনি হন।"

"এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি
সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১।১৬)

"দুগ্ধে নিহিত ঘৃতবৎ যিনি
সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত—
আত্মবিদ্যা-তপোমূল যিনি
শ্রেষ্ঠরূপে বেদে ব্যক্ত,
সত্য-তপস্যা মাধ্যমে তিনি
আত্মায় হন প্রাপ্ত,
আত্মবিদ্যা-তপোমূল যিনি
শ্রেষ্ঠরূপে বেদে ব্যক্ত॥"

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা"

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।৫)

"এই আত্মাকে সত্য ও তপস্যা দ্বারা লাভ করা যায়।"

কিন্তু কেন এইভাবে "তপস্যা"কেই শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে? তার কারণ হল এই যে, এরূপ "তপস্যার" মধ্যেই নিহিত ও মিলিত হয়ে রয়েছে অন্যান্য সকল সাধন—জ্ঞান—ভক্তি—কর্ম একত্র। বস্তুতঃ, "তপস্যার" মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান; শ্রেষ্ঠভক্তি, অথবা ব্রহ্মভক্তি; শ্রেষ্ঠধর্ম অথবা ব্রহ্মসেবা।

এবং এরূপ "তপস্যার" অঙ্গাঙ্গী সাধন হল

"সন্ন্যাস", অথবা, সাংসারিকভোগবিমুখতা, যা না থাকলে "তপস্যাই" হয়ে পড়ে অসম্ভব।

এরূপ শ্রেষ্ঠ সাধনদ্বয় "তপস্যা" ও "সন্ন্যাসের" সম্বন্ধে সর্বজনবরেণ্যা ভগিনী নিবেদিতা কি বলেছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে। বিদেশিনী হয়েও তিনি কিভাবে ভারতবর্ষের এই দুটি নিগূঢ়-কঠিন সাধন বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে, সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা ভাবলে সত্যই পরমাশ্চর্য বলে বোধ হয়। অবশ্য, এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য যে, প্রকৃত সাধকের ক্ষেত্রে দেশকাল-ভেদ নেই—তিনি দেশাতীত, কালাতীত, সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বজনের নিরন্তর। তা সত্ত্বেও, মার্গারেট নোব্‌ল্ যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা ও উচ্চশিক্ষিতা এবং অপরপক্ষে, ভারতবর্ষ তখনও গভীর-অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন। সেজন্য, তিনি যে কি করে এক নিমেষেই সেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত, সকলের অবহেলিত দেশকেও আত্মার আত্মীয়, প্রাণের বান্ধব, মনের শান্তিরূপে গ্রহণ করে নিলেন—তা নিশ্চয়ই সকলকে আশ্চর্যান্বিত করে তুলেছিল।

সার্থকনাম্নী "নিবেদিতা" এইভাবে তাঁর "Aggressive Hinduism" নামক সুবিখ্যাত, অগ্রবর্ষী প্রবন্ধসংগ্রহসমূহে "তপস্যা" ও "সন্ন্যাস" সম্বন্ধে অতি সুন্দররূপে প্রপঞ্চনা করেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঋজু ও দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। ভারতীয় সাধনক্ষেত্রে সেই দিক থেকে তাঁর দান অল্প নয়। "শিখাময়ী" নিবেদিতার সুবর্ণ জীবন-শিখা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও দীপ্যমানা সগৌরবে। প্রথমতঃ, "তপস্যা" কি? "তপস্যা" হল প্রচেষ্টা। কি বিষয়ে প্রচেষ্টা? আত্মধারণ বিষয়ে প্রচেষ্টা, আত্মোপলব্ধি করে, আত্মধারণ করে, আত্মস্থিতি—এই তো হল মহাজীবন-লক্ষ্য। বস্তুতঃ, "উপলব্ধি" "ধারণ" ও "স্থিতি" সমার্থক। যে উপলব্ধি ধৃত হয়ে থাকে না, যে ধৃত হয়ে স্থিতি করে না—তার মূল্য কতটুকু? এই কারণে, ভারতীয় দর্শন-মতে প্রকৃত "উপলব্ধি" শাশ্বত, এবং "উপলব্ধি", "ধৃতি" ও "স্থিতি" এই কারণেই সমার্থক। যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সে জন্য তাপস, অথবা স্বীয় মহিমায় চির-ভাস্বর। এবং যিনি মুমুক্ষু, তিনি এই মহোপলব্ধিলাভের সঙ্গে তার শাশ্বত ধারণ ও স্থিতির জন্য সচেষ্ট হন। মুমুক্ষুর এরূপ তপস্যার একটি সুন্দর সংজ্ঞা দান করে নিবেদিতা বলছেন—"In the life of Tapasya is constant renewal of energy and light". (P. 28)

আমরা কি উপলব্ধি করি? উপলব্ধি করি আত্মার অন্তরস্থ শক্তি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, আলোক, আনন্দ, অমৃত। সাধক-স্তরে, এই সব বারংবার ধরে নিতে হয়, এই সব দিয়ে জীবনকে বারংবার পূর্ণ করে নিতে হয়, এই সবের গরিমায় বারংবার নিজেকে ভাস্বর করে নিতে হয়।

এই অর্থেই, নিবেদিতা এস্থলে "renewal" অথবা "নবানীকরণের" কথা বলেছেন। প্রকৃতকল্পে, আত্মার যে স্বরূপ, যে শক্তি ও আলোক, তার "নবানীকরণের" কোনো প্রয়োজন, অথবা সম্ভাবনামাত্রই নেই, যেহেতু, যা নিত্য, তা পুনরায় নবানীকৃত হতে পারে না। তা সত্ত্বেও, সাধকের পক্ষে, মোক্ষের পন্থা স্বভাবতই অতি কঠিন পন্থা, যাকে কঠোপনিষদ্ অতি যোগ্য ভাবে বলেছেন—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" (কঠোপনিষদ্ ১।৩।১৪) শাণিত ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি দুর্গম, অতি দুরতিক্রমণীয় এই সাধনপথ, এই মোক্ষ-

মার্গ। অতএব, সেই পথে প্রয়োজন নিরন্তর তপস্যার, নিরন্তর সাধনার, নিরন্তর আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার।

এই ভাবে মুমুক্ষু ও মুক্ত, উভয়ের জীবনই ওতপ্রোতভাবে তপস্যা-বিমণ্ডিত—অবশ্য কিছু বিভিন্ন অর্থে।

সুবিখ্যাত ছন্দোগোপনিষদে, মানুষের,—সাধারণ মানুষ, মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষ, সকলেরই—জীবন যে তপস্যাময়, এই তত্ত্বটি অনুপম ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে "পুরুষ-বিদ্যা" অথবা পুরুষযজ্ঞ প্রকরণে (৩-৭)। এ স্থলে, পুরুষকে তুলনা করা হয়েছে একটি যজ্ঞের সঙ্গে।

"অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩-১৭-৪)

অর্থাৎ, "তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা এবং সত্যবচন—এই সমুদয় এই পুরুষরূপী যজ্ঞের দক্ষিণা।"

যাঁরা এইভাবে পুরুষ বা জীবনকে তপস্যা-দান-সরলতা-অহিংসা-সত্যবচনরূপ প্রকৃষ্ট পঞ্চগুণ বিশিষ্টরূপে দর্শন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই—

"আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি।"

(ছাঃ ৩-১৭-৭, ঋগ্বেদ ৮।৬।৩০)

"যে জ্যোতি পরব্রহ্মে দীপ্তি পাচ্ছে, জগতের বীজস্বরূপ, দিবালোকের ন্যায় সর্বব্যাপী, সেই শাশ্বত, প্রাচীন জ্যোতি দর্শন করেন।"

তাঁহারাই সানন্দে, সগৌরবে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্থিরবিশ্বাসভরে বারংবার বলেন—

"উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩-১৭-৭)

"অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, সেই জ্যোতিকে স্বীয় অন্তরস্থ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে দর্শন করে, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে লাভ করেছি—আমি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকেই লাভ করেছি!" জ্যোতির্ময়ী নিবেদিতা এই অমল জ্যোতিরই আভাস দিয়েছেন তাঁর সুধন্য জীবনের প্রতি পদে।

দ্বিতীয়তঃ "সন্ন্যাস"। এস্থলেও নিবেদিতা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদেরই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—"It is not his Gerua cloth but his selflessness that makes a monk". (P. 29)

"সন্ন্যাসের অর্থ কেবল গেরুয়া বস্ত্র পরিধান নয়, কিন্তু স্বার্থপরতা বিসর্জন।"

"সন্ন্যাস" কি? "সন্ন্যাস শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—"সম্যক্ ভাবে ন্যাস" অথবা সুষ্ঠুভাবে অর্পণ, স্থাপন, ত্যাগ। এরূপে, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী যিনি স্বীয় আত্মাকে নিঃশেষে অর্পণ করতে পারেন বিশ্বাত্মার মধ্যে, স্বীয় আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে স্থাপন করতে পারেন আত্মার ভিত্তিতে, স্বীয় আত্মাকে অকাতরে ত্যাগ বা দান করতে পারেন জনগণের সেবার্থে। স্বামী বিবেকানন্দ একবার অতি সুন্দর ভাবে বলেছিলেন—

"The ordinary sannyasi gives up the world, goes out and thinks of God. The real sannyasi lives in the world, but is not of it. · ···Live in the midst of the battle of life. Any one can keep calm in a cave, or when asleep. Stand in the whirl and madness of action, and reach the centre. If you

have found the centre, you cannot be moved."

"সাধারণ সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগ করেন, বাইরে চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসী সংসারেই বাস করেন, অথচ সংসারে আবদ্ধ হন না।……জীবন-সংগ্রামের মধ্যেই বাস কর। নির্জন গুহায় অথবা নিদ্রাকালে যে কোনো ব্যক্তিই শান্ত হয়ে থাকতে পারেন। কর্মের ঘূর্ণাবর্ত ও উন্মত্ততার মধ্যেই দণ্ডায়মান হও, এবং কেন্দ্রে উপনীত হও। একবার কেন্দ্রটিকে লাভ করলে, তোমাকে কেহই সরাতে পারবে না।"

এই ত হল সন্ন্যাসের প্রকৃত কথা—একবার কেন্দ্রটিকে লাভ—এই তো হল "সম্যক্ ন্যাস" অর্থাৎ. আত্মাতে আত্মাকে ন্যস্ত করা, আত্মার কেন্দ্রে আত্মাকে স্থাপন করা, আত্মার ভিত্তিতে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা পূর্বেই বলা হয়েছে।

পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের বাণীর প্রতিধ্বনি করে, নিবেদিতাও একই সুরে বলছেন—

"Great is the impulse of renunciation; great is the sustained self-sacrifice of a heroic life" (P. 29)

"ত্যাগের প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই মহৎ; কিন্তু মহত্তর হল বীরের নিত্য আত্মত্যাগ।"

অর্থাৎ, একদিন সংসার ত্যাগ করে চলে যাওয়া বরং সহজ। কিন্তু, প্রতিদিন, পলে পলে, পদে পদে, নিরন্তর আত্মত্যাগ করে যাওয়া: জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য কর্ম করে যাওয়া; সংসারে বাস করেও সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত না হওয়া—অল্পশক্তি, অল্প সাহস, অল্প কৃতিত্বের কথা নয়। সে জন্য প্রকৃত সন্ন্যাসী জীবন-যুদ্ধ-বিমুখ নন, সংসার-রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নির্জন কাননের শান্তিলাভে ব্যাকুল নন। উপরন্তু, সংসারে বাস করে, সংসারকে জয় করাতেই তাঁর শৌর্যবীর্য। সেজন্য সন্ন্যাসীর জীবন ওতপ্রোতভাবে বীরের জীবন, ভীরুর জীবন নয়।

অনুপমভাবে নিবেদিতা পুনরায় বলছেন—

"In the soul of the Mahapurusha it is difficult sometimes to tell whether soldier or sannyasi is predominant. He combines the daring of one with the freedom of the other" (P. 29)

"মহাপুরুষের আত্মায়, যোদ্ধা অথবা সন্ন্যাসীর মধ্যে কোন্ জন প্রধানতর, তা বলা মাঝে মাঝে সত্যই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকৃত-পক্ষে, তিনি একের সাহস এবং অপরের স্বাধীনতার একটি সুন্দর সমাবেশই মাত্র।"

এই ভাবে, যে "Aggressiveness" অথবা সাহস-সক্রিয়তা-শৌর্যবীর্যাদি নিবেদিতার জীবনদর্শনের মূল মন্ত্র ছিল, তাই তিনি বিশেষ-ভাবে সন্ন্যাসেরও মূলমন্ত্ররূপে ঘোষণা করেছেন। বিশেষভাবে, এই জন্য যে, তিনি স্বয়ং ছিলেন সন্ন্যাসিনী, এবং তাঁর গুরুর সম্প্রদায়ও তাই। সেজন্য বারংবার তিনি বলছেন—সুন্দর উপমার সাহায্যে—

"Years have no mark on the aggressive life. It is as ready to cast itself down from the palm-tree's height in old age as it was in youth. Or, more. For, the spiritual will has grown stronger with time." (P 29-30)

অর্থাৎ, এরূপ সতেজ সক্রিয় শৌর্যবীর্য-শীল জীবনে কাল তার পদচিহ্ন রেখে যেতে পারে না। সেজন্য এরূপ জীবন উচ্চ খর্জুর-বৃক্ষ

থেকে ঝাঁপ খেতে যৌবন ও বার্ধক্যে সমান প্রস্তুত ; বরং, বার্ধক্যে প্রস্তুত আরো অধিক, যেহেতু আধ্যাত্মিক ইচ্ছা-শক্তি কালের সঙ্গে বরং বর্ধিতই হয়।

এরূপে, সন্ন্যাসী বীর, সন্ন্যাসী কর্মী, সন্ন্যাসী সংসারাবাসী। তা সত্ত্বেও, সন্ন্যাসী সম্পূর্ণরূপে নিরাসক্ত পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, তিনি সংসারে বসবাস করেও, সংসারে লিপ্ত হন না। নিবেদিতা বলছেন যে, সন্ন্যাসীর নিকট আত্ম-সুখ তুচ্ছ—

"The self ceases to be a possible motive."

"স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি কিছুই করেন না।"

এরূপে, সন্ন্যাসী গীতায় বর্ণিত "স্থিত-প্রজ্ঞ" অথবা "স্থিতধী" "মুনি" (২।৫৪-৭২)।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।"
(২।৫৬)

"দুঃখে অনুদ্বিগ্ন যিনি, সুখে স্পৃহাহীন।
তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি, কামাদিবিহীন॥"

তিনি সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী, ভোগের পরিবেশের মধ্যে থেকেও ত্যাগী, চঞ্চলতার সংস্পর্শেও স্থির। গীতার বাণী পুনরায় শুনুন—

"আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।"
(২।৭০)

"পরিপূর্ণ নির্বিকার সমুদ্র যেমন
নদীজলধারে কভু হয় না প্লাবিত,
সেই মত কাম্য মাঝে রাজেন যে জন
তিনি শান্তিলাভকারী, নয় কামস্ফীত।"
(গীতা ২।৭০)

এইভাবে, "তপস্যা" ও "সন্ন্যাসের" মাধ্যমে আমাদের অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়ে গেলে, মেঘাপসরণে সূর্য যেমন তার অনির্বাণ সুবর্ণবিভায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি এই শ্রেষ্ঠ সাধনদ্বয়ের সহায়তায় আমাদের অন্তরের অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে গেলে আমাদের অন্তরস্থ আত্মার স্বীয় স্বরূপটি প্রকাশিত হয় পরিপূর্ণ গরিমায়, মহিমায়, মধুরিমায়। এরূপ "তাপস", অথবা "সন্ন্যাসীই" তো হলেন যুগযুগান্তব্যাপী ভারতীয় জীবন-ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতীক :—

"Strong as the thunderbolt, austere as Brahmacharya, great-hearted and self-less, such should be that Sannyasin who has taken the service of others as his Sannyas ; and, not less than this should be the son of a militant Hinduism." (P 32)

"বজ্রের মত কঠোর, ব্রহ্মচর্যের মত সংযমী, উদারহৃদয় ও নিঃস্বার্থপর, পরসেবাকেই স্বীয় সন্ন্যাসরূপে গ্রহণকারী সন্ন্যাসীর এই তো লক্ষণ।"

এরূপ সন্ন্যাসীর স্বপ্নই দেখেছিলেন আজীবন স্বামী বিবেকানন্দ ; এবং এরূপ মাত্র বিশ জনকে পেলেই যে ভারতোদ্ধার হতে পারে, সে কথাও তিনি স্থির-বিশ্বাসভরে, আনন্দসহকারে, শক্তি-সঞ্চারে, উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করে গিয়েছেন।

যোগ্য গুরুর যোগ্যা শিষ্যা তপস্যা ও সন্ন্যাসের এই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য অতি মনোরমভাবে প্রকাশিত করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

স্বামী আদিনাথানন্দ

ভূমিকা

শিবাবতার ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য ও যতিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণাবতার শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য উভয়েই শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে[১] ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উভয় আচার্যই দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক ও সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা। সর্বোপরি উভয়েই বেদান্তদর্শনের অভিনব ভাষ্যপ্রণেতারূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের দিব্যজীবন ও প্রতিভা-দীপ্ত দার্শনিক চিন্তাসম্ভার ভারতের বেদান্ত-দর্শন-সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

শ্রীশঙ্করাচার্যের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিজ্ঞান ও বিদ্বৎসন্ন্যাস ও বিবিদিষাসন্ন্যাস, জ্ঞান ও কর্মের অসমুচ্চয় প্রভৃতি অদ্বৈতভাব-মূলক মতবাদ কোন ঐতিহাসিক কারণে দক্ষিণ ভারতে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। উত্তর ভরতে অবশ্য তৎপ্রতিষ্ঠিত দশনামীসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী পণ্ডিতপ্রবর প্রচারকগণ উক্ত মতবাদকে একটি স্থায়ী রূপ দানে সমর্থ হইয়াছেন। স্বয়ং আচার্য জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত উত্তর ভারতে অবস্থান করিয়া স্বীয় মতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আবার অন্যদিকে বাংলাদেশে ও উত্তর ভারতে শ্রীরামানুজ-প্রচারিত অদ্বৈতভাবমূলক অতি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মতবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-মণ্ডলী ব্যতীত অন্য কোন মহলে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অথচ ভগবান শঙ্করাচার্যের শারীরক-ভাষ্যের সমতুল্য প্রসন্নগম্ভীর শ্রীভাষ্য জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়মূলক অধ্যাত্মসাধনার অপূর্ব প্রেরণার উৎস। দক্ষিণ ভারতে অষ্টশত বৎসরব্যাপী এই যতিরাজের মতবাদের বহুল প্রচার ও ব্যাপ্তি, শ্রীসম্প্রদায়ের অনুগামী অগণিত ভক্তসমাকুল বৈষ্ণবসমাজ, এবং তাঁহার পদানুগ প্রতিভাসম্পন্ন ঋষিতুল্য বহু দার্শনিক আচার্যের আবির্ভাব শ্রীরামানুজদর্শন ও মতবাদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচায়ক। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হওয়ায় আর্য-সংস্কৃতি যে বৈদিক সংবিৎ পুনরায় লাভ করিয়াছিল, শ্রীরামানুজের অপূর্ব অবদান তাহার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অভাববশতঃ এই মতবাদের কোন আলোচনা বা প্রসার নাই বলিলেই চলে। বিদ্বন্মণ্ডলীতে এই মতবাদটি অবশ্য শঙ্করাচার্যের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অল্পবিস্তর স্থানে আলোচিত হইয়া থাকে, সর্বসাধারণের মধ্যে এই পরম ভক্তিমূলক অদ্বৈতবাদের প্রচার হয় না বলিলেই চলে।

সেই জন্য মনে হয় নব যুগধর্মপ্রবর্তনে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সহজসাধ্য ধর্মমত সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। যুগনায়ক স্বামীজী তাঁহার সারগর্ভ বহু বক্তৃতায় এই মতবাদের সম্যক অলোচনা করিয়া মূল্য নির্ণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক চিন্তায় এই মতবাদকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি বিশিষ্ট স্তররূপে নির্দেশিত করিয়াছেন। বিভিন্ন অবস্থানকেন্দ্র হইতে তোলা সূর্যের

১ রামানুজের জন্ম চৈত্র মাসে, শঙ্করের বৈশাখে।

বিভিন্ন আলোকচিত্রের (Photograph) প্রত্যেকটিই সেই সূর্যেরই প্রতিচ্ছবি—কোন চিত্রই মিথ্যা নহে—অথচ প্রত্যেক চিত্র বিভিন্নাকারবিশিষ্ট। তেমনই মানবমন চরম সত্যের অনুভূতির পথে 'একই সত্যকে' বিভিন্নাকারে নিজের মনের ছাঁচে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কারণে জগতে এত মতবাদ ও সত্যের এত রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুভূতি আসিয়া থাকে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বলা যাইতে পারে, 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি বিশেষ স্তর।

২

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মতবাদ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :

১১ই মার্চ ১৮৮৫ খৃঃ ভক্তপ্রবর গিরীশ ও যুবক নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হন। বিষয়বস্তু ছিল, ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করিতে পারেন কি না। কারণ তিনি যদি বাক্যমনাতীত সত্তা হন, যদি অনাদি, অনন্ত ও নির্গুণস্বরূপ হন, তবে তাঁহার সাকার-রূপ ধারণ কি প্রকারে সম্ভব?—ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই আলোচনা শুনিয়া 'শ্রীম'কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন : 'আমার এই সব তর্কবিচার ভাল লাগে না। আমি দেখি সবই ঈশ্বর। তিনি জগতের অতীত, আবার জগতের সব তিনিই। আমি কখনও এমন স্তরে যাই যখন সব তাঁর সত্তাতে লীন হয়ে যায়। আমার আমিটুকুও। আবার নীচের ধাপে এসে দেখি তিনিই সব হয়েছেন। শঙ্করের নির্গুণ অদ্বৈত ভাব সত্য। আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবও সত্য।'

অন্য সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, বেলের সবটাই লইতে হয়—খোসা, শাঁস, বীচি, সব, তাহা না হইলে ওজনে কম পড়িয়া যায়। ইত্যাদি। ইহা শ্রীরামানুজ-প্রচারিত অদ্বৈতবাদের আসল কথা। শ্রীগীতায় আছে :

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥

পূজ্যপাদ স্বামীজী তাঁহার স্বরচিত 'সৃষ্টি' কবিতায় উক্ত মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :

"সেই সূর্য তারি কিরণ;
যেই সূর্য, সেই কিরণ॥"

অন্য এক প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন,

"যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥"

৩

বহুধাবিভক্ত বৌদ্ধধর্মসম্প্রদায়গুলির নৈতিক অবনতির পর হিন্দুসংস্কৃতির যে নবজাগরণ হয়, সেই সম্বন্ধে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ স্বরচিত প্রবন্ধে দক্ষিণ ভারতের দুইটি ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

'এই প্রতিক্রিয়া আন্দোলন উত্তরে কুমারিল এবং দক্ষিণে আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া হিন্দুধর্ম তাহার শেষ রূপ পরিগ্রহ করিল। এই প্রতিক্রিয়া প্রথমতঃ বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রবর্তনে চেষ্টা করিয়াছিল। পরে ব্যর্থ হইয়া বেদের দার্শনিক ভাগ বা উপনিষদ্সমূহকেই ভিত্তিরূপে স্থাপন করিয়াছিল।

'শঙ্করাচার্যের আন্দোলন অতি উচ্চ জ্ঞানমার্গেই চালিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতিভেদে অতি নিষ্ঠা, সহজভাবাবেগ সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং শুধু সংস্কৃতচর্চার মাধ্যমে প্রচার—এই ত্রিবিধ কারণে জনসাধারণের মধ্যে এই আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। অন্যদিকে রামানুজ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও বাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব ও ভক্তির

বিরাট আবেদন লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্মোপাসনাদিব ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবিভাগ তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন; সর্বসাধারণের কথ্য ভাষাই ছিল তাঁহার প্রচারের ভাষা। ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরাইয়া আনিতে রামানুজ সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিলেন।'

শ্রীরামানুজদর্শনের বিশদ আলোচনা পরবর্তী সংখ্যায় করা হইবে। তাহাতে শ্রীরামানুজদর্শনের চরম সিদ্ধান্ত, তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইবে; এবং তৎপূর্বে উক্ত মতের প্রচার হইয়াছিল কিনা, তাঁহার প্রবর্তিত পন্থাবলম্বনকারীদিগকে 'শ্রীসম্প্রদায়' বলা হয় কেন, ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য আছে কিনা, বেদান্তসূত্রের 'শ্রীভাষ্যে' আচার্য শঙ্করের দার্শনিক মতবাদকে কিভাবে খণ্ডন করিয়া তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং একটি সরস ভক্তিমূলক অদ্বৈতবাদের প্রবর্তন করিয়া ভারতীয় দর্শনচিন্তাকে একটি নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন—ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

মায়ের আগমনে

স্বামী জীবানন্দ

স্নিগ্ধ অমল শারদ প্রভাতে
এলে মা মোদের ঘরে,
কণ্ঠ আজিকে হয়েছে মুখর
তব আবাহন তরে।
মঙ্গলঘট সাজাব আমরা,
মঙ্গলশাঁখ বাজাব।
বনফুল তুলে মায়ের পূজায়
পুণ্য অর্ঘ্য সাজাব।
মায়ের নামেতে মিলিব সবাই
ভেদাভেদ ঘুচে যাবে।
অযুত কণ্ঠে উঠিবে যে তান
দুর্গা মায়ের ভাবে!

মহা সমারোহ জাগিছে ভুবনে
আনন্দধারা বহিছে জীবনে
মধুর ছন্দে পুলকিত মনে
গাহিব মায়ের গান।
জননী মোদের এসেছে দুয়ারে
হবে দুখ অবসান।
অসুরনাশিনী এসেছে মোদের
দূরে যাবে সব ভয় দানবের
বিদূরিত হবে দীনতা মনের
পুলকে ভরিবে প্রাণ।
পরান ভরিয়া পূজিব মায়েরে
লভিব আর্তিত্রাণ।

জয় মা জয় মা শক্তিদায়িনী,
জয় মা শান্তিদায়িনী।
জয় মা জয় মা অসুরনাশিনী,
জয় মা মুক্তিদায়িনী।

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম

অধ্যাপক রেজাউল করীম

আমাদের দেশের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল স্বামীজীব আবির্ভাবের কিছু পূর্বে। স্বামীজীর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি জাতীয়তাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে উত্তোলন ক'রে একটি মহৎ আদর্শে উন্নীত করেছিলেন। জাতীয়তার তিনি যে সংজ্ঞা দিলেন, তা আর ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকল না। তাঁব জাতীয়তার ধারণা ও আদর্শ শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-প্রেম ও বিশ্বমানবতার পর্যায়ে উন্নীত হ'ল। বস্তুতঃ তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে "জাতীয়তা" বলতে ঠিক কি বোঝায় তার সম্যক ধারণা আমাদেব বহু নেতার ছিল না।

পাশ্চাত্য দেশের আদর্শ অনুসারেই কি আমাদের জাতীয়তা গ্রহণ করতে হবে? তা যদি করি তবে ভারতের শাশ্বত আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য দেশের জডবাদী আদর্শের পার্থক্য থাকল কোথায়? পশ্চিম দেশে জাতীয়তা বলতে বোঝায় একধর্মাবলম্বী ও একভাষাভাষী লোকসমষ্টি নিয়ে একজাতি গঠিত হবে। তারা বসবাস করবে একটা নির্দিষ্ট দেশে। সে-দেশে অন্য ধর্মাবলম্বী ও অন্য ভাষাভাষী লোকের কোনো রাজনৈতিক অধিকার থাকবে না। ফরাসী বিপ্লবের বহু পূর্বে ত্রিশবর্ষীয় যুদ্ধের পর এই ধরনের জাতীয়তা ইউরোপে গড়ে উঠেছিল, তার ফলে ক্যাথলিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকল। আর প্রটেস্ট্যাণ্ট দেশে প্রটেস্ট্যাণ্ট প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকল। এর শেষ পরিণতি এই হল যে, প্রটেস্ট্যাণ্ট দেশে ক্যাথলিকগণ আর ক্যাথলিক দেশে প্রটেস্ট্যাণ্ট-গণ নিজেদের নিরাপদ মনে করত না। এরা পার্শ্ববর্তী স্বধর্মাবলম্বীদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। তারপর ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হ'ল। এই বিপ্লবও ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তন করতে পারল না। এর কিছুদিনের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এক ধর্ম ও এক ভাষা নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হতে লাগল। এবং এক দেশ অন্য দেশকে শত্রু মনে করতে লাগল। পাশাপাশি দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কত যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়ে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত জাতীয়তার প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হয়নি। পাশ্চাত্য দেশের জাতীয়তা অপর দেশের মানুষের প্রতি একটা অহেতুকী ঘৃণার ভাব জাগ্রত করতে সাহায্য করে। নিজের রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করে অপর রাজ্যের উপর অধিকার বিস্তার করার প্রতি সবসময় সে-দেশে একটা প্রবণতা দেখা দেয়। তাই ইউরোপে বিগত দু-তিনশ বছর ধরে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। তবুও পররাজ্য-জয়ের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়নি। অতি উগ্র জাতীয়তার শেষ পরিণতি যুদ্ধ, রক্তারক্তি ইত্যাদি। নিজের দেশের মঙ্গলের নামে সেখানে কোনো অন্যায় কাজ করতে কেহই পশ্চাৎপদ নয়। দেশের মঙ্গলের জন্য যদি অপর দেশ দখল করা দরকার মনে করে, তবে তা করতে কেহই দ্বিধা বোধ করে না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ ধরনের জাতীয়তাবোধের সহিত ন্যায়নীতি বিশ্বপ্রেম ও মানবতার কোনো সংস্রব নাই। পরমহংসদেবের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রকার বিদ্বেষ-সৃষ্টিকারী

উগ্র জাতীয়তাবাদের আদর্শকে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মতে জাতীয়তার আদর্শ আরও উন্নত, মহৎ ও ব্যাপক হওয়া দরকার।

স্বামীজীর পূর্বে সত্যই এদেশে কোনো উন্নততর জাতীয়তার আদর্শ দানা বাঁধেনি। তিনি প্রকৃত জাতীয়তার আদর্শের নূতন সংজ্ঞা দিলেন। তিনি একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে, পাশ্চাত্য দেশ যে জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করেছে তার হুবহু নকল করলে ভারতের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ হবে বেশী। তিনি বললেন, বেদান্ত যে-দেশের মর্মকথাকে অমর ভাষায় ঘোষণা করেছে, সে-দেশ পাশ্চাত্য দেশের জাতীয়তাকে গ্রহণ করতে পারে না। বৈদান্তিক আদর্শ যে দেশের চরিত্র, মানবিকতা ও চিন্তাকে গঠন করতে উৎসাহ দেয় সে-দেশ কখনো মানব-প্রেম-বর্জিত পাশ্চাত্যের জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না। তিনি নানাপ্রকার উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দিলেন যে, ভারতবর্ষ যদি পাশ্চাত্যের জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করে তবে নৈতিক, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তার সমূহ ক্ষতি হবে। তাতে ভারতের অখণ্ডতা থাকবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়বে। এই হিংসা-বিদ্বেষ গোটা ভারতকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে। তাই তিনি জাতীয়তার নূতন সংজ্ঞা দিলেন। জাতীয়তার গোটা প্রশ্নকেই নূতনভাবে চিন্তা করলেন। আজ সমগ্র জগৎ বুঝেছে যে গত পঞ্চাশ বছর ধরে ইউরোপে যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ অহরহ লেগে আছে, তার মূল কারণ এই ভ্রান্ত জাতীয়তা। এই যে দু-দুটো বিশ্ব-সমর হয়ে গেল তা তার ভ্রান্ত জাতীয়তাকে প্রারম্ভিক প্রেরণা দিয়েছে। "সবার উপর জার্মানি সত্য"—এই ধারণাই হিটলারকে দাম্ভিক, অহঙ্কারী ও পরদেশ-লোলুপ করে তুলেছিল। স্বামীজী আমাদের বার বার সাবধান করে দিয়েছেন যেন আমরা এ-ধরনের কোনো মতবাদকে প্রশ্রয় না দিই। তা যদি দি, তবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মতই আমাদেরও ধ্বংস হবে। যে জাতীয়তা-বাদের আদর্শ বিশ্ব-শান্তির পরিপন্থী, সে-আদর্শ বেদান্ত ও উপনিষদের দেশ ভারতবর্ষ কোন-ক্রমেই গ্রহণ করতে পারে না।

স্বাধীনতা-লাভের বহু পূর্বেই স্বামীজী দেশ-প্রেম ও জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে যে-সব মূল্যবান কথা বলেছিলেন ও যে-উপদেশ দিয়েছিলেন তা যদি আমরা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতাম ও তদনুসারে দেশের রাজ-নৈতিক আদর্শকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হতাম, তবে স্বাধীনতালাভের পর দেশের অবস্থা অন্যরূপ হত। আজ দেশের চতুর্দিকে যে-সব বিচ্ছিন্ন ও বিভেদকারী মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে এবং দেশের সংহতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, তা হয়তো সম্ভব হত না। আজ দেশের চারদিকে যে-অবস্থা দেখছি তাতে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অতীতের মহান সাধকদের ঐক্যসাধনা বুঝি ব্যর্থ হতে চলেছে। আজ দেশের তরুণসমাজের এক বিরাট অংশ স্বামীজীর রচনাবলী ভক্তির সহিত পাঠ করে না; বিদেশের নেতাদের তারা আদর্শ বলে গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করে না। আজ যদি তারা স্বামীজীর রচনাবলী পাঠ করত তবে দেখত যে, এ-যুগের উপযোগী রাজনীতি ও অর্থনীতির বহু কথা তিনি পূর্বে প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মকে বাদ দিয়ে সত্যিকারের জাতীয়তা বা স্বদেশপ্রেম হয় না। টাকা-পয়সা ও আর্থিক সম্পদ চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু কেবল এইগুলিই কোন জাতির একমাত্র কাম্যবস্তু হওয়া উচিত নয়। আর্থিক সম্পদ

ও পার্থিব সুখ-সম্ভোগের সহিত চাই ধর্মনিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক সাধনা, চাই মনের গভীরতা, চিন্তার ঔদার্য, মনের প্রীতি। চাই ভারতের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। এ-সবের অভাবে নিছক রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধার দ্বারা দেশের মানুষের প্রকৃত মঙ্গল হবে না। ইউরোপ জীবনের আধ্যাত্মিক দিককে বাদ দিয়ে কেবলই জাতীয়তা ও দেশ-প্রেমের উপর সমস্ত শক্তি নিবদ্ধ করেছে। ইউরোপ যন্ত্রদানবের পূজা করতে করতে গোটা মানুষকেই ভুলতে বসেছে। এইভাবে সে এমন একটা ফ্রাঙ্কেনস্টিন সৃষ্টি করেছে, যে গোটা পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন ভারতবর্ষকে কি এইভাবে পশ্চিম দেশের হুবহু নকল করতে হবে? এরূপ করলে ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতবর্ষ কি ইউরোপের মত ঐরূপ একটা জাতীয়তার সৃষ্টি করবে যা দেশের ধর্মনৈতিক জীবনকে শুষ্ক করে দেবে, যা ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনাকে স্তিমিত করে দেবে? স্বামীজী কিছুতেই তা চাননি। কত আকুলভাবে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতার মত বহু সার সত্য বলেছেন। আজ আমরা তাঁর সে-সব কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। তিনি কখনও কোন অর্থহীন তাৎপর্যবিহীন ফাঁকা বুলি আওড়াননি। তিনি যা বলতেন তা আত্মা ও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে তবেই বলতেন। তাঁর ছিল একটা গভীর প্রত্যয়বোধ, আন্তরিকতা, দেশের মানুষের প্রতি হৃদয়-ভরা দরদ; এই সব মহৎ গুণের জন্যই তিনি দেশ-বিদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর আন্তরিকতা ও গভীর জ্ঞানের জন্য সকলকে প্রভাবিত করেছিলেন। আজ গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে স্বামীজীর রচনা সকলের পাঠ করা দরকার। তাঁর দেশপ্রেম- ও জাতীয়তা-ভাবোদ্দীপক রচনাবলী পড়লে মনে হবে যে, তাঁর বাণী ও উপদেশ চিরনূতন। তা কোনো দিন পুরাতন হবে না। আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর পূর্বে তিনি যা বলেছেন, তার মূল্য এতটুকু হ্রাস পায়নি। কারণ, তাঁর বাণীর মধ্যে ছিল একটা অসাধারণ মৌলিকতা। দেশের তথা জগতের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন; আজ গভীরভাবে চিন্তা করে তার সদুত্তর অনুসন্ধান করতে হবে।

স্বামীজীর জাতীয়তার মধ্যে হিন্দু ব্যতীত খ্রীষ্টান, মুসলিম, পার্শী, যিহুদী, শিখ, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি মনে করতেন এরা সকলেই ভারতীয় জাতীয়জীবনের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, ভারতের জন্য চাই বৈদান্তিক মন ও ঐস্লামিক দেহ। অপরাপর সম্প্রদায়কেও তিনি আপন-জন বলে মনে করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, দেশ বলতে দেশের মাটিকে বুঝায় না। দেশের মানুষকে নিয়ে দেশ। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়: "বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" দেশ মানে দেশের অগণিত নরনারী; ক্ষুধিত, দরিদ্র, আশ্রয়হীন, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ—এদের সকলকে নিয়েই দেশ। এদের কল্যাণই দেশের কল্যাণ। বিশেষ করে তিনি দেশের অগণিত দীনদরিদ্র, ক্ষুধার্ত, পীড়িত, আর্ত মানুষের জয়গান গেয়েছেন। এদেশের

রাজনৈতিক নেতারা এদের কথা চিন্তা করেননি যখন, স্বামীজী উদাত্তকণ্ঠে এদের আহ্বান করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে বীর,···সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই,···ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা,···আমায় মানুষ কর।'—এই মহাবাণী যিনি উদাত্তস্বরে বলেছেন, তাঁর চেয়ে আদর্শ দেশ-প্রেমিক আর কে হতে পারে? তাঁর উপদেশের মর্মকথা হল, দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে, প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করতে হবে, চরিত্র-গঠন করতে হবে ; ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে প্রাণহীন আচার বিচারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে সজীব করে তুলতে হবে।

আমাদের দেশের নেতারা যখন বক্তৃতা করে দেশ সেবার কাজ শেষ করতেন, তখন স্বামীজী বাস্তব কাজের কথা বলেছেন। তিনি বললেন, কেবল বক্তৃতা করলেই দেশ-প্রেম হয় না। দেশের জনগণের সহিত একাত্ম না হলে প্রকৃত দেশ-সেবা হয় না, তাতে প্রকৃত দেশ-প্রেমেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন এই কেমন করে দেশের লোকের সহিত একাত্ম হওয়া যায়? যে-ব্যক্তি দিনরাত অর্থচিন্তা নিয়ে ব্যস্ত, জড়বাদী চিন্তায় বিভোর, খাওয়া-পরা ব্যতীত অন্য কথা ভাবে না, ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পদ ছাড়া অন্য চিন্তা যার মনে আসে না, সে যদি দেশ-প্রেমের কথা বলে, তবে তার চেয়ে হাস্যাস্পদ জিনিস আর কী হতে পারে। সে কেমন করে দেশের সহিত একাত্ম হবে? ইউরোপ আমেরিকাও এই অর্থে দেশ প্রেমের কথা বলে। সেখানে দিনরাত যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথাই উচ্চারিত হয়ে থাকে। জীবিকার লড়াই, রাজ্যবিস্তার ও প্রভাব-বিস্তারের লড়াই—এই সবই তো ইউরোপের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেখানে মানুষ কি মনের শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে? সেখানে pleasure আছে, কিন্তু happiness নাই। নিত্য-নূতন মারণাস্ত্র তৈয়ার হচ্ছে সেখানে। কিন্তু সে-দেশের মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন শূন্য। ভারত যদি সেই আদর্শ গ্রহণ করে তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। দেশের সহিত একাত্ম হতে গেলে চাই ধর্মনিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ, নৈতিক জীবন গঠন, প্রত্যেক রাজনৈতিক আদর্শের পশ্চাতে থাকা চাই বিশ্ব-প্রেম, সর্ব-ব্যাপী প্রীতি ও ভালবাসা -সেই ভালবাসা যা পরদেশ-বিজয়ে উল্লাসবোধ করে না। সকল মানুষের মধ্যে প্রেম প্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চারিত করে দিতে হবে। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—ঠাকুরের এই মহতী বাণী হল সেই আদর্শের পূর্ণ পরিণতি। জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের মধ্যে থাকবে না কোনো ভেজাল। এই প্রকার জাতীয়তা ও দেশপ্রেম মানুষকে বাঙালী বিহারী ইত্যাদি ভাবে দেখবে না, কাউকে প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক করবে না—করবে মানুষ। এই মহান জাতীয়তাই ছিল স্বামীজীর জাতীয়তা। এই উদার দেশ-প্রেম তথা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করাই ছিল স্বামীজীর আদর্শ। ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের মনে যখন এই ভাব জাগ্রত হবে তখন তার জাতীয় চেতনাও সার্থক হয়ে ওঠবে। তখন তার দেশ প্রেম বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হবে। স্বামীজীর দেশ-প্রেমের লক্ষ্য ছিল সর্বব্যাপী বিশ্বপ্রেম।

দেশকে ভালভাবে জানবার জন্য স্বামীজী সারা ভারত পর্যটন করেন। বিশ্ব-প্রেমিক রামকৃষ্ণদেবের তিনি মানস সন্তান। তাঁর আদর্শকেই তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণদেবের আদর্শের মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণতা ছিল না; কোনো প্রাদেশিকতা অথবা সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র তাতে ছিল না। তাঁর স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ ছিল সকল শ্রেণীর মানুষের সর্ববিধ মঙ্গলসাধন; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল শ্রেণীর মানুষ ছিল তাঁর স্নেহ-ভালবাসার পাত্র। ভারতের জাতীয়তার পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি এদের সকলকেই স্থান দিয়েছিলেন। তাদের সকলের মধ্যে সমন্বয় ঘটানই হল তাঁর কাজ। "দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে, যাবে না ফিরে—এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।" এ শুধু কবির কথা নয়—স্বামীজীরও ছিল জাতীয়তার এই আদর্শ। বস্তুতঃ ভারতাত্মার মর্মবাণীকে তিনি ঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। এ-কথা সকলেই জানেন যে, একবার স্বামীজী পরমহংস-দেবের নিকট নির্বিকল্পসমাধিতে মগ্ন থাকার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঠাকুর তাতে সম্মত হলেন না। তিনি তাঁকে বললেন: না, তোমার ব্রত আরও মহৎ। তোমার নিজের মুক্তির আগে দেশের মানুষের মুক্তি-সাধন করাই হল তোমার প্রধান কাজ। তুমি হবে বিশাল বটবৃক্ষ—তাতে কত মানুষ তোমার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। তা না করে তুমি তোমার নিজের মুক্তির জন্য অধীর হয়ে উঠলে! এ কি তোমাকে শোভা পায়? ঠাকুরের সেই উপদেশকে মাথায় করে নিয়ে স্বামীজী ভারতের বন্ধনমুক্তির জন্য সর্বত্র পাগলের মত ঘুরে বেড়ালেন।* দেশ প্রেম বল, আর জাতীয়তা বল সবই তো এই অগণিত মূক মূঢ় ম্লান জনগণের জন্যই। সেইটাই আসল কাজ। ভারতের দীনতম ব্যক্তির যুগযুগব্যাপী দুঃখ-দুর্দশা তিনি যেমনভাবে উপলব্ধি করলেন, সে-যুগে তেমন আর কেউ করেনি। তাই তিনি ঘোষণা করলেন: 'নিজের মুক্তি চাই না। তার চেয়ে মানুষের মুক্তির জন্য সাধনা করে যাব।' মানুষের সেবাই হল দেশপ্রেমের আসল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে তিনি বাস্তব রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁর যুগে এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের একটা ধারণা ছিল যে, ইংরাজের সহায়তায় আইন-সভায় প্রবেশ করে কিছু ভাল আইন পাশ করিয়ে নিলেই দেশের বহু উপকার করা হবে। তাঁদের আন্দোলনের লক্ষ্যও ছিল এই আইনসভায় প্রবেশ করা ও তার ক্ষমতা ও অধিকার সম্প্রসারিত করা। কিন্তু স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে এই পোশাকী ও একপেশে সংস্কার-পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করলেন। তিনি স্বদেশ-প্রেমের নূতনতর ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন, মানুষের ভিতর যে ঈশ্বর আছেন সর্বপ্রথম তাঁকেই জাগ্রত করতে হবে। ভিতরের শক্তিকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। সে কাজ আইনসভায় গিয়ে হবে না। তিনি এইভাবে জাতীয়তার ভিত্তিকেই সবল করে তুলতে চাইলেন। জাতীয়তার আদর্শের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মচেতনার ভাব প্রবেশ করাতে হবে। কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করলেই সব কিছু হবে না। বস্তুতঃ সমগ্র রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। তিনি বললেন, 'ত্যাগ কর। সাহসী হও এবং মনে কর যে দেশের জনগণের সেবাই হচ্ছে সত্যকার ঈশ্বর-পূজা।' স্বামীজীর নিকট দেশপ্রেম ছিল একটা ধর্ম। কিন্তু চলতি কথায় যাকে আমরা ধর্ম বলি স্বামীজীর ধর্মবোধ তা নয়। তাঁর নিকট দেশপ্রেম ও মানব-প্রীতি একই বস্তু। আজ দেখছি জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা ও দেশপ্রেমের নামে গোটা দেশ ছিন্ন-ভিন্ন

হয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালী-বিহারী, উত্তরভারত-দক্ষিণভারত এই সবই কোথাও কোথাও প্রবল আকার ধারণ করছে। অখণ্ড ভারত যেন শুধু কবির কল্পনা। বিভিন্ন পার্টি'র কোন্দল দেশের সম্মুখে একটা মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এ-সবের কারণ কি? কারণ এই যে, জীবনের মর্মকেন্দ্র থেকে ধর্মবিশ্বাস, ধর্মচিন্তা, আধ্যাত্মিকতা উড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থাকে দূর করার উদ্দেশ্যেই স্বামীজী দেশবাসীকে আকুলভাবে আহ্বান করেছেন। ধর্মহীন জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের অনিষ্টকর প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য বহু পূর্বে ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাশ্চাত্যের জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের আদর্শ আমাদের জন্য নয়। তিনি বলেছেন সব কাজেই পশ্চিম দেশের অনুকরণ ও অনুসরণ করলে চলবে না। তাতে কিছুতেই দেশের সত্যিকারের কল্যাণ হবে না। ইউরোপ, রাশিয়া বা চীন আমাদের আদর্শ হতে পারে না। দেশপ্রেমের যে আদর্শ তিনি দিয়েছেন, তাই হোক আমাদের আদর্শ। প্রার্থনা করি, দেশের মানুষ যেন তাঁর আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সাধনা করে। এই পথেই দেশের মুক্তি—অন্য পথে নেই।

'তত্র কো মোহঃ'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায

নামুক অলকানন্দা দিব্যপ্রেরণার
ঊর্ধ্ব হ'তে। এ জড়তা শক্তির বন্যার
তরঙ্গ-আঘাতে দাও অবলুপ্ত করি!
চেতনার প্রতি অণু-পরমাণু ভরি'
বিরাজ করো মা তুমি চিত্তে সর্বক্ষণ!
জ্বলন্ত পাবককুণ্ডে ইস্পাত যেমন
হারায় মালিন্য তার, রক্তবর্ণ হয়—
তেমনি তোমাতে যার হৃদয় তন্ময়
সমস্ত জড়তা হ'তে মুক্ত হয়ে যায়!
নূতন বসন্ত আসে নব মহিমায়
জীবন-অঙ্গনে তার! জেনেছি জননী,
একমাত্র তুমি মোর পারের তরণী।
অনুক্ষণ ভাবনায় তুমি আছ যার—
কোথা ভয়? কোথা মোহ? কোথা শোক তার?

বর্তমান সমস্যা

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশে, প্রধানতঃ বিভিন্ন রাজনীতিক দলের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রভেদের ফলে যে সংঘাত, হিংসা, বিদ্বেষ, জিঘাংসা এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান চলেছে তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ ভোগ করছেন। এবিষয়ে রাজ্যসরকারের দায়িত্ব কতটুকু, কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে বহু ঘরোয়া আলোচনা চলেছে। প্রকাশ্যে যে গণ-আন্দোলনের কথা সংবাদপত্রে পড়ি, মুখ্যতঃ এবং প্রকৃতপক্ষে তা বিভিন্ন রাজনীতিক দলের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার আন্দোলন। দেশের প্রকৃত সমস্যা ও সংকটের সমাধান গৌণ ও উপলক্ষ্য মাত্র।

সম্প্রতি এই দেশব্যাপী অরাজকতা এবং আইন ও শৃঙ্খলার অভাব এক নতুন আকারে দেখা দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের শ্বেত মর্মরমূর্তি আলকাতরা মাখিয়ে বীভৎস করা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি পাদপীঠ থেকে টেনে ফেলে দিয়ে ভগ্ন করা প্রভৃতি তার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-রকম যে ঘটতে পারে, এরূপ সম্ভাবনাও একমাস আগে কেউ ভাবতে পারেনি। আজ সমগ্র দেশ বিমূঢ় ও স্তম্ভিত হয়ে ভাবছে, আমরা কত দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে চলেছি।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে যা অনেক সময় ঘোরতর অশুভ মনে হয়—হয়ত তার মধ্য দিয়েও কোন শুভ পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে এই ভাবটা আমার মনে যে আকারে রেখাপাত করেছে তারই কিছু আভাস দেব।

স্বামী বিবেকানন্দ বার বার উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছেন যে, স্বাধীনতা পেলেও আমাদের কোন লাভ বা উপকার হবে না যদি আমরা মানুষ না হতে পারি। তার এই মানুষ হবার প্রধান উপায় শিক্ষা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মানুষ তৈয়ারী করা (man-making)—এ কথা তিনি নানাভাবে বলেছেন ও নানাগ্রন্থে লিখেছেন। কিন্তু আমরা তাঁর এই উপদেশ ও আদর্শের মর্যাদা কতদূর পালন ও রক্ষা করেছি—তা ভাববার সময় এসেছে। ২২ বছর আগে আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম তখন সকলেই মনে করতেন এবং অনেক বড় বড় নেতারাও প্রকাশ্যে বলেছেন যে, এতদিন ইংরেজের দাসত্বের ফলে আমরা দাসসুলভ শিক্ষা ও মনোবৃত্তিই অর্জন করেছি, এবার জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত নতুন শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা আমরা আবার প্রকৃত মানুষ হব। কিন্তু ২২ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা শিক্ষার কি এবং কতটুকু উন্নতি করেছি—প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে কতটা অগ্রসর হয়েছি? আজ যদি প্রত্যেক বাঙ্গালী—তথা প্রত্যেক ভারতবাসী—নিজের বুকে হাত দিয়ে নিজেকে এই প্রশ্ন করি—তবে তার একমাত্র উত্তর হবে, উন্নতি তো দূরের কথা আমাদের শিক্ষার মান ক্রমশই নীচের দিকে যাচ্ছে; শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ—সকলেই প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনেই তৎপর। শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষালাভ করা এবং শিক্ষার

উপযুক্ত ব্যবস্থা করা—এই তিনটি মহৎ কর্তব্য ও আদর্শ আজ আমরা প্রায় ভুলে গেছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হয়েছে রাজনৈতিক দলাদলির কেন্দ্র। শিক্ষক ও ছাত্রের অধিকাংশই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক মতবাদ, দলাদলি ও ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত। প্রকৃত শিক্ষার কথা ভাববার অবসর বা ইচ্ছা কারও নেই।

আমরা মনুষ্যত্বের পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছি, দেশের বর্তমান অবস্থাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাজ্যশাসন, স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষাকেন্দ্র, ব্যবসায় বাণিজ্য, যে দিকেই তাকাই, দেখি একেবারে উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত সর্বত্রই দুর্নীতি, কলুষতা, অযোগ্যতা, কর্তব্যে অবহেলা আমাদের জাতীয় জীবনের মূর্ত প্রতীকরূপে বিরাজ করছে। ইংরেজের রাজত্বে আমাদের অনেক ন্যায্য অভিযোগ ছিল—কিন্তু তারা শতাধিক বৎসরের চেষ্টায় শাসনযন্ত্রের যে সুদৃঢ় কাঠামো তৈয়ারি করেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তারা দশ বছরের মধ্যেই তা চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করেছেন। ইংরেজরা যখন ভারত ছেড়ে যায় তখন নগদ দুই হাজার তিনশত কোটির বেশী টাকা আমাদের (sterling reserve হিসাবে) মজুত ছিল। সেসব তো গেছেই, তাছাড়া ভারতের ঋণের পরিমাণ ১৯৫০ সনে ছিল তিন হাজার কোটি, আর আজ তার পরিমাণ চৌদ্দ হাজার কোটি টাকা। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে, তার থেকে আশানুরূপ লাভ ও দেশের গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের যে স্বপ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল তা শূন্যে মিলিয়ে গেছে—এবং সরকার-পরিচালিত কলকারখানার প্রায় সবগুলিতেই প্রতি বছর প্রচুর লোকসান হচ্ছে। আজ বাংলাদেশে নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কথা প্রতি বাঙালীই বুঝতে পারেন। এর মূলে আছে প্রধানতঃ আমাদের দুর্নীতি, কলুষতা ও অযোগ্যতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান ও জার্মানির যে আর্থিক দুরবস্থা হয়েছিল, তা আমাদের কল্পনারও অতীত। কিন্তু আজ এই দুই দেশই মাথা তুলে নিজেদের পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে, বহু সঞ্চিত ধন লাভ করেও আর্থিক দুরবস্থার চরমে পৌঁছেছে এবং পৃথিবীর ছোট বড় সকল দেশের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকৃত মানুষ কি উন্নতি করতে পারে আর মনুষ্যত্বের অভাবে দেশের কি দুরবস্থা হয়, জার্মানি ও জাপানের কথা ভেবে আমাদের দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা তা বুঝতে পারি। আমাদের সামাজিক ও জাতীয় ঐক্যসাধনের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা চরম অবনতিই হয়েছে। দেশের বেকারসমস্যা দ্রুত বেড়েই চলেছে।

আজ যারা বিবেকানন্দের মূর্তিতে আলকাতরা মাখিয়েছে, তারা সর্বথা নিন্দার পাত্র। কিন্তু তারা স্থূল-হস্তাবলেপে যা করেছে আমরা কি মনে মনে তা করিনি? আমরা কি আমাদের প্রতিদিনের আচরণ ও অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দের মুখে কালিমালেপন করিনি এবং এখনও করছি না? আশুতোষ শিক্ষার যে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন তা ধ্বংস করে কি আমরা প্রতিদিন তার মূর্তি ধুলায় লুণ্ঠিত করিনি? আমাদের এই স্বেচ্ছাকৃত মহাপাপের কথা দুষ্কৃতকারীরা বিবেকানন্দ, আশুতোষ প্রভৃতির মূর্তির অমর্যাদা করে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। আজ সে কথা ভাববার সময়

এসেছে। হয়ত এই ভাবনাই আমাদের মুক্তির পথ নির্দেশ করবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কর্ম সাধিত হয় না।" আমাদের বর্তমান বিষম সঙ্কট থেকে মুক্তিলাভের জন্য রাজভবনে বৈঠক হচ্ছে, নানা সভায় এবিষয়ে আলোচনার জন্য অনেক চেষ্টা ও ব্যবস্থা হচ্ছে—কিন্তু গোড়ায় যে গলদ তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে না। সমস্ত শৃঙ্খলাহীনতা ও দুরবস্থার জন্য সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থাকেই মূলতঃ দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু এই সামাজিক ও অর্থনীতিক কুব্যবস্থার জন্য দায়ী কে, রাজভবনের সভায় তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ যে মনুষ্যত্বের অভাব উপলব্ধি করেছিলেন—সেই অভাব না ঘোচাতে পারলে আমাদের বর্তমান সঙ্কটের হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশা নেই। এই অভাব ঘোচাতে হলে প্রথমেই আমাদের শাসনযন্ত্রের আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন আবশ্যক বলে আমি মনে করি। কিন্তু এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। আমার বক্তব্য কেবল এই যে, আমরা যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি—আমরা যে প্রতিদিন স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছি তার ফলেই আমাদের এই বর্তমান দুরবস্থা। এই কথাটি মনে রেখেই এর প্রতিকারের পথ খুঁজতে হবে। তা ছাড়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার জন্য সরাসরি বা সোজা কোন রাজপথ নাই।

মা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পায় যে বহুভাগ্যে তোমার অকূলবাঁশি শুনতে কানে,
ঝঙ্কারে তার পথে অভয়—রাজো বলি' তুমি প্রাণে।
জানে সে—লয় বেসুরাদের হবেই তোমার সুরের কৃপায়,
যাবেই স'রে গহন বাধার আড়াল তোমার নয়নবিভায়।
চাই শুধু মা—তোমার মুখের হাসির মন্ত্র যেন ফোটে
যখন বেসুরাদের বিষাণ চারিদিকেই গ'র্জে ওঠে।
অনুযোগ না করি যেন পাব হব মা মরু যখন,
মরুর পারে মন্দাকিনীর দেখিনি কি অমর স্বপন?
এই প্রত্যয় জপি যেন—স্বপ্নে আভাষ পেয়েছি যার
মূর্ত হবে জাগরণে, প্রেমব্রতী মানে না হার।
জানি—কঠিন প্রেমের দিশায় চলা স'য়ে মরুর দাহন,
আরো জানি—তোমার চরণ সেই পায় যে চায় মা শরণ।
জানি—তোমার দুরভিযান করবে বরণ যে সে হবেই
মায়াজয়ী সফলসাধন, তুফানেও তার ভয় নেই।
বিদ্যুতেও যে দেখেছে সোনার আলোর কেতন তোমার,
রক্তকাঁটাও কমলিনীর গান শোনাবে অন্তরে তার।

বাজিকরের মেয়ে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভক্তেরা সব বলে তোমায়
বাজিকরের মেয়ে,
সত্য তাহাই বুঝছি এখন
দেখছি যত চেয়ে।
এই যে সোনার বঙ্গভূমি,
ছারখারই কি করবে তুমি ?
মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখে
অশ্রু আসে ছেয়ে।

কোথায় গেল আশ্রম সব
শান্তরসাস্পদ ?
খুনখারাপি রঙের শুধু
বাড়ছে যে গৌরব !
বীভৎসতার এ ভোজবাজি
দেখতে আমি নই মা রাজি
দেখাও তোমার রাঙা চরণ
পরম সম্পদ।

যিনি ছিলেন অন্নপূর্ণা
ত্রিভুবনেশ্বরী,
'ধূমাবতী' দেখে তাঁরে
আতঙ্কে শিহরি।
কোথায় সে সব মহামানব ?
প্রতিভার কই সে মহোৎসব ?
চারিদিকে 'গরিলা'দের
দল যে কেবল হেরি।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেশ যে এটা
রামপ্রসাদের দেশ,
আবর্জনায় পূর্ণ হবে !
নাই কি দয়ার লেশ ?
অসম্ভব তোর কি মা আছে ?
কাতর প্রাণে এ দীন যাচে
তুমিই কর হেথায় দিব্য
জীবনের উন্মেষ।

রাখালের তীর্থ

শ্রীকালিদাস রায়

রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ে বৈশাখী জল-ঝড়ে,
দুই দিন পরে ফিরে পেয়ে তারে বক্ষে চাপিয়া ধরে।
লেহন পরশে পুলকাঞ্চিত কপোলে অশ্রু গলে,
বাৎসল্যের গোমুখী-তীর্থ জাগিল কুটীর-তলে।
জ্যৈষ্ঠের দিনে গোষ্ঠের দাহে ক্লান্ত, তপ্ত কায়ে,
রাখাল যখন শ্রান্তি হরিয়া সুশীতল বটছায়ে,
গাছের গুঁড়িটি আঁকড়িয়া কয় 'বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি !"
বটতল হয় প্রেম-মৈত্রীর বোধি তরু-তলভূমি॥

বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সবার আগে ত্যাগ করা চাই
তোমার মনের অহমিকা,
কর্তা তুমি ভুলতে হবেই
নইলে দেখবে মরীচিকা।
মালিক তুমি নও তো কিছুর
জাগবে এ বোধ যবে মনে,
হয়তো তুমি খুঁজচো যে ধন
ঘুরচো সুদূর গিরি বনে;
দেখবে সে তো বক্ষে তোমার
সতত্তই যে করে বাস,
খুঁজতে তাঁরে হয় না অধিক
যখন আসে সে বিশ্বাস।
আছেন তিনি তোমার মাঝেই
করান নিতি সব কাজ,
আদেশ যদি না মানো তাঁর
শাস্তি দেবেন মহারাজ।
চরণে তাঁর সরল প্রাণে
করিলে সব নিবেদন,
রবে না আর আত্মশ্লাঘা,
শুদ্ধ হবে দেহ মন।
হয়তো পাবে সেদিন তোমার
ধ্যানের ধনের দরশন,
মুক্ত হবে সকল বাঁধন
লভি দুর্লভ পরশন।

আর্তের প্রার্থনা

বনফুল

মূর্খ আমি বারংবার প্রতারিত হই
সুধা ভেবে পান করি তীব্র হলাহল
নিজেরে বন্ধনে বাঁধি', বলি মুক্তি কই,
শান্তি খুঁজি যেখানেতে খালি কোলাহল
দেখাও আমারে তুমি পথ।

এ প্রার্থনা করিবার যোগ্যতা যে নাই
তা-ও জানি, তবু আমি বড় অসহায়,
দু' হাত বাড়ায়ে কিছু খুঁজিয়া না পাই,
ভয় হয় শেষে মোর কি হবে উপায়
তুমি এস তুমি এস প্রভু।

ভগবান দেখা দেন যে বিশ্বাসবলে
সে বিশ্বাস নাই মোর; দ্বিধা-ভরা মন,
উত্তাল-তরঙ্গ-নদী, জীর্ণ তরী টলে
আকাশে বিদ্যুৎ হানে তুমুল শ্রাবণ
এস তুমি হে চির-কাণ্ডারী।

দীন হীন অতি তুচ্ছ, পঙ্ক-লিপ্ত দেহ,
অহঙ্কারে স্ফীত-শির, চিত্ত তমোময়
তুমি শুদ্ধ না করিলে পারিবে না কেহ
তাই তব শরণার্থী ওগো দয়াময়
ত্রাণকর্তা এস এস তুমি।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

Chilkapita House, Almora,

P. O. Kumaon, U. P.

4.12.13

প্রিয় অ—,

মহিমবাবু পাঁচটি টাকা আমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি নাকি আমায় পাঠাবার জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলে। তুমি যে একা গ্রামে এই দুঃসময়ে একটি সেবাশ্রম খুলিয়া দুঃস্থ পীড়িতদের সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, ইহা শুনিয়া যে আমি কি আনন্দ পাইয়াছি তাহা পত্রে লিখিয়া কি জানাইব। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বাস্তবিক গরীব দুঃখীর সেবা [যদি] না হইল তবে অর্থ উপায় করিয়া নিজ উদর প্রতিপালন করিয়া দিন কাটান তো সাধারণ লোকে সকলেই করিয়া থাকে। তুমি যে অবিবাহিত থাকিয়া দেশের দুঃস্থ পীড়িতদের সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, ইহাই শ্রীস্বামীজী মহারাজের প্রাণের প্রিয় কার্য বলিয়া আমরা জানি এবং শ্রীগুরুদেব তোমার উপর পরম প্রীত জানিবে। প্রভু তোমায় খুব বল দিন যাহাতে তোমার এই প্রতিষ্ঠিত কার্য পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়, ইহাই আমার হৃদয়ের প্রার্থনা, এবং আমার দৃঢ় ধারণা যে তাহাই হইবে। ও দেশে এইরূপ সেবাশ্রম এখন বিশেষ প্রয়োজন। তুমি আমার হৃদয়ের আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমায় খুব শক্তি দিন, তুমি কৃতকার্য হও।

এখানে খুব শীত। পল্টুবাবুরা এখান হইতে ২৫শে নভেম্বর চলিয়া গিয়াছেন, তাঁদের সিমুলতলায় নিজের বাড়ী আছে, এখন সেখানে গেলেন। এখন তোমাদের ওদেশে ব্যারামাদি কেমন? এবং যাহাদের ঘরদ্বার পড়িয়া গিয়াছিল এবং শস্যাদি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল তাহারা এখন কিছু ভাল আছে ত?

ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

'মোহরাত্রিশ্চ দারুণা'

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জগন্মাতা মহামায়াকে স্তুতি করে বলা হয়েছে :

প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥

"(ত্রিগুণের তারতম্যেই সব কিছুই সৃষ্ট) তুমি গুণত্রয়ের তারতম্য-বিধায়িনী প্রকৃতি। তুমি মহাপ্রলয়রূপ রাত্রি, মরণরূপরাত্রি এবং মানুষী মোহরাত্রি।" শুভ ও অশুভ—এ উভয়ই জগন্মাতা মহামায়ার পাদপীঠ। তিনি অমঙ্গলরূপিণী, আবার তিনিই সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপা—"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।" নিবেদিতা এই পরমতত্ত্বটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন : "মহামায়া একাধারে এই সকল বিপরীতভাবের সমন্বয়-স্থল। তিনি ভাল ও মন্দ উভয়ের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সকল পথের গন্তব্যস্থল তিনিই।"[১] এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :

"যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা।
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥"

যিনি সুকৃতিগণের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মী, আবার পাপাত্মাগণের গৃহে অলক্ষ্মী, যিনি নির্মল-চিত্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি, যিনি সাধুগণের শ্রদ্ধা এবং সৎকুলজাত ব্যক্তির লজ্জাস্বরূপ, সেই তোমাকে প্রণাম করিতেছি।"

এই পরমতত্ত্বের মধ্যে নিপুণ সমাজবিজ্ঞানী নিবেদিতা লক্ষ্য করেছেন ইতিহাসের পরম-সত্যকে। ইতিহাসের গতিপথ সরলরেখায় বিস্তীর্ণ নয়, সে পথ "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা," শুভ ও অশুভের মধ্য দিয়ে সম্মুখে প্রসারিত। নিবেদিতা এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করে বলেছেন : "স্বামীজী যখনই (উপরোক্ত) মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিতেন, তখনই আমরা একটিমাত্র কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে বহুযন্ত্রোত্থিত মৃদুধ্বনির ন্যায় ইতিহাস-রূপ নাটকের মহাসংগীত শুনিতে পাইতাম।"[২] সুরাসুরের যে দ্বন্দ্বকাহিনী শ্রীশ্রীচণ্ডীর আখ্যান-ভাগে বর্ণিত, তাকেই ইতিহাস প্রকট করেছে বারে বারে নানাভাবে।

ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন দেশ। তার ইতিহাস দীর্ঘ। তার দীর্ঘকালে এর প্রমাণ মিলেছে বারবার। পৌরাণিক কাহিনীতে মধুকৈটভ, মহিষাসুর বা বৃত্রাসুরের প্রবল প্রতিপত্তির কথা পাওয়া যায়। দেবগণ মধ্যে মধ্যে অসুরগণের হস্তে শ্রী-সম্পদ রাজ্য-আশ্রয় সব হারিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছেন দেখা যায়। ভারতের মহান ইতিবৃত্ত মহাভারতে দেখা যায়, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করে দ্বারকায় নূতন রাজ্য স্থাপন করেছেন। কুরুপঞ্চালের যুদ্ধকাহিনী ঐতিহাসিক বলে স্বীকৃত। কথিত আছে, এই মহাসমরে সুবিশাল ভারতভূমির একতৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হয়েছিল, ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠেছিল। ঐতিহাসিক কালেও দেখা যায় চেংগিসখান দিল্লী নগরীতে মৃত-

১ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—"নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণী" শীর্ষক অধ্যায়।

২ Ibid

দেহের প্রাকার নির্মাণ করেছিলেন, ঔরংজীব হিন্দুমন্দিরসমূহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলেন, হার্মাদ জলদস্যুদের অত্যাচারে একদা দক্ষিণবঙ্গের বহু সমৃদ্ধ জনপদ শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে পরিণত হয়েছিল ' এ সকল ইতিবৃত্তই আমাদের জাতীয় জীবনের ঘোর কালরাত্রির ইতিবৃত্ত।

এইসকল ঘোর কালরাত্রি আবার দারুণ মোহরাত্রিও ছিল। মূল্যবোধে বিকৃতি, মনুষ্যত্বের অধঃপতন এইসকল যুগকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভারতে দেখা যায় যে, সভাপর্বের শেষে মহারাজ যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় মহিষী দ্রৌপদীকে পণ রেখে পরাজিত হলে দুঃশাসন তাঁকে বলপূর্বক কৌরবরাজসভায় নিয়ে আসে। তেজস্বিনী দ্রৌপদী তখন ওজস্বিনী ভাষায় ধিকার দিয়ে এইকথা বলেছিলেন, "ধিক! ভরতবংশের চরিত্র আর ধর্ম নষ্ট হয়েছে, এ সভায় কৌরবগণ কুলধর্মের মর্যাদা-লঙ্ঘন নীরবে দেখছেন।" সভাস্থ সকলে ব্যথিত হলেন, কিন্তু দুর্যোধনাদির ভয়ে কিছু বলতে সাহস করলেন না। একমাত্র ভীষ্ম বলেছিলেন, "ভাগ্যবতি, ধর্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।" সভাকে ধিকার দিয়েছিলেন সেদিন একমাত্র দুর্যোধন-ভ্রাতা বিকর্ণ যাঁর মধ্যে তখনও বিবেক নিঃসংশয় ছিল। কিন্তু কেউ সেদিন তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। তারই ফলে ঘটেছিল পূর্বোক্ত বিপুল লোকক্ষয়কারী মহাসমর।

চারিত্রিক অধঃপতনের কারণেই একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্ষের সম্মুখেই যদুবংশের ধ্বংস হয়েছিল। মহাভারতের মৌষলপর্বে আছে নানারূপ দুর্লক্ষণ দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে ডেকে বললেন: "ভারতযুদ্ধকালে এই প্রকার দুর্নিমিত্ত দেখা গিয়েছিল, আমাদের বিনাশ আসন্ন হয়েছে। তোমরা সমুদ্রতীরস্থ প্রভাসতীর্থে যাও।" সেখানে গিয়েও এবং নিজেদের আসন্ন বিনাশ জেনেও তাঁরা নিজেদের সংযত রাখতে পারলেন না। মহাভারতকার বলছেন, "সেখানে তাঁরা নারীদের সঙ্গে নিরন্তর পানভোজন করতে লাগলেন।" পরিণামে সুরাপানে উন্মত্ত যাদবগণ কলহ করতে করতে পরস্পরকে ধ্বংস করলেন।

পরবর্তী ঐতিহাসিক কালের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। হার্মাদ জলদস্যুগণ প্রকাশ্য দিবালোকে যখন গৃহস্থকন্যা অপহরণ করেছে তখন বাধা দেবার জন্য একজনকেও দেখা যেত না। কিন্তু মর্মান্তিকশোক-পীড়িত অপহৃতা কন্যার পিতাকে সমাজচ্যুত করবার জন্য বহু জনকে পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা যেত। নির্বীর্য কাপুরুষদের কখনও মঙ্গল হয় না। সেজন্য অত্যাচারিত নিরপরাধ নারীর অশ্রুজলের সঙ্গে মিশে প্রবাহিত হয়েছিল বিপুল রক্তস্রোত। এইরূপ মোহ ও চারিত্রিক অধঃপতনকে দেখা গিয়েছে সর্বকালে জাতীয় বিপর্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে। বস্তুতঃ প্রতিটি ঐতিহাসিক কালেই জাতীয় সংকটের প্রধানতম কারণ ছিল এইরূপ অধঃপতন।

মনে রাখতে হবে একটি জাতির উন্নতির মাপকাঠি শুধুমাত্র তার ধনসম্পদ নয়, তার চারিত্রিক সম্পদও। এ বিষয়ে রাধাকৃষ্ণন শিক্ষা কমিশনের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "একটি দেশের শ্রেষ্ঠত্ব তার সীমানার পরিধির উপর নির্ভর করে না, তার যোগাযোগব্যবস্থার দৈর্ঘ্যের উপরও নির্ভর করে না, তার ধনসম্পদের উপরও নির্ভর করে না। যদিও এগুলির প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা

দেশে কেবল বর্বর উন্নতি কামনা করি, যা হবে (রামায়ণ-বর্ণিত) রাক্ষস-রাজত্বের অনুরূপ, তাহলে কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক বা প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাব্যবস্থা করলেই চলবে। কিন্তু তাতে মানুষের আত্মা থাকবে উপেক্ষিত। তখন আমরা পাবো একদল বিবেকহীন বৈজ্ঞানিক, একদল রুচিহীন কলাকুশলী যারা দেখবে তাদের অন্তরে বিরাজ করছে বিরাট শূন্যতা। নীতির ক্ষেত্রেও শূন্যতাই থাকবে। তখন তাদের নষ্ট প্রয়াস ও ভ্রষ্ট লক্ষ্যের জন্য অন্তরের শূন্যতা ও বিক্ষোভ তাদের তাডনা করে নিয়ে যাবে যে-কোন পরিবর্তের দিকে, সে যাই হোক না কেন। যদি আমরা সভ্যতার দিক থেকে প্রকৃত উন্নত হতে চাই, তাহলে দরিদ্র ও দুঃখীদের জন্য চিন্তিত হবার শিক্ষা চাই। জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাস চাই, শান্তি ও স্বাধীনতায় আস্থা চাই। হিংসার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ ঘৃণা চাই।"[৩] অর্থাৎ মনুষ্যত্বই একটি জাতির উন্নতিবিধায়ক, মনুষ্যত্ব ব্যতীত কোন উন্নতি স্থায়ী হতে পারে না। এ জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "মনুষ্যত্ব জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মূল্যবান।" সুতরাং তাঁর মতে "আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা আমাদের মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক যেগুলি আমাদের মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষার প্রয়োজন।"

কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক থেকেই আমরা আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পুনরায় সর্বহারা হতে বসেছি। আমাদের মূল্যবোধ আজ তুলনাহীনভাবে বিকৃত। আবার ঘনিয়ে এসেছে আমাদের জাতীয় জীবনে এক গভীর তমিস্রাময় মোহরাত্রি, পরিণামে তা হয়ত এক ভয়াল কালরাত্রির রূপ ধারণ করবে। চারদিকে দুর্লক্ষণসমূহ দেখা যাচ্ছে। মানুষ আজ অসাধু অধর্মাচারী বিবেকহীন হয়েছে তাই শুধু নয়, পশুর চেয়েও নির্মম নিষ্ঠুর হয়েছে। অপরদিক দিয়ে তাদের ভীরুতার অন্ত নেই। সমস্ত জাত বিনা প্রতিবাদে দাসত্ব-শৃঙ্খলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সন্দেহ নাই, আমরা আজ তুলনাহীনভাবে মোহগ্রস্ত। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, আমাদের কাম্য লক্ষ্য যতই শ্লাঘার বস্তু হোক, মানুষকে পশু করে তার কোন ভাল করা যায় না। হিংসার প্রতিক্রিয়া প্রবলতর হিংসা—পরিণামে আসে ধ্বংস। শ্রেয়-প্রেয় বোধ, ন্যায়-অন্যায় বিচার, যুক্তিপরতা, প্রেম, সহানুভূতি—এগুলিই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। আজ এর কোনটাই মনুষ্য-চরিত্রে দেখা যাচ্ছে না। বিচারপূর্বক প্রেয়ের উপর শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠাই কল্যাণের পথ। অন্য পথ নেই।

যাদের মূল্যবোধ আজও বিকারগ্রস্ত নয়, তারাও তামসিকতা, নিষ্ক্রিয়তা ও ভীরুতার কবলগ্রস্ত। এগুলি আরও বড পাপ। মনে রাখা প্রয়োজন যে, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে" তারা উভয়েই সম-অপরাধী। যে আদর্শবাদ হৃদয়ে অগ্নিসঞ্চার করে না, "অগ্নিময় বিশ্বাস" উদ্বুদ্ধ করে না, শিরায় শিরায় ত্যাগের প্রেরণা জাগায় না, সে আদর্শবাদের কোন মূল্য নেই। এসকল তথাকথিত আদর্শবাদী কি একবার ভেবে দেখেছেন যে, একমাত্র অবিচলিত শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকর্মের সাহসিক অনুষ্ঠান ছাড়া এই অমঙ্গলের সাম্রাজ্য-বিস্তার-রোধের আর কোন উপায় নেই, এড়িয়ে গিয়ে

৩ University Commission—Vol I, P. 67—অনুবাদ: লেখিকা

আত্মরক্ষার কোন পথ নেই। নির্ভীকতা দিয়ে ভীরুতাকে জয় করতে হবে, প্রেম দিয়ে অপ্রেমকে, ত্যাগ দিয়ে স্বার্থবুদ্ধিকে, অহিংসা দিয়ে হিংসাকে।

স্বাধীনতালাভের পর থেকে আমরা ধন-সম্পদবৃদ্ধির বহু প্রয়াস করেছি। কলকারখানা, ক্ষেত-খামার, উৎপাদন, বিনিয়োগ, মূলধন-গঠন, কর্মে নিয়োগবৃদ্ধির বহু পরিকল্পনা হয়েছে, সেই পরিকল্পনাকে কার্যকর করবার জন্য বহুতর প্রয়াসও হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে যা বড় সম্পদ—মানুষ, তাকে গঠন করবার কোন প্রয়াস হয়নি। শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের আত্মাকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। ফলে অবিবেকী বিজ্ঞানী কলাকুশলী শুধু কেন, অবিবেকী শিক্ষকসমাজ, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্মচারী—আজ প্রতিটি ব্যক্তিই। তাদের অন্তরের দুঃসহ শূন্যতা ও নীতির ক্ষেত্রে নৈরাজ্য আজ তাদের নষ্টপ্রয়াস ভ্রষ্টলক্ষ্য করেছে। সেজন্য বিক্ষোভে তারা প্রতিনিয়ত ফেটে পড়তে চাইছে। আদর্শের ক্ষেত্রে শূন্যতা মানুষের কাছে সবচেয়ে দুঃসহ। সেজন্য সম্মুখে তারা যা পেয়েছে তাই গ্রহণ করেছে—তা নিরঙ্কুশ ধ্বংসবাদই হোক না কেন। আজ নিজেদের সৃষ্ট সম্পদ,—শ্রেষ্ঠ সম্পদ সবই তারা ধ্বংস করতে চাইছে। বস্তুতঃ অন্তরের শূন্যতার অসহ্য যন্ত্রণায় তারা আজ আত্মহনন করতে চাইছে।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতীয় ঐতিহ্যকে কোন স্থান দেওয়া হয়নি। সেজন্য সুপ্রাচীন এই দেশের মহামূল্যবান সংস্কৃতি যা যুগ যুগ ধরে বহু মানুষকে যুগিয়েছে প্রাণের রসদ, তা আজ তারা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে দ্বিধাহীন চিত্তে। যে ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় নেই, যে সম্পদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তারা অবহিত নয়, তার প্রতি তাদের মমত্ব থাকবে—এ আশা করা অনুচিত। কিন্তু ঐতিহ্যকে ফেলে দিয়ে অগ্রগতি তো সম্ভব নয়। অতীতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে সম্পদ লাভ হয়েছে তা ফেলে দিলে বারবার তো একই জায়গা থেকে আরম্ভ করতে হবে। তাহলে অগ্রগতি আর কি করে সম্ভব হবে? মানুষেরই অতীত আছে, ঐতিহ্য আছে, তাই মানুষের অগ্রগতি আছে। পশুর সমাজের অতীত নেই, ঐতিহ্য নেই, তাই অগ্রগতিও নেই।

আজকের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে একটি ন্যায্য লক্ষ্যকে-শূদ্র বা শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার-অর্জন। এ দেশে এ যুগসাধনাকে যাঁরা প্রথম রূপ দিয়েছেন তাঁরা জাতির মহাপুরুষ আচার্যগণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এর প্রথম প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"ভারতের উচ্চবর্ণেরা, তোমরা শূন্যে বিলীন হও, বেরুক নূতন ভারত। বেরুক মুদীর দোকান হতে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ হতে। বেরুক হাট থেকে, বাজার থেকে।" শ্রীঅরবিন্দও ঐসময়ে লিখেছিলেন, "আমাদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী অজ্ঞানতার গভীরে নিমজ্জিত, নিদারুণ দুর্গতির পীড়নে পর্যুদস্ত। কিন্তু সেই দুঃখনিমজ্জিত জ্ঞানহীন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই আমাদের একমাত্র আশা, ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা বিরাজ করছে।" কিন্তু এঁরা এ সংগ্রামের যে রূপ দিতে চেয়েছিলেন তা ভিন্নতর। তাঁরা এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুক্তিকে স্বোপার্জিত হতে হয়, অপরের হাত হতে কখনও মুক্তি পাওয়া যায় না, অন্যের হাত দিয়ে যা আসে তা শৃঙ্খল হয়ে পায়ে ওঠে। এজন্য তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বাগ্রে দিতে চেয়েছিলেন

শিক্ষা ও সংস্কৃতি যা তাদের দৃষ্টির বাধা অপসারিত করবে। তখন নিজেদের লক্ষ্য তারা নিজেরা সাধন করবে। সেজন্য অন্ধ অজ্ঞ জনসাধারণকে কোন লক্ষ্যের দিকে তাড়িত করে নিয়ে যেতে তাঁরা চাননি।

একই কারণে বিবেকানন্দ স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। অন্নহীন ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতা ধর্ম ও নীতি যেমন অর্থহীন, তেমনি দাসের নিকট স্বাধীনতাবিহীন অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা; ধর্মহীন নীতিহীন ব্যবস্থা উন্নত মানুষের কাছে তেমনি অর্থহীন। বিবেকানন্দ সেজন্য জোরের সঙ্গে বলেছেন, "চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে আমার মতে স্বাধীন ও চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও ভাল।" এ বিষয়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের একটি মূল্যবান কথাও স্মরণীয়— "উত্তম শাসন স্ব-শাসনের কোন পরিবর্ত নয়" (A good government is no substitute for self-government[৪])। সেজন্য সমাজের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির বলিদান যে ব্যবস্থায় অবশ্যম্ভাবী, তা কখনও শুভকর নয়। বিবেকানন্দ সেজন্য বেদান্তের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের লক্ষ্যরূপে রাখতে চেয়েছেন।

এই সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই ভারতের জাতীয় আদর্শ। এই আদর্শই অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের সম্মুখে বারবার সঞ্জীবিত হয়েছে। সেজন্য আমাদের মহান ধর্মনায়কেরা সকলেই সাম্য ও স্বাধীনতা-মন্ত্রের প্রচারক। তাঁরা সকলেই সমাজে বিশেষ সুবিধা, কায়েমী স্বার্থের উপর আঘাত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। নিবেদিতার একটি সমীক্ষা এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে: "যে যুগে উপনিষদের জ্ঞান শুধু আর্যদিগের বিশেষ অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত, ভগবান তথাগত সেই যুগে আবির্ভূত হইয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণকে ত্যাগের দ্বারা নির্বাণলাভরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গের উপদেশ করিলেন। যে যুগে এবং দেশে সিদ্ধ সাধকের প্রদত্ত মন্ত্র কেবল অত্যল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই সযত্নে রক্ষিত হইত, আচার্য রামানুজ কাঞ্চীনগরীর গোপুরমে আরোহণ করিয়া সেই মহামন্ত্র পারিয়া চণ্ডালের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন।"[৫] এই কারণে সাম্যসাধক অধ্যাত্মনায়কেরাই যুগে যুগে আমাদের সমাজেরও নায়ক হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি ধর্মাচার্যেরা তাঁদের পূর্বসুরীদেরই অনুসরণ করে যুগোপযোগী সাম্য-প্রয়াস করেছেন। সেজন্য বিবেকানন্দ মানবতা ও সাম্যভিত্তিক ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবার উপর জোর দিয়েছেন। বলেছেন: "আমাদের কার্যের এই মূল কথাটি স্মরণ রাখিবে—ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতিবিধান।...তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পারো?" ধর্ম মানুষকে উন্নত করে, দয়া প্রেম সহানুভূতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেয়, যা পরস্পরের কল্যাণ আনয়নে সহায়ক। সেজন্য ধর্ম মানুষকে উন্নত করে। মানুষকে উন্নত করেই প্রকৃত সাম্য বা মুক্তি আনা সম্ভব, অন্যথায় নয়। সাম্যকে সেজন্য ধর্মভিত্তিক করতেই হয়। নতুবা সাম্য

৪ J. S. Mill—Representative Government—P. 82

৫ নিবেদিতা: স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ

নামেই সাম্য হয়, কার্যতঃ হয় না। যে বলশালী, সেই প্রাধান্য লাভ করে, অন্যরা বঞ্চিত হয়।

আমরা যে নিদারুণ বিভ্রান্ত তার প্রমাণ এই যে, এই শ্রেয়োপথ আমাদের আজ আকর্ষণ করছে না। সম্মুখে সেজন্য হয়তো অনেক দুঃখ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এই দুঃখের তপস্যাই হয়তো আমাদের মোহমুক্তি ঘটাবে, কল্যাণের পথ চেনাবে। এইরূপ যে ঘটতে পারে সে সম্ভাবনার ইঙ্গিতও আমাদের জাতীয় নায়কেরা দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ একদা বলেছিলেন: "আমাদের শূদ্র-জাতির সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, কিন্তু কি ভয়ানক সংক্ষোভ ও আলোড়নের মধ্য দিয়া তাহা সংঘটিত হইবে।" শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন: "অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই শ্রমিকের মধ্য হইতে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লব প্রধূমিত হইয়া উঠিবে।···সমুদ্রের গভীর তলদেশে আলোড়ন উঠিয়াছে, আদিম মানুষের যে প্রচণ্ড ধ্বংসপ্রেরণা সহজাত, সভ্যতা যাহার উপরের একটি ক্ষীণ প্রলেপমাত্র, তাহা আজ গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ।" এই হিংস্রতাকে জয় করেই সভ্যতার বিস্তার, এর কাছে পরাজয় ঘটলে সভ্যতার পরজয়। ভারতে আজ যে সংকট ঘনিয়ে এসেছে তা শুধু জাতীয় সংকট নয়, তা সভ্যতার সংকট।

সেজন্য আজ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চলবে না। বিবেকানন্দ এ জন্য আমাদের সমস্ত ভীরুতা, নিষ্ক্রিয়তা ও তামসিকতার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন। বলেছিলেন, "এমনকি আকাশ থেকে বজ্রপাত হলেও ভয় পেয়ো না—খাড়া হয়ে ওঠো, ওঠো কাজ কর।···দূর করে দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা। আগুনে ঝাঁপ দাও, মানুষকে ভগবানের দিকে নিয়ে এস।" বস্তুতঃ আত্মশক্তির জাগরণ ছাড়া ইতিহাসের কালরাত্রি মোহরাত্রি কখনও অতিক্রম করা যায় না। অতীতেও যায়নি, আজও যাবে না। বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন আজ তাই চাই: "হাজার হাজার পুরুষ চাই, নারী চাই—যারা আগুনের মতো হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ মেরু ছড়িয়ে পড়বে।" আজ তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিতে হবে: "লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা ও সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।"

এজন্য আজ সকলকে শক্তিসাধনায় ব্রতী হতে হবে। ভগিনী নিবেদিতার এক প্রজ্ঞাবাণী এখানে স্মরণীয়: "আমার বরাবর বিশ্বাস যে, এইরূপ একটি বিপর্যয় ও ভয়ের যুগে জনসাধারণকে পরিচালিত করিবার ও প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্যই আমাদের আচার্যদেব (বিবেকানন্দ) ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শক্তি-পূজার এক মহান উদ্বোধন ধ্বনিত হয়েছে।"[৬] শুভ ও অশুভ যাঁর পাদপীঠ, সকল বিভ্রান্তি একদিন যাঁর চরণে বিলীন হয়, সকল পথের অন্তেই এক যিনি বিরাজমান, যিনি সকল মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপা আজ সেই পরমাজননীর চরণে প্রার্থনা জানাতে হবে—"মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" ইতিহাসের যে মহাসন্ধিক্ষণ আজ সমাসন্ন, তাই তো বীরসাধকের মাতৃপূজার পরমলগ্ন। আর স্মরণ রাখতে হবে আমরা বারবার ইতিহাসের এই মরণরূপ কালরাত্রি ও দারুণ মোহরাত্রি পার হয়ে এসেছি। ভারতবর্ষে মানুষের আত্মা চির-অপরাহত, বারবার সে এখানে মোহ ও মৃত্যুকে জয় করে অশোক ও অমৃতময় জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতের এ চিরন্তন ইতিহাস। আজও তা অব্যাহত থাকবে। আজ দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মহাপূজার প্রাক্কালে তাই প্রার্থনা: তিনি আমাদের মোহ বিভ্রান্তি দূর করুন, আমাদের দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করুন, আমাদের নির্ভীকতা-বর দান করুন, আমাদের অভয়মন্ত্রে সঞ্জীবিত করুন।

---

৬ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ

লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্

ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস

আমরা মহাশূন্যে ভাসা এই-যে পৃথিবী নামে জগতে বসবাস করছি—এ পৃথিবী কত বৈচিত্র্যময়। এর বুকে রয়েছে সমুদ্র নদী জ্যোৎস্না দিনরাত্রি শীতগ্রীষ্ম। আমরা থাকি বা না-থাকি এসব রয়েইছে। যেদিন থেকে মানুষ টেলিসকোপ আবিষ্কার করেছে, সেদিন থেকে সে রাতের পর রাত আকাশের দিকে টেলিসকোপ নিয়ে ওত পেতে রয়েছে মহাশূন্যে ভাসা আর কোন, আর কী রকম জগৎ দেখা যেতে পারে এ আশায়। মহাকাশের রাতের গায়ে যে অগণিত আলোর ফোঁটা দেখা যায় তাদের মধ্যে লালচে-একটিকে দিগন্তের দক্ষিণ কানার ওপর নজর পড়ে। লাল রঙের জন্য ওকে অন্যদের থেকে বেশ পৃথক করা যায়। প্রাচীন মানুষদের ঐ লাল রঙ যুদ্ধে রক্তপাতের কথা মনে করিয়ে দিত। আশ্চর্য নয় যে তারা যুদ্ধদেবতার নামে ওর নাম রেখেছিল। গ্রীকদের যুদ্ধদেবতার নাম অ্যারেস, রোমানদের মারস্। মারস্ নামের চলই রয়ে গেছে। ভারতীয়দেরও কাছে সে দেবতার মতো—'লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্।' তবে যুদ্ধের নিশানা বলে নয়, মঙ্গলের জন্য। ওর ভারতীয় নাম মঙ্গল।

ঐ মঙ্গল-জগতের গড়পড়তা ব্যাস প্রায় ৪,২০০ মাইল। এ-পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি। মোট জায়গার পরিমাণ পৃথিবীর ¼ ভাগের একটু বাড়তি। সূর্য থেকে মঙ্গলের গড়পড়তা দূরত্ব প্রায় ১৪১,৭০০,০০০ মাইল আর পৃথিবীর ৯৩,০০০,০০০ মাইল। পৃথিবীর পরেই এর ঠাঁই। পৃথিবীর দিনের মাপে ৬৮৭ দিনে সে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে যেমন পৃথিবী ঘুরে আসে ৩৬৫ দিনে। অর্থাৎ পৃথিবীর ৬৮৭ দিনে মঙ্গল-জগতে এক বছর হয়, যেমন আমাদের জগতে হয় ৩৬৫ দিনে। মঙ্গল নিজে নিজেই একবার ঘোরে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে। এ-সময়ে মঙ্গল-জগতে হয় একদিন!

আমরা সব গ্রহের চাইতে মঙ্গলের খবর বেশি জানি। শুক্রের মতো সে আমাদের এত নিকটে না এলেও ওর পুরো একটা আলোকিত দিক দেখতে পাই। মঙ্গলের অনেক ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর মতো উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, বিষুবরেখা, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ ঠিক করাও হয়েছে। টেলিসকোপ দিয়ে উজ্জ্বল গায়ে কালো কালো নানা আকার দেখা যায়। ঐ অন্ধকার অংশকে পূর্বে জলভাগ বলে ধারণা করা হতো। আর আলোকিত অংশকে ভাবা হতো মহাদেশ। যেমন পৃথিবীর জলভাগ আর স্থলভাগ। বিভিন্ন অন্ধকার জায়গাকে আকার অনুযায়ী সমুদ্র লেক ক্যানাল ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছিল। ইদানীং ম্যারাইনার নামক ব্যোমযান দ্বারা তোলা ছবি থেকে জানা গেছে যে, ওসব জলাশয় নয়। তবু এরকম নাম এখনো রয়ে গেছে। মহাদেশের বিভিন্ন জায়গারও নাম দেওয়া হয়েছে পৌরাণিক বা পৃথিবীর কোনো কোনো ভৌগোলিক নাম থেকে।

পৃথিবীর মতো মঙ্গলকেও ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। পূর্বে ভাবা হতো বায়ুমণ্ডলে অল্প অকসিজেন রয়েছে। অধিকাংশই নাইট্রোজেন ও কিঞ্চিৎ কারবন-ডাই-অকসাইড।

কিন্তু হালে ম্যারাইনার দিয়ে ধরা গেছে যে শতকরা ৯৮ ভাগ কারবন-ডাই-অকসাইড। অকসিজেন ও নাইট্রোজেন লেশমাত্রাতেও নাই। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর চেয়ে খুব পাতলা ও অশান্ত। প্রায়ই ধূলোর ঝড় ওঠে। অনেকখানা জায়গা জুড়ে বালির ঘূর্ণি তৈরী হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর শতকরা একভাগ। যে-মেরুদণ্ডকে খাড়া রেখে মঙ্গল নিজে নিজেই ঘোরে, তা সিধা দিক হতে ২৫ ডিগ্রী কোণে বাঁকানো, যেমন পৃথিবীর মেরুদণ্ড হেলানো ২৩½ ডিগ্রীতে। সুতরাং এ বাঁক প্রায় পৃথিবীর বাঁকের সমান। ঋতুপরিবর্তন নির্ভর করে এ-বাঁকের উপর। তাই মঙ্গল-জগতে পৃথিবীর মতো বিভিন্ন ঋতু রয়েছে। মঙ্গলের উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ঋতুর সঙ্গে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ঋতুর তুলনা করা যায়। একমাত্র পার্থক্য যে, সেখানে ঋতুর স্থিতিকাল পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ পৃথিবীতে তিন মাস করে লম্বা চার ঋতু ধরলে মঙ্গল-জগতে এক এক ঋতু প্রায় ছমাস করে লম্বা। কারণ মঙ্গলের বছর পৃথিবীর বছরের প্রায় দ্বিগুণ। যখন মঙ্গলের কোনো গোলার্ধে শীতকাল, তখন সে-গোলার্ধের মেরুদেশে সাদা ঝকঝকে—মাথার টুপির মতো—এক আচ্ছাদন তৈরী হয়। আর অন্য গোলার্ধের মেরু-আচ্ছাদন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে যায়। সাদা মেরু-আবরণকে পূর্বে বরফ বলে অনুমান করা হতো, যেমন পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিন মেরুর আবরণ সাদা বরফ। ইদানীং ম্যারাইনার দ্বারা পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, দক্ষিণ মেরুর 'আইস ক্যাপ' প্রধানতঃ জমানো কারবন-ডাই-অকসাইড, যাকে ড্রাই আইস বলে। যদি মঙ্গলে বরফ থেকে থাকে তাহলে গ্রীষ্মকালে মেরু-আচ্ছাদন গ'লে জল তৈরী হতে পারে। কিন্তু ম্যারাইনার দ্বারা জানা গেছে যে, মঙ্গল-জগতে জল নেই। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে মেঘ হয়। এ মেঘ পৃথিবীর মতো জলীয় বাষ্পের নয়। মেঘ তিন রঙের। সাদা নীল আর হলদে। সাদা মেঘ কুয়াশা বলে মনে হয়। নীল মেঘ আইস-কণার রাশ। আর হলদে সম্ভবতঃ ঝড়ে উঠা ধূলো। পৃথিবীতে যেমন জল বর্ষিত হয় তেমনি মঙ্গল-জগতের আকাশ হতে কোনো তরল পদার্থ পড়ে কি না—খুবই কৌতূহলের বিষয়।

মঙ্গল সূর্য হতে অনেক দূরে। ফলে সূর্য হতে পৃথিবী যে-পরিমাণ তাপ আর আলো পায় মঙ্গল পায় তার অর্ধেকেরও কম। তাই মঙ্গল-জগৎ পৃথিবীর চেয়ে বেশ ঠাণ্ডা। মেরুদেশের তাপ শীতকালে মোটামুটি −৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং গ্রীষ্মে ৫ থেকে ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বিষুবরেখার কাছাকাছি যত যাওয়া যায় তত তাপ বাড়ে। বিষুবরেখায় প্রায় ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

পৃথিবীর যেমন এক চাঁদ রয়েছে, মঙ্গলের সে রকম রয়েছে দুই চাঁদ। নাম কোবোস ও ডাইমোস। নাম দুটি গ্রীক পৌরাণিক চরিত্রের। এ দুজন গ্রীক যুদ্ধদেবতা, অ্যারেস-এর (রোমক ভাষায় মারস্) দুই চর। উপগ্রহ দুটি এত ছোটো যে, এদের চাঁদের মতো এক একটি জগৎ বলা চলে না। যেন দু-দুটি পর্বত।

কোবোস ব্যাসে দশ মাইলের বেশি নয়। মঙ্গলের সব চেয়ে নিকটে। প্রায় ৩,৭০০ মাইলের মধ্যে। মঙ্গলের আকাশে সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে উজ্জ্বল জগৎ বলে মনে হয়, অবশ্য সূর্য বাদে—যেমন পৃথিবীর আকাশে চাঁদকে মনে হয়। কোবোস প্রায়ই মঙ্গলের ছায়ার মধ্যে পড়ে এবং কোবোসগ্রহণ হয় যেমন হয় চন্দ্রগ্রহণ, তবে

হয় প্রায়ই। মঙ্গলের খুব নিকট হওয়ায় কোবোসের উপর মঙ্গলের আকর্ষণ খুব বেশি। তাই কোবোস খুব বেগে মঙ্গলের চারদিকে ঘোরে। প্রতি ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একবার। এ মঙ্গলের দিনের প্রায় তিন ভাগের ভাগ।

ডাইমোস মঙ্গল হতে প্রায় ১২,৫০০ মাইল দূরে। এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। কোবোসের চাইতে ছোট। সম্ভবতঃ ছ'মাইলের বেশি ব্যাসের নয়। মঙ্গল থেকে একে আর-সব নক্ষত্রের মতো দেখায়। মঙ্গলের চারদিকে প্রায় তিরিশ ঘণ্টায় একবার চক্কর দেয়।

প্রথম প্রথম টেলিসকোপ দিয়ে দেখে মনে হতো মঙ্গল-জগৎ পৃথিবীর মতো বৈচিত্র্যময়। বুঝি-বা ওখানেও প্রাণ রয়েছে। এমনকি এক সময় এমন ভাবা হতো যে, পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নতধরনের মানুষ সেখানে বসবাস করে। জলের অভাবের জন্য তারা মঙ্গলের মেরুদেশ হতে খাল কেটে সারা দেশে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করছে। মঙ্গলের অলোকিত অংশে এদিকে সেদিকে কালো কালো লাইন দেখে এরকম চিন্তা করা হতো। ক্রমে জানা গেছে যে, এ-মত ঠিক নয়। ম্যারাইনারে তোলা ছবি দেখে স্থির হয়েছে—সেখানে জলের খাল নেই। যেখানে মেরুদেশ জলশূন্য সেখানে জলের খাল তৈরির সম্ভাবনা নেই। আর প্রাণও বাঁচতে পারে না। পৃথিবীতে যত শ্রেণীর প্রাণী রয়েছে—সকলেরই প্রয়োজন জলের। শুধু তাই নয়, প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এহেন অকসিজেন ও নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে একদম নেই। আছে দম বন্ধ করা কারবন-ডাই-অকসাইড। এরকম অবস্থায় মঙ্গলে এমনকি অতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্‌ও বাঁচতে পারে না বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। মঙ্গলে শুকনো খাঁ খাঁ করা মরুভূমি—বালি আর গর্ত। হাজার হাজার মাইল জায়গার এরকম এক জগৎ গভীর শূন্যে ভেসে চলেছে। আর আমাদের কাছে হয়ে রয়েছে শুধু রাতের আকাশে এক ফোঁটা লাল আলো।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র

সারদার অভয় পদ কর মন সার
এ ভীষণ ভবার্ণবে যদি হবে পার।
সন্তান-নয়নজল আর কে মুছাবে বল,
তাই ও চরণতল ছেড়ো নাকো আর॥

ক্ষমায় ধরণীসমা জননী গো কর ক্ষমা,
আর কিছু জানি না মা শুধু কর নিস্তার।
হৃদয় মমতাভরা, ভয়াকুল-ভয়হরা,
দাও মাগো ভক্তি ত্বরা হয়ে যাই উদ্ধার॥

মা তোমার ভক্তকুল মা-নামেতে প্রেমাকুল
ভব-জলধি অকূল অনায়াসে হয় পার॥

ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

চিকাগোয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়—সেই ধর্মমহাসভা ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, এই তথ্য বিস্ময়কর হলেও সত্য। সুতরাং ধর্মমহাসভা-সংক্রান্ত সংবাদ কিভাবে ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল তা সন্ধানের ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে।

ভারতবর্ষে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতির সংবাদ প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছিল তার ঠিক উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবত: ঐ সংবাদ বেরিয়েছে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের কোনো সময়ে বা তারও পূর্বে। স্বামীজী যদি পরিব্রাজক অবস্থায় জুনাগড়ে থাকাকালে ধর্মমহাসভার সংবাদ পেয়ে থাকেন তাহলে বোঝা যায়, ১৮৯২ সালের গোড়ার দিকেই পশ্চিমভারতে খবরটি প্রচারিত হয়ে গেছে। আমরা পুরাতন *সংবাদপত্রের সন্ধানকার্য সাধারণভাবে করেছি* ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে, তাই ঐ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে আমাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া সকল কাগজ আমরা পাইনি বা পরীক্ষাও করতে পারিনি। তবে সুখের বিষয়, এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সাময়িকপত্র দেখতে পেয়েছি, যাদের কর্তৃপক্ষ ধর্মমহাসভার ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত এবং সক্রিয়ভাবে উৎসাহী ছিলেন—একটির নাম 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার'—বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান সম্প্রদায়ের মুখপত্র এটি, অন্যটি হল 'মহাবোধি সোসাইটি জার্নাল'—ভারতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মুখপত্র। ধর্মমহাসভার সংগঠনে নববিধান সম্প্রদায়ের প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ উৎসাহ ছিল, তিনি উপদেষ্টা সমিতির (Advisory Council) সদস্যও ছিলেন—'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার' প্রতাপচন্দ্রের প্রভাবাধীন। অনাগারিক ধর্মপাল ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রাখতেন—তিনি মহাবোধি সোসাইটি জার্নালের পরিচালক ছিলেন।

চিকাগোর ধর্মমহাসভা কলম্বিয়া এগজিবিশনের অংশবিশেষ ছিল। ঐ এগজিবিশন ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে যথেষ্ট স্থান নিয়েছিল। আমেরিকায় পৌঁছে স্বামীজী এই বিশ্বমেলার (World's Fair) বিরাটত্ব সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভারতের চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন। 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার' কাগজে ১৮৯৩ সালের ২৯ জানুআরি সংখ্যায় বিশ্বমেলা সম্বন্ধে লেখা হয়:[১]

---

১ Great preparations are being made in America and elsewhere to make the coming Chicago Exhibition to be held on 1st May, 1893, the grandest spectacle of its kind that ever was witnessed on earth. Chicago is about 15 times as large as Calcutta and is about twice as populations. It has made a wonderful progress in the course of a few years. The exhibition ground covers an area far larger than that of any other international exhibition up-to-date. The first international exhibition in London took up 21½ acres or about 65 bighas of land but the Chicago exhibition ground will comprise no less than 1037 acres or upwards of 3000

হয় প্রায়ই। মঙ্গলের খুব নিকট হওয়ায় কোবোসের উপর মঙ্গলের আকর্ষণ খুব বেশি। তাই কোবোস খুব বেগে মঙ্গলের চারদিকে ঘোরে। প্রতি ৭ ঘন্টা ৩৯ মিনিটে একবার। এ মঙ্গলের দিনের প্রায় তিন ভাগের ভাগ।

ডাইমোস মঙ্গল হতে প্রায় ১২,৫০০ মাইল দূরে। এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। কোবোসের চাইতে ছোট। সম্ভবতঃ ছ'মাইলের বেশি ব্যাসের নয়। মঙ্গল থেকে একে আর-সব নক্ষত্রের মতো দেখায়। মঙ্গলের চারদিকে প্রায় তিরিশ ঘণ্টায় একবার চক্কর দেয়।

প্রথম প্রথম টেলিসকোপ দিয়ে দেখে মনে হতো মঙ্গল-জগৎ পৃথিবীর মতো বৈচিত্র্যময়। বুঝি-বা ওখানেও প্রাণ রয়েছে। এমনকি এক সময় এমন ভাবা হতো যে, পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নতধরনের মানুষ সেখানে বসবাস করে। জলের অভাবের জন্য তারা মঙ্গলের মেরুদেশ হতে খাল কেটে সারা দেশে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করছে। মঙ্গলের অলোকিত অংশে এদিকে সেদিকে কালো কালো লাইন দেখে এরকম চিন্তা করা হতো। ক্রমে জানা গেছে যে, এ-মত ঠিক নয়। ম্যারাইনারে তোলা ছবি দেখে স্থির হয়েছে—সেখানে জলের খাল নেই। যেখানে মেরুদেশ জলশূন্য সেখানে জলের খাল তৈরির সম্ভাবনা নেই। আর প্রাণও বাঁচতে পারে না। পৃথিবীতে যত শ্রেণীর প্রাণী রয়েছে— সকলেরই প্রয়োজন জলের। শুধু তাই নয়, প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এহেন অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে একদম নেই। আছে দম বন্ধ করা কারবন-ডাই-অকসাইড। এরকম অবস্থায় মঙ্গলে এমনকি অতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্‌ও বাঁচতে পারে না বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। মঙ্গলে শুকনো খাঁ খাঁ করা মরুভূমি—বালি আর গর্ত। হাজার হাজার মাইল জায়গার এরকম এক জগৎ গভীর শূন্যে ভেসে চলেছে। আর আমাদের কাছে হয়ে রয়েছে শুধু রাতের আকাশে এক ফোঁটা লাল আলো।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র

সারদার অভয় পদ কর মন সার
এ ভীষণ ভবার্ণবে যদি হবে পার।
সন্তান-নয়নজল আর কে মুছাবে বল,
তাই ও চরণতল ছেড়ো নাকো আর ॥

ক্ষমায় ধরণীসমা জননী গো কর ক্ষমা,
আর কিছু জানি না মা শুধু কর নিস্তার।
হৃদয় মমতাভরা, ভয়াকুল-ভয়হরা,
দাও মাগো ভক্তি ত্বরা হয়ে যাই উদ্ধার ॥

মা তোমার ভক্তকুল মা-নামেতে প্রেমাকুল
ভব-জলধি অকূল অনায়াসে হয় পার ॥

ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

চিকাগোয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়—সেই ধর্মমহাসভা ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, এই তথ্য বিস্ময়কর হলেও সত্য। সুতরাং ধর্মমহাসভা-সংক্রান্ত সংবাদ কিভাবে ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল তা সন্ধানের ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে।

ভারতবর্ষে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতির সংবাদ প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছিল তার ঠিক উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবত: ঐ সংবাদ বেরিয়েছে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের কোনো সময়ে বা তারও পূর্বে। স্বামীজী যদি পরিব্রাজক অবস্থায় জুনাগড়ে থাকাকালে ধর্মমহাসভার সংবাদ পেয়ে থাকেন তাহলে বোঝা যায়, ১৮৯২ সালের গোড়ার দিকেই পশ্চিমভারতে খবরটি প্রচারিত হয়ে গেছে। আমরা পুরাতন সংবাদপত্রের সন্ধানকার্য সাধারণভাবে করেছি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে, তাই ঐ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে আমাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া সকল কাগজ আমরা পাইনি বা পরীক্ষাও করতে পারিনি। তবে সুখের বিষয়, এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সাময়িকপত্র দেখতে পেরেছি, যাদের কর্তৃপক্ষ ধর্মমহাসভার ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত এবং সক্রিয়ভাবে উৎসাহী ছিলেন—একটির নাম 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার'—বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান সম্প্রদায়ের মুখপত্র এটি, অন্যটি হল 'মহাবোধি সোসাইটি জার্নাল'—ভারতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মুখপত্র। ধর্মমহাসভার সংগঠনে নববিধান সম্প্রদায়ের প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ উৎসাহ ছিল, তিনি উপদেষ্টা সমিতির (Advisory Council) সদস্যও ছিলেন—'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার' প্রতাপচন্দ্রের প্রভাবাধীন। অনাগারিক ধর্মপাল ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রাখতেন—তিনি মহাবোধি সোসাইটি জার্নালের পরিচালক ছিলেন।

চিকাগোর ধর্মমহাসভা কলম্বিয়া এগজিবিশনের অংশবিশেষ ছিল। ঐ এগজিবিশন ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে যথেষ্ট স্থান নিয়েছিল। আমেরিকায় পৌঁছে স্বামীজী এই বিশ্বমেলার (World's Fair) বিরাটত্ব সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভারতের চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন। 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার' কাগজে ১৮৯৩ সালের ২৯ জানুআরি সংখ্যায় বিশ্বমেলা সম্বন্ধে লেখা হয়:[১]

---

১ Great preparations are being made in America and elsewhere to make the coming Chicago Exhibition to be held on 1st May, 1893, the grandest spectacle of its kind that ever was witnessed on earth. Chicago is about 15 times as large as Calcutta and is about twice as populations. It has made a wonderful progress in the course of a few years. The exhibition ground covers an area far larger than that of any other international exhibition up-to-date. The first international exhibition in London took up 21½ acres or about 65 bighas of land but the Chicago exhibition ground will comprise no less than 1037 acres or upwards of 3000

"১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মে যে চিকাগো প্রদর্শনী খুলবে তার জন্য আমেরিকায় ও অন্যত্র বিপুল আয়োজন চলছে, যাতে এটিকে পৃথিবীতে এ-যাবৎ অনুষ্ঠিত এই-জাতীয় প্রদর্শনী-গুলির মধ্যে সর্বাধিক জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলা যায়। চিকগো শহর আয়তনে কলকাতার পনেরো গুণ, লোকসংখ্যায় দ্বিগুণ। গত কয়েক বছরে চিকাগোর উন্নতিও হয়েছে বিপুল পরিমাণে। এর আগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলির জন্য যতখানি করে জমির দরকার হয়েছে, এই প্রদর্শনীটি তার বহুগুণ বেশী জায়গা জুড়ে বসবে। লণ্ডনের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য জমি লেগেছিল ২১.৫ একর বা প্রায় ৬৫ বিঘা; চিকাগো প্রদর্শনী বসছে ১,০৩৭ একর বা ৩,০০০ বিঘারও বেশী জমি জুড়ে। কতকগুলি বাড়ীর উচ্চতা ও পরিসর মনে হর্ষ আর বিস্ময় জাগাবে। ছয় বিঘা জমি জোড়া এবং বিশতলা বাড়ীই তো কয়েকটি রয়েছে; 'প্যারিসের ইফেল টাওয়ার-এর চেয়েও ১৫০′ ফুট বেশী উঁচু' একটা তোরণের খবরও আমরা পেয়েছি। খবর পেয়েছি, রাস্তার নীচ দিয়ে অনেক সুরঙ্গ হচ্ছে। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থপতিবিদ্যার আরো কত আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে সেখানে।"

পুণা থেকে প্রকাশিত 'মারহাট্টা' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিকে (বালগঙ্গাধর তিলকের পত্রিকা এটি) ১৪ মে, ২১ মে ও ২৮ মে—এই তিন সংখ্যায় চিকাগো এগজিবিশনের দীর্ঘ বর্ণনা সংকলন করে প্রকাশিত হয়। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:[২]

"চিকাগো প্রদর্শনী

বিশ্বমেলার উদ্বোধন

আজ খুব জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে 'কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন' অর্থাৎ

---

bighas. Some of the buildings are so lofty and so specious as to present a most sublime spectacle. We are told of houses 20 stories high and of buildings covering over 6 bighas of land, of "a tower 150 ft. higher than the Eiffel Tower in Paris"; of tunnels passing under the streets, and other wonders of modern engineering and architecture". *(The Orthodox Hindu's Voyage to Chicago).*

২ THE CHICAGO EXHIBITION
Opening of the World's Fair

To-day the President of the Republic of the United States formally opens the Columbian Exposition, or the Great World's Show at Chicago with much pomp and ceremony.....

The History of the Exhibition: Chicago had a hard fight to obtain the privilege of holding a grand International Exhibition. The Americans were determined to hold a World's Fair on a gigantic scale, and which should put the late Paris Exposition completely in the shade, and commemorate the 400th anniversary of the discovery of America by Columbus; but they were divided as to the *locale*. Chicago boldly advanced its claim to the honour and was heartily disliked by other towns for so doing.

The first ground was broken on 27th January, 1891.....The exposition buildings were dedicated on October 12th of last year that being the 400th anniversary of the discovery of America by Columbus—with imposing ceremonies, in the presence of 125,000 people. It was baptised the World's Columbian Exposition, taking its name from Columbus. The work of placing exhibits commenced in November last.

পৃথিবীর বৃহত্তম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন।…

"প্রদর্শনীর ইতিহাস : একটি মহতী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী করার গৌরবের অধিকারী হতে চিকাগোকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চতুঃশতবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে এমন বিরাটভাবে একটি বিশ্বপ্রদর্শনী খুলতে আমেরিকাবাসিগণ কৃতসংকল্প হয়েছিলেন, যা প্যারিসে সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীকে একেবারে কানা করে দিতে পারে। কিন্তু প্রদর্শনীটি কোথায় হবে তাই নিয়ে মতবিরোধ হতে লাগল। এই সম্মানলাভের দাবী সবার আগে পেশ করল চিকাগো ; ফল হল, তাকে আর সব শহরের অপ্রীতিভাজন হতে হল।… [শেষ পর্যন্ত অবশ্য চিকাগোবাসীরাই বিজয়ী হলেন, কংগ্রেসের সহায়তায়। গভর্ণমেণ্টও সাহায্যার্থে হস্তপ্রসারণ করেন, জনগণেরও অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়া যায়।]…জমিতে প্রথম কাজ শুরু হয় ১৮৯১-এর ২৭ জানুআরি।… ১,২৫,০০০ লোকের সামনে ঘটা ক'রে বাড়ীগুলি উৎসর্গ করা হয় গত বছর ১২ অক্টোবর—কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কারের ঠিক ৪০০ বছর পূর্তির দিনে। কলম্বাসের নামেই নাম দেওয়া হল—'দি ওয়ার্লড্‌স কলম্বিয়ান একস্‌পোজিশন।' দর্শনীয় জিনিস-পত্র রাখা শুরু হল গত নভেম্বর থেকে।"

উক্ত রচনার মধ্যে প্রদর্শনীর খরচের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা সে যুগের স্বত্বসর্বস্ব ভারতের কাছে কল্পনাতীত এক সংখ্যাসমষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারপরে নানা শিরোনামায় প্রদর্শনীর নানা অংশের ও বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছিল—শিরোনামাগুলিরই শুধু উল্লেখ করছি :৩

"'আর্থিক ব্যবস্থা', 'প্রদর্শনীর স্থান', 'কারিগর-ভবন', 'খনি', 'বিদ্যুৎ-ভবন', 'যন্ত্রগৃহ', 'মৎস্যপালন-ভবন', 'উদ্যান ও কৃষি বিভাগ', 'পরিবহন-ভবন', 'স্ত্রী-ভবন', 'যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিদ্যা প্রদর্শনী', 'কলম্বাসের স্মারকদ্রব্য', 'অষ্ট্রেলিয়া-বিভাগ', 'ভারতীয় শিবির', 'বোম্বাই-এর মৃৎশিল্প প্রদর্শনী', 'কানাডা-বিভাগ', 'বিবিধ-বিষয়ক বিভাগ'।"

চিকাগো প্রদর্শনীর এই বিবরণ ভারতের সাময়িক পত্র থেকে কিছুটা উদ্ধার করে আনবার উদ্দেশ্য আমেরিকার ঐশ্বর্য তখন ভারতের কাছে কী কল্পনাতীত আকার নিয়ে প্রতিভাত তা দেখিয়ে দেওয়া। চিকাগো প্রদর্শনী ভারতীয় কল্পনাকে আকর্ষণ করে উদ্দীপিত করেছিল, মনে হয়েছিল—সে এক আশ্চর্য রোমাণ্টিক জগৎ। এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে ভারতীয় মনে যে-ঔৎসুক্য জেগেছিল, তা স্বতঃই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত চিকাগো ধর্মসভা লাভ করেছিল। ভারতের শিক্ষিত মানুষেরা চিকাগোয় একটা বিরাট কিছু যে ঘটছে সে সম্বন্ধে সচেতন ও উৎসাহী হয়ে উঠেছিল।

---

৩ "The Financial Arrangements", "The Sight of the Exhibition", "The Manufacturer's Building", "The Mines", "The Electricity Building", "The Machinery Hall", "The Fisheries Building", "The Fine Arts Building", "The Horticulture Building", "The Transportation Building", "The Women's Building", "The United States Navy Exhibit", "Relics of Columbus", "The Australian Section", "The Indian Pavilion", "Exhibits of Bombay Art Pottery", "The Canadian Section", "Miscellaneous Items".

তার ফলে প্রদর্শনী-সংশ্লিষ্ট ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অসামান্য সাফল্যের সংবাদ যখন ভারতে প্রচারিত হল, তখন সমাজদেহের মধ্যে তীব্র শিহরণের সৃষ্টি হয়েছিল।

যাই হোক প্রদর্শনীর ভারতীয় অংশের যে-বিবরণ মারহাট্টায় বেরিয়েছিল তা ভারতীয় পাঠকদের কাছে কৌতূহলজনক মনে হতে পারে বলে উদ্ধৃত করছি :[৪]

"ভারতীয় শিবির

চিকাগো থেকে রয়টার ৩রা এপ্রিল বিশেষ টেলিগ্রামে 'ডেলি ক্রনিকল'-কে বিশ্বমেলায় ভারতীয় শিবিরের বিবরণ জানিয়েছেন। শিবিরটির গঠনভঙ্গিমায় খুঁটিনাটি বিষয়েও প্রাচ্য স্থাপত্যের নিদর্শন সুপরিস্ফুট, ভবনটি আকারে প্রায় চতুষ্কোণ. একটি সু-উচ্চ তোরণশোভিত;··· পার্কের উত্তর দিকে চোখে পড়ার মতো বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য-নমুনার ভেতর এর বাইরের চেহারা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।··· [এরপর বলা হয়েছে যে, প্রদর্শনীর প্রধান জিনিস হল চা, যার উৎপাদনে ইণ্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েশন লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ঢেলেছেন, আর দেড়লক্ষেরও অধিক ভারতবাসী নিযুক্ত রয়েছে। এখানে এলে যে ভারতীয়দের স্বহস্তচিত্রিত কারুকার্যমণ্ডিত পাত্রে ভারতীয়দের দ্বারা পরিবেশিত চা খেতে পাওয়া যাবে, সেকথারও উল্লেখ করা হয়েছে।]···শিবিরটি পুরোপুরি ভারতীয় প্রথায় সাজানো হবে। মেলার এই অনন্য শিবিরটিতে এই সব দর্শনীয় জিনিস সাজিয়ে রাখা হবে : ভারতীয় কার্পেট, পিতল ও তামার বাসন, স্বর্ণ- ও রৌপ্যপাত্র, মূল্যবান ধাতুর ওপর জালতি ও পাথর বসানো সূক্ষ্মকারুকার্য-মণ্ডিত প্রাচীন ভারতের অস্ত্রশস্ত্র। এছাড়া সবচেয়ে জমকালো সংগ্রহ হল সব রকম ডিজাইনের হাতির দাঁতের জিনিস। সংগ্রহগুলির মোট মূল্যের অঙ্কটি বিশাল—কয়েক শো হাজার ডলারের কাছাকাছি ."

কেবল ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলিই নয়, দেশীয় পত্রিকাগুলিও যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে চিকাগো-প্রদর্শনীর উপর সংবাদ-প্রবন্ধ ছেপেছিল। ঐ কালের বাংলা পত্রিকার অনেকগুলিরই মধ্যে চিকাগো প্রদর্শনীর বিবরণ আছে। 'সখা' পত্রিকার জুন সংখ্যায় 'চিকাগো মহামেলা' নামে একটি বিবরণবহুল রচনা প্রকাশিত হয়, তার শেষ দিকে পাই : "আমাদের ভারতবর্ষ হইতে অনেক জিনিসপত্র গভর্নমেন্টের সাহায্যে টেলারী কোম্পানী তথায় পাঠাইয়াছেন। শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া চিকাগো মহামেলায় প্রদর্শনার্থ কতকগুলি জিনিস নিজের সঙ্গে লইয়া

---

৪ The Indian Pavilion
A special Reuter telegram from Chicago to the Daily Chronicle of April 3 describes the Indian pavilion at the World's Fair. The style of architecture is Oriental in its minutest detail. The building is almost square in form with a lofty gateway, ...and the general effect of the exterior renders the structure a striking object among the curiously varied specimens of architecture to be found at the north end of the park. ...The pavilion will be furnished throughout in the Indian fashion Indian carpets, brass and copper utensils, gold and silver vessels, antique Indian arms, curiously inlaid with filigree and mosaic work in precious metals, besides perhaps the most magnificent collection of ivory goods in all designs to be seen at the Fair, will be exhibited for the inspection of visitors in this unique pavilion. The total value of the collection will be something enormous, reaching hundreds of thousands of dollars....,

গিয়াছেন। তিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে। ঐ জিনিসগুলি মহারানীর জনৈক পুত্রী সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

চিকাগো বিশ্বমেলা যে ভারতবর্ষে প্রবল আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ, জনৈক ভারতীয় ব্যবসায়ীর তত্ত্বাবধানে একটি 'হিন্দু জাহাজ' আমেরিকায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ জাহাজে আহারাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ হিন্দু আচার বজায় থাকবে। সমুদ্রযাত্রা ও আহারাদি বিষয়ে তৎকালীন হিন্দুমনের সংস্কারাচ্ছন্নতার পটভূমিকায় 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার' কাগজের ২৯শে জানুআরি ১৮৯৩ সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য এখন ইতিহাসের অংশ :[৫]

---

[৫] Messrs Cursetji Sorabji and Co. of Bombay have published a prospectus of a proposed Hindu expedition to Chicago, a copy of which has been kindly sent to us "We have made arrangements", says the Prospectus, "to charter a first class steamer, which will start to Chicago, via London and New York, on 15th March, 1893, returning in July, 1893. Hindus only will be taken as passengers, whose religious feelings will be fully respected, both during their voyages to and on their arrival at Chicago, so far as their bathing, dining, sleeping and other daily avocations of life are concerned. Due care will be taken to superintend properly all the arrangements and carry them out to the satisfaction of those who will undertake the journey for the above Exhibition There will also be a competent Hindu Doctor, conversant with Hindu medicine as used by orthodox Hindus, in addition to one who will be a Graduate of Medicine to dispense the same according to English style. Provision will be made to enlist the services of competent Hindu managers, first class Brahmin cooks, professional Hindu confectioners, and other Hindu servants, and the entire stock of provisions will be taken from Bombay on a scale which will suffice for the requirements of the passengers during the entire trip New extra water tanks will be placed in the steamer for the use of the Hindu passengers No animal will be killed on board the steamer, nor fishing even will be allowed, in fact every possible precaution will be taken to respect their religious prejudices, so that no complaint may arise". Among the patrons of the project we find the names of Mahamahopadhyaya Pandit Mohesh Ch. Nyayaratna, C. I. E., Maharaj Kumar Binoy Krishna Deb Bahadur, The Hon'ble P. Chentsalrao Puntulu, C I. E., Dewan K. Sheshadri Iyar, C. S.I. Dewan Ram Das, C. S. I., The Hon'ble Ranchordlal Chotalal, C. I. E., Dewan Mathuradass Bahadur of Kapurthala, Raj Tej Narayan Singh Bahadur, Rao Bahadur Koylash Chandar Mukerjee. The first class passengers will have to pay Rs. 3000 each, the second class passengers Rs. 2500 each, while the fare for attendants will be Rs. 1500 each. The above sums will include return passage with meals, railway charges and everything. Applications for passage should be made on or before the 1st February, 1893. Now that the sea-voyage has found so many orthodox supporters in Bengal and in other parts of India, we hope the projects of Messrs Cursetji Sorabji and Co. will meet with a large measure of success. There are many well-to-do people among the educated classes, not to mention the rich Zemindars, merchants and others, who can well afford to spend a few thousands of rupees for such a worthy object. Those who will avail themselves of this grand opportunity will not only enrich their own minds with a vast supply of new ideas, but will be the means of shaping to a great

"বোম্বাই-এর মেসার্স কারসেটজী সোরাবজী এ্যাণ্ড কোম্পানী হিন্দুদের চিকাগোযাত্রার জন্য একটি প্রস্‌পেকটাস ছেপেছেন এবং অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে তার একখানা পাঠিয়েছেন। তাতে আছে, 'আমরা একখানা প্রথমশ্রেণীর ষ্টীমার ভাড়া করছি; সেটি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ লণ্ডন ও নিউইয়র্ক হয়ে চিকাগো যাবে, আর ফিরবে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। কেবলমাত্র হিন্দু যাত্রী নেওয়া হবে—যাওয়ার পথে এবং পৌঁছবার পর চিকাগোতেও স্নান, আহার, নিদ্রা এবং অন্যান্য সব দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাঁদের ধর্মসংস্কারকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে। সব ব্যবস্থা ঠিকমত করার জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়া হচ্ছে—পূর্বোক্ত মেলায় যাত্রীদের যাতে পরিতুষ্ট করা যায়। তাঁদের চিকিৎসার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের চিকিৎসায় অভিজ্ঞ একজন হিন্দু কবরেজ সঙ্গে যাচ্ছেন; তাছাড়া যাচ্ছেন ইংরেজী মতে চিকিৎসা করতে পারেন এমন একজন পাশকরা ডাক্তারও। হিন্দু ম্যানেজার, উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ রাঁধুনী, পেশাদারী হিন্দু মোদক, এবং অন্যান্য হিন্দু পরিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। যাত্রা করা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত প্রয়োজন মেটাবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-সম্ভার বোম্বাই থেকেই জাহাজের ভাণ্ডারজাত করে নেওয়া হবে। কেবল হিন্দু যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ষ্টীমারে কতকগুলি নতুন জলের ট্যাঙ্ক বসানো হবে। ষ্টীমারের ওপর কোন পশুবধ করা হবে না, এমনকি ষ্টীমার থেকে মাছ ধরতেও দেওয়া হবে না। এককথায়, যাত্রীদের ধর্মসংস্কার যাতে পূর্ণ মর্যাদা পায়, এ নিয়ে কোন অভিযোগ যাতে না ওঠে, তার জন্য *যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা হবে।'* দেখছি এই পরিকল্পনায় পেট্রোনদের মধ্যে রয়েছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই, মহারাজকুমার বিনয়-কৃষ্ণ দেব বহাদুর, মাননীয় পি. চেণ্টসালরাও পাণ্ট্‌লু সি. আই. ই, দেওয়ান কে. শেষাদ্রি আয়ার সি. এস. আই, দেওয়ান রামদাস সি. এস. আই, মাননীয় রণছোদ'লাল ছোটলাল সি. আই. ই, কাপুরথালার দেওয়ান মথুরাদাস বাহাদুর, রাজা তেজনারায়ণ সিং বাহাদুর, রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র মুখার্জী। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের প্রত্যেকের জন্য দিতে হবে ৩,০০০৲ টাকা করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২,৫০০৲ টাকা করে; পরিচারকদের জন্য দিতে হবে মাথাপিছু ১,৫০০৲ টাকা। ঐ ভাড়ার মধ্যে তাঁদের যাওয়া-আসা, খোরাক, রেলভ্রমণের খরচ ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। যাত্রী হবার জন্য দরখাস্ত করতে হবে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুআরি বা তার আগে। এই সমুদ্রযাত্রায় বাংলার ও ভারতের অন্যান্য অংশের বহু-সংখ্যক গোঁড়া হিন্দুদের সমর্থন দেখে আমরা আশা করছি মেসার্স কারশেটজী সোরাবজী

---

extent the future of their country *The Chicago Exhibition will mark an epoch in the history of India as will doubtless mark an epoch in the history of the world at large....* One thousand respected Hindus crossing the *Kalapani* and sojourning for a month in a country where no Hindu of the orthodox type had ever set his foot, will be an event in our national history, the beneficial results of which, educational and social, we can hardly over-estimate Nor would India alone be a gainer by such a close contact ....Europeans and Americans also would benefit immensely by a closer view of the Aryan Civilization as exemplified in the lives of high-born and respectable Hindus.

এ্যাণ্ড কোম্পানীর পরিকল্পনা বহুল পরিমাণে সফলতা লাভ করবে। শিক্ষিতদের মধ্যে এমন ধনী লোক অনেক আছেন,—ধনী জমিদারদের তো কথাই নাই,—ব্যবসায়ীরা এবং আরও অনেকে আছেন, যাঁরা এরকম একটি সমুদ্রযাত্রার মতো যোগ্য বিষয়ে কয়েক হাজার টাকা স্বচ্ছন্দে খরচ করতে পারেন। এ সুবর্ণসুযোগের সদ্ব্যবহার যাঁরা করবেন, তাঁরা যে শুধু প্রচুর নতুন ভাব পেয়ে নিজেদের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন তাই নয়, স্বদেশের ভবিষ্যৎ-গঠনের কাজেও অনেকখানি সহায়তা তাঁরা করতে পারবেন। **শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, সমগ্র জগতের ইতিহাসে চিকাগো প্রদর্শনী একটি যুগান্তকারী ঘটনা হবে।**··· একহাজার সম্মানার্হ হিন্দু কালাপানি পাড়ি দিয়ে এমন এক দেশে একমাসের জন্য প্রবাসী হবেন, যে দেশে কোন গোঁড়া হিন্দু কখনো পদার্পণ করেন-নি,—আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সমাজে এর ফল যে কতখানি শুভকারী হবে, তা আমাদের ব'লে শেষ করার নয়। এই ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে ভারত একাই লাভবান হবে না,··· উচ্চবংশজাত সম্মানার্হ হিন্দুদের জীবনে পরিস্ফুট আর্যসভ্যতাকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পাবার ফলে ইউরোপ এবং আমেরিকাও উপকৃত হবে প্রভূত পরিমাণে।" * [ক্রমশঃ]

---

* প্রকাশিতব্য গ্রন্থ, 'ভারতীয় পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ' হইতে—সঃ

"অন্যেরা যে-যাই ভুল করুক, তাঁর কাছে এ দেশ নবীন। ভারতের ভাষাসমূহ অকর্ষিত, সম্ভাবনায় নমনীয়। ভারতের প্রাণশক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে। যন্ত্রণা ও সহনের মধ্য দিয়ে আজ যে-নবচেতনার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাবী পরিবর্তনের তা প্রথম স্তর মাত্র। তাঁর মতে, ভারতের আশার উৎস তার নিজের মধ্যে, বিদেশে নয় কদাপি। একথা সত্য, তাঁর বিশাল হৃদয় বিদেশীর প্রয়োজন উপলব্ধি করে সর্ব মানুষের পক্ষেই আশার বাণী উচ্চারণ করেছে। কিন্তু তিনি অপরপক্ষে অন্যের সাহায্যভিখারী ছিলেন না। দানের ক্ষেত্রে সৌভাগ্য দাতারই, গ্রহীতার নয়। বাহির থেকে তিনি আশাও করতেন না, আশঙ্কাও নয়। ভারতের আত্মিক স্বরূপের পুনর্ঘোষণা, সমুদ্রলক্ষ্যে জাতির প্রাণগঙ্গাকে নব-প্রবাহে সঞ্জীবিত ও উচ্ছ্বসিত করে তোলাই তাঁর সন্ন্যাসের তাৎপর্য।"

—ভগিনী নিবেদিতা

যারা আমাদের জাগালো

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

যারা আমাদের জাগায়ে তুলিল নূতন জীবন-গানে
প্রথম উষায় নবসূর্যের গেয়ে বন্দনা-গীতি।
পশুশক্তিরে নাশিল যাহারা আত্মিক শক্তিতে
ভুলিব কি মোরা সত্যসন্ধ তাদের পুণ্য স্মৃতি॥

যুগে যুগে যারা মিথ্যারে দলি আপনার পদতলে
করি প্রতিষ্ঠা মানুষের মনে চিরসত্যের বাণী,
যাহারা জ্বালিল আঁধারের পথে আলোকের বর্তিকা
তাদের স্মরিয়া পাঠানু আমার প্রাণের প্রণামখানি॥

জীবনযুদ্ধে পরাজিত আর নিপীড়িত নরনারী
যাদের বাণীতে ফিরিয়া পেয়েছে অমিত শক্তি প্রাণে।
যাহারা দানিল জীবনে নূতন সরণির সন্ধান
নবজাগরণী মন্ত্র যাহারা শুনায়েছে কানে কানে॥

যাহারা প্রথম জানালো আমরা অমৃতের সন্ততি,
মৃত্যুসাগর মন্থন করি আনিল অমৃত-বারি।
সত্য যাদের হলো ধ্রুবতারা ধর্মের পথমাঝে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিপদপাথার অনায়াসে দিল পাড়ি॥

মোহবন্ধন করি খণ্ডন জ্বালিল জ্ঞানের শিখা,
মূঢ় অন্ধেরো জ্ঞানের পিপাসা যাহারা জাগালো মনে।
শত বরষের বিপ্লব ঠেলি ভারত দাঁড়ায়ে আছে
যাদের কৃপায় জড়ায়ে রয়েছে ধর্মের বন্ধনে॥

সেই সব মহাপুরুষ প্রধান ভারত-সাধক পদে
নিবেদন করি আমার প্রাণের ভক্তি অশ্রুজল।
দুর্গত আজ ভারতবাসীরা, হইয়াছে পথহারা
তাদের হৃদয়সরসে ফুটুক জ্ঞানের পদ্মদল॥

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

স্পেন্সারের শিক্ষাসূত্রের চতুর্থ সূত্র—'যাহা দ্বারা সামাজিক অবস্থা যথাযথ সংরক্ষিত হয়।'[১] স্বামীজীর অনুবাদের ভাষায়—"...এক্ষণে মনুষ্যের সামাজিক কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করা যাউক। কি প্রকার শিক্ষা এবং জ্ঞান মনুষ্যকে সামাজিক ব্যবহারে পটু করিতে পারে? বলা যায় না যে, ঐ প্রকার শিক্ষা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় অভাবতঃ (?) সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে। ইতিহাস ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্বে যে প্রকার বলা হইয়াছে, এই শিক্ষা সামাজিক বিষয়ে প্রকৃত নেতা হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে অধীত ইতিহাসই কোন প্রকার সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না। ভূপতিদিগের জীবন, পারিষদ্‌দিগের ষড়যন্ত্র, বলপূর্বক সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি বিষয়সমস্ত সমগ্র জাতীয় জীবনের অল্পই চিত্রিত করে। অমুক অমুক রাজ্যের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ের জন্য বিবাদ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক পক্ষে এত সৈন্যসংগ্রহ এবং কামান ছিল, অমুক সেনাপতি এইপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া জয়লাভ করিলেন। বলুন দেখি, ইহা শিক্ষা করিয়া আপনার সামাজিক জীবনের কি উপকার হইবে? বলিবেন, ইহা সত্য, কিন্তু সত্যের অনুরোধে পাঠ করি। সত্য হইলেই কি তাহা মূল্যবান হইল?"[২]

১, ২ শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ-অনুদিত : 'বসুমতী'-প্রকাশিত শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ : পৃ: ১০, পৃ: ৩০-৩১

স্পেন্সারের মূল গ্রন্থ Education-এর ভাষা—"... Let us pass now to the function of the citizen. We have to enquire what knowledge fits a man for the *discharge of these functions.* It cannot be alleged that the need for knowledge fitting him for these functions is wholly overlooked; for our school-courses contain certain studies which, nominally at least, bear upon political and social duties. Of these only one that occupies prominent place is History.

But as already hinted, the information commonly given under this head, is almost valueless for purposes of guidance. Scarcely any of the facts set down in our school-histories, and very few of those contained in the more elaborate works written for adults, illustrate the right principles of political action. The biographies of monarch (and our children learn little else) throw scarcely any light upon the science of society. Familiarity with court intrigues, plots, usurpations, or the like and with all personalities accompanying them aids very little in elucidating the causes of

national progress. We read of some squabble for power, that it led to a pitched battle; that such and such were the names of the generals and their leading subordinates, that they had each so many thousand infantry and cavalry, and so many cannon,....... And now, out of the accummulated details making up the narrative, say which it is that helps you in deciding on your conduct as a citizen....... "But these are facts —interesting facts," you say. Without doubts they are facts (such, at least, as are not wholly or partially fictions); and to many they may be interesting facts. But this by no means implies that they are valuable"

স্পেন্সার ইতিহাসের সাধারণ তথ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, তা আধুনিক ইতিহাস-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গত। প্রাচীনযুগের পুরাণে ও ইতিহাসে মহাপুরুষ, অবতার, রাজা ও বীরের দলের প্রাধান্য। পুরাণ জাতীয় ইতিহাসের কল্পনাসমৃদ্ধ রূপ। তাই ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে পুরাণেরও নিজস্ব ভূমিকা আছে। তবু এ সব কিছুই সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর বৃত্তান্ত। সমাজের মূল প্রাণশক্তি যে সাধারণমানুষ, তাদের সম্বন্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ ইতিহাসই নীরব। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এই সাধারণমানুষই ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র।

'পরিব্রাজক'-গ্রন্থে য়ুরোপের সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য—"...গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো। রাশি রাশি অন্য-দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়, এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড! বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী—এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্চে প্রাণ।"[৪]

স্বামীজীর এ মন্তব্য যেমন 'নীচজাতি অজ্ঞ দরিদ্র পতিতের' সঙ্গে তাঁর একাত্মতার পরিচায়ক তেমনি তাঁর সমাজসচেতন মননে ইতিহাসের মূল সত্য অন্বেষণের দৃষ্টান্ত। স্পেন্সার যেমন সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিকায় ইতিহাসকে স্থাপন করতে চেয়েছেন, পরবর্তী কালে স্বামীজী 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসকে তেমনি ভারতের প্রজাশক্তির ধারাবাহিক অভ্যুদয়রূপে বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। আবার সেইসঙ্গে ভারত-ইতিহাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধর্মচেতনা ও ধর্মবীরদের নিজস্ব ভূমিকার কথাও আলোচনা করেছেন।

রাজনীতি-প্রধান য়ুরোপীয় সভ্যতা ও ধর্ম-নীতি-প্রধান ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে স্বামীজী লিখছেন—"গোটাকতক শক্তিমান্ পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে; বাকিগুলো খালি 'ভেড়িয়া-ধসান' বই তো নয়। ও তোমার 'পার্লামেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র। সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে শক্তিমান্ পুরুষ কে? না—ধর্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই সমাজের রীতি-নীতি বদলাবার দরকার হলে বদলে দেন। আমরা চুপ করে শুনি আর করি।

৪ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ১১৭-১১৮

তবে এতে তোমার বাড়ার ভাগ ঐ মেজরিটি ভোট প্রভৃতি হাঙ্গামাগুলো নেই, এই মাত্র।

অবশ্য ভোট-ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই।"৫

উদ্ধৃত মন্তব্যের শেষাংশটুকু আর এ যুগের ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার নিজস্ব ধরনটি বিশ্লেষণে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত সত্য। রাজশক্তি ও প্রজা-শক্তির সম্বন্ধের মাঝখানে ভারতে একটি প্রধান মধ্যস্থ শক্তি সমাজ। তাই প্রত্যক্ষভাবে রাজপ্রাসাদ থেকে জনজীবন ততটা নিয়ন্ত্রিত করা এদেশে সম্ভব হয়নি। মূলতঃ গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা ভারতীয় জীবনধারাকে যুগে যুগে লালন পালন করে এসেছে। কিন্তু এ ব্যবস্থাও নিশ্ছিদ্র বা নিষ্কলঙ্ক কিছু নয়। লোকাচার, দেশাচার, ছুঁৎমার্গ—এ সবের ভারে জীর্ণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষেও যুগে যুগে প্রতিবাদ দেখা দিয়েছে। সে প্রতিবাদের ভাষা ধর্ম।

'বর্তমান ভারতে' ভারতীয় ইতিহাসের সেই বৈশিষ্ট্য স্বামীজীর গাঢ়বদ্ধ সাধু ভাষায়—"ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, আর্য-সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।"৬

সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসের সমাজবিজ্ঞান-সম্মত রূপায়ণ প্রচেষ্টায় প্রথম জীবনে স্পেন্সারের অনুবাদক বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের শেষ কয় বছরে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। 'বর্তমান ভারত' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ দুটি এ দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের কোনোটিতেই ইতিহাসের সাধারণ ঘটনা-কৌতূহল চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা নেই। ইতিহাসের মর্মে প্রবেশ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ই এ দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ইতিহাসের তথ্যরাশি থেকে কেমন করে প্রাণের সত্য নিষ্কাশিত হবে, সে সম্বন্ধে স্পেন্সার লিখেছেন—"We want all facts which help us to understand how a nation has grown and organised itself. Among these, let us of course have an account of its government; with as little as may be of gossip about the men who officered it, and as much possible about the structure, principles, methods, prejudices, corruption etc. which it exhibited, and let this account include not only the nature and actions of the central government, but also those of local governments, down to their minutest ramifications……. Let us know, too, that what were all the other customs, which regulated the popular life out of doors and indoors…. The only history that is of practical value, is what may be called Descriptive Sociology. And the highest office which the historian can discharge, is

৫ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ১৬১-১৬২

৬ বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ২৩৭

that so narrating the lives of nations, as to furnish materials for a Comparative Sociology and for the subsequent determination of the ultimate laws to which social phenomenon conforms."[৭]

স্বামীজীর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ—"কি প্রকারে সমাজবিশেষ গঠিত হইল, কি প্রকারে জাতিবিশেষের অভ্যুদয় হইল, তাহাই আমাদের প্রয়োজন। রাজ্যশাসন কি প্রকারে হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন। শাসকদিগের ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া কি করিব? কেবল যে সর্বোচ্চ শাসন-সমিতির আবশ্যক, তাহা নহে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ-পরিচালক শক্তিসমষ্টিরও বিবরণ আবশ্যক। কি প্রকারে বিবিধ সামাজিক সম্প্রদায় নিম্ন-শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, কি প্রকারে বিবিধ নিম্নশ্রেণীর দ্বারা সম্মানিত হইতেছে, এই সমস্ত বিবরণের প্রয়োজন। গৃহে এবং বাহিরে সেই সমাজের লোকেরা কি প্রকার ব্যবহার করিত, তাহাও আবশ্যক। স্ত্রীপুরুষ, পিতামাতা, এবং সন্তান পরস্পরের উপর কিরূপ ব্যবহার করিত, কি কি কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বাণিজ্যের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহাদের শিল্পবিবরণ, তাহাদের মানসিক অবস্থা প্রকৃত ইতিহাসে সমুদয় বিবৃত থাকা উচিত; এই সকল বিবরণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিবৃত হওয়া উচিত যে, পাঠ করিলে সমস্ত সমাজের ছবি মানসপটে উদিত হইবে। বিবিধ সময়ে সেই সমাজের বিবিধ পরিবর্তনও কার্য-কারণ-সম্বন্ধের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, এই প্রকার ইতিহাসই বাস্তবিক ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের যথার্থ সহচর।"[৮]

৩, ৭ Education : Spencer. 1st Edn. p 32-36 মূল ইংরেজী থেকে স্বানাভাবের জন্য কিছু অংশ এখানে বর্জিত। অনুবাদ সবটাই দেওয়া হয়েছে।

৮ শিক্ষা: পৃ: ৩২-৩৩

"স্বার্থসুখ ত্যাগ না করিলে জগতে কোন মহৎ বিষয়ই লাভ হয় না, এবং ঐ ত্যাগই শক্তিপূজাপদ্ধতির বলি ও হোমের একমাত্র লক্ষ্য।"

"যে উপায়েই হউক বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারিত হইলেই তুমি উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে; অন্তর্নিহিত পরমাত্মার ধ্যানে উদ্দিষ্ট বিষয়-লাভের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হইল; পূজা ও স্বার্থত্যাগে সেই শক্তি সঞ্চিত, ঘনীভূত ও মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল; এবং পরিশেষে সেই নবশক্তি-নিয়োগে অভীষ্টফল করতলগত হইল। সর্বদেশে সর্ব-কালে সর্বফলসিদ্ধির জন্য এই নিয়মই প্রবর্তিত—শক্তিক্ষয়-নিবারণ, অন্তর্নিহিত মহাশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান।"

—স্বামী সারদানন্দ

প্রাচীন বাঙালীর আহার ও পানীয়

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

বাঙালী চিরদিনই খুব ভোজনপ্রিয় জাত বলে গণ্য। যদিও ষোড়শ শতাব্দীর কিছু কিছু কাব্য ছাড়া তার আগে আর কোথাও বাঙালীর ভোজনপ্রিয়তার তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তথাপি সামান্য নিদর্শন যা' পাওয়া গেছে তার থেকে এধারণা করা কষ্টকর নয় যে, ভোজনের ব্যাপারে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য অনেককাল আগে থেকেই শুরু হয়েছিল।

ভেতো বাঙালী,—এমন একটা বদনাম কি সুনাম অনেক দিন থেকেই বাঙালীর আছে। এর কারণ কি? ইতিহাসের উষাকাল থেকেই ধান ছিল বাঙলাদেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। তাই ভাতই বাঙালীর প্রধান খাদ্য। ভাত খাওয়ার এ অভ্যাসটি বাঙালী রপ্ত করেছে আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে এসে। ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকলের কাছেই এদেশে ভাত অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য বলে বিবেচিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের একটি পদে আছে 'হাড়িত ভাত নাহি নিতি নিতি আবেশী'—। ভাতরান্নার সুন্দর উল্লেখ রয়েছে নৈষধচরিতে দময়ন্তীর বিবাহের বর্ণনাতে। ঘি দিয়ে গরম ভাত খাবার রীতি বাঙালী সমাজে চলে আসছে অনেক দিন থেকেই।

প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থে (চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি?) প্রাকৃত বাঙালীর কলাপাতায় আহারের এক বিস্তৃত না হলেও সুদুর্লভ বর্ণনা রয়েছে: 'ওগ্‌গরা ভাগ গাইক ঘিত্তা', গোঘৃত-সহকারে সফেন গরমভাত। নৈষধচরিতের বর্ণনা বিস্তৃততর। পরিবেশিত অন্ন থেকে ধোঁয়া উঠছে, তার প্রত্যেকটি কণা অভগ্ন, একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন (ঝরঝরে ভাত), সে অন্ন সুসিদ্ধ সুস্বাদু ও শুভ্রবর্ণ, সরু এবং সৌরভময় (১৬।৬৮) দুগ্ধ ও অন্নপক্ক পায়সও উচ্চকোটির লোকের এবং সামাজিক ভোজে অন্যতম প্রিয় ভক্ষ্য ছিল। (১৬।৭০)

ভাত সাধারণত: খাওয়া হোত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে। দরিদ্র এবং গ্রাম-বাসীদের ভোজ্য ছিল শাকসবজি। নানা-প্রকারের শাকের মধ্যে নালিতা (পাট) শাকের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় প্রাকৃতপৈঙ্গলে। এতে বাঙালীর একটি সনাতন প্রিয়ভোজের এরূপ সুন্দর বর্ণনা আছে—

> ওগ গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা
> দুগ্ধ সযুক্তা
> মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা
> খা(ই) পুনবন্তা।

কলাপাতায় গরমভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করতে পারেন তাঁর স্বামী পুণ্যবান।

গৃহস্থরা প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকাতে শাকান্ন যুক্ত করলেও সামাজিক ভোজে—বিশেষত: বিবাহভোজে বরযাত্রীরা শাকান্ন পছন্দ করতেন না।

দময়ন্তীর বিবাহভোজে সবুজরঙের পাত্রে ভাত-তরকারি পরিবেশন করা হয়েছিল। বরযাত্রীরা মনে করেছিলেন বুঝিবা শাক-তরকারি পরিবেশন করা হয়েছে; একটু বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করলেন দেখে কন্যা-পক্ষীয়েরা বললেন, আপনাদের শাক-পরিবেশন

করা হয়নি, পাত্রটির বর্ণ সবুজ বলেই অন্ন ব্যঞ্জন সবুজ দেখাচ্ছে।

বিবাহভোজে হরিণ ছাগ এবং পক্ষীমাংসের নানারকমের ব্যঞ্জন, মাছের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য আরো নানাপ্রকারের সুগন্ধি এবং প্রচুর মসলা-যুক্ত ব্যঞ্জন পরিবেশিত হওয়াই ছিল বাঙালী সমাজের রীতি। তারপর এসবের শেষে নানাপ্রকারের সুমিষ্ট পিষ্টক এবং দই ইত্যাদিও পরিবেশিত হত। পানীয়রূপে পরিবেশিত হত কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জল। ভোজের পরে দেওয়া হতো নানামসলাযুক্ত পানের খিলি।

দই পায়স ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানা-প্রকারের খাদ্যের উল্লেখ প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থের নানাস্থানে পাওয়া যায়। এগুলি চিরদিনই বাঙালীর প্রিয়খাদ্য। ভবদেবভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে নানাপ্রকারের দুগ্ধপান সম্বন্ধে নানাপ্রকারের বিধিনিষেধ রয়েছে।

মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় ছিল। বিশেষতঃ শবর পুলিন্দ প্রভৃতি শিকারজীবী লোকেদের মধ্যে এবং সমাজের অভিজাত স্তরে হরিণের মাংস খাওয়া হতো। ছাগমাংস খাবার রীতি ছিল সমাজের সকল-স্তরেই। কোন কোন প্রান্তে ও লোকস্তরে, বিশেষভাবে আদিবাসী কৌমে বোধহয় শুকনো মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল কিন্তু ভবদেবভট্ট কোনকারণেই শুকনো মাংস খাওয়া অনুমোদন করেননি বরং নিষেধই করেছেন। কিন্তু মাছই হোক আর মাংসই হোক, অথবা নিরামিষই হোক, বাঙালীর রান্নার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ছিল।

মাংসের প্রতি বাঙালীর বিরাগ কোন-কালেই ছিল না। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকেই খাদ্যের জন্য প্রাণিহত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে তো বটেই, একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছিল এবং আর্যব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশঃ নিরামিষ আহার্যের প্রতিই পক্ষপাতী হয়ে উঠছিল। বাংলাদেশেও এই প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, সন্দেহ নেই ; কিন্তু চিরাচরিত এবং বহু অভ্যস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তা' যথেষ্ট কার্যকরী হতে পারেনি। বাংলার প্রথম ও অন্যতম প্রধান স্মৃতিকার ভট্টদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করে বাঙালীর এই অভ্যাস সমর্থন করেছেন।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে রোহিত, শফর (পুঁটি বা শফরী মাছ), সকুল (সোল) এবং শ্বেতবর্ণের অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের আহার্য ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশে প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়ে জিমূতবাহন ইল্লিস (ইলিস বা ইলসা) মাছের তেলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা বলেছেন। আজকের দিনের মত প্রাচীনকালেও ইলিসমাছ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল। সব মাছ কিন্তু বাংলাদেশের ব্রাহ্মণরা খেতেন না ; যেসব মাছ গর্তে কাদায় বাস করতো, যাদের আঁশ নেই, সে সব মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পচা ও শুকনো মাছও খাওয়া হতো না। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ প্রভৃতির মাংস, নানাপ্রকারের আঁশছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি বানমাছ, গর্তকাদাবাসী নানাপ্রকারের অকুলীন মাছ, নানাপ্রকারের পাখীর মাংস—সবই খাওয়া হতো। শশক, সজারু ও কচ্ছপ খাওয়ার কোন বাধা ছিল না।

তরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁকরুল, কচু (কন্দ) প্রভৃতি আদি-অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এসব তরকারি বাঙালী খুব প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার করে আসছে, ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এই অনুমান

অনৈতিহাসিক নয়। পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে পর্তুগীজদের চেষ্টাতে এবং অন্যান্য নানা সূত্রে নানা তরকারি, যেমন আলু আমাদের খাদ্যের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু আদিপর্বে তাদের অস্তিত্ব ছিল না।

ফলের মধ্যে কলা তাল আম কাঁঠাল নারিকেল ও ইক্ষুরই উল্লেখ পাওয়া যায় বারবার। আম-কাঁঠালের উল্লেখ লিপিমালায় সুপ্রচুর। পূজা বিবাহ স্নানযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলাগাছের উল্লেখ দেখা যায়। আখের রস আজকের মতন তখনও পানীয় হিসাবে সমাদৃত ছিল। রস থেকে গুড় ও একপ্রকারের দানাওয়ালা খণ্ড চিনিও প্রস্তুত হতো। তেঁতুলের ব্যবহার দই চিড়া মুড়ি ও খইখাওয়ার কথাও লেখা আছে নানান প্রাচীন গ্রন্থে।

দুধ, নারিকেলের জল, আখের রস, তালরস ছাড়া মদ্যজাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল। গুড় থেকে প্রস্তুত সবরকমের গৌড়ীয় মদের খ্যাতি ছিল সারা-ভারত জুড়ে। ভাত গম গুড় মধু আখ তালরস প্রভৃতি গেঁজিয়ে নানাপ্রকারের মদ তৈরী হতো। ভবদেবভট্ট তাঁর প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে নানাপ্রকার মদ্যপানীয়ের উল্লেখ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজ ও দ্বিজেতর সকলের পক্ষেই মদ্যপান নিষিদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞা ক'জন শুনতো বলা কঠিন।

প্রাচীন বাঙালীর খাদ্যতালিকায় কোথাও ডালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর কারণ বাংলাদেশে ডাল উৎপন্ন হত না। আর তাছাড়া সুলভ মৎস্যভোজীর পক্ষে তার প্রয়োজন ছিল কম। বস্তুতঃ ডালের চাষ ও ডালখাওয়ার রীতিটা বোধহয় আর্য ভারতের দান এবং তা' মধ্যযুগে।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মৎস্যভোজী বাঙালীর আহার্য অবাঙালীদের রুচি ও রসনায় খুব শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিল না। আজও নেই।

তা না থাক। একথা বলতেই হয় যে, বাঙালী অতি প্রাচীন কাল থেকেই অতি ভোজনপ্রিয় জাত। নিজে খেয়ে এবং অন্যকে খাইয়েই ছিল তার সুখ। কিন্তু সেদিন গেছে যখন বাঙালীর গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আর পুকুরভরা মাছ তার সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

আজ ঈশ্বরী পাটনীরা মনের দুঃখই কেবল শোনাবে,—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে", কিন্তু কোন অন্নপূর্ণার হাত সানন্দে তাদের হাতে দুধভাতের বাটি তুলে দিয়ে লক্ষ্যে কী অলক্ষ্যে প্রার্থনা মঞ্জুর করবে কবে?

একবেলা ভাত, একবেলা রুটি এবং পাত থেকে মৎস্যখণ্ড এবং মাংস প্রায় অবলুপ্ত আজ বাঙালীর খাদ্যতালিকাতে। দুধও প্রায় নিশ্চিহ্ন।

এমন খাদ্যাভাব বাঙালীর আর কোনদিন হয়নি।

একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব

ইংরেজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, ষোল বৎসর বয়সে, আমি প্রথম 'রামকৃষ্ণ মিশন' এবং শিশু 'উদ্বোধনে'র সাথে পরিচিত হই। আমার বাবা তখন নোয়াখালীতে কাজ করিতেন এবং আমি সেখানকার গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান Class IX) পড়িতাম। সে বছর কুখ্যাত লর্ড কার্জনের বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা দেশটা আলোড়িত তো ছিলই, তা ছাড়া "গোদের উপরে বিষ-ফোড়া"র মতন বাংলার কয়েকটি জেলাতে দুর্ভিক্ষও দেখা দিয়াছিল ; চাউলের দাম মন প্রতি সাত-আট টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে নোয়াখালী জেলাও এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জেলাগুলির অন্যতম ছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যকল্পে বেলুড় মঠ হইতে পূজনীয় আশু মহারাজ (স্বামী সত্যকাম) এবং ব্রহ্মচারী অমূল্যচরণ (পরবর্তী কালে স্বামী শঙ্করানন্দ) নোয়াখালীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে তৎকালীন খ্যাতনামা উকীল রাধাকান্ত আইচ মহাশয়ের গৃহে তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাধাকান্ত বাবুর দ্বিতীয় পুত্র রমেশ ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী, সেই সূত্রে তাঁহার বাড়ীতে আমার প্রায়ই যাতায়াত ছিল ; সুতরাং স্বামীজীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে সহজ হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া 'উদ্বোধন' ও স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাদি আনাইয়া পড়িতে আরম্ভ করি, যাহার ফলে তখন হইতেই মঠ-মিশনের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়। ইহার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৭-১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় General Assembly's Institution-এ (বর্তমান Scottish Church College) I.A. পড়িবার সময় একাধিকবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণদর্শন, মঠস্থ মহারাজদিগের,—বিশেষতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের বিশেষ স্নেহভাজন হইবার, এবং কথামৃত-প্রণেতা 'মাষ্টার মহাশয়ের' পবিত্র সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু নানাকারণে B.A. পড়িবার জন্য আমাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বহরমপুরে যাইতে হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদিগের পবিত্র সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি, ইহাতে চিত্ত যে দারুণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল একথা বলা বাহুল্য। এই ক্ষোভনিবারণকল্পে সারগাছি অনাথ আশ্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের নিকটে যাতায়াত আরম্ভ করি, এবং ছুটি হইলেই মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঠাকুর-স্বামীজীর কথা ও হিমালয়-তিব্বত-ভ্রমণকাহিনী শ্রবণ করা আমার এক প্রকার রুটিনে পরিণত হইয়াছিল। নিম্নে বর্ণিত ঘটনাটি এই সারগাছিতেই সংঘটিত হইয়াছিল।

সন ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাস (ইং১৯১১খৃঃ); শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজাদি সারগাছি আশ্রমে যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী রবিবারে সাধারণ মহোৎসব। ইহার

দুই দিন পূর্বে শুক্রবারে স্বামী অখণ্ডানন্দ বহরমপুরে গিয়া নিমন্ত্রণপত্রাদি বিলির বন্দোবস্ত শেষ করিয়া, এবং মহোৎসবের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সারগাছি রওনা করিয়া দিবার পরে, বৈকালে আমাদের মেন হোষ্টেলে (Main Hostel) আসিয়া আমাদিগকে এই নির্দেশ দিয়া গেলেন যে, আমরা ছয় সাত জন কর্মী যেন শনিবারে বিকালে, এবং আরও পনেরো-ষোল জন কর্মী পরদিন প্রাতে সারগাছিতে চলিয়া যাই। তদনুযায়ী শনিবারে বিকালের ট্রেনে আমরা সাতজন সারগাছি গেলাম। অনাথআশ্রমে স্থানাভাববশতঃ আশ্রম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে প্রান্তরমধ্যে তখনকার দিনে উক্ত বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এই স্থানে খুব উঁচু পাড দিয়া ঘেরা একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল; ঐ পাড়ের উপরে এক পার্শ্বে একটি শাখা-প্রশাখা-বিস্তীর্ণ পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল। এই বট-বৃক্ষের নীচে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদী এবং রন্ধনাদির আয়োজন করা হইত, আর পাড়ের নীচে, এক পার্শ্বে, উন্মুক্ত প্রান্তরে দরিদ্রনারায়ণসেবা ও সমাগত ব্যক্তিদিগকে প্রসাদবিতরণ করা হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে সুদূরবিস্তৃত নানাজাতীয় বৃক্ষের জঙ্গল, সম্মুখে পুষ্করিণী, এবং পুষ্করিণীর পাড়ের নীচে অন্য তিনদিকে সুদূরপ্রসারী শস্যক্ষেত্র ছিল।

আমরা সেখানে পৌঁছিলে পর স্বামীজী আমাদিগকে চা দিলেন; চা-পানের পর তরকারি কুটিতে লাগাইয়া দিলেন। তিন চারি জন পাচক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা রান্নার কাজ করিতেছিল। সারারাত্রি জাগিয়া কাজ করিতে হইবে বলিয়া আমরা বিশেষ কিছু খাইলাম না, সামান্য জলযোগ মাত্র করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম, এবং স্বামীজী আমাদের মধ্যে বসিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাদিগকে চা তৈরী করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন ও নানা প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনায় আমাদের শ্রম লাঘব করিতে লাগিলেন। এইভাবে রজনী অতিবাহিত হইল।

পরদিন যথাবিধি মহোৎসব পালিত হইল এবং সূর্যাস্তের অল্প পূর্বেই খাওয়াদাওয়ার কাজ মিটিয়া গেল। তখন বহিরাগত কর্মীদিগের মধ্যে আমাদের সঙ্গের পাঁচজন এবং সেইদিন প্রাতে আগত ষোলজন সুযোগ বুঝিয়া বহরম-পুরের একটি দলের সাথে মিশিয়া কর্মব্যস্ত স্বামীজীর নিকট হইতে এক ফাঁকে বিদায় গ্রহণ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে, আমি এবং হীরালালদাদা (হীরালাল চক্রবর্তী) যখন স্বামীজীর চরণে প্রণামান্তে বিদায় প্রার্থনা করিতে গেলাম, তখন তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা সকলেই চলে গিয়ে কি আমাকে ঠাকুরের কাছে অপরাধী করে রাখবার সঙ্কল্প করেছ? কাল থেকে সারা-দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঠাকুরের কাজ করলে, কি খেলে না খেলে দেখতে পেলাম না; আজ এখুনি তোমরা চলে গেলে আমি মনে যে কতখানি কষ্ট পাব, তা কি বুঝতে পার না? আজ তোমাদের যাওয়া হ'তে পারে না; কাল আমি নিজহাতে রেঁধে তোমাদের খাওয়াব। কাল বিকালে তোমরা যেও।" এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রতি বছর উৎসবের পরদিন নিজহাতে রাঁধিয়া কর্মী-দিগকে না খাওয়াইতে পারিলে স্বামীজী শান্তি পাইতেন না। সুতরাং সেরাত্রে আমা-দের দুইজনের আর যাওয়া হইল না।

সন্ধ্যার পরেই স্বামীজী 'ঘেঁটু যাত্রা'র বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। একজন বাদক, একজন বংশীবাদক এবং একটি ১২।১৩ বৎসর

বয়স্ক বালক এই তিনজনকে লইয়া সেই গ্রাম্য যাত্রাপার্টি গঠিত। বালকটি শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া বৃন্দাবনলীলা গাহিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনাইল, আর শুনিলাম আমরা এবং সারগাছিনিবাসী কতিপয় শ্রোতৃবৃন্দ। রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ যাত্রা শেষ হইয়া গেল, এবং গ্রামবাসী শ্রোতারা যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলেন। সেই মাঠের মধ্যে রহিলাম আমরা চারিটি প্রাণী,—স্বামীজী, স্থানীয় মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়, আমি ও হীরালাল দাদা। অমরা দুইজন একবস্ত্রে গিয়াছিলাম বলা চলে, সঙ্গে বিছানাদি কিছুই ছিল না; সুতরাং বিছানা ছিল মাত্র দুইটি, একটি স্বামীজীর, এবং অপরটি হেডমাষ্টার মহাশয়ের। স্বামীজীর বিছানা ঠাকুরের বেদীর সামনে, বেদী থেকে ৮।১০ হাত দূরে এবং অপরটি স্বামীজীর বিছানার ৮।১০ হাত বামে পাতা হইল। বেদীর দুই পাশে দুইটি টিনের কারবাইড ল্যাম্প সারারাত্রির মতো জ্বালিয়া রাখা হইল, বাকী হ্যাজাক আলো কয়টি নিভাইয়া দেওয়া হইল। স্বামীজীর শয্যাটিতে তিনি একা শুইলেন; অপরটিতে আমরা তিনজন একত্র একই লেপের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া শুইলাম, স্থূলকায় তথা স্ফীতোদর হেডমাষ্টার মহাশয় এবং হীরালালদাদা যথাক্রমে আমার ডাইনে ও বামে এবং ছিপছিপে পাতলা দেহ লইয়া আমি তাঁহাদের মাঝখানে লুক্কায়িতপ্রায় অবস্থায় শুধু মুখটি বাহিরে রাখিয়া। শয়নানন্তর একথা-সেকথার মধ্যে হীরালালদা বলিলেন, "আচ্ছা, জীবন! রাত্রে আমরা ঘুমুলে যদি একটা বাঘ এসে আমাদের কারুকে তুলে নিয়ে যায়"—তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে না দিয়াই স্বামীজী ভৎ‌র্সনার সুরে বলিয়া উঠিলেন, "ও কি কথা তোমাদের! তোমরা ঠাকুরের কাজে এসে সারাক্ষণ তাঁর কাজ ক'রে এখন বিশ্রাম করছ, আর তাঁরই সামনে থেকে তোমাদের বাঘে নিয়ে যাবে! ঠাকুরের উপরে এতটুকু বিশ্বাস তোমাদের নেই কি?" স্বামীজীর কথা শেষ না হইতেই হেডমাষ্টার মহাশয়ের শঙ্কাপূর্ণ সতর্কবাণী শোনা গেল, "ওই, বলতে না বলতে এসে গেছে!" আমরা জঙ্গলের দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম যে, সেদিক হইতে রাজকীয় চালে দুলিতে দুলিতে একটি পূর্ণকায় চিতাবাঘ আমাদের দিকে আসিতেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমাদিগকে আতঙ্কবিহ্বল হইতে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, "কোন ভয় নাই; একদম চুপ ক'রে থাকো; নোড়ো না, কোন শব্দ কোরো না।" তাঁহার কথামত আমরা নীরবে বাঘটির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

বাঘটি ধীরেধীরে ঠাকুরের বেদী ও স্বামীজীর বিছানার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং বেশ খানিটা সময় আমাদের তিনজনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, পরে মাথা উঁচু করিয়া ঠাকুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনবার হুঙ্কার দিয়া যে-পথে আসিয়াছিল ঠিক সেই পথে ফিরিয়া গিয়া জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "দেখলে? তোমাদের কারুকে কি খেয়ে গেল? আজ সারাদিন মানুষের ভিড়ের মধ্যে ও ঠাকুরকে দর্শন-প্রণাম করতে আসতে পারেনি, এখন তাই নিরিবিলিতে এসে দর্শন-প্রণাম ক'রে গেল, আর তিনটি জোকার (জয়ধ্বনি) দিয়ে গেল। ও তোমাদের খেতেও আসেনি বা নিয়ে যেতেও আসেনি।"

ইহার পরে নিরাপদে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন স্বামীজী ঐ পুকুরপাড়ের বটতলাতেই

স্বহস্তে খিচুড়ি ও মাংস রাঁধিয়া আমাদিগকে এবং স্থানীয় কয়েকজন কর্মীকে খাওয়াইলেন, তৎপর বিকালে আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

উক্ত ঘটনার পরে সুদীর্ঘ ৫৯ বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, তথাপি উহার স্মৃতি আজও আমার মনে একইভাবে অম্লান রহিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি আমি একথার কোন সুনিশ্চিত মীমাংসা করিতে সমর্থ হই নাই যে, ব্যাঘ্রটির আগমনের কারণ সম্বন্ধে মহারাজ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা তখন তাঁহার যাহা মনে হইয়াছিল তাহাই বলিয়াছিলেন, না ও কথাগুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে সত্য জানিয়া বলিয়াছিলেন? আবার সময় সময় একথাও ভাবি যে, আমাদের অবিশ্বাসী মনের পর্দায় গভীরভাবে বিশ্বাসের ছাপ আঁকিয়া দিবার জন্যই উক্ত ঘটনাটি ঘটে নাই তো!

আনন্দময়ী

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আকাশের বুকে মেঘ যেন কাশ—মরালপাখার মতো,
বিস্তৃত ক্ষেতে তোলা আউশের সুগন্ধি মর্মর!
শান্তিবটের ছায়ায় শালিক ছাতারে দোয়েল কতো,
দূরান্ত থেকে আশ্রয় চায় শামকুট যাযাবর।

বিকেলের হাওয়া বনমরমের কী জানায় পরিচিতি,
নলখাগড়া ও উলুখড় ঝোপে গলছে রোদের সোনা,
ধুঁধুল ফুলের আলোয় চকিত অপরাজিতার স্মৃতি,
বাবলার বনে কত বসন্ত-বৌলির আনাগোনা!

নদীর ওপারে বেতবন জুড়ে ছায়া-আলোকের খেলা,
দুলছে এপারে চাঁদাঘাস—তার বেগুনী ফুলের সাজ,
সন্ধ্যামালতী বক আর ঘেঁটু বন্যেবুড়োর মেলা,
বৈঁচিবনের আড়ালে ফুল্ল কাকজঙ্ঘাও আজ!

শরতের বুকে পরমাপ্রকৃতি—এ কার পদাশ্রয়ী?
শুনেছে কী তান—আগমনী গান আনে আনন্দময়ী?

'আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে'

শিবদাস

১

'আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে সিন্ধু ধরার হাত,
বিশ্বজনারে মিলাইতে সেথা দৃশ্য জগন্নাথ।'

—কবি একথা বলিয়াছেন পুরীধামের জগন্নাথদেব সম্বন্ধে। কন্যাকুমারীতেও এই আকাশ-সিন্ধু-ধরণীর হাতধরাধরির অপূর্ব দৃশ্য। এখানে একটি নয়, দুটি সাগর ও একটি মহাসাগর পরস্পর-মিলিত। এখানে দাঁড়াইয়া সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুই-ই দেখা যায়। তিন দিকে শুধু জল। কিন্তু বিশাল সমুদ্রবক্ষের কতটুকুই বা একসঙ্গে চোখে পড়ে? পৃথিবীর বর্তুলাকার পৃষ্ঠ দৃষ্টিকে তো সীমিত করিয়া দেয়। এখান হইতে সোজা দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরের বুকে যদি ভাসিয়া যাওয়া যায় মাঝপথে কোন স্থলভাগ পথরোধ করিবেনা, সোজা ৫,০০০ মাইল জলরাশির বিস্তৃতির পর পাওয়া যাইবে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের তটভূমি। এই সুবিশাল জলরাশির সম্মুখে, এখানেও, দেবী কন্যাকুমারীর মন্দিরে সমগ্র ভারতের লোক মিলিত হইয়া আসিতেছে যুগযুগান্ত ধরিয়া। সম্প্রতি এখানে আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বজনকে মিলাইবার জন্য, একার্য সাধনার্থে যে ভাবধারার নবযুগে উন্মেষ তাহারই ধারক ও প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারী মন্দিরের অদূরে সাগরমধ্যস্থ 'ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের' উপর নবনির্মিত স্মৃতিমন্দির বিবেকানন্দ-মণ্ডপে। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতির সঙ্গে এই 'বিবেকানন্দ-শিলা' ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আবার, প্রাচীন উপাখ্যান অনুযায়ী দেবী কন্যাকুমারীর সঙ্গেও। দেবী কুমারীরূপে এই শিলাখণ্ডের উপর সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য। দেবীর সেই তপস্যারত মূর্তিই স্থাপিত কন্যাকুমারী-মন্দিরে। সেখানে মায়ের হস্তধৃত জপমালা দেখিয়া মনে হয় মা যেন এখনো তপস্যা করিতেছেন—ভারতের প্রাণ-শক্তি যেন চিরতপস্যারত, পরমসত্তার সঙ্গে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে।

২

বিবেকানন্দ-শিলার সহিত শুধু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়, ভারতের নবজাগরণও, সমগ্র মানবজাতির নবযুগের উদ্বোধনও ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব লীলাসংবরণ করেন। তাহার পূর্বেই যে-কার্যের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ধর্মস্থাপনের মাধ্যমে জগৎকল্যাণসাধনের গুরু-ভার দিয়া যান তাঁহার প্রধান সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের উপর। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে ব্যাপক যোগাযোগের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী তখনই কতকগুলি জাগতিক বিষয়ের দিক দিয়া এক হইতে শুরু করিয়াছে। কাজেই এবারের ধর্মস্থাপনের কাজ শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্যই। কিন্তু ইহার জন্য সর্বাগ্রে 'সর্বধর্মের জননী' ভারতের সনাতন ধর্মকে ভারতবাসীর জীবনে মূর্ত করিয়া তোলা প্রয়োজন; কারণ ভারতই ভবিষ্যতে শুধু বাহিরের দিক দিয়া নয়, হৃদয়ের দিক দিয়াও

এক হওয়ার আদর্শ সমগ্র জগৎকে দেখাইবে। কিন্তু ভারতের অবস্থা তখন কি? —পরাধীন, শিক্ষাহীন, অন্নহীন, আত্মগৌরববিস্মৃত, পরানুকরণে এমনকি পরধর্মগ্রহণেও সমুৎসুক একটি জাতি। এই অবস্থায় ভারতে ধর্মের নবজাগরণের জন্য সর্বাগ্রে চাই জাগতিক উন্নতি, কিন্তু উহা করিতে যাইয়া ভারত আবার ধর্মকে না ভুলিয়া যায়, ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়াই উহা করিতে পারে, সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে ভবিষ্যতে জগৎকে কোন্ আদর্শ সে দেখাইবে? জগতের অপরাপর উন্নত জাতি-গুলির সহিত তাহার পার্থক্য থাকিবে কী? তাছাড়া ভারতবাসীর জীবনে যথার্থ ধর্মের বিকাশের মাধ্যমেই তাহার সর্ববিধ উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে; ভারতের বর্তমান অবনতির কারণ ধর্ম নয়, যথার্থ ধর্মজীবনের অভাব। এই মহাকার্যের গুরুভারই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কিভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার বিস্তারিত সব কিছু বলেন নাই, বলিয়াছিলেন যে যথাকালে মা সব জানাইয়া দিবেন।

কিভাবে একার্য সমাধা করা যায় তাহার চিন্তায় তিনি বহু বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছেন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারত পরিব্রাজকরূপে ঘুরিয়া ভারতের জনগণের তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ববিধ অবস্থার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া সর্ববিষয়েই জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশায় চোখের জলে ভাসিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারকল্পে কোন্ পথে প্রথম পদক্ষেপ করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই।

অবশেষে সমবেদনাদীর্ণ ও চিন্তাকুল হৃদয় লইয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি কন্যাকুমারীর মন্দিরে উপনীত হন। মাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার পর তটভূমি হইতে প্রায় দুই ফার্লং দূরে সমুদ্র-বক্ষে অবস্থিত দেবী কন্যাকুমারীর পদরেণুপূত শিলা বলিয়া আখ্যাত, অধুনা 'বিবেকানন্দ-শিলা' নামে পরিচিত, চতুর্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত এই শিলাখণ্ডে তিনি সাঁতরাইয়া উপস্থিত হন। সমুদ্রে সাঁতার দিয়াই যাইতে হইয়াছিল, কারণ নৌকাভাড়া করিয়া যাইবার পয়সা সঙ্গে ছিল না। সেখানে পৌঁছিয়া, ভারতের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ভারতের বর্তমান অবনত অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে এবং অঝোরে সমবেদনার অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তিনি গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যান। আর তখনই ভারতের অতীত গৌরবের, তাহার বর্তমান দুরবস্থার এবং তাহার ভবিষ্যৎ মহিমারও উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠে। আর সেই সঙ্গে পান ভারতের ও জগতের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য কোন্ পথে প্রথম পদক্ষেপ করিবেন তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এখানেই, ধ্যানাসনে বসিয়াই তিনি স্থির করিয়া ফেলেন যে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার চিকাগো শহরে যে ধর্মমহাসভা বসিবে তাহাতে তিনি যোগদান করিবেন। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত মনীষিমণ্ডলীর কাছে ভারতের যুগযুগান্তের প্রাণবাণী, মানবজাতির সর্বোচ্চ চিন্তা, বেদান্তের সর্বজনীন প্রাণপ্রদ উদার অভয় ভাবরাশি প্রচার করিবেন। ইহাতে দুই কাজ একসঙ্গে হইবে—রাজসিকতায় চঞ্চল পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করাও হইবে, এবং ভারতবাসীকে জাগাইবার জন্য সর্বপ্রথম যাহা প্রয়োজন সেই আত্মবিশ্বাসের,

নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসের উদ্বোধনও করা হইবে পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির জয়গান ধ্বনিত করিয়া। বস্তুতঃ হইয়াছিলও তাহাই। তাছাড়া ভারতের নিপীড়িত জনগণের উন্নয়নের জন্য কার্য আরম্ভ করিবার মতো কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিবার ইচ্ছাও তাঁহার মনে ছিল।

নবযুগে সমগ্র মানবজাতির পরম কল্যাণ সাধনের জন্য যে রামকৃষ্ণভাবসলিল উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই ভাবগঙ্গাকে তাঁহার নিজের ও শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যালব্ধ বিপুল শক্তিতে মণ্ডিত করিয়া মহাদেবের মতো শিবাবতার বিবেকানন্দ এতদিন শিরে ধারণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এই বিবেকানন্দ-শিলারূপ গোমুখীতীর্থে সে ভাবসুরধুনী যেন প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিবার জন্য বিপুল আবেগে উন্মুখ হইয়া উঠিল, যেন বলিয়া উঠিল, 'আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া চলিব ছুটিয়া আকুল পাগল পারা'।

কাজেই ভারতের নবজাগরণের এবং সমগ্র জগতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের সঙ্গে এই বিবেকানন্দ-শিলার স্মৃতিও চির-বিজড়িত।

৩

এই বিবেকানন্দ-শিলাটি ভারতের সর্বদক্ষিণ তটভূমি হইতে প্রায় ১,৫০০ ফুট দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে শিলাটির সর্বোচ্চ সীমার উচ্চতা প্রায় ৫৫ ফুট। এই শিলাটির পাশেই আর একটি ছোট শিলাও রহিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব পালনের এবং তাহার অঙ্গরূপে এই শিলার সহিত বিজড়িত তাঁহার স্মৃতিকে স্থায়ী রূপ দিবার সদিচ্ছায় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাদ্রাজে 'স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারী সেলিব্রেশন এ্যাণ্ড বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি' গড়িয়া উঠে। পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশের মাধ্যমে স্বামীজীর ভাবধারাপ্রচার এবং ভারতের 'অশিক্ষিত, দরিদ্র, নিষ্পেষিত' জনগণের সেবার মাধ্যমে উহার বাস্তব রূপায়ণ, স্বামীজীর ইচ্ছানুগ পথে জাতিগঠন ও মানুষ তৈয়ারীর কাজে ব্রতী হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে এই কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিবেকানন্দ-শিলার উপর একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া সেখানে বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা।

এই স্মৃতিমন্দির-নির্মাণের অনুমোদনের জন্য কমিটি ১৯৬২ খৃস্টাব্দের শেষভাগে মাদ্রাজ সরকারের (বর্তমান তামিলনাড়ু) নিকট আবেদন জানান। দুই বৎসর কথাবার্তার পর ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে বাঞ্ছিত অনুমোদন পাওয়া যায় এবং মাদ্রাজ সরকারের সহিত আলোচনা করিয়াই মন্দিরের নক্সাটি তৈয়ারী করা হয়।

সমগ্র পরিকল্পনাটির মোটামুটি তিনটি অংশ ছিল—'বিবেকানন্দ-মণ্ডপম্' ও 'শ্রীপাদমণ্ডপম্' নির্মাণ, এবং তটভূমি হইতে শিলাখণ্ডে গমনাগমনের জন্য পারাপারের ব্যবস্থা করা। 'শ্রীপাদমণ্ডপম্' নির্মাণের অনুমোদন অবশ্য পাওয়া যায় পরে, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর। যেখানে দেবী কন্যাকুমারী তপস্যা করিতেন, সেখানে শিলাখণ্ডের উপর একটি চিহ্ন তাঁহারই শ্রীপদের চিহ্ন বলিয়া আখ্যাত; তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই বিবেকানন্দ মণ্ডপের সম্মুখে এই মণ্ডপটির বিকল্পনা।

সমগ্র পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য এক কোটিরও অধিক টাকার প্রয়োজন ছিল; অবশ্য ইহার মধ্যে স্মৃতি-মন্দিরের সংরক্ষণ এবং পারাপার-ব্যবস্থাটিকে স্থায়িভাবে চালু রাখা প্রভৃতি আরো কয়েকটি কাজ অন্তর্ভুক্ত;

রাজ্যসরকারের অনুমোদনলাভের পরই কমিটি অর্থসংগ্রহের জন্য সমগ্র ভারতের জনগণের নিকট আবেদন জানান এবং রাজ্যসরকারগুলির প্রত্যেককে কমপক্ষে একলক্ষ করিয়া টাকা দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই সাড়া পাওয়া যায়, চারিদিক হইতে টাকা আসিতে থাকে, এবং ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দেই পাথর কাটিয়া সাইজ করা, উহাতে নকসা তোলা প্রভৃতি প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়া যায় (মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে তৈয়ারী)। সমুদ্রতটে একটি সুবিধামতো স্থানে পরিচালনা-ব্যবস্থার এবং কর্মের ও কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহাদির ব্যবস্থা করিয়া এই কাজ আরম্ভ করা হয়।

ইহার পর হাত দেওয়া হয় মন্দির গাঁথার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায়। পাথরগুলি গাঁথনির জন্য প্রস্তুত হইলে সেগুলিকে তটভূমি হইতে শিলাখণ্ডে লইয়া যাইতে, এবং সেখানে পৌঁছিলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৫ ফুট উপরে তুলিতে হইবে। নির্মাণকার্যের জন্য ও কর্মীদের পানের জন্য শিলাখণ্ডে স্বাদুজল-সরবরাহের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আরও খুঁটিনাটি অনেক কিছু করিবার ছিল।

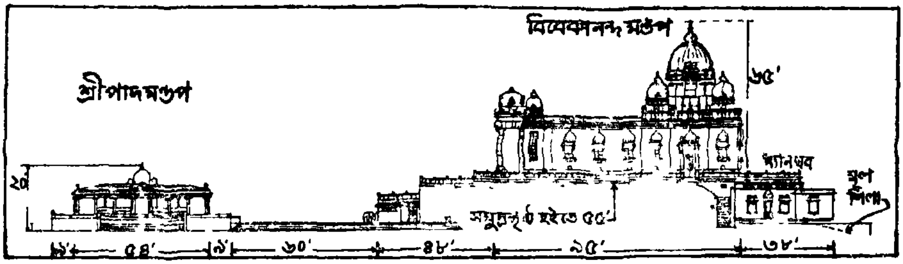
তটভূমিতে ও শিলাখণ্ডে দুটি জেটি নির্মাণ করিয়া মোটরবোটে টানা ছোট ছোট গাধা-বোট জাতীয় নৌকা করিয়া পাথরগুলিকে শিলামূলে লইয়া যাওয়া হইত। সেখান হইতে উপরে তোলা হইত ঢালু পথে টানিয়া। মন্দিরের নির্মাণকার্যে প্রয়োজনীয় জলের জন্য শিলার দুইপার্শ্বে নীচে বাঁধ দিয়া দুইটি বৃহৎ জলাধার তৈয়ারী করা হইয়াছিল—শিলাখণ্ডের উপর সারা বছর ধরিয়া বর্ষিত বৃষ্টির জল উহাতে জমিত। কর্মীদের পানীয় জল অবশ্য লইয়া যাইতে হইত তটভূমি হইতেই, নৌকা করিয়া। সমুদ্রের জলের নীচ দিয়া এপার হইতে লইয়া যাওয়া হইল প্রায় ১,৬০০ ফুট লম্বা কেব্‌ল, নির্মাণকার্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-সরবরাহের জন্য। টেলিফোনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লইয়া উভয় তীরে বেতারযন্ত্র স্থাপন করিয়া যোগাযোগরক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। এই সব আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর শুভ বিজয়াদশমী তিথিতে শিলাখণ্ডে প্রস্তর লইয়া যাওয়া ও মন্দির গাঁথার কাজ আরম্ভ হয়।

উদ্যোক্তাদের দীর্ঘ আট বৎসরের তপস্যা, শত শত কর্মীর দীর্ঘ ছয় বৎসরের অনলস শ্রম আজ সফল হইয়াছে। বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মণ্ডপ এবং শ্রীপাদমণ্ডপ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। গত ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে মন্দিরে।

স্থায়ী জেটী নির্মাণের ভার তামিলনাড়ু সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাও সমাপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের নীচ দিয়া পাইপ-লাইন বসাইয়া শিলাখণ্ডে স্থায়িভাবে স্বাদু জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না, সে বিষয়েও চিন্তা করা হইতেছে।

৪

শিলাখণ্ডের সর্বোচ্চ দেশে বিবেকানন্দ-স্মৃতি মন্দির (বিবেকানন্দ-মণ্ডপম্) স্থাপিত হইয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মন্দিরের তলদেশের উচ্চতা ৫৫ ফুট। বিবেকানন্দ-মণ্ডপ লম্বায় ১৩০ ফুট, চওড়ায় ৪০ ফুট। ইহার দুটি অংশ—গর্ভমন্দির (সভামণ্ডপম্) এবং নাটমন্দির (ধ্যানমণ্ডপম্)। গর্ভমন্দিরের চূড়াটি বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের চূড়ার অনুরূপ; ইহার শীর্ষদেশের উচ্চতা মন্দিরের



বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মন্দির

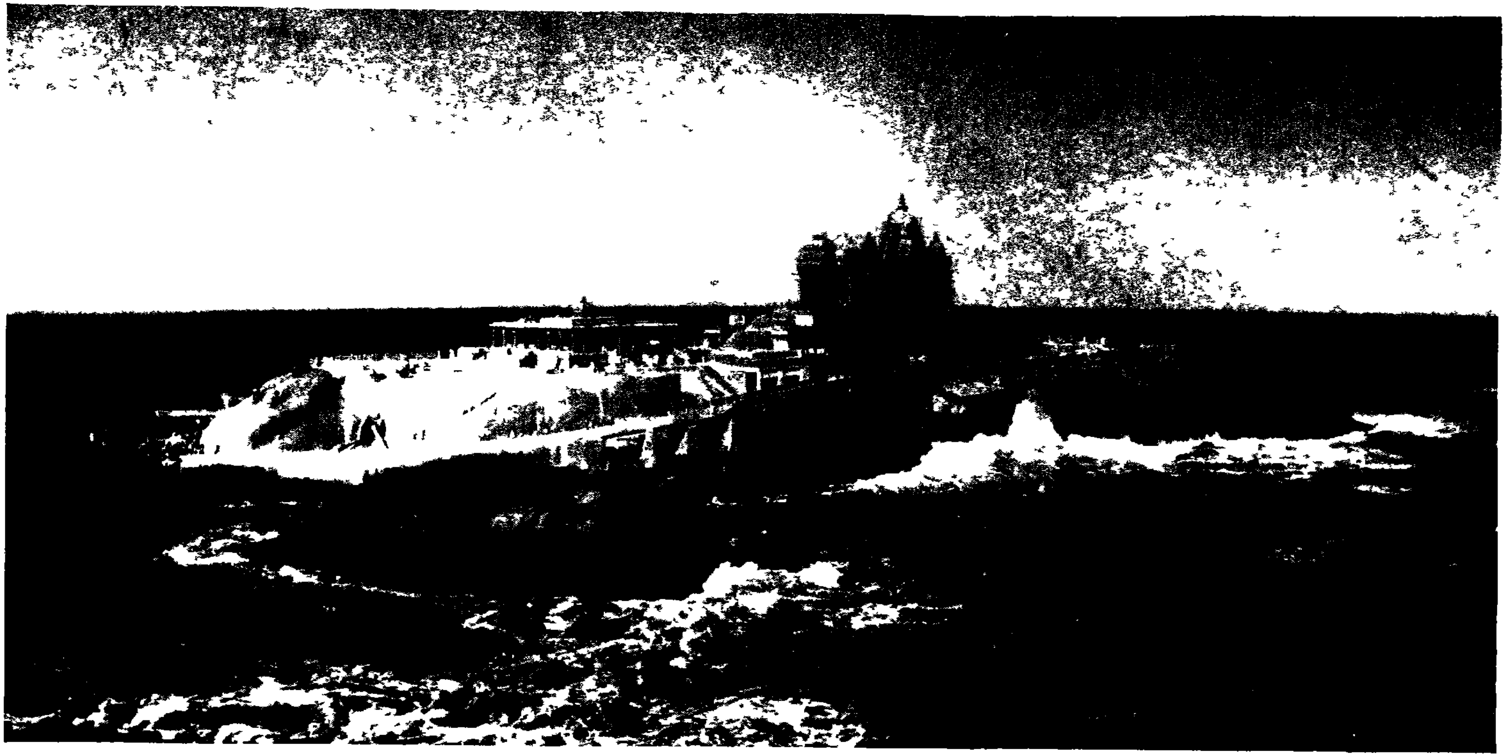
তলদেশ হইতে ৬৫ ফুট, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০ ফুট। গর্ভমন্দিরে ৪ ফুট উচ্চ বেদীতে স্বামী বিবেকানন্দের ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ ব্রোঞ্জ-নির্মিত পরিব্রাজক মূর্তি স্থাপিত। মূর্তিটি পশ্চিম-উত্তর দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান। নাটমন্দিরটির ভিতরের দেওয়ালে স্বামীজীর জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চিত্র রিলিফ করা। মন্দিরটির চারিদিকেই রোয়াক। গর্ভমন্দিরের পিছনে, মন্দিরতলের নীচের লেভেলে কয়েকটি কক্ষ সংলগ্ন। তাহারও পিছনে গৃহতলসংলগ্ন একটি চত্বর। এই চত্বরেরও নীচে মন্দির ও শ্রীপাদমণ্ডপ বেড়িয়া একটি সমতল রাস্তা। শিলাতল হইতে গড়ানে রাস্তা আসিয়া মিশিয়াছে এই সমতল রাস্তাটিতে। এখান হইতে অনেকগুলি ধাপ ভাঙিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়।

'শ্রীপাদমণ্ডপম্' বিবেকানন্দমণ্ডপের ঠিক সম্মুখে নির্মিত। মন্দিরস্থ বিবেকানন্দের মূর্তি হইতে শ্রীপাদমণ্ডপের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত শ্রীপাদচিহ্নের দূরত্ব ২১৯ ফুট।

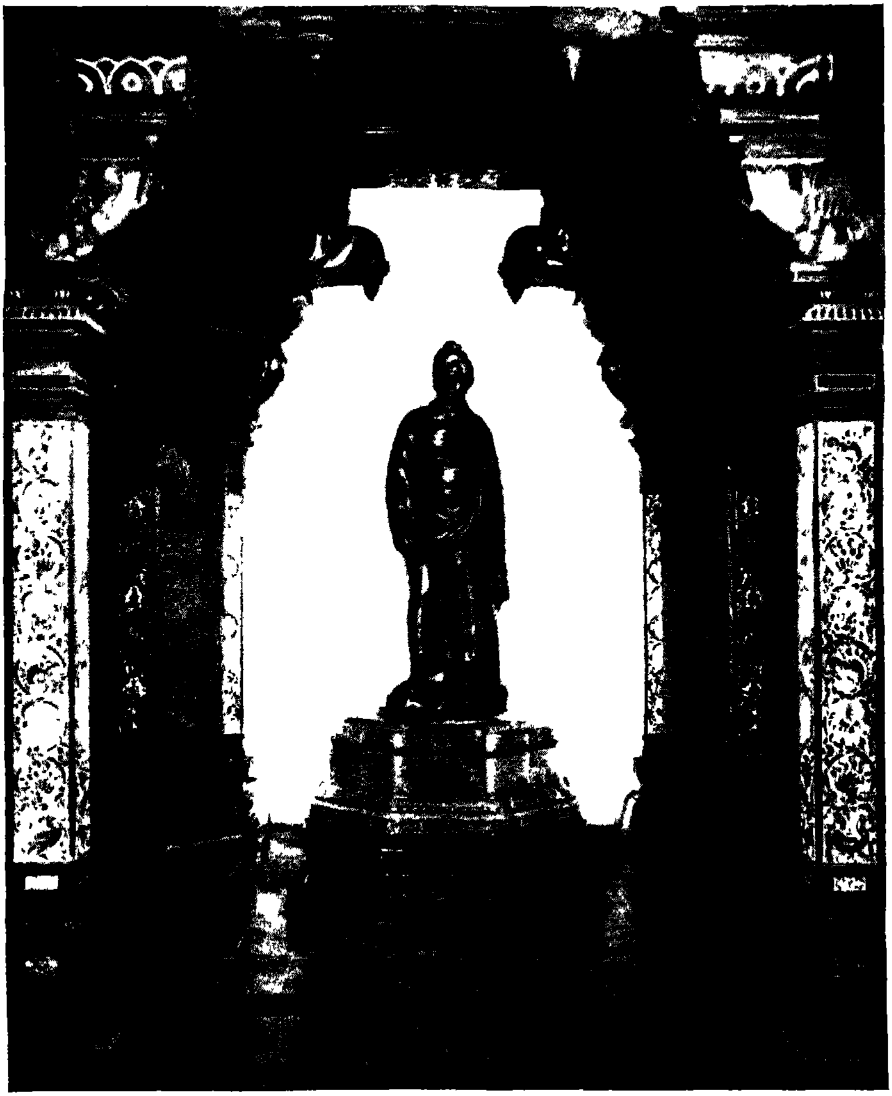
মন্দির হইতে নাটমন্দিরের সম্মুখের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া, ২৫-২৬টি ধাপ ভাঙিয়া নীচে নামিয়া আসিলে একটি চত্বর; নাটমন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে ইহার সরলরৈখিক দূরত্ব ৪৮ ফুট। চত্বরে নামিয়া উহার উপর দিয়া ৬০ ফুট আগাইয়া গেলে শ্রীপাদমণ্ডপে উঠিবার ধাপ। শ্রীপাদমণ্ডপটি চতুষ্কোণ, ৫৪ ফুট লম্বা, ৫৪ ফুট চওড়া।

৫

এই বিবেকানন্দমন্দিরের পাদদেশে দাঁড়াইলে দেখা যায় সিন্ধু একহাতে ধরিয়াছে সন্নিকটস্থ পুণ্যভূমি ভারতের মূল ভূভাগকে, অপর হস্তে সুদূর দিকচক্রবালে অনন্ত আকাশকে —'আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার হাত।' এই মিলনতীর্থে মন্দিরাভ্যন্তরে সমুন্নত শিরে দাঁড়াইয়া স্বামী বিবেকানন্দ। মনে হয়, ধরা যেন আমাদের জাগতিক জীবনের প্রতীক; আকাশ আমাদের স্বরূপের, অসীম পরমসত্তার প্রতীক; আর সেতুটির সংযোগ-সেতুরূপে প্রচণ্ড নিষ্কামকর্মের প্রতীক উত্তালতরঙ্গময় সিন্ধু, যাহার মাঝখানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া স্বামী বিবেকানন্দ—প্রচণ্ড কর্মতৎপরতার মধ্যে চিরপ্রশান্ত মূর্তিতে। সমগ্র দৃশ্যটি যেন বিবেকানন্দের নবযুগের জাগরণ-মন্ত্রের প্রতীক—শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কার্যের মাধ্যমে নিজের দেবস্বরূপতার উপলব্ধিলাভ, আত্মজ্ঞানলাভ। এখানে দাঁড়াইয়া তিনি যেন ব্যাকুলভাবে বিশ্বজনকে আহ্বান জানাইতেছেন এই ভারতবর্ষে মিলিত হইতে, এখান হইতে সে মন্ত্র শিখিয়া লইতে।



বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মন্দির [বামদিকে শ্রীপাদমণ্ডপ]



বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি

কারণ, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' আর, তাঁহারা এখানে আসিয়া যেন রিক্তহস্তে ফিরিয়া না যান, তাই সে মন্ত্রকে ভারতবাসীর জীবনে মূর্ত করিবার জন্য জগন্মাতা উমারই অন্য রূপ তপস্যারতা দেবী কন্যাকুমারীর শ্রীপদ-চিহ্নের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া যেন আমাদের সকলের হইয়া তাঁহার চরণে অবিরাম প্রার্থনা জানাইতেছেন : মা, আমাদের কাপুরুষতা, দুর্বলতা দূর কর ! মা, আমাদের মানুষ কর !

মন্দির নির্মাণ করিয়া স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে নিঃসন্দেহ ; এবং বিবেকানন্দ-শিলায় এই বিবেকানন্দ-মণ্ডপটি যে আমাদের জাতীয় গৌরবের, বিবেকানন্দের প্রতি সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধার নিদর্শন, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে আমরা যেন না ভুলি, এ স্মৃতি-মন্দির প্রতীকমাত্র ; বিবেকানন্দের আসল স্মৃতিমন্দির গড়িতে হইবে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে। 'বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি' সেদিকেও দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করিয়াছেন—বিবেকানন্দের আদর্শে জাতীয় জীবন গঠনই যাহার মূল লক্ষ্য। আজ এই বিবেকানন্দ-মণ্ডপে বিবেকানন্দচরণে প্রণত হইয়া এই প্রার্থনাই জানাই – ভারতের বর্তমান বিভ্রান্তির অমানিশার অবসান ঘটাইয়া সে শুভদিনের উজ্জ্বল প্রভাত অবিলম্বে আসুক, যেদিন, ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, 'জাতীয় মনের হর্ম্যমন্দিরে তাঁর বিশ্বাস রূপ নেবে। সর্ব মত ও জাতির ত্রিশকোটি নরনারীর জীবনের উপরই তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে। সেই সঙ্গে হয়তো পৃথিবীর বিশ্বাসের জগতে নতুন যুগের অভ্যুদয়।' আর নিবেদিতার ভাষাতেই প্রাণের আকুতি জানাই, আমি 'সেই মন্দির-নির্মাণে যেন একটি ইটও বহনের যোগ্য হই !'

মায়ের পূজা

সেখ সদর উদ্দীন

মায়ের পূজা করবি যদি এক হয়ে আয় সকল ভাই,
রক্ত নয়, আজকে তাজা হৃদয়খানাই অর্ঘ্য চাই !
ফেলরে ছুঁড়ে হিংসা-দ্বেষ আর মারমুখী ভাব হৃদয়জোড়া,
ফুলের মত চিত্ত নিয়ে আয়রে ভাই, আয়রে তোরা।
অনেক রক্ত ঝরে গেছে, ভিজে গেছে ধূসর মাটি,
চোখের জল ফেলছে দেখ, তোমার আমার সবার 'মা'টি।
ভায়ের বুকে আঘাত হেনে কাঁদাবে আর ক'দিন মাকে ?
মায়ের পূজায় ভায়ের সেবায় বিলাও এবার আপনাকে।
রক্তে রাঙা মায়ের চরণ আঁখির নীরে ধুইয়ে দাও
ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে মিলনেরই গানটি গাও।

বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন

গত ২রা সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ-শিলার উপর নবনির্মিত বিবেকানন্দস্মৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে।

ঐ দিন ভোর ৪টা হইতে মন্দিরে বেদাদিশাস্ত্র পাঠ ও ঘটস্থাপন করিয়া তাহাতে জগন্মাতার পূজা আরম্ভ হয়। পূজান্তে হোম হয়। পাঁচশতাধিক ভক্ত এবং বিশ-বাইশ জন সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ৬টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মন্দিরে উপনীত হন। হোমে পূর্ণাহুতি দিবার পর তিনি পূর্ণকুম্ভের জলে স্বামীজীর মূর্তি অভিসিঞ্চিত করেন এবং স্বামীজীকে মাল্যভূষিত করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ৭টায় শুভকার্য সমাপ্ত হইবার পর সকলে তটভূমিতে ফিরিয়া আসেন।

পরে সকাল ৯টার সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি গিরি আসিয়া মন্দিরটির দ্বারোদ্ঘাটন ও স্বামী বিবেকানন্দের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মন্দিরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেখান হইতে ৯½ টার সময় তটভূমিতে ফিরিয়া তিনি মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. করুণানিধি। সভার প্রারম্ভে বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতির সভাপতি শ্রী ডি. এম. সিংহ সকলকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইবার পর সমিতির কর্মসচিব শ্রীএকনাথ রানাডে বিবৃতি পাঠ করেন। পরে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বচন-ভাষণান্তে শ্রীকরুণানিধির ভাষণের পর শ্রী ভি. ভি, গিরি ভাষণ দেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর ভাষণ

এই পবিত্র পরিবেশে, জগন্মাতা কন্যাকুমারীর পাদমূলে তাঁহারই একজন বিশেষ সন্তানকে, যাঁহাকে তিনি কৃপা করিয়া এদেশের ও জগতের কল্যাণের জন্য আমাদের মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাওয়া আমি মহা সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করি। যাঁহারা এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, দূর ও নিকটে চতুর্দিক হইতে যাঁহারা আমাদের লক্ষ্য করিতেছেন, যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শিরে জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হউক।

অদূরের ঐ শিলাখণ্ডে বসিয়া ধ্যানকালে স্বামীজীর মানসপটে যে অমূল্য চিন্তাগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছিল, আমার মনে হয় সেগুলির স্মৃতিচারণই অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের উপযোগী হইবে। এখানে, কন্যাকুমারীতে পৌঁছিয়া মন্দিরে জগন্মাতাকে পূজা করিবার পর ঐ নির্জন শিলাখণ্ডে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে। সমুদ্রে সাঁতার দিয়া তিনি ঐ শিলাখণ্ডে উপনীত হন—যেখানে আজ ভারতমাতার সেই মহান সন্তানের স্মৃতিতে এই বৃহৎ সুরম্য মন্দিরটি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। শিলার উপর বসিয়া

তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। এই সময়ে, পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণকালে রাজা মহারাজা হইতে শুরু করিয়া কৃষক পর্যন্ত ভারতের সর্বস্তরের লোকের জীবন ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে যে বিপুল তথ্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেগুলি, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী ভারতীয় জাতির জীবনধারা, লক্ষ্য ও কৃতিত্ব—সবই তিনি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, ধর্মই হইল ভারতীয় জাতির প্রাণ, তাহার উৎসাহের উৎস ; ভারতের ভবিষ্য সামগ্রিক নবজাগরণও ঘটিবে ধর্মের মাধ্যমে। দেখিলেন, বহুধাবিভক্ত জাতি, ভাষা, আচরণপ্রথা প্রভৃতির ভিতরেও ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি সুনিশ্চিত একত্ববোধ রহিয়াছে, যাহা সাধারণ সংহতিরূপে জাতিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে।

আধ্যাত্মিক আদর্শের গুরুত্ব এবং জাতির উপর তাহার প্রভাব উপলব্ধি করিলেও স্বামীজী জনগণের দুর্গতির কথা, তাহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞানের কথা ভুলিতে পারেন নাই। নিজ ধর্মের নামেই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণকর্তৃক তাহারা শত শত বৎসর ধরিয়া নির্যাতিত ও পদদলিত হইয়া আসিতেছে। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজনগণকে ধর্মের সুফললাভে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে ; যাহার ফল জাতীয় অধঃপতন।

তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতকে যদি আবার উন্নত হইতে হয় তাহা হইলে সর্বসাধারণের জাগতিক উন্নতিবিধান এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে হইবে।

ভারতের অন্যতম অবনতির কারণ হইল, সে নিজেকে বাকী জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, অন্য জাতিগুলির সঙ্গে সে মিশিতে চায় নাই, সে নিজে যে প্রাণপদ সত্যগুলির অধিকারী তাহার ভাগ তাহাদের দিতে চায় নাই। প্রাচীন কালে ভারত যখন তাহা করিত, তখন সে উন্নত ছিল। যেদিন হইতে সে দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে শুরু করিয়াছে, সেইদিন হইতেই ভারতের এই অধঃপতনের সূত্রপাত। বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বেদান্তের ভাবপ্রচারের ফলে ভারত এবং বহির্জগৎ উভয়ই প্রভূতপরিমাণে লাভবান হইবে। মানসনেত্রে তিনি দেখিয়াছিলেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে, সমগ্র মানবজাতি সেই সভ্যতারই প্রতাক্ষায় রহিয়াছে। এই ভাবানুপ্রাণিত হইয়াই তিনি পাশ্চাত্যে যাইবার কথা চিন্তা করেন।

ইহাই শিলাখণ্ডে সমাসীন স্বামীজীর ধ্যানের বিষয়। ধ্যানভঙ্গের পর তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে তাঁহার জীবনের উদ্দিষ্ট কর্ম—যাহা হইল ভারতে জাতির নবজাগরণের জন্য এবং পাশ্চাত্যে সমগ্র মানবজাতির পুনর্গঠনের জন্য বাণী প্রচার। আমাদের জাতির কাছে তাই এই শিলাখণ্ডটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে, আর সেজন্য ইহার উপর এই মহান ভারতসন্তানের স্মৃতিমন্দির থাকা যথোপযুক্ত।

শ্রীএকনাথ রাণাডের প্রতি এবং এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে তাঁহার সহায়ক ও বন্ধুদের প্রতি এজন্য সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞ। জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করি, ইঁহাদের সকলেরই শিরে তাঁহার আশীর্বাদ যেন বর্ষিত হয়, এবং স্বামী বিবেকানন্দ জগতের কাছে যে বাণী গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন, এটি যেন সে বাণী প্রচারের একটি সক্রিয় কেন্দ্র হইয়া হইয়া উঠে।

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরির ভাষণের সারাংশ

শ্রী ভি. ভি. গিরি তাঁহার ভাষণে বিবেকানন্দের আদর্শে ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনের উপর জোর দিয়া বলেন, ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনই জাতীয় চরিত্রগঠন। তিনি বলেন: কর্ম-ও চিন্তাধারা-পরিচালনায় মৌলিক নীতিগুলিকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণই শোষণ-ও অভাবমুক্ত সমাজ গড়িয়া তুলিবে। একাধারে দার্শনিক, সন্ন্যাসী, স্বদেশপ্রেমিক নবচিন্তার উদ্ভাবক ও সংস্কারক স্বামীজীর অবদান কেবল আমাদের জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনেই সীমিত নয়, মানুষের দুর্গতি দূর করা ও সাম্যস্থাপনের কাজেও তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—ভারতের নিপীড়িত ও পদদলিত জনসাধারণের দুর্গতি-মোচনকল্পে ভারতীয় জাতিকে জাগাইয়া তোলার জন্য তাঁহার অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মানুষের বুভুক্ষা, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য সর্বাগ্রে দূর করিবার কথা তিনি বারবার আমাদের বলিয়া গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে ধর্মকে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও জীবনে রূপায়িত করাইবার জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানুষের সেবার মাধ্যমেই চিত্ত শুদ্ধ হয়, অপরের সহিত একাত্মতা-বোধও আসে। বলিয়াছেন, সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন করা সম্ভব। আজ জাতির ভাগ্যবিপর্যয়ের দিনে স্বামীজীর শিক্ষা—সত্য, মানবতাবোধ, ধর্মের বিশ্বজনীনতা ও নিস্বার্থসেবাই আমাদের পথের দিশারী। শ্রী গিরি বলেন, সমাজ ও জাতির সেবাপর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ভারত ও বিশ্বের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের একটি মহত্তম দান।

শ্রী এম. করুণানিধির ভাষণের সারাংশ:

শ্রী এম. করুণানিধি সভাপতির ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সমগ্র মানব-সমাজের; তাই তাঁহার স্মারক শিলার উপর মন্দিরটি বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এটি আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রহরী। তিনি বলেন, স্বামীজীর চিকাগো যাত্রাকালে মহান সেতুপতির নেতৃত্বে তামিল নাড়ু তখন স্বামীজীর বাণীবহনে এগিয়ে এসেছিল; এজন্য তামিল নাড়ু গর্ববোধ করে। তিনি বলেন, স্বামীজী কর্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নি এখনো উজ্জ্বল শিখা বিস্তার করিতেছে; তাঁহার শিক্ষা ভারতের বিবেককে জাগ্রত করিয়াছে, ঐক্যের প্রতি তাহার আস্থা বর্ধিত করিয়াছে, মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি বলেন, জনসাধারণের প্রতি স্বামীজীর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। মুক্তি, জনসাধারণের উন্নয়ন ও সাম্যই ছিল তাঁহার বাণীর মর্মার্থ; আমি এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে সানন্দে ঘোষণা করিতেছি, তামিল নাড়ু সরকার বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী—দরিদ্রের হাসিতে আমরা ভগবানকে দেখিতে পাই, দরিদ্রের মুখে হাসি ফোটানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

মন্দিরটির পরিকল্পনা- ও নির্মাণ-স্থপতি শ্রী এস. কে. আচারী। জে. জে. স্কুল অব আর্টট-এর ভাস্কর্য-শাখার অধ্যাপক শ্রী এন. এল. সোনাদ্বেকর স্বামীজীর মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন। সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি খুবই মর্মস্পর্শী হইয়াছিল।

ভারতে ভাবগত সংহতিসাধনে সংস্কৃত

অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

১

জাতীয় সংহতির অভাব স্বাধীনোত্তর ভারতে সার্বিক উন্নতির পথে এক জটিল সমস্যা এবং বিরাট বাধা। অনন্ত বৈচিত্র্যের লীলাভূমি এই বিশাল উপমহাদেশ বহু প্রদেশে বিভক্ত এবং জনগণও বহুভাষাভাষী। চিরকাল ধরিয়াই ভৌগোলিক এবং সামাজিক, আহার এবং বেশভূষার বহুবিধ পার্থক্য এই দেশের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রহিয়াছে। তদুপরি বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে বিভিন্ন অংশ এই দেশে শাসিত হইত। ফলে বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে এইখানে ছিল বহুবিধ পার্থক্য। মধ্যে মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, প্রিয়দর্শী অশোক, হর্ষবর্ধন শীলাদিত্য, মহামতি আকবর প্রভৃতি সম্রাটবৃন্দ বাহুবলের দ্বারা বহুধাবিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে জয় করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংহতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৃটিশ শাসনকালেও রাজনৈতিক দিক হইতে সংহতিসাধনের সেই প্রয়াস কিছুটা সার্থকতালাভ করিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তাই, ভারতে সংহতিস্থাপনের প্রথম প্রবর্তকরূপে বৃটিশকে বন্দনা করিতে অনেক সুশিক্ষিত ভারতীয় বর্তমানে কুণ্ঠিত নহেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক V.A. Smith-এর মতে এক সম্রাট অশোকের শাসনেই ভারতসাম্রাজ্য বৃটিশ ভারত হইতেও বৃহত্তর ছিল—"far more extensive than British India of today, including Burma" (Asoke, P. 81). সমদুঃখভাগিতা এবং সমনির্যাতনভোগের মাধ্যমে বৃটিশ ভারতে যে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কিন্তু ছিল কৃত্রিম। তাই, স্বাধীনতালাভের পর সেই কৃত্রিম সংহতিবন্ধন অচিরেই ছিন্ন হইল। চতুর্দিকে প্রধানতঃ ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই রাজ্যপ্রতিষ্ঠার বহ্ন্যুৎসবে ভারতের বাঞ্ছিত সংহতি ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। স্বাধীনভারতের প্রশাসকমণ্ডলী নিত্য নূতন বিধিবিধানের দ্বারা সংহতিপ্রতিষ্ঠার নামে সংহতিসংহারই সম্পাদন করিয়া চলিতেছেন।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতবর্ষ অতীতে বহুধা বিভক্ত থাকিলেও, জনসাধারণের বহিরঙ্গজীবনে বেশভূষা, আহার-বিহার এবং লোকাচার-সদাচারে লক্ষণীয় পার্থক্য থাকিলেও এক মহাভারতীয় চেতনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সকলের অন্তরলোকে ছিল প্রবাহিত। সেইকালে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধে এই বহুধাবিভক্ত জনগণ সর্বদাই উদ্বুদ্ধ থাকিতেন। এই মৌলিক ঐক্যসাধনা যদিও বিচিত্র লীলায় বিলসিত হইয়াছিল, তবুও মূলতঃ সংস্কৃতভাষাই ছিল এই ঐক্যসাধনার একমাত্র আশ্রয়। ভারতে যদিও পাঁচশতাধিক ভাষা কথ্যরূপে প্রচলিত, তথাপি একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই ছিল সকলের সংযোগসূত্র তথা ঐক্যবিধায়িনী শক্তি। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য মনীষী Sir Monier Williams এই বিষয়েই সাক্ষ্যদান করিয়া বলিয়াছেন—

"India, though it has, as we have seen, more than 500 spoken dialects,

has only one sacred language and only one sacred literature, accepted and revered by all, however diverse in race, dialects, rank and creed. That language is Sanskrit, and that literature is Sanskrit literature, the only quarry whence the requisite materials may be obtained for improving the vernaculars or for expressing important religious and scientific ideals"
(Hinduism, P. 13)

সংস্কৃতাশ্রিত ভারতীয় সামগ্রিক সংস্কৃতির সহিত পূর্ণ পরিচয়ের অভাবে কেহ কেহ বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির অতি সামান্য অংশ জানিয়া খণ্ডিত জ্ঞানের দ্বারা অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়া অনৈক্যের আবিষ্কার করিয়া থাকেন এবং বৃটিশ শাসনকেই ভারতে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করেন। স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অনুসন্ধান করিলে অনায়াসেই অনুভব করা যায় যে, বৃটিশ শাসনের বহু পূর্ব হইতেই সমগ্র ভারতের এক গভীর ঐক্যভাবনার ধারা নিয়তই প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। এই জন্যই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'The Fundamental Unity of India' গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

"Superficial observers are therefore liable to be bewildered by this astonishing variety in Indian life and geography. They lack that power of perception which dives beneath appearances and externals and sees into the life of things. They thus fail to discover the One in the many, the Individual in the Aggregate, the Simple in the Composite.·· A keen penetrating insight can hardly fail to recognise that beneath all this manifold variety there is a fundamental unity.···As Sir Herbert Risby has truly observed: 'Beneath the manifold diversity of physical and social type, language, custom and religion which strikes the observer in India there can still be discerned as Mr. Yusuf Ali has pointed out, a certain underlying uniformity of life from the Himalayas to Cape Comorin." (P. 29)

ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে যেমন বহু দেবতার অন্তরালে একই পরমদেবতার অস্তিত্ব-স্বীকার—"একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"—তেমনি লৌকিক জীবনেরও সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালে অনুভূত হয় একই মহতী ঐক্যচেতনা। আর এই ঐক্যচেতনার ধাত্রী হইল প্রাচীনা হইয়াও চিরসঞ্জীবিতা অমৃতময়ী সংস্কৃতভাষা।

ভারতের সকল প্রান্তের নদনদীগুলিকে পুণ্যসলিল'রূপে চিহ্নিত করিয়া সকল ভারতীয়ের নিকটই নিখিল ভারতের নদীধারাকে সমবেতভাবেই বন্দনা করিতে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষগণ। ধর্মানুষ্ঠানকালে এই নদীগুলিকে একসঙ্গে আহ্বানের দ্বারা অখণ্ড ভারতের ভাবমূর্তিটি আমাদের চিত্তে অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। যেমন বৈদিক সংস্কৃতে শুনি—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা

সুষোমমা ॥"

তেমনি পৌরাণিক সংস্কৃতেও শুনি—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥"

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত পর্বতসমূহ প্রতিটি ভারতীয়ের নিকট সমভাবেই পবিত্র। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে তাই দেখি—

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শক্তিমান্ ঋক্ষপর্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ ॥"

তীর্থযাত্রা আমাদের অবশ্যকরণীয় পুণ্যকর্ম। বহু রাজ্যে বিভক্ত ভারতের অধিবাসীরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তীর্থদর্শনে সর্বদাই ছিলেন উৎসুক। পরিব্রজন পুণ্যকর্ম বলিয়া এইখানে বিবেচিত হয়। এই মোক্ষদায়িকা তীর্থগুলির দ্বারা পবিত্রীকৃত অখণ্ড ভারতভূমি পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্তিত হইয়াছিল।—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥"

তারপর সতীর একান্ন পীঠ তো সারা ভারতের সকল প্রান্তে অবস্থিত। শৈব এবং বৈষ্ণব তীর্থগুলিও এই প্রকারে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিরাজ করিতেছে। সেইজন্য সকল প্রান্তই সকল প্রান্তের ভারতীয়ের নিকটে পবিত্র।

অখণ্ড ভারতেরই প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জনগণের চিত্তে সংস্কৃতভাষা চিরকাল জাগ্রত রাখিয়াছে। তাই মনীষী ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

"This intense passion for fatherland indeed, utters itself throughout Sanskrit literature." (The Fundamental Unity of India)

অথর্ববেদে নানাভাবে মহিমান্বিতা অখণ্ড ভারতের অনবদ্য বন্দনা পাঠককে মুগ্ধ করে। ঋষি বলিতেছেন —

"নানাবীর্যা ওষধীর্যা বিভর্তি…"(অ-বে-১২-২)

"যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্বভুব"—(ঐ ১২-৩)

"যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে যস্যাং দেবা অসুরানভ্যবর্তয়ন্" (ঐ ১২-৫)

"গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবি স্যোনমস্তু" (ঐ ১২-১১)

"ভূম্যাং দেবেভ্যো দদতি যজ্ঞং হব্যমরংকৃতম্" (…১২-১-২২)

"যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যাব্যৈলবাঃ।
যুদ্ধান্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ ॥"
(১২-১-৪১)

"বিষ্ণুপুরাণে" ভারতভূমিকে দেবতাদেরও বাঞ্ছিত ভূমি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥"
(২-৩ ২৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীহরির জন্মপূত এই ভারতভূমির কতই প্রশংসা পাঠককে ভারত-প্রেমে উৎসাহিত করে।—

"অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনম্
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবোপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥"
(৫-১৯-২০)

"যদ্যত্র নঃ স্বর্গসুখাবশেষিতং
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনম্।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদ্-
বর্ষে হরির্যদ্ ভজতাং শং তনোতি ॥"
(৫-১৯-২৮)

মহাভারতের বনপর্বে, তন্ত্রচূড়ামণিতে, দেবীভাগবতে এবং আরো বহু গ্রন্থে এই সমগ্র দেশকে চিন্ময়ী মাতৃরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই তো সংস্কৃতেই শুনি—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" সংস্কৃত তন্ত্রশাস্ত্র তাই বলেছেন যে, জন্মভূমি, গর্ভধারিণী জননী এবং পয়স্বিনী গোমাতা মহাশক্তিস্বরূপিণী মহামাতারই প্রতিরূপ—

"সর্বপ্রসূর্জন্মভূমিঃ জননী গৌ পয়স্বিনী।
মহামাতুঃ স্বরূপেণ প্রতিরূপা সুশোভনা।"

ইহারই পরিণতিতে বর্তমান যুগে সংস্কৃতভাষাতেই রচনা করেন বাংলার সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্"।

সমগ্রারূপিণী দেশমাতৃকার প্রতি এই ভক্তিই ভারতে জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করিয়াছিল। সকল রাজ্যের অধিবাসীই নিজেদের প্রথমে ভারতীয় বলিয়াই চিন্তা করিতেন এবং একই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়া নিজেদের গৌরবিত বোধ করিতেন। তাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বদা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া বহুধাবিভক্ত জনগণকে ঐক্যের স্বর্ণসূত্রে বাঁধিয়া রাখিত। কেরলের কানাড়ীভাষী মনীষী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সমগ্র ভারতে ধর্মাভিযানে বহির্গত হইয়া হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা যখন ভারতের চারিটি প্রান্তে উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবলম্বন ছিল শুধুমাত্র সংস্কৃতভাষা। গৌড়বঙ্গের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাপথে সংস্কৃতেই করিয়াছিলেন তাঁহার প্রেমধর্মপ্রচার। সংস্কৃতভাষাতেই রহিয়াছে সর্বভারতীয়, সর্বকালিক, সর্বজনীন আবেদন। আন্তঃরাজ্য সংযোগ এবং ভাবের আদানপ্রদান সংস্কৃতেই সেইদিন নিষ্পন্ন হইয়া জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করিত। তখন অধিকাংশ রাজ্যেরই, এমন কি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বলি, জাভা, বোর্নিয়ো, সুমাত্রা, শ্যাম, কাম্বোজাদি রাজ্যের পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। অধিকাংশ শিলালিপি তাই সংস্কৃতেই লিখিত হইয়াছিল। এই বাংলাদেশেও পাঠানশাসনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের শাসনকাল অবধি রাজকার্য সংস্কৃতেই সম্পাদিত হইত। বাংলাভাষায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের' টীকা সংস্কৃতে রচিত। অধিক প্রচলিত এবং সর্বভারতীয় ভাষা বলিয়াই এই সকল টীকাকার সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

বর্তমানে উত্তর ভারতের সকল প্রচলিত ভাষাই সংস্কৃত হইতে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন। সংস্কৃতজ্ঞান বিনা সেই সকল ভাষায় পরিণত জ্ঞান অসম্ভব। আর, দক্ষিণভারতীয় ভাষাসমূহও সংস্কৃতের দ্বারাই সমধিক সম্পুষ্ট। দক্ষিণের প্রবীণ নেতা ডঃ পট্টাভি সীতারামাইয়া সেইজন্য বলিয়াছিলেন—

"Sanskrit can no longer be regarded as a dead language. It is up to us to make it a living language. Sanskrit remains dead today because it is neglected. To us in South India, I do not see how we shall stand to lose by recognising Sanskrit as the national language. We can understand Sanskrit better than Hindi and other derivatives of Sanskrit. In Telegu there is 60 p. c. Sanskrit admixture and in the Malayalam whole Samasas of Sanskrit are incorporated."

আজিও দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের মন্দিরে মন্দিরে বহুভাষাভাষী জনগণ সংস্কৃতমন্ত্রই পাঠ করিয়া থাকেন। জাতকর্ম হইতে মৃত্যুর পরে ঔর্ধ্বদেহিক কর্ম পর্যন্ত সকল ভারতীয়ই এক

সংস্কৃতমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেন। সংস্কৃতে রচিত বেদ, উপনিষদ্, গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-স্মৃতি, কালিদাস-ভবভূতির কাব্য সকল ভারতীয়েরই গৌরবময় উত্তরাধিকার। তাই উজ্জয়িনীর কালিদাস বাঙ্গালীরও আত্মজন। বাংলার জয়দেব বৃন্দাবনের প্রাণধন। ইংরেজী শিক্ষিত জনগণের কেহ কেহ মনে করেন ইংরেজীও সকলের বোধগম্য সর্বভারতীয় ভাষা। সমগ্র ভারতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির হার যথেষ্ট কম। আর ইংরেজীতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আনুমানিক শতকরা পাঁচজন। সুতরাং, ইংরেজীকে সর্বজনবোধগম্য সর্বজনীন ভাষারূপে মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। তদুপরি, ইহা বিজাতীয় ভাষা, স্বদেশীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং মাতৃভূমির প্রতি মমতা এই ভাষার দ্বারা সম্ভব নহে। Cultural Slavery তথা সাংস্কৃতিক দাসমনোভাব এই বিজাতীয় ভাষার ফলশ্রুতি, যাহার ফলে কবিগুরুর ভাষায় আমরা "দেশদেখা চোখ" হারাইয়া ফেলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব; তাকে অন্তরে গ্রহণ করব। সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে। সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে। তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী। বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।"

বহুভাষাভাষী এই দেশের একমাত্র স্বদেশীয় সংহতিসূত্র এই সংস্কৃতভাষা। এখনো কাশ্মীর হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত ভারতের সকল প্রান্তে জনগণের কাছে সংস্কৃতভাষায় ভাষণদান করিয়া দেখিয়াছি সংস্কৃত বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হয় না। প্রত্যেকটি ভারতীয়ের মাতৃভাষায় এই সংস্কৃত শব্দরাজিরই প্রাচুর্য থাকায় সকলেই অল্পবিস্তর সংস্কৃত বুঝিতে পারেন। অনভ্যাসবশতঃ বলিতে পারেন না মাত্র। অর্থোপলব্ধিতে কাহারো তেমন অসুবিধা হয় না। কিন্তু, নিতান্ত বিজাতীয় ইংরেজী ভাষা ইংরেজীতে অজ্ঞ অধিকাংশ ভারতীয় মোটেই বুঝিতে পারেন না। এই কারণে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"I believe in the great power which Vivekananda used to ascribe to Sanskrit. We are unnecessarily frightened by the difficulty of learning Sanskrit. And that it must not be forgotten that such a knowledge of Sanskrit gives one a master-key to the knowledge of the majority of Indian languages not exceeding the Southern group···I quite agree that the study of Sanskrit is sadly negleted. I belong to a generation which believed in the study of the ancient languages. I do not believe that such a study is a waste of time and effort. I believe it is an aid to the study of modern languages. This is more true of Sanskrit·· and every nationalist should study Sanskrit." (Harijan, 23rd March, 1940)

সংস্কৃতকে ত্যাগ করিয়া হিন্দী কিংবা ইংরেজীর দ্বারা ভারতে কখনো জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। স্বাধীন ভারতের

নাগরিকদের চিত্তে একান্ত প্রয়োজনীয় এই ঐক্যবোধের বীজ একমাত্র সংস্কৃতভাষার মাধ্যমেই উপ্ত হইতে পারে। আত্মকলহে নিমগ্ন, প্রাদেশিকতার বিষে বিষণ্ণ, ভ্রাতৃবিদ্বেষে বিক্ষুব্ধ স্বাধীনোত্তর ভারতের গণজীবনে ভাবগত সংহতিসাধনের জন্য সংস্কৃতের অপরিহার্যতা অনস্বীকরণীয়। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ্, দক্ষিণ ভারতের সুপুত্র ডঃ সর্দার কে. এম্. পাণিক্করের বাণীগুলি স্মরণ করি—

"When we talk of our national genius being unity in diversity, the fundamental oneness of the Indian mind, what we are really meaning is the dominance of Sanskrit which over-rides the regional differences and linguistic peculiarities and achieves a true national character in our thought and emotion and even gives form and shape to the languages.

"The study of Sanskrit is not a luxury, it is a necessity. Sanskrit being our greatest single national inheritance, the roots of our national behaviour, pattern of our thought and the source of all our ideas being embedded in Sanskrit a familiarity with it is necessary for any one who claims to be a true Indian.'

"Sanskrit alone has the pre eminence which Hindi could never claim over the great regional languages enabling her to maintain and uphold in every region of India, the supreme claim of Indian Unity." (Indian Inheritance, —P.1)

তাই ক্রান্তদর্শী মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ বারংবার সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করিয়া বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্ন ভারতে পুনরায় ভাবগত সংহতি প্রমূর্ত হইয়া উঠুক—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তাই কামনা জানাই এবং বন্দনা করি বর্তমান ভারতের বরেণ্য সংস্কৃত কবি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কণ্ঠে—

"কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনতু নিতরাং ভারতে দেবভাষা
রাষ্ট্রে চাস্মিন্ বিলসতু হি সা রাজরাজেশ্বরীব।
যজ্ঞে পুণ্যে স্বজন-মিলনে রাষ্ট্রকার্যে বিষাদে
দীব্যাদ্ রম্যা মহিমবিভবৈঃ সা হি সৌখ্য-
প্রদাত্রী॥

বন্দে ত্বাং সুরভারতীং সুরপতেঃ
পুণ্য-প্রভাস্পর্ধিনীং
সাক্ষাৎ শ্রীকমলালয়াং চ পরমাং
স্বাহাস্বধোদীরিতাম্।
মূর্তাং ভারতসংহতিং চ সুখদাং
প্রাণৈকগ্রন্থিং পরাং
ধর্মপ্রেমসুধাসমেলনকরীং বিশ্বেশ্বরীমাশ্রয়ে॥"

সমালোচনা

তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত (প্রথম খণ্ড): মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি. লিট, পদ্মবিভূষণ। প্রকাশক—কর্মসচিব, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা—৩২৫+৮। মূল্য - দশ টাকা।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সুগভীর জ্ঞানসম্পন্ন সাধক ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধ লইয়া প্রকাশিত এই গ্রন্থটি সাধারণের নিকট তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক রহস্যময় বিষয়কে সহজবোধ্য করিয়াছে। গ্রন্থকার বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনা করিবার সময় সর্বদা মূল তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, উপনিষদ্, গীতা, সাংখ্যদর্শন, এমনকি কোথাও বা সুফী শাস্ত্রের ঐ বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলিও দেখাইয়াছেন।

তান্ত্রিক সাধনা বলিতে গ্রন্থকার "শাক্ত সাধনা ও আনুষঙ্গিকরূপে শৈবসাধনা" লক্ষ্য করিয়াছেন, যদিও তাঁহার মতে "বৈষ্ণব ও সৌরাদি সাধনপ্রণালীও বস্তুতঃ তান্ত্রিক পরম্পরার প্রকারভেদ মাত্র।" যেমন, চরমসত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে ঐ সত্যে মন স্থির করিয়া মনবুদ্ধিরও উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। উচ্চ অধিকারীরা প্রথম হইতেই ধ্যানাদি সহায়ে উহাতে ব্রতী হইতে পারেন, কিন্তু সকলে নয়। সাধারণের জন্য তন্ত্রমতে অন্যতম প্রশস্ত সাধনা জপ; গ্রন্থকারের মতে বৈষ্ণব সাধনার নামসংকীর্তন উহারই রূপান্তর মাত্র।

গ্রন্থটিতে 'তন্ত্রের স্বরূপ, আবির্ভাব ও ভেদ', 'তান্ত্রিক সংস্কৃতি', 'গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরুরহস্য', দীক্ষারহস্য', 'কুণ্ডলিনীতত্ত্ব' প্রভৃতি দ্বাদশটি বিষয় পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত।

প্রথম দুটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে "বৈদিক সাধনারই মুখ্য স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই", কিন্তু অন্যান্য বহু সাধনার ধারাও তাহাতে মিশিয়াছে এবং "এই সব ধারার মধ্যে তন্ত্রের ধারাই প্রধান।" শুধু তাহাই নহে, "বৈদিক ধারার উপাসনাক্রম অনেকাংশে তত্ত্বতঃ তান্ত্রিক ধারার সহিত একসূত্রে গ্রথিত," "বেদ ও তন্ত্রের মৌলিক দৃষ্টি একই," "বেদ ও তন্ত্রের নিগূঢ় রূপ একই প্রকার।"

বেদ বা তন্ত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি, গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, তাহা জ্ঞানের 'বৈখরী' অবস্থা মাত্র, অর্থাৎ বাক্-এর মাধ্যমে জ্ঞানের প্রকাশ। ইহার সূক্ষ্মতর রূপ 'মধ্যমা' অবস্থা, যখন জ্ঞান চিন্তাকার ধারণ করিতে উন্মুখ। সূক্ষ্মতম অবস্থাই হইল আসল জ্ঞান—যাহার প্রকাশক স্বয়ং 'পরমেশ্বর' বা 'পরমশিব'। যাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করেন তাঁহারাই ঋষি; তাঁহারাই গুরু। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াই বেদকে অপৌরুষেয়, এবং তন্ত্রকে শিব- বা শক্তিকথিত বলা হয়।

গ্রন্থকার গ্রন্থটির প্রায় সব অধ্যায়েই তন্ত্রশাস্ত্রের মূল তত্ত্বটির আংশিক বা পূর্ণ উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে পুনরুক্তি হইলেও বিষয়বস্তু সহজবোধ্য হইয়াছে। তথাপি, গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির অর্থ একটি পৃথক পৃষ্ঠায় একত্র দিলে বোধ হয় আরো ভাল হইত।

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে বেদ ও তন্ত্র একই কথা বলেন, ভিন্ন ভাষায়। (অদ্বৈত তন্ত্র ও অদ্বৈত বেদান্তই গ্রন্থকারের লক্ষ্য। বিভিন্ন তন্ত্রে দ্বৈত, ভেদাভেদ, অদ্বৈত সব ভাবই আছে। শাক্ত তন্ত্র প্রধানতঃ

অদ্বৈত। চরম তত্ত্ব কোথাও শিব, কোথাও শক্তি।) পার্থক্য যা আছে, সামান্য। যেমন, তন্ত্রমতে অদ্বয় অবস্থাতেও শক্তি থাকেন, সচ্চিদানন্দের সহিত মিশিয়া এক হইয়া। শাঙ্কর বেদান্তমতে ব্রহ্মে মায়াশক্তির কোন স্থান নাই। বেদের ব্রহ্ম ও তন্ত্রের পরমশিবে পার্থক্য শুধু এইটুকু। আবার তন্ত্রমতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-বিধায়িনী শক্তি বিকশিতশক্তিযুক্ত পরমশিবই—সদাশিব-নিবাসিনী মহামায়া। সর্বভাবের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের অতি সহজ সরল ভাষায় তন্ত্রের এই তত্ত্বটি আমাদের নিকট আরো স্পষ্ট: সাপ যেন স্থির ছিল, চলিতে শুরু করিয়াছে; একই সাপ, দুটি পৃথক সাপ নহে; একথাও বলা যায় না যে, যখন স্থির ছিল তখন সাপের মধ্যে চলার শক্তি ছিল না। অথবা: যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি, যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করিতেছেন বলিয়া ভাবি, তখন তাঁহাকেই কালী বলি। তত্ত্ববিষয়ে তন্ত্রের সহিত বেদের আর একটি পার্থক্য গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন —তন্ত্রমতে সচ্চিদানন্দই চরম কথা নয়, চরম সত্য উহারও পারে, তাহা কেবল 'সৎ'-রূপ।

গ্রন্থটিতে সৃষ্টির তন্ত্রোক্ত একটি ক্রম-বর্ণনায় দেখানো হইয়াছে, এই সৎ হইতে চিদ্ ও আনন্দ বিকশিত হয়। পরে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সহিত একীভূতা যে শক্তি, তাহার প্রথম বিকাশ ঘটে ইচ্ছারূপে; ইহা শক্তির সৃষ্টি-উন্মুখ অবস্থা—'কলা'। ইহার পরবর্তী বিকাশ সদাশিবের সহিত সদাসমন্বিতা মহামায়া; ইনিই আমাদের 'ঈশ্বর', 'জগন্মাতা', 'সগুণব্রহ্ম' ইত্যাদি। ইনি সৃষ্টির জন্য সক্রিয় হইলেই 'নাদ' ও 'জ্যোতিঃ' বা জ্যোতির্ময় নাদ প্রকাশিত হয়; "শক্তির ক্রিয়াবস্থাই নাদ এবং নিষ্ক্রিয়াবস্থা কলা।" নাদকে চিন্তা ও বাক্যের সূক্ষ্ম অবস্থা, বীজাবস্থা বলা যাইতে পারে। "নাদ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া 'বিন্দু'র আকার ধারণ করে।" বিন্দু বিভক্ত হইয়া বিন্দু ও 'বীজ' (সৃষ্ট পদার্থের কারণ) রূপ ধারণ করে। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ যেন একটি ত্রিকোণের বাহুগুলির সংযোগবিন্দু, যে ত্রিকোণের মধ্য-বিন্দুতে, 'মহাবিন্দু'রূপে শিব ও শক্তি অভিন্ন হইয়া অবস্থিত। এই ত্রিকোণ হইতেই বিশ্বের সব কিছুর উদ্ভব, উহাই আমাদের 'কারণ দেহ', উহাই কুণ্ডলিনী শক্তি।

দীক্ষা, গুরু ও সাধনা বিষয়ক অধ্যায়গুলিতে বলা হইয়াছে, তন্ত্রের *প্রথম কথা হইল*, 'জাগো', সর্বদা সজাগ থাক—"প্রবুদ্ধঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ।" আমরা স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ, যাহা শিব অথবা শক্তিরও স্বরূপ। 'মল' (নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং দেহাদি অনাত্মাতে অহংবোধ), 'কর্ম' ও 'মায়া'—এই তিনটি পাশে আমরা নিজেদের দেহমনসীমিত বদ্ধজীব বা 'পশু' বলিয়া মনে করিতেছি। ইহাই 'পাশবদ্ধ', নিদ্রিত অবস্থা। আমাদের জাগ্রত হইয়া, 'পাশমুক্ত' হইয়া নিজ শিবস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহার প্রচেষ্টাই সাধনা। নিজ শিবস্বরূপতা উপলব্ধির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহা তো অনন্ত শক্তি 'কুণ্ডলিনী'রূপে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রসুপ্তা রহিয়াছেন। তাঁহাকে জাগাইবার প্রচেষ্টাই, শক্তির উদ্বোধনই সাধকের প্রথম লক্ষ্য। অধিকারি-ভেদে সাধনাও ভিন্ন। সাধনার জন্য তন্ত্রমতে গুরুকরণ চাই-ই; কারণ পরমেশ্বরই গুরুর মাধ্যমে 'শক্তিপাত' অর্থাৎ কৃপা করেন; ভগবৎকৃপা ছাড়া পাশমুক্ত, বিশেষ করিয়া 'মল' বা আণব-পাশ হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বসিরহাট ও হাসনাবাদে পূর্বপাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সেবায় ১৪. ৬. ৭০ হইতে ১০. ৭. ৭০ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক দৈনিক গড়ে ৩,১৪২ কুইন্ট্যাল চাল, ৩৪৩ কুইন্ট্যাল ডাল, ১১৯ কুইন্ট্যাল পেঁয়াজ, ২০৩ বস্তা লবণ, ১৩২ পাউণ্ড বার্লি এবং ২০ কেজি গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে; উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল দৈনিক গড়ে ৩৯,৭২০ জন করিয়া।

১১. ৭. ৭০ হইতে ১০. ৮. ৭০ পর্যন্ত দৈনিক ৩,৬৩১ কু: চাল, ৩৪৬ কু: ডাল, ২৬৭ বস্তা পেঁয়াজ, ২৫০ বস্তা লবণ, ৫৮ পাউণ্ড বার্লি এবং ৪৫ কেজি গুঁড়া দুধ বিতরিত হইয়াছে। কেন্দ্রদুটিতে বিপন্ন উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪০,০০০। গত ছয় মাস ধরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন এই সেবায় রত।

গত ২২শে অগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী হাসনাবাদ, সৈনিকবাগান এবং বসিরহাটের সেবাকেন্দ্র (relief camp) পরিদর্শন করিয়াছেন। হাসনাবাদের সন্নিকটস্থ সৈনিক-বাগানের সেবাকেন্দ্রটি নূতন খোলা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণসেবা

গত ২রা হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারদিন অবিশ্রাম বারিবর্ষণের ফলে পশ্চিম-বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তিদের সেবায় রত হইয়াছেন।

হুগলী জেলার আরামবাগ, গোঘাট ও খানাকুল থানা অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ) সেবাকেন্দ্র খুলিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্থানীয় বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলগুলি হইতে বহু বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার ও আশ্রয়দান করিয়াছেন এবং সেবাকার্য চালাইয়া যাইতেছেন।

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বহু অঞ্চলও এই বারিবর্ষণের ফলে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে বিপন্ন প্রায় ৩১,২০০ ব্যক্তিকে রামকৃষ্ণ মিশন নিম্নোক্ত কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে আশ্রয়, আহার, শিশুখাদ্য, ঔষধ দান করিয়া সেবা করিতেছেন :

কেন্দ্র	সেবিত অঞ্চল	লোকসংখ্যা
সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ)	লিলুয়া, ঘুসুড়ী, ডোমজুড়	৩,১০০
রহড়া	স্থানীয় অঞ্চল, বন্দীপুর, কল্যাণনগর	২,৮০০
বেলঘরিয়া	যতীনদাস নগর ও নন্দননগর কলোনী	১,৭০০
বরাহনগর	ন-পাড়া, মাল্লাপাড়া	১,৭০০
নরেন্দ্রপুর	গোপাল ঘাট, চৌহাটী, আয়াপাঁচ, জগন্নাথপুর ইত্যাদি (১৭ টি গ্রাম)	১৭,০০০
কলিকাতা :		
সেবাপ্রতিষ্ঠান	গোবরা	২,০০০
অদ্বৈত আশ্রম	টাংরা, তিলজলা, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, হাজরা	২,৫০০
উদ্বোধন আফিস	বাগুইআটী অঞ্চল	৪০০

পুরুলিয়ায় খরাত্রাণকার্যে 'গভর্ণমেণ্ট টেস্ট রিলিফ স্কীম'-এ ৩০. ৫. ৭০ হইতে ৪. ৭. ৭০ পর্যন্ত ১৭,০৪১ ব্যক্তিকে ১৩ ৫০৫'১৫ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে এবং ১৩,৫০৫'১৫ কেজি গম ডোল হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৫টি গ্রামের ২,৭৪৭ ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক হিসাবে ও অন্যান্য খরচ বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

গুজরাটে দুঃস্থসেবায় প্রতিদিন ১,২০০ ব্যক্তিকে পূর্ববৎ খাওয়ানো হইতেছে। ৭৫টি পরিবারকে কৃষিকার্যের জন্য আর্থিক সাহায্য এবং সূচীশিল্পের জন্য বস্ত্র ও সূচসুতা দেওয়া হইয়াছে। বন্যাত্রাণসেবাও আরম্ভ হইয়াছে।

ছাত্রের কৃতিত্ব

কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের জনৈক বিদ্যার্থী ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

দেওঘর বিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র এই বৎসর অখিল ভারত জাতীয় মেধাবৃত্তি (All India National Talent Search Scholarship) লাভ করিয়াছে।

মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজে বট্যানি ব্লক

গত ২৬শে অগস্ট, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের বট্যানি ব্লকের উদ্বোধন করিয়াছেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক দিব্যায়ন পরিদর্শন

গত ১৮ই জুন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাঁচীর রামকৃষ্ণ মিশন দিব্যায়ন প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন। সেখানকার ছাত্র ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী গান্ধী তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, বর্তমানে দেশে দিব্যায়নের মতো প্রতিষ্ঠানের খুব প্রয়োজন। বহুদূরের গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে আগত আদিবাসী ছাত্রদের নিকট তিনি আশা করেন যে, তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া এখানকার শিক্ষার সদ্ব্যবহার করিবে এবং এ ভাবে গ্রামগুলির উন্নতিসাধন করিবে।

ইহার পূর্বদিন, ১৭ই জুন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র কর্তৃক রাঁচী জেলার বরাঘাগরা নামক গ্রামে নবনির্মিত আদিবাসী দেবীস্থান মন্দিরটির উদ্বোধন করেন দেবীস্থানে অঞ্জলি প্রদান করিয়া। ১৮ই জুন সন্ধ্যায় এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক বিশাল আদিবাসী জনসমাবেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেবাকেন্দ্রের পক্ষ হইতে একটি অর্পণনামায় সই করিয়া মন্দিরটি বরাঘাগরা গ্রামের প্রধান পাহামকে (পুরোহিত) গ্রামবাসীদের জন্য অর্পণ করেন।

স্বামী সদাত্মানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৯শে জুলাই, ১৯৭০ সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে স্বামী সদাত্মানন্দ (মণীন্দ্র মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ নানাবিধ রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতেই সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

মণীন্দ্র মহারাজ ছিলেন একজন মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট। কয়েক বৎসর তিনি বেলুড় মঠে ও কনখল সেবাশ্রমে আর্তনারায়ণের সেবাকার্যে নিরত থাকেন, তারপর বাকী জীবন বারাণসী সেবাশ্রমে অতিবাহিত করেন।

স্বামী সদাত্মানন্দ ছিলেন কঠোরী ও ধ্যান-পরায়ণ সন্ন্যাসী। তাঁহার আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

আবেদন

সাম্প্রতিক বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অবর্ণনীয় ক্ষতির কথা সর্ববিদিত। রামকৃষ্ণ মিশন বহুস্থানে বন্যার্তসেবায় ব্রতী হইয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সেবাকার্য বন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, ডোমজুড় প্রভৃতি অঞ্চলে এবং নরেন্দ্রপুরের পার্শ্ববর্তী প্রায় ২০টি গ্রামে এই সেবাকার্য বেশ কিছুদিন চালাইতে হইবে। এই কার্যে অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ সর্বসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। যে-কোন প্রকার দান নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে :

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
পো:—বেলুড় মঠ ; জেলা—হাওড়া

বিবিধ সংবাদ

জাতীয় নেতা ও মনীষীদের প্রতি অবমাননার প্রতিবাদ

জাতীয় নেতা ও মনীষীদের মূর্তি ও প্রতিকৃতির প্রতি অবমাননা এবং তাঁহাদের সাহিত্য ধ্বংস করা প্রভৃতির প্রতিবাদে 'পূর্ব কলিকাতা গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটি'র আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রিদ্বয় শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, কয়েকটি সংস্থার সদস্য ও তরুণ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সর্বমোট প্রায় তিনশত জন গত ৮ই অগস্ট সকাল ৭টা হইতে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত দক্ষিণ কলিকাতার গোল পার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তির পাদদেশে অনশনব্রত পালন করেন।

স্বামীজীর পুষ্পমাল্যভূষিত মূর্তিটির নিম্নে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্যর আশুতোষ, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজীর মাল্যশোভিত প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। স্বামীজীর এই মর্মর-মূর্তিটিকেও গত মাসে দুষ্কৃতকারীরা কালিমালিপ্ত করিয়াছিল ; পরে সন্নিকটস্থ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার হইতে লোক পাঠাইয়া উহা মুছিয়া দেওয়া হয়।

অনশনের প্রারম্ভে ও শেষে অনশনরত নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে জাতীয় নেতা ও মনীষিবৃন্দের সাম্প্রতিক এই-জাতীয় অবমাননা-প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করিয়া বলা হয় যে, এভাবে তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতিকে ম্লান করা যায় না, ইহাতে শুধু নিজেদেরই মুখ কলঙ্কিত করা হয় ; ইহা জাতির ধ্বংসেরই পথ। নেতারা বলেন, যাঁহাদের অবদানে আমাদের জাতীয় সত্তা গড়িয়া উঠিয়াছে ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি চিরসম্মান দেখাইবার বিবেককে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।

একই উদ্দেশ্যে গত ১২ই অগস্ট এখানেই, স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তির পাদদেশে 'মনীষী স্মৃতিপূজা কমিটি' কর্তৃক একটি সভা আহূত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও নাগরিকগণ এই সভায় যোগদান করেন ; সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় সভাপতির এবং বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীসত্যেন্দ্র

নাথ বসু বলেন যে, বর্তমানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রহিয়াছি। দেশের পূর্বগ মনীষীদের প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কথা চিন্তাই করা যায় না। তিনি বলেন, এসবের জন্য কেবল ছাত্রদের দায়ী করা চলে না, দায়ী রাজনৈতিক নেতা এবং শিক্ষকগণও; তাঁহারা অবক্ষয়ের কবল হইতে ছাত্রদের রক্ষা করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহাদের ছাত্র ও যুবসমাজকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়া সেদিকে চালিত করিতে হইবে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য চাই সকলের বিপুল পরিশ্রম; স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমাবর্ষণ দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায় না। যাঁহারা ভাবেন আগে ভাঙিয়া পরে গড়িব, তাঁহাদের ভাঙাই সার হইবে, গড়া আর হইবে না।

'মনীষী স্মৃতিপূজা কমিটি' কর্তৃক এই উপলক্ষ্যে গত ১৪ই অগস্ট আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মর্মরমূর্তির পাদদেশে। সভাপতির ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেন, স্বামীজী, নেতাজী, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির আদর্শ ও বাণী মুছিয়া ফেলার অপপ্রচেষ্টা কখনই দেশের প্রগতির পথ প্রশস্ত করিবার উপায় হইতে পারে না। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রতুল গুপ্ত বলেন, যাঁহারা বাংলা ও সমগ্র ভারতের গৌরব, তাঁহাদের প্রতি অবমাননা-প্রদর্শনের দ্বারা দেশের সংস্কৃতিকে মুছিয়া ফেলা সম্ভব নয়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায় বলেন, যাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ফলে আজ আমরা প্রগতিপরায়ণ হইতে শিখিয়াছি, তাঁহাদের আদর্শকে, ভারতের মহান ঐতিহ্যকেই আজ যুবসমাজের কাছে তুলিয়া ধরিতে হইবে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, প্রাচীন ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়া জাতি কখনো বড় হইতে পারে না, স্বামীজী প্রভৃতি মনীষী-প্রদর্শিত পথেই আমাদের দেশগঠনের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের অবমাননার প্রচেষ্টা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়, এতে জাতির মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হইবে, জাতির পুনর্গঠন হইবে না।

উৎসব-সংবাদ

শান্তিপুর সাহাপাড়া স্ট্রীটে গত ১৯শে জুন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী সাধন কুঞ্জ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সারাদিনব্যাপী উৎসবান্তে বিকালে সভায় ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য কথামৃত পাঠ করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন শান্তিপুর পুরাণ পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক প্রেরিত লিখিত-ভাষণও সভায় পঠিত হয়। সভান্তে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের সৌজন্যে 'শ্রীশ্রীমা' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

নিউ আলিপুর শ্রীসারদা মহিলা সমিতির উদ্যোগে গত ৩রা মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চত্রিংশদধিক শততম জন্মতিথি পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা শ্রীশ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতার জীবনী আলোচনা করিয়া এ যুগে মাতৃজাতির আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবোধনে তাঁহাদের অমূল্য অবদানের কথা বিবৃত করেন।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

আদ্যা শ্রীনির্গুণা কালী বাচ্যাতীতা পরাৎপরা।

—শক্তিসঙ্গম তন্ত্র

অরূপা সা মহাদেবী লীলয়া দেহধারিণী॥

—মহাভাগবত

শক্তির্মহেশ্বরো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থবাচকাঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকো ভেদঃ শব্দতো ন পরার্থতঃ॥

—গন্ধর্বতন্ত্র

পুংরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং স্ত্রীরূপাং বা বিচিন্তয়েৎ।
অথবা নিষ্কলং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্॥

—কুলার্ণব তন্ত্র

কালিকা নির্গুণা নিত্যা, পরাৎপরা আদিভূতা, বাক্যের অতীতা।
অরূপা সে মহেশ্বরী লীলা তরে দেহ ধরি (হন শিব, হন বিশ্বমাতা॥)

শক্তি শিব ব্রহ্ম এই পরমেশ-নামত্রয় সবই সমার্থক
স্ত্রী-পুরুষ-আদি যেই ভেদ, তাহা শব্দেতেই
শিব শক্তি ব্রহ্ম সবই চরম পরম একই অবিনাশী সত্তার বাচক॥

পুরুষ বা নারী রূপে, সচ্চিদ্-আনন্দ রূপে—পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে,
যেভাবেতে প্রাণ চায় সেভাবে ভাবিয়া তাঁয়
ধ্যানে তাঁর অবগাহি (হের চিদানন্দময়ী জননীরে আপন স্বরূপে॥)

কথাপ্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ী সকলকেই আমরা ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীকালিকা

মা কালী সগুণা নির্গুণা দুই-ই

কত খণ্ডতা, কত নানাত্ব, কত বৈচিত্র্য এই জগতে আমরা দেখি, সে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। বৈচিত্র্যের মধ্যেও আবার বৈচিত্র্য। দুটি মানুষ ঠিক এক রকম হয় না—দেহেও না, মনেও না। বৈশেষিক মতে দুটি পরমাণুও ঠিক একরকম নয়। অথচ এক মহান সামঞ্জস্যে সব বিধৃত।

এই বৈচিত্র্য কমিয়া আসে, যত আমরা বিশ্বের মূলের দিকে অগ্রসর হই। মূলে বৈচিত্র্য নাই, খণ্ডত্ব নাই, উহা অখণ্ড, পূর্ণ, অদ্বয়, নির্গুণ, নিরাকার সত্তা। সে সত্তা অবিনাশী, সে সত্তা চৈতন্যস্বরূপ, সে সত্তা আনন্দস্বরূপ।

এই পর্যন্ত, আমাদের শাস্ত্রের দুটি প্রধান বিভাগ বেদ ও তন্ত্র একমত। বেদ সে মূল সত্তাকে বলিতেছেন ব্রহ্ম; তন্ত্র তাহাকেই বলিতেছেন আদ্যাশক্তি—মায়াতীতা মহামায়া—তুরীয়া নির্গুণা মা। শুধু তফাত, তন্ত্র বলিতেছেন এই নির্গুণা মা-ই সগুণা হন, অখণ্ড সত্তাই জগজ্জননীর, জীবের, জগতের রূপ ধারণ করেন; তিনি সগুণা নির্গুণা, সাকারা নিরাকারা দুই-ই—(কালী) 'নির্গুণা সগুণাপি চ' (নিরুক্ত তন্ত্র), 'সাকারাপি নিরাকারা।' (মহানির্বাণ তন্ত্র)।

আমাদের স্বরূপও তাই। মা-ই আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার হইয়াছেন; বিশ্বের সব কিছুই হইয়াছেন। কিন্তু এ স্বরূপবোধ, এ অখণ্ড দৃষ্টি তো আমাদের নাই। আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। বিস্মৃত হইয়া অখণ্ড-কেই খণ্ড খণ্ড রূপে দেখিতেছি; নিজেকে দেখিতেছি দেহমনবুদ্ধির সীমায় খণ্ডিত রূপে, জগতের বস্তুচয়কে দেখিতেছি পরস্পর হইতে, আমা হইতে মা হইতে পৃথক রূপে।

কিন্তু কেন এমন হয়? মা কালীই মায়ার রূপ ধরিয়া ইহা ঘটাইতেছেন। সত্য সম্বন্ধে, নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে তিনি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের যেন ঘুম পাড়াইয়াছেন। তবে একেবারে অচেতন, সুষুপ্ত করিয়া রাখেন নাই, ঘুম পাড়াইয়া ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখাইতেছেন—নিজেকেই পৃথক পৃথক জীব ও জগৎ রূপে দেখাইতেছেন। যেন 'পাশ' দিয়া, বন্ধনরজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন আমাদের জ্ঞানকে। তন্ত্রে এ পাশের নাম 'আণব পাশ'—বেদান্তদর্শনে যাহার নাম মায়ার 'আবরণ'- ও 'বিক্ষেপ'-শক্তি।

এ ঘুম হইতে আমাদের জাগিতে হইবে। উপায় কি? উপায় তো জগতের সর্ব ধর্মমতে, সর্বশাস্ত্রসম্মতিক্রমে একটিই—তাঁহাতে মন একাগ্র করা। কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ, করা তো ততটা, ততটা কেন মোটেই সহজ নয়। দুইচারিজনের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা কয়জন একটানা কতক্ষণই বা আর মার চিন্তা করিতে পারি? কিন্তু ঘুম তো সকলেরই ভাঙানো চাই। তন্ত্রে তাই ক্রিয়ার বাহুল্য। তন্ত্র বলিতেছেন, মাকে কেন্দ্র করিয়া পূজা প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকো—যাহা তোমরা সকলেই পারিবে। আবার, নিম্ন অধিকারীদের জন্য আমাদের প্রিয় বিষয়েই

পরিবেশেই ক্রিয়ার ব্যবস্থা—যেখানে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, সেখানে থাকিয়াই মাকে ডাকার ব্যবস্থা। উহাতেই কাজ হইবে, মার চিন্তাই—যেভাবেই হউক—আমাদের ঘুম ভাঙাইবে।

কিন্তু নিগু'ণা মাকে আরাধনা তো দূরের কথা চিন্তাই যে করা যায় না! নিশ্চয়ই যায় না। তন্ত্র বলিতেছেন, সগুণা সাকারা মাকে চিন্তা কর, তাঁর আরাধনা কর।

দশমহাবিদ্যা—কালীরূপ

কিন্তু কোন্ রূপে চিন্তা করিব, আরাধনা করিব মায়ের? আমাদের যাহার যেরূপ ধারণাশক্তি, মাকে যে রূপ-ও গুণবিশিষ্ট পাইলে আমরা সব চেয়ে বেশী খুশী হইব, আমাদের জন্য মা সেই রূপই ধরিবেন—'গুণ-ক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা' (মহানির্বাণ তন্ত্র)। মায়ের দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণের, একই মায়ের বিভিন্ন রূপ-ও গুণবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভাবের মূল কথা ইহাই। তন্ত্র বলিতেছেন ইহলোকের বিষয়ভোগে আসক্তি তোমার খুব বেশী? —বেশ তো, ঐ ভোগের পথের বাধা সরাইবার জন্যই মাকে ডাকো - বগলা, কমলা, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী রূপে তাঁহার আরাধনা কর। নিজের স্থূলদেহাতীত সত্তায় যদি বিশ্বাস আসিয়া থাকে, যদি বিশ্বাস কর যে এই দেহের নাশের পরও তুমি সূক্ষ্মদেহে থাকিবে, এবং স্বর্গে যাইয়া ভোগ করিবে, তবে মাকে ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ষোড়শী প্রভৃতি রূপে আরাধনা কর। আর যদি ইহলোক ও পরলোকের সব ভোগকে অনিত্য জানিয়া দেহ-মন-বুদ্ধি-বিধৃত এই সব ভোগের স্বপ্ন ভাঙিয়া পূর্ণ জাগ্রত হইতে চাও, নিজের অবিনাশী পরমানন্দময় সত্তা উপলব্ধি করিতে চাও, তবে কালী, তারা ও ত্রিপুরাসুন্দরী রূপে মাকে ডাকো।

এই তিনটি রূপের মধ্যে আবার এবিষয়ে কালীরূপের আরাধনাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন তন্ত্র। দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা, নির্বিকারা, নিগু'ণ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশিকা। যোগিনীতন্ত্রে মা কালী নিজেই বলিতেছেন, নিগু'ণ নিরাকার ব্রহ্মকে সগুণ সাকাররূপে চিন্তা করিবার পক্ষে কালীরূপই শ্রেষ্ঠ—'ইতঃ পরতরং রূপং ব্রহ্মণো নাস্তি কুত্রচিৎ।' সাধারণ বুদ্ধিতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, মা বা সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ সবভাবেরই একত্র প্রকাশ কালীরূপের মতো আর কোন রূপেই নাই।

কালীর আবির্ভাব

বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য দশমহাবিদ্যার ভিতর বিশেষ রূপগুণসমন্বিতা মূর্তির আরাধনা প্রশস্ত, একথা বলিলেও তন্ত্র ইহাও বলিয়াছেন, দশমহাবিদ্যার সকলেই 'ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী।'

সব রূপই যে তাঁহারই রূপ, সব রূপে উপাসনা যে তাঁহারই উপাসনা, এই সত্যটিও মায়ের দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণের মূলে রহিয়াছে। সনাতন ধর্মের চিরাচরিত প্রথামতো এই সত্যটি সর্বসাধারণের নিকট পরিবেশিত হইয়াছে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে।

শিব এবং শক্তি হইলেন শুদ্ধ চৈতন্য এবং তাহার সহিত সদা-অভিন্ন শক্তির প্রতীক। দক্ষরাজার কন্যা, শিবের অর্ধাঙ্গিনী সতী শক্তিরই এক রূপ। দক্ষরাজ এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু দম্ভভরে শিব ও সতীকে সেখানে উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন নাই; আর সব দেব দেবীই নিমন্ত্রিত। নারদের মুখে পিতৃগৃহে এই উৎসবের সংবাদ পাইয়া সতী বিনা নিমন্ত্রণেই

সেখানে যাইবার জন্য শিবের সম্মতি চাহিলে শিব সম্মতি দিলেন না। তখন সতী দশ-মহাবিদ্যা রূপ ধারণ করিয়া শিবের দশদিকে আবির্ভূতা হইলেন।

কেন? কালিকা পুরাণ মতে শিব অনুমতি না দেওয়ায় সতী ক্রুদ্ধা হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন। মহাভাগবত পুরাণ মতে, সতী দেখিলেন, শিব তাঁহার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন—তিনিই যে জগতের মূল, তাঁহার ইচ্ছাতেই যে বিশ্বের সব কিছু ঘটিতেছে, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার দক্ষালয়ে যাইবার ইচ্ছায় বাধা দিতেছেন; শিবের স্মৃতি ফিরাইয়া আনিবার জন্যই তিনি দশমহাবিদ্যা হন। ঐ সময় সর্বাগ্রে তিনি কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

নারদপঞ্চরাত্র মতে দক্ষালয়ে দেহত্যাগের পর সতী হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে কালী রূপে জন্মগ্রহণ করেন, 'অনুগৃহ্য চ মেনায়াং জাতা তস্যাস্তু সা তদা। কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা···।'

দেবীমহাত্ম্যে চামুণ্ডাকেই 'কালী' বলা হইয়াছে। শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধের প্রারম্ভে দেবীর ললাট হইতে কালী অসি ও পাশ হস্তে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছিলেন। আবার, পার্বতীর দেহ হইতে অম্বিকা দেবী নির্গত হইবার পর পার্বতীর দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাওয়ায় তিনি 'কালী' নামে সমাখ্যাতা হন, ইহাও আছে।

কালী নাম ও রূপের তাৎপর্য

যখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ছিলেন না, পঞ্চভূতও ছিল না, তখন শুধু মা কালী ছিলেন—ব্রহ্মরূপে (মহাকালসংহিতা)। কালী আদিরূপিণী, সব কিছুর কারণ; প্রলয়ে সব কিছু তাঁহাতেই বিলীন হয়—মহাকাল বিশ্বগ্রাস করেন, তিনি গ্রাস করেন মহাকালকে—তাই তিনি 'কালী' (মহানির্বাণ তন্ত্র)। আবার, বিশ্ব 'কলন' (ক্ষেপণ ও সংহার) করেন বলিয়াই তিনি 'কালী'। কালীরূপও অনেক, দক্ষিণাকালী যার অন্যতম। যমের স্থান দক্ষিণে; 'কালীনাম্না পলায়তে ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ' (নির্বাণ তন্ত্র), কালী নাম শুনিয়াই যম ভয়ে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করেন বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণাকালী।

কালী কৃষ্ণবর্ণা কেন? আসলে মায়ের কোন রূপই নাই, তিনি অরূপা, ব্রহ্মস্বরূপা। আবার, সব রূপই তাঁর রূপ। একদা স্বামী সারদানন্দকে, যিনি জগতের যাবতীয় নারী-মূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন তাঁহাকে জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মের কোন রূপ আছে কি? উত্তরে সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, "যাহা কিছু দেখিতেছ সবই তাঁহার রূপ।" তবে, কোন রূপে তাঁহাকে দেখা. সে যেন দূর হইতে—নিজেকে তাঁহা হইতে পৃথক রাখিয়া, দূরে রাখিয়া—দেখা। স্বরূপে পৌঁছিয়া দেখাই হইল নিকটে যাইয়া মাকে দেখা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা, সমুদ্রের জল দূর হইতে নীল বা কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, কাছে যাইয়া হাতে তুলিয়া দেখিলে দেখা যায় কোন রঙ নাই। তেমনি মা কালী দূর হইতে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, কাছে যাইয়া দেখিলে কোন রঙ নাই। আবার, শ্বেত পীতাদি সব বর্ণই যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তেমনি বিচিত্ররূপমণ্ডিত বিশ্বের সব কিছুই কালীর মধ্যে বিলীন হয় বলিয়াই তিনি কৃষ্ণবর্ণা (মহানির্বাণ তন্ত্র)। মাকে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের কর্ত্রীরূপে যখন দেখিতেছি. তখনও তাহা দূর হইতেই দেখা। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ হইতেও তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণা, 'তমোরূপা' বলা হইয়াছে। আমরা

সাধারতঃ যাহাকে 'জ্ঞান' বলি, তাহা অখণ্ডকে খণ্ডরূপে, নানারূপে দেখার জ্ঞান; আসল জ্ঞান, সত্যজ্ঞান নহে। বিশ্বের মূলে যে সত্য, বেদ ও তন্ত্র উভয় মতেই তাহা এক, অখণ্ড; নানাত্ব, খণ্ডত্ব নাই সেখানে —আমাদের অহং-মন-বুদ্ধির-ও পৃথক অস্তিত্ব নাই সেখানে—সবই মায়ের মধ্যে বা ব্রহ্মে লীন। কাজেই তাহা 'বাচাতীতং মনোঽগম্যং' (মহানির্বাণ তন্ত্র), 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (বেদ—তৈত্তিরীয় উঃ)। এই অখণ্ড সত্যকে যদি আমাদের মনবুদ্ধির সীমানায় থাকিয়া, নানাত্বে রঞ্জিত জ্ঞানের মধ্যে ধারণা করিতে চাই, তাহা হইলে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। তম বা ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারই উহার উপযুক্ত প্রতীক। আমরা তো দেখি অমানিশা আমাদের জগতের সব রূপকে গ্রাস করিয়া এক অখণ্ড তমিস্রায় লীন করিয়া দেয়। বেদে এই রূপক ব্যবহৃত হইয়াছে, 'তম আসীৎ তমসা গুঢ়মগ্রে'; মহানির্বাণ তন্ত্রেও, 'সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপম্-অগোচরম্।' সগুণের সীমায় নির্গুণা মায়ের প্রতীক তাই তম, মা তাই কৃষ্ণবর্ণা। তবে এ কৃষ্ণবর্ণ আমাদের সর্ববিধ খণ্ডজ্ঞানশিখার নির্বাণজ্ঞাপক হইলেও অখণ্ডজ্ঞানের, স্বরূপ-জ্ঞানের উদ্ভাসেরই পটভূমি। কালী তাই কৃষ্ণ-বর্ণা হইয়াও 'জ্যোতির্ময়ী।' সাধক কবি এই কথাই কৈবল্যদায়িনী কালিকাকে বলিতেছেন, 'তমোময়ি, অমানিশা ভালবাস, আঁধার হৃদয়ে স্বরূপ প্রকাশ।' এই দৃষ্টিকোণ হইতে বলা যায়, বেদ ও তন্ত্রোক্ত এই 'তম' আর বৌদ্ধশাস্ত্রের 'নির্বাণ' সমার্থজ্ঞাপক—সর্ববিধ খণ্ডজ্ঞান এবং আমাদের খণ্ডতাশ্রয়ী অহংবোধের বিলোপ যার লক্ষ্য।

মা কালীর করধৃত উদ্যত খড়্গ এই খণ্ডজ্ঞান ও তার আশ্রয় দেহমন-বুদ্ধি-অহংকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সাধককে স্বরূপ-জ্ঞান দিবার জন্যই।

মা দিগম্বরী। অম্বর বস্ত্র, আবরণ; সূক্ষ্মতম এবং মূল আবরণ মায়া, যাহা সত্যকে আবৃত করিয়া রাখে। মায়ের সে আবরণও নাই, তিনি মায়াতীতা, তাই দিগম্বরী।

মা রক্তবর্ণ লোলরসনা বিস্তার করিয়া বিকশিত দন্তপংক্তি দ্বারা তাহা চাপিয়া রাখিয়াছেন। কেন? লোকপ্রচলিত উত্তর হইল, স্বামীর বুকে পা দিয়াছেন দেখিয়া লজ্জাশীলা পল্লীবধূর মতো মা এভাবে লজ্জা প্রকাশ করিতেছেন। অন্য উত্তর, মা যে শুদ্ধসত্ত্বগুণ-প্রধানা, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। রক্তবর্ণ রজোগুণের প্রতীক, শ্বেতবর্ণ সত্ত্বের প্রতীক। প্রথমে রজোগুণের বিকাশ ঘটাইয়া তামসিকতা বিনাশ করিতে হয়, পরে সত্ত্বগুণের প্রকাশে রজ দমিত হইলে সত্যলাভ হয়। শুভ্র দন্তপংক্তি দ্বারা রক্তজিহ্বাকে চাপিয়া থাকার ইহাই তাৎপর্য।

কালীরূপের আরাধনার লক্ষ্য কি, তাহা পূর্বেই দেখিয়াছি—স্বরূপোপলব্ধি। এই আরাধনা সবলের আরাধনা। এই আরাধনায় দুর্জয় সাহস অবলম্বনে স্থূলসূক্ষ্ম সর্ববিধ দেহাশ্রিত স্বার্থ ও ভয়কে বলি দিয়া লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়—হৃদয়কে শশ্মানে পরিণত করিতে হয়, তবেই 'শ্মশানবাসিনী' মা সেখানে আবির্ভূতা হন। 'শ্মশানবাসিনী' ও 'তমোরূপম্' ভাবের দিক দিয়া সমার্থক, "মৃত্যুরূপাও" তাহাই। তাই যে মাকালীর আরাধনায় "স্বার্থ-সাধ-মান" চূর্ণ করিয়া হৃদয়কে শ্মশান করিতে পারে, "মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে", তাহারই আরাধনা কালীর যথার্থ পূজা,—"মাতৃরূপা তারি পাশে আসে।"

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

শ্রীরামানুজদর্শনের অপরিহার্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে সমাজজীবনে কি সমস্যার উদয় হইয়াছিল তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। কেন যে তিনি তাঁহার প্রসন্নগম্ভীর শ্রীভাষ্যে আচার্য শঙ্কর-প্রতিপাদিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্যকে দার্শনিক ভিত্তিতে খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, মায়াবাদ নিরসন করিয়া নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ভক্তিবাদ প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তৎকালীন সমাজ জীবনের বিপথগামিত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। যখনই সত্য-ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই ঈশ্বরাদিষ্ট মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া মানবমনকে একটি উন্নত স্তরে লইয়া যান। আবার কালধর্মে উহা গ্লানিগ্রস্ত হয়, আবার শ্রীভগবানের দক্ষিণামূর্তি —নরশরীরাবলম্বনে—সত্য-ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করে। ইহা ভারত-সংস্কৃতির একটি চিরন্তন ধারা। As a chosen people, ভারত তাহার আর্যসংস্কৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বিগত বহু সহস্র বৎসর অব্যাহত গতিতে চলমান এবং ভবিষ্যতেও মধ্যে মধ্যে সমুত্থিত দানবশক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়া জগৎকল্যাণের প্রয়োজনে স্বমহিমা-মণ্ডিত হইয়াই বাঁচিয়া থাকিবে। ইহা বিধি-নির্দিষ্ট সত্য। এই সংস্কৃতির উপর যে শক্তি আঘাত হানিতে চাহিবে, তাহাকে চূর্ণবিচূর্ণ হইতেই হইবে। ভারতাত্মা অমর, ভারতের প্রাণবাণী চির অমৃতস্যন্দী।

পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী শ্রীরামানুজচরিত গ্রন্থে শ্রীরামানুজ আচার্যের পুণ্য আবির্ভাবের হেতু নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:

"স্বকার্য সাধনপূর্বক দ্বাত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে শঙ্করমূর্তি শঙ্করদেব স্বকীয় পরমধামে গমন করিলেন। কাল একদিকে যেমন সুন্দর সুন্দর নূতন বস্তুর আবির্ভাব করাইয়া সকলের চিত্তকে পুলকিত ও আকৃষ্ট করে, অন্যদিকে, আবার সেই চিত্তোৎফুল্লকর নবীন পদার্থকে ছিন্নভিন্ন বিশীর্ণ করিয়া দরিদ্রেরও হেয় করিয়া তুলে। ইহাই কালধর্ম। সেই কালধর্মানুসারে শঙ্কর-কথিত বেদচতুষ্টয়সার মহাবাক্যচতুষ্টয়ের দুরর্থ করিয়া তন্মতাবলম্বী অনেক সন্ন্যাসিবেশধারী ইন্দ্রিয়পরবশ মানব, আপনাদের উপর এবং সমাজের উপর বহু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যে তাঁহারা সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত, সপ্তধাতুময়, বিষ্ঠামূত্রবাহী, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির নিবাসভূমি, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, অধ্রুবনশ্বরজীবন, অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং অকৃতবুদ্ধি মনুষ্যই অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বাশ্রয়, পরমানন্দধাম অচ্যুত ব্রহ্ম এইরূপ স্থির করিলেন। পদ্মপত্রে যেরূপ জল লগ্ন হইতে পারে না, ব্রহ্মবস্তুতেও সেইরূপ পুণ্য পাপ, আচার অনাচার, সত্য মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমিই সেই ব্রহ্ম—সুতরাং আমি যাহাই করি না কেন, আমাতে কোনও দাগ লাগিতে পারে না। এতদপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? এরূপ ধারণার বশবর্তিগণ যে শীঘ্রই আপনাদের স্বদেশের

সর্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্তুতঃই উক্ত স্বকপোলকল্পিতত্বুরর্থকারিগণ শঙ্করকথিত পরম-নির্মল ধর্ম ধারণা করিতে না পারিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে দুর্নীতি, হিংসা, দ্বেষ, অসত্য প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ, শান্তি ও সত্যের অভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সেই অভাব দূর করিবার জন্য যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন, হে পাঠক! এস এক্ষণে আমরা সেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারকর্তা ভগবান শ্রীশ্রীরামানুজাচার্যের নির্মল জীবনচরিত্র আলোচনার জন্য অগ্রসর হই। এ ভাবরাজ্যে অভাববস্তু থাকিতে পারে না। সুখ, শান্তি, সত্য, দাক্ষিণ্য, ধর্ম প্রভৃতি ভাববস্তু এবং দুঃখ, অশান্তি, মিথ্যা, হিংসা, সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, অধর্ম প্রভৃতি অভাববস্তু। যাহা না থাকিলে মনুষ্যের কষ্ট হয়, তাহাই ভাবপদার্থ। অতএব সুখ-শান্তি প্রভৃতি ভাববস্তু, এবং তৎসমুদায়ের অভাব, দুঃখ অশান্তি প্রভৃতি অভাববস্তু। অভাব হইলেই ভাব আসিয়া তাহার প্রতিবিধান করে, ইহা পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই নিয়মানুসারেই ভারত-ভূমিতে শ্রীমৎ রামানুজাচার্যের আবির্ভাব হইল।" (পৃঃ ৬২,৬৩)

ইহা অনস্বীকার্য যে, ধর্মসংস্কারক মহাপুরুষ যখনই কোন নূতন মতবাদ প্রচার করেন তিনি তদানীন্তন ধর্মমত ও পূর্বগ আচার্যগণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, বুদ্ধদেব গীতার ধর্মের প্রভাবান্বিত, আচার্য শঙ্কর বহুল পরিমাণে আধ্যাত্মিক শূন্যবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিবাদে দক্ষিণের মাধ্ব-সম্প্রদায়ের এবং ভাগবত ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। এমন কি যীশু-প্রচারিত ধর্মমতের উপর গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারা ও ভারতের বৌদ্ধ-ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

শ্রীরামানুজাচার্য যে আবেষ্টনীর মধ্যে জীবনযাপন করিতেন উহা উচ্চাঙ্গের ভক্তি-ভাবপরিপূর্ণ ছিল। তিনি যে সব মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্মচিন্তা, পরম পবিত্র ভক্তিরসাপ্লুত জীবন তাঁহাকে সম্যক্‌ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

অনূন ৯০৮ খৃঃ বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনার স্রোত শ্রীশ্রীনাথ মুনি নামক কোন মহাপুরুষের হৃদয়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া ভবিষ্যৎ মহাপ্লাবনের সূচনা করিতে লাগিল।

শ্রীনাথ মুনি দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় মত তন্মধ্যে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। "এই গ্রন্থদ্বয় শ্রীবৈষ্ণবগণের চিরকাল মহার্ঘ রত্নস্বরূপ ও পরম আদরের বস্তু হইয়া আছে।" শ্রীরামানুজাচার্য এই মতবাদে সিঞ্চিত হইয়াছিলেন।

আবার তাঁহার দার্শনিক চিন্তার উপজীব্য হইল শ্রীযমুনা মুনির মতবাদ। "যমুনাচার্যের হৃদয়ে কেবল মাত্র শ্রীবিষ্ণুই অধিরূঢ় থাকিতেন বলিয়া তাহা তাঁহার সিংহাসনস্বরূপ ছিল।" তিনি শেষ জীবনে সংস্কৃত ভাষায় চারিখানি পুস্তক রচনা করেন। এই সকল পুস্তকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের অমোঘ ইচ্ছায় যেন শ্রীরামানুজ বিগ্রহধারণ করিয়া অচিরে তাঁহার সেই কামনা চরিতার্থ করিয়া দিয়াছিলেন। "শ্রীরামানুজ আলওয়ান্দারের (যমুনাচার্যের) পূর্ণ বিকাশ মাত্র।"

অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নিম্নে বিবৃত হইল :

পরদিবস রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের নিকট গমন করিলে তিনি বলিলেন, "বৎস, তোমার সম্বন্ধে গত রজনীতে শ্রীবরদরাজ এইরূপ কহিয়াছেন :

'আমিই জগৎকারণ প্রকৃতির কারণ পরব্রহ্ম। হে মহামতে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ একমাত্র মুক্তির উপায়। মদীয় ভক্তগণ অন্তিম সময়ে আমার স্মরণ করিতে না পারিলেও তাঁহাদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। দেহত্যাগ হইলেই আমার পরম ভক্তগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্বগুণ-সম্পন্ন মহাত্মা মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর।'"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানুজ বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িলেন। যে ছয়টি সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে অশান্তির রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা সর্বতোভাবে উন্মূলিত হইয়া গেল।

তাহার পর শ্রীরামানুজ কাঞ্চীপুরে তপস্বী মহাপূর্ণের নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

পূর্বোক্ত ঘটনাসমূহ হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, শ্রীরামানুজ বিষ্ণু উপাসক মহাত্মাগণের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হইয়া স্বীয় অভিনব দার্শনিক মত শ্রীভাষ্যের মাধ্যমে প্রচার করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌-ভাগবতম্ এবং বোধায়নবৃত্তি তাঁহার মতবাদের উপজীব্য ছিল। (ক্রমশঃ)

প্রিয়তম

শ্রীনীরদবরণ চট্টোপাধ্যায়

এসো প্রিয়তম, চির সুন্দর,
এসো প্রেমের সুরেতে মাতিয়া ;
এসো মনোরম চির বাঞ্ছিত
হেরিব নয়ন ভরিয়া।
কত যে দীপ গেল জ্বলি,
কত যে ফুল হলো ধূলি ;
তোমারই আশায় রহিয়া।
নীড়হারা পাখি ডাকিয়া উঠিলে,
মনে হয় প্রিয়, তুমি কি আসিলে ?
আঁধারের মাঝে খুঁজি যে তোমারে,
তোমার মিলন লাগিয়া ;
এসো প্রেমের সুরেতে মাতিয়া।

জগন্মাতার আরাধনা

শ্রীমতী মৃন্ময়ী দত্ত

মা বিশ্বজননী। তবু আমরা তাঁর নাগাল পাই না। শিশু কাঁদতে থাকলে মা কতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারেন? অবশ্যই এসে চোখ মুছিয়ে কোলে নেন। সেভাবে কেঁদে কেঁদে ডাকতে হবে মাকে। তবে কেবল দুঃখ এড়াবার জন্য নয়, সুখকেও তুচ্ছ করে মাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হওয়া চাই। সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছেন :

"আমি দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি
সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাকতে,
তুমি মনে বসে মন দেখ মা,
আমায় দেখা দাও না তাইতে।"

কবি অতুলপ্রসাদ গেয়েছেন :

"আমার চোখ বেঁধে এই ভবের খেলায়
বলছ হরি আমায় ধর ;
আঘাত দিয়ে বারে বারে বলছ এই তো
আমায় কর।"

আমাদের খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে মা লুকিয়ে থাকেন, আমরা মার জন্য কাঁদি কি না তাই দেখতে। এরই নাম লীলা। মায়াসহায়ে মা এই লীলা করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই মায়ার বর্ণনা আছে। এই মায়ার প্রভাবেই জগৎ চলছে। আমরা হয়ত বুঝছি সব। কিন্তু মায়াপাশ ছিন্ন করতে পারছি না—"তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা।"

গীতাতেও শ্রীভগবান বলছেন : "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" আবার তিনি মায়া পার হওয়ার উপায়ও বলে দিচ্ছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" অর্থাৎ আমাকে যে লাভ করতে পারে সে-ই মায়া কাটাতে পারে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথাও তাই। বৈশ্য সমাধি মায়া কি বুঝেছেন, কিন্তু তার হাত থেকে বের হতে পারছেন না! উপায় কি? মেধা ঋষি তাঁকে বললেন, মহামায়ার আরাধনা কর, মাকে প্রসন্না কর, তাহলেই মা নিজে বাঁধন খুলে দেবেন—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

অনেকের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারো নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে জগন্মাতা মহাশক্তির ভাব দেখা যায়। দেবীসূক্তের ঋষি ছিলেন মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা বিদুষী বাক্। বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে বলেছিলেন, "আমিই ব্রহ্মময়ী আদ্যা দেবী ও বিশ্বেশ্বরী।" ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন ঋষি কুশিক। অনেকের মতে এই রাত্রিসূক্তে কালিকাদেবীর মূল রয়েছে। ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ—এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি সামবেদীয় কেনোপনিষদের নিম্নোক্ত উপাখ্যান থেকে জানা যায় :

দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই দেবতাদের বিজয় হ'ল। স্বশক্তিতে জয় হয়েছে মনে করে দেবতারা গৌরবান্বিত বোধ করলেন। তাঁদের মিথ্যা অভিমান অপনোদন করবার জন্য ব্রহ্ম জ্যোতিরূপে দেবগণের সম্মুখে

আবির্ভূত হলেন। দেবগণ আবির্ভূত পূজ্য এই জ্যোতি কে, তা জানতে না পেরে জেনে আসার জন্য অগ্নিকে তৎসমীপে প্রেরণ করলেন। জ্যোতিরূপী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম ও শক্তি কি?' অগ্নি বললেন, 'আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ; এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয় আমি দগ্ধ করতে পারি।' ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করে তা দগ্ধ করতে বললেন। অগ্নি সর্বশক্তি দিয়েও তৃণটি দগ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে অবনতমস্তকে দেবগণের নিকট ফিরে এলেন। এবার ব্রহ্মসমীপে বায়ু গমন করলেন। ব্রহ্ম পূর্ববৎ তাঁর নাম ও শক্তি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, ইনি বায়ু এবং পৃথিবীর সব কিছুই উড়িয়ে নিতে সমর্থ। ব্রহ্ম একখণ্ড তৃণ বায়ুর সম্মুখে রাখলেন। কিন্তু বায়ু স্বশক্তি-প্রভাবে তা ওড়াতে না পেরে লজ্জিত বদনে সরে পড়লেন। অনন্তর ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রহ্মের সমীপে উপস্থিত হওয়া মাত্র সেই জ্যোতি অন্তর্হিত হলেন এবং সেখানে আকাশে ইন্দ্র হৈমবতী উমাকে দর্শন করলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলেন যে, ব্রহ্মের শক্তিতেই দেবতাগণ শক্তিশালী হয়ে সংগ্রামে অসুরবিজয়ী হয়েছেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গার এই গায়ত্রীটি আছে—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে। কন্যাকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ' (১০।১।৭)। সায়নাচার্যের ভাষ্যমতে দুর্গি ও দুর্গা অভিন্ন।

মহাভারতের নানা স্থানে উমা ও পার্বতীর কথা আছে, দক্ষযজ্ঞের কাহিনী আছে। তাছাড়া যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের দুর্গাস্তব আছে। বিরাটনগরে যাবার পথে যুধিষ্ঠির অন্যান্য পাণ্ডবগণকে নিয়ে দুর্গাদেবীর স্তব করেন—'বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ। অস্তুবন্মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্॥ যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্। নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্॥' কংস-নিধনের জন্য ভগবান দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। কংস পূর্বেই দৈববাণীতে একথা টের পেয়েছিলেন এবং জেনেছিলেন যে, ঐ সন্তানই তাঁকে হত্যা করবে। তাই বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করে রাখেন, এবং এক-একটি করে সন্তান জন্মাবার পর-ই তার পায়ে ধরে একটা শিলাখণ্ডে আছড়ে মেরে ফেলতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব তাঁকে নন্দালয়ে রেখে আসেন। নন্দ ও যশোদার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না; কিন্তু যে-রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাত্রেই যশোদার গর্ভে মহামায়া কন্যাসন্তান-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব দৈবনির্দেশিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার কাছে রেখে কন্যাটিকে নিয়ে কারাগারে ফেরেন। কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে জেনে কারাগারে এসে ঐ কন্যাটিকে নিয়ে শিলাতলে যখন আছড়ে মারতে যান, তখন কন্যারূপিণী মহামায়া নিজমূর্তি ধারণ ক'রে আকাশে বিলীন হন। যুধিষ্ঠির সেই 'শিলাতটবিনিক্ষিপ্তা' 'আকাশং প্রতিগামিনী' 'বাসুদেবস্য ভগিনী' 'খড্গখেটকধারিণী' দুর্গার স্তব করেছিলেন। এই মহামায়াই যে মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গা, সেকথাও যুধিষ্ঠির স্তবেই বলেছেন: "ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনী। প্রসন্না মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব॥"

অর্জুন দুর্গার স্তব করেন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে, কুরুক্ষেত্রে রণ আরম্ভের পূর্বে, বিজয়ের জন্য মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রে—"স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা। জয়ো ভবতু মে নিত্যং তৎপ্রসাদাৎ রণাজিরে।"—মা! আমি শুদ্ধ হৃদয়ে তোমার স্তব করছি, তোমার

কৃপায় যুদ্ধে আমার যেন নিত্য জয় হয়।

কৃত্তিবাস-কৃত বাংলা রামায়ণে আছে, রাম ও রাবণ উভয়েই দেবীভক্ত ছিলেন। অবশ্য বাল্মীকি-রামায়ণে একথার উল্লেখ নেই। দুর্গাপূজার মন্ত্রেও দেখা যায়, 'রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে বোধিতা দেবী…।' শারদীয়া পূজা কৃত্তিবাসের কল্পিত নয়, বহুকাল থেকেই বাংলা দেশে এই প্রবাদ প্রচলিত। কাহারো মতে দেবীভাগবত পুরাণ থেকে এই আখ্যান কৃত্তিবাস গ্রহণ করেছেন। প্রবাদ অনুসারে রামই শরৎকালে দেবীর অকাল বোধন করেন রাবণবধের জন্য। রাবণ ও মেঘনাদ উভয়েই দেবীর আরাধনা করতেন। রামের আরাধনায় প্রীতা হয়ে দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করেন। এই মতানুসারে বাসন্তীপূজাই প্রকৃত দেবীপূজা। কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতে শরৎকালেই সুরথ ও সমাধি দেবীপূজা করেন। দেবীভাগবতের মতে শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি। সে যাই হোক, রামচন্দ্র ১০৮ পদ্ম দ্বারা দেবী-পূজার সংকল্প করেন। আবশ্যকীয় পদ্ম সংগ্রহ করা হল। দেবী রামচন্দ্রের ভক্তি পরীক্ষা করার জন্য ছলনা করলেন, একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখলেন। পূজার সময় একটি পদ্মের অভাব হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র প্রমাদ গণলেন। পূজা পূর্ণাঙ্গ না হ'লে দেবী সন্তুষ্ট হবেন না; সংকল্পও সিদ্ধ হবে না। রাম পদ্মপলাশলোচন নামে অভিহিত। সেজন্য তিনি স্থির করলেন নিজের একটি চক্ষু উৎপাটিত করে পদ্মরূপে মায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি দেবেন। রামচন্দ্র ধনুর্বাণ-হস্তে চক্ষু উৎপাটন করবার উপক্রম করতেই দেবী আবির্ভূ'তা হয়ে তাঁকে অভীষ্ট বর প্রদান করলেন।

সুরথ রাজা কখন থেকে দেবীপূজা প্রবর্তন করলেন, তা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে নিম্নোক্ত ভাবে পাওয়া যায়:

পুরাকালে সুরথ নামে এক রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে আপন সন্তানজ্ঞানে প্রতিপালন করতেন। সে-সময়ে কোলাবিধ্বংসী (দেবী-ভাষ্যমতে কাশ্মীর-প্রান্তদেশস্থ যবন রাজগণ) তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে যুদ্ধ করলেন। সুরথ রাজা অধিকসংখ্যক সৈন্য নিয়েও যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্বীয় রাজধানীতে ফিরে এসে স্বদেশের অধিপতি হয়ে রইলেন। তারপর রাজধানীতে দুষ্ট অমাত্যগণ অধুনা বলহীন রাজার ধনভাণ্ডার ও সৈন্যাদি অধিকার করে নিল, রাজা রাজত্ব হারিয়ে মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বারোহণে গভীর অরণ্যে গমন করলেন। সেই বনে তিনি শান্তভাবাপন্ন হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ ও শিষ্যশোভিত দ্বিজবর মেধা মুনির আশ্রম দেখতে পেলেন। সেই মুনি কর্তৃক সমাদৃত হয়ে মুনির আশ্রমে কিছু-কাল অতিবাহিত করলেন। কিন্তু এমন স্থানে থেকেও সুরথ রাজার মনে শান্তি নেই। রাজ্যচিন্তা মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এত সাধের রাজ্যখানি আজ পরপদানত! এত আদরের প্রজারা আজ নিপীড়িত! সযত্নে রক্ষিত কোষের ধন আজ অপব্যয়িত! ইত্যাদি। তারপর সেই আশ্রমে এলেন বৈশ্য সমাধি। সমাধির প্রথমেই সুরথ রাজার সহিত সাক্ষাৎ। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ভদ্র, আপনি কে, এখানে আসার কারণ কি, কেনই বা আপনাকে শোকাকুল ও দুর্মনা দেখা যাচ্ছে?' বৈশ্য সবিনয়ে আপন পরিচয় দিয়ে বললেন যে তাঁর অসাধু স্ত্রীপুত্রগণ ধনলোভে তাঁর সব সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাঁকেও পরিত্যাগ করেছে। অথচ কি আশ্চর্য, বনবাসী হয়েও

সেই স্ত্রীপুত্রের জন্য তিনি চিন্তাকুল। রাজা বললেন, 'সত্যই আশ্চর্য! যারা ধনলোভে আপনাকে পরিত্যাগ করেছে তাদের প্রতি আপনার চিত্ত স্নেহাসক্ত কেন? তারপর উভয়ে মেধা মুনির সমীপে উপস্থিত হয়ে যথারীতি সম্ভাষণ পূর্বক সুরথ মুনিকে বললেন, 'আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহপূর্বক তার উত্তর দিন। আমার চিত্ত আমার বশীভূত নয়—মমতাই আমার দুঃখের কারণ—একথা জেনেও অজ্ঞের ন্যায় মমতান্ধ হয়ে আছি—এর কারণ কি? আর এই বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রগণ কর্তৃক বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হয়েও তাদের প্রতি অতিশয় আসক্তই বা কেন?' মুনিবর বললেন, 'সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। অতএব এ বিষয়ে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। মহামায়া সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেছে; তিনি প্রসন্না হলে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন।'

'সেই মহামায়া নিত্যা (জন্মমৃত্যুরহিত,) আবার এই জগৎ প্রপঞ্চই তাঁর বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপী এবং নিত্যা হলেও তাঁর বহু-প্রকার আবির্ভাবের বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন।' তারপর তিনি দেবীকর্তৃক মধুকৈটভবধ, শুম্ভ-নিশুম্ভবধ, চণ্ডমুণ্ডবধ, রক্তবীজবধ প্রভৃতি বর্ণনা করলেন।

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥' অর্থাৎ যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবে জগতে বিঘ্ন উপস্থিত হবে, তখনই আমি আভির্ভূতা হয়ে তাদের বধ করবো। সর্বার্থসাধক দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করে মুনি বললেন, 'দেবী ঈদৃশ প্রভাবান্বিতা; তিনিই এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, আবার তিনিই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে ও অন্যান্য বহুজনকে মোহাচ্ছন্ন করেছেন। সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও।' তখন রাজা সুরথ এবং সমাধি মেধাঋষির উপদেশ শ্রবণ করে তাঁহাকে প্রণতিপূর্বক সেইক্ষণই দেবীর আরাধনার্থ গমন করলেন।

সুরথ ও সমাধি দু'জনে নদীতটে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করলেন। কখনো নিরাহারী, কখনো অল্পাহারী হয়ে তিন বৎসর সংযতচিত্তে আরাধনার ফলে জগদম্বা চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের দেখা দিলেন এবং দুজনকেই বর প্রদান করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনন-গ্রন্থ 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসচিন্তায় যে স্পেন্সারের সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসচেতনার প্রভাব রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ইতিহাসের পরিমাপক হিসাবে 'সাধারণ প্রজা' বা সাধারণ মানুষের কথা স্বামীজী যেমন ভেবেছেন, তেমনি তাঁর বিশ্লেষণে প্রাধান্য পেয়েছে ভারতীয় ভাবাদর্শে ধর্মচেতনার প্রাধান্যের কথা। এক হিসাবে ভারত-ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ঐতিহাসিক বিবর্তনেরই বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে ভারতের ধর্মান্দোলনসমূহের ইতিহাসকে বিন্যস্ত করা চলে। 'বর্তমান ভারতে' সে-কথাই মনে করিয়ে দিয়ে স্বামীজী লিখেছেন—'চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্মুখে ফেনিল, বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।'[১]

এদিক থেকে কার্ল মার্কসের দৃষ্টিতে খৃষ্ট-ধর্মের ইতিহাস-বিশ্লেষণও স্মরণীয়। খৃষ্ট-ধর্মকে মার্কস্ সেকালের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিবাদের প্রকাশরূপে দেখেছেন। ভারতবর্ষে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মহাবীর বা বুদ্ধদেবের প্রচেষ্টা; বৌদ্ধ অবক্ষয়ের প্রতিবাদে শঙ্কর, রামানুজের আবির্ভাব; হিন্দুমুসলমান-সংস্কৃতির বিরোধনিরসনকল্পে কবীর, নানক, চৈতন্য; এবং ইংরেজ আগমনে পাশ্চাত্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ প্রভৃতির ভূমিকা স্মরণীয়।

মোটের উপর ধর্ম ও সমাজচেতনার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্বামীজীও স্বীকার করেছেন। কিন্তু মার্কসের মতো মানবমনের বিবর্তনে অর্থনৈতিক তত্ত্বকেই প্রাধান্য[২] না দিয়ে মানব-চৈতন্যের মূলে অধ্যাত্মচেতনার গভীরতর প্রভাবকে লক্ষ্য করেছেন। মার্কস্ ধর্মকে অনাবশ্যক জ্ঞানে পরিহার করেছেন, স্বামীজী ভারতের তথা জগতের ইতিহাসে ধর্মের অত্যাবশ্যক ভূমিকাটি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কার ও সাধক-মহাপুরুষদের প্রেরণার মূলে যেমন অধ্যাত্ম-প্রেরণা কার্যকরী, তেমনি সমাজের সাধারণ-মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও আদর্শের সংগ্রামও এই ধর্মীয় আন্দোলনকে অবলম্বন করেই রূপায়িত। ইতিহাসচেতনার এই তত্ত্বটি স্পেন্সারের চিন্তায়ও অবহেলিত। এই ধর্ম-চেতনার সঙ্গে ইতিহাসের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনাকালেই স্বামীজীর দৃষ্টিতে ধর্মান্দোলন ও গণচেতনার নিগূঢ় ঐক্য ধরা পড়েছে। ধর্মতন্ত্র বা রাজতন্ত্র কোনোটিই স্বয়ম্ভূ নয়, এদের মূলে রয়েছে সাধারণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা। নৃপতি-কেন্দ্রিক ইতিহাসের কথা মনে রেখেই স্পেন্সার তাঁর সমকালীন ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস রচনাপদ্ধতি

১ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড : বর্তমান ভারত : পৃঃ ২৩৭

২ On Religion : Marx and Engels দ্রষ্টব্য

সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তাঁর বক্তব্য—"That which constitutes History, properly so called, is in great part omitted from works on this subject. Only of late years have historians commenced, giving us, in any considerable quantity, the truly vulnerable information. As in past ages the king was everything and the people nothing; so in past histories the doings of the king fill the entire picture, to which the national life forms but an obscure background; while only now, when the welfare of nations rather than of rulers is becoming the dominant idea, are historians beginning to occupy themselves with the phenomena of social progress. The thing it really concerns us to know, is the national history of society."[৩]

'শিক্ষা'-গ্রন্থে স্বামীজীর অনুবাদ—"যথার্থ ইতিহাস অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকেই পাওয়া যায়। পূর্বে প্রজারা রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে অতি অল্পই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত, অতএব ঐতিহাসিকেরা তাহাদের প্রায় কোন প্রসঙ্গই করিতেন না। আধুনিক প্রজাদের ক্ষমতা দিন দিন পরিবর্ধিত হইতেছে। লোকে প্রজারাই রাজ্যের সর্বস্ব, এ কথা ক্রমে বুঝিতেছে, সুতরাং আধুনিক ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে তাহারা স্থান পাইতেছে। বাস্তবিক ইতিহাস সমাজের জীবনবৃত্তান্ত।"[৪]

তরুণ মননে ইতিহাসপাঠের প্রণালী সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ যে-ধারণা করেছিলেন, 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাস-বিশ্লেষণ তার অনুগামী। 'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩০৫-৬) ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে স্বামীজীর প্রথম ধারাবাহিক রচনা 'বর্তমান ভারত' প্রকাশিত হতে থাকে। হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education' -এর অনুবাদকাল যদি ১৮৮৪-৮৫ হয়ে থাকে তাহলে প্রায় পনেরো-ষোলো বছর পরে সমাজ-চেতনার আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা দেখা দিল 'বর্তমান ভারতে'র পৃষ্ঠায়।

'বর্তমান ভারতে'র আগে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২)। ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার মানদণ্ডে ভারতের সমাজ-ইতিহাস এবং তুলনামূলক ভাবে বিশ্বসভ্যতার আলোচনার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি স্বামীজী পড়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর মিল ও অমিল দুই-ই আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা স্বামীজী যেভাবে সাধারণ মানুষের জীবনস্রোতকে লক্ষ্য করে ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, ভূদেবের চিন্তায় সে-জাতীয় কোনো দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নেই। অথচ আধুনিক কালের ইতিহাসচেতনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীই সর্বাধিক স্বীকৃত।

'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাস-বিশ্লেষণের সূত্রপাত বৈদিক যুগ থেকে। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের সাধারণ প্রজার অবস্থা বর্ণনা করে স্বামীজী লিখেছেন—"রাজ্যরক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিত-কুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন। বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।

---

৩ Education : Spencer : 1st Edn. p 34.

৪ শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত : শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ, পৃ: ৩২

"কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায় প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই—হিন্দুজগতেও নাই, বৌদ্ধজগতেও তদ্রূপ। যদিও যুধিষ্ঠির বারণাবতে বৈশ্য-শূদ্রেরও গৃহে পদার্পণ করিতেছেন, প্রজারা রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে রাজ্যের প্রথাস্বরূপ, প্রজাদের কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে-শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; সে-কৌশলেরও সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে"।[৫]

'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসচেতনায় স্বামীজী ভারতীয় সভ্যতার চারটি স্তর-বিশ্লেষণ করেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের আগে প্রধানতঃ 'ব্রাহ্মণ'-যুগ--পুরোহিতপ্রাধান্যের যুগ। বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য। ইংরেজ আমল মূলতঃ বৈশ্য যুগ। ইংরেজ আমলেই স্বামীজীর দৃষ্টিতে বৈশ্যশক্তির শোষণকারী রূপটি ধরা পড়েছে এবং তিনি নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে 'শূদ্রত্বসহিত শূদ্রপ্রাধান্যের' সময় আসন্ন মনে করেছেন। শুধু ভারতের ইতিহাস নয়, মোটামুটিভাবে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসকে স্বামীজী এই ভাবে চারটি ক্রম-পরম্পরায় যুগ-বিভাগে বিন্যস্ত করেছেন।[৬]

ভারতবর্ষের ইতিহাসই যেহেতু স্বামীজীর লক্ষ্য, সেহেতু ভারতীয় সমাজের যারা ধারক ও বাহক তাদের ক্রম-অভ্যুত্থানের কথাই স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় বিভিন্ন যুগের বিশ্লেষণে প্রাধান্য পেয়েছে। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের প্রজাশক্তি তখনও আপন নিহিত বলের সন্ধান পায়নি। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও তিনি দেখিয়েছেন--প্রথমতঃ গ্রামীণ সভ্যতার পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্ঘে ও সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সভ্যদের সকলের অভিমতের গুরুত্বদানের উদাহরণ। কিন্তু পঞ্চায়েতী স্বায়ত্তশাসন কখনো রাজশক্তির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি বলে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তার যতই কার্যকারিতা থাক, রাজ্যশাসনে তার প্রভাব কিছুই ছিল না। অপরপক্ষে সন্ন্যাসীরা নিজেদের মধ্যে যে ব্যবস্থাই করুন, সাধারণ সমাজব্যবস্থায় সেই স্বায়ত্তশাসনের কোনো প্রভাব ছিল না।

ক্ষত্রিয় বা রাজশক্তির সর্বব্যাপী প্রভাবের যুগে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের পুরো দায়িত্ব রাজার। কিন্তু এমন সর্বগ্রাসী ক্ষমতার ফলে প্রজাদের রক্ষা সত্যি সত্যি কতটা হয়, সন্দেহের বিষয়। যুধিষ্ঠির, অশোক বা আকবরের মতো রাজা কোনো দেশেই বেশী দেখা যায় না। প্রজাকে আত্মশাসনে স্বনির্ভর করে তোলাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজশাসনের কালে তা হয়ে ওঠা দুষ্কর। স্বামীজীর মতে—"সমাজ—গৃহের সমষ্টি মাত্র। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' যদি প্রতি পিতার

---

৫ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ২২২-২২৩

৬ "...পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।"—বর্তমান ভারত : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ২২৯। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, এ লেখার বছর চারেক আগে ১৮৯৬-এর ১লা নভেম্বর মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী প্রথম বিশ্বসভ্যতার যুগবিভাগ করেন। "Human society is in turn governed by the four castes—the priests, the soldiers, the traders and the labourers." 'বর্তমান ভারতে'র বীজ এই পত্রটিতেই অঙ্কুরিত। Complete Works of S. Vivekananda: Vol VI: Page 381-382; Centenary Edn.

পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজ-শিশু কি সে ষোড়শবর্ষে কখনই প্রাপ্ত হয় না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান্ শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।"[৭]

ভারতবর্ষের সমাজচেতনায় এ-জাতীয় বিপ্লব দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকেন্দ্র যেমন নৈমিষারণ্যে, কাশীতে, মিথিলায়, তক্ষশীলায়, নালন্দায়, বিক্রমশীলায়, নবদ্বীপে ছিল, তেমনি ভারতের সমাজচেতনার স্ফুরণ ঘটেছে জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও পথের সাধকবৃন্দের প্রচেষ্টায়।[৮] অন্যান্য দেশে যা রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা সাধিত হয়েছে, ভারতের তা হয়েছে ধর্মান্দোলনের দ্বারা। ধর্মচেতনাই এদেশে গণচেতনার অভিব্যক্তি।

বহিরাগত ধর্মান্দোলনের মধ্যে ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মও এদেশের ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে ভারতের সাধারণ মানুষের সামাজিক অধিকারলাভের প্রচেষ্টাকে অন্যদিক থেকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু সাধারণভাবে ভারতে সনাতনধর্মের মধ্যেই যাবতীয় মত ও পন্থার মিলন ও সমীকরণ ঘটেছে। আধুনিকতম কালে ভারতীয় গণচেতনা ও ধর্মচেতনার মিলিত উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

"চার্বাক, জৈন" থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের "ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ" প্রভৃতির কথা উল্লেখ করলেও স্বামীজী স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতঃই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামোল্লেখ করেননি। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ধর্মান্দোলনের গণচেতনাময় ইতিহাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনেও লক্ষণীয়।

[ক্রমশঃ]

৭ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ২৩৭

৮ বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা : শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন।

ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ২ ॥

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে চিকাগো প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। মে মাস পর্যন্ত সাধারণভাবে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় চিকাগো প্রদর্শনীর সংবাদের প্রাধান্য ছিল। তারপর থেকে ঐ প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মমহাসভা সংবাদপত্রে অধিক স্থানলাভ করতে থাকে। পাঠকদের স্মরণ আছে, স্বামীজী ৩১শে মে ভারতত্যাগ করে যান, এবং তার পরেই ধর্মমহাসভার পরিকল্পনাদির বিস্তারিত রূপ জনসাধারণ জানতে পারে। ভারতীয় জনসাধারণ যে, ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে যাবে, ভারতত্যাগের পূর্বে স্বামীজীর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। ধর্মমহাসভা হয়ে যাবার পরে এক চিঠিতে তাই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছিলেন— দেখছি, এখানকার সব সংবাদ ভারতে পৌঁছে গেছে, ইত্যাদি।

এখন আমরা ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সে বিষয়ে সংবাদ কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু ইতিহাস সন্ধান করব। ভারতীয় প্রতিনিধিদের আমেরিকাযাত্রা, এবং তাঁদের প্রাথমিক সংবর্ধনা প্রভৃতি বিষয়েও কিছু কৌতূহলজনক তথ্য এই সূত্রে পেয়ে গিয়েছি।

যতদূর দেখা যাচ্ছে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি' (Printed Circular) মারফত ভারতের সর্বত্র ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা হয়। তার আগে থেকেই বিভিন্ন প্রতিনিধির সঙ্গে ধর্মসভাসমূহের সাধারণ সমিতির সভাপতি (Chairman, Genl. Com. on Rel Congress) ডাঃ জন হেনরি বারোজ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে মহাবোধি সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত 'মহাবোধি সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী' এইচ. ধর্মপালকে লিখিত ডাঃ বারোজের চিঠি থেকে এই-জাতীয় যোগাযোগের চেহারা দেখতে পাই। ডাঃ বারোজ ২৫ নভেম্বর, ১৮৯২ তারিখে লিখেছিলেন:[১]

"প্রিয় ভ্রাতা,...ধর্মমহাসভায় সাহায্যের যে সব প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি, তাতে আমরা খুবই উৎসাহিত। দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধ মঠের প্রতিনিধির নাম আমাদের কাছে শীঘ্রই পাঠাবেন বলে আশা করি। আপনার প্রেরিত ৬ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র চিকাগোর ইউনিটেরিয়ান পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।"

এর পরে এপ্রিল মাসে মহাবোধি জার্নালে এবং 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টারে' (এবং নিশ্চয় অন্য সংবাদপত্রেও) ধর্মমহাসভার প্রস্তাবিত কার্যসূচী প্রকাশিত হল। ৯ই এপ্রিল মিনিস্টারে প্রকাশিত কার্যসূচীই অধিক বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হয় মহাবোধিতে

১ "My dear brother, . . . we are greatly encouraged by the promise of help we are getting for the Parliament of Religions. We hope that you will soon send to us the name of the delegate from the Southern Church of Buddhism. Your letter of September 6th has been published in the Unitarian paper of Chicago".

অগস্ট সংখ্যায় :[২]

"ডক্টর বারোজ বলেন, ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠানসূচী খুব খেটে, খুব মনোযোগ দিয়ে করা হয়েছে ; বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ প্রায় একশো জন পণ্ডিতকে দিয়ে এর দোষগুণ বিচার করিয়ে নেয়া হয়েছে। এই সূচীতে নিম্নোক্ত সাধারণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত : ঈশ্বর ; মানুষ ; ধর্ম—মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্কের অভিব্যক্তি ; বিভিন্ন ধর্মমত ; জগতের শাস্ত্রগ্রন্থচয় ; পাপ সম্বন্ধে বিশ্বজনীন ধারণা ; অবতারবাদ ; পতিত ও পাপীদের উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ; মানবজাতির ধর্মনেতাগণ ; বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সহিত ধর্মের সম্পর্ক ; ধর্ম ও নীতি ; ধর্ম ও পারিবারিক ধর্ম এবং নারী ; ধর্ম ও দরিদ্র, পথভ্রষ্ট এবং অপরাধী ; ধর্ম ও সভ্যসমাজ এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব ; ইংরেজী ভাষাভাষী জাতিগুলির ধর্মবিষয়ে মনোভাব ; ধর্মের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী ; এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার কাছে ধর্মবিষয়ে জগতের ঋণ ; বিভিন্ন দেশের খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের পুনর্মিলন ; সমগ্র মানবপরিবারের ধর্মীয় মহামিলন ; সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মের সার কথা ; চরম ধর্মের বৈশিষ্ট্য।"

ঐ একই সংখ্যায় ডা: বারোজের একটি প্রবন্ধের অংশ উদ্ধৃত হয়েছিল :[৩]

---

২ "'The programme of the Religious Parliament'—says Dr. Barrows, 'has been elaborated with much care, and with the criticism of nearly a hundred experts in Science, Philosophy, Ethics and Divinity. It covers such general things as God, Man, Religion as the Expression of Man's Relation to God, systems of Religion, the Sacred Books of the World, the Universal Sense of Sin, the Incarnation Idea, different schemes for the restoration of fallen or faulty Man, the Religious leaders of Mankind, Religion in its Relations to Science, Art and letters, Religions and Morals, Religion and the family Religion, and Women. Religion and the Poor, the Erring and Criminal, Religion and Civil Society, the fraternity of Peoples, the religious Notion of the English speaking Nations, the present outlook of Religion, the world's Religious debt to Asia, Europe and America, the Religious Reunion of Christiandom, the Religious Union of the whole Human family, the elements of a perfect Religion, the characteristic of the Ultimate Religion".

৩ "In the April number of the Review of Reviews (American edition) an explanatory article on the World's First Parliament of Religions, from the pen of Dr. John Henry Barrows, D.D., Chairman of the General Committee on Religious Congresses, appears. He writes —Side by side with the meetings in the stately Art Palace of the Parliament, which opens on Monday, September 11th, and continues for seventeen days, there will be the presentation, by different religious bodies, of their history and distinctive doctrines, and more than twenty of the leading Churches of Christiandom have already accepted invitations to make before the Parliament these presentations . . . It is safe to say that no opportunity comparable with this has been offered in any generation. It is hard to overestimate the educating and the liberalising influence of such gatherings. Most people know of other Churches and Faiths only through the representations of their own Church and Faith. So soon as we begin to know other Faiths truly, that is, at first hand, we in some measure, modify our views of them, our spiritual attitudes towards them, and thus truth promotes brotherhood'."

"'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকায় (আমেরিকা সংস্করণ) ধর্মসভাগুলির সাধারণ সমিতির চেয়ারম্যান ডক্টর জন হেনরি বারোজ, ডি. ডি.-র লেখা জগতের প্রথম ধর্মমহাসভার একটি ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন: মহাসভার প্রাসাদোপম 'আর্ট প্যালেস'-এ ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে সভাগুলির উদ্বোধন হবে এবং ১৭ দিন চলবে; সেখানে একই সঙ্গে পাশাপাশি অনুষ্ঠিত সভাগুলিতে বিভিন্ন ধর্মসংস্থা কর্তৃক তাঁদের ইতিহাস ও বিশিষ্ট মতবাদগুলিও উপস্থাপিত করা হবে। ইতিমধ্যেই খৃষ্টান-জগতের প্রধান ধর্মসংস্থাগুলির মধ্যে কুড়িটিরও বেশী সংস্থা মহাসভায় তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।···এটুকু নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যায় যে, এর আগে কোন যুগেই এর তুল্য সুযোগ আর কখনো আসেনি। শিক্ষা ও উদারতাসঞ্চারের দিক থেকে এ-ধরনের সমাবেশের প্রভাব যে কতখানি, তা আন্দাজে ধরা কঠিন। অপর সম্প্রদায় ও ধর্মমতগুলি সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেরই জ্ঞান হল তাদের নিজের ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলিকে যেভাবে দেখা যায়, তাদের নিজের যাজকসম্প্রদায় সেগুলিকে যেভাবে উপস্থাপিত করেন, তারই মাধ্যমে আহৃত। অপর ধর্মমত সম্বন্ধে সঠিকভাবে, অর্থাৎ সেই সব ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে সোজাসুজি জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে সব ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেগুলির প্রতি আমাদের আধ্যাত্মিক মনোভাব কিছুটা পালটে যাবেই; আর এভাবে সে যথার্থ জ্ঞান ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়িয়ে তুলবে।"

ডাঃ বারোজ প্রথমশ্রেণীর সংগঠক তাতে সন্দেহ নেই। তিনি যথার্থই কর্মবীর। ধর্মমহাসভা সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র ও রচনাদিতে তিনি কতখানি উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, উপরে উদ্ধৃত অংশে তা যথেষ্ট দেখা যায়। ধর্মমহাসভার উপদেষ্টাসমিতির সদস্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারে নিকট প্রেরিত সার্কুলার চিঠিতে দেখতে পাই, ধর্মমহাসভায় যাতে সর্বধর্মের প্রতিনিধিত্ব যথার্থই ঘটে সে বিষয়ে ডাঃ বারোজ কতখানি সচেষ্ট ছিলেন। মিনিস্টারের ৩০ এপ্রিল, ১৮৯৩ সংখ্যায় ঐ সার্কুলার চিঠিটি ছাপা হয়েছিল:[৪]

৪ "The plan of holding a Parliament of Religions at which the representatives of the great historic Faiths shall sit together in frank and friendly conference over the great things of our common spiritual and moral life, is no longer a dream The religious world in its great branches will be represented in this truly ecumenical conference. There will be Buddhist scholars, both from Japan and India, and probably also from Siam One of the high priests of Shintoism is expected to be present. Two Moslem scholars, eminent in India, have accepted invitations The eloquent Mazumdar will speak for progressive Hindusim Arrangements are being made to secure papers from orthodox Hindus The Chinese Government has commissioned a scholar to present the Confucianism. It is expected that Parsis from Bombay will speak of their ancient faith Jewish Rabbis of Europe and America are in earnest sympathy with this movement. The interest in the Exposition and in this approaching Congress will draw to Chicago numerous representatives of the historic religions Leading Christian missionaries and native Christians of many lands will be present, including some of the foremost men of India. Prominent scholars in America, England and Germany have already accepted invitations to address the parliament. We are encouraged to hope that the Russian, Armenian, and Bulgarian Churches will have representation in the Parliament".

"মহান ঐতিহাসিক ধর্মগুলির প্রতিনিধিরা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে একসঙ্গে সভায় বসে আমাদের সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের প্রধান জিনিসগুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা ক'রবেন,—এমন একটি ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা এখন আর স্বপ্নের জিনিস নয়। এই যথার্থ'ই সার্বজনিক সভায় ধর্মজগতের প্রধান প্রধান বিভাগের প্রতিনিধিরা আসবেন। জাপান ও ভারত থেকে, এবং বোধ হয় শ্যাম থেকেও বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এখানে আসবেন। শিন্টো ধর্মের উচ্চপদস্থ পুরোহিতদেরও একজন আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ভারতের দুজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। বাগ্মী মজুমদার প্রগতিশীল হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধিরূপে বলবেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুদের কাছ থেকে লিখিত ভাষণ আনাব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কনফিউসিয়ান ধর্ম সম্বন্ধে বলার জন্য চীন সরকার একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে বোম্বাই থেকে পার্শীরা এসে তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন। ইউরোপ ও আমেরিকার ইহুদী রাব্বীদের (ব্যাখ্যাতা) আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে এই আন্দোলনটির প্রতি। প্রদর্শনীর এবং সামনের এই মহাসভাব প্রতি আকর্ষণ ঐতিহাসিক ধর্মগুলির অসংখ্য প্রতিনিধিকে চিকাগোয় নিয়ে আসবে। প্রসিদ্ধ খৃষ্টান মিশনারীরা এবং বহু অঞ্চলের দেশীয় খৃষ্টানরা এই সভায় উপস্থিত থাকবেন; ভারতের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে কয়েকজনও আছেন তার মধ্যে। আমেরিকা, ইউরোপ ও জার্মানীর বিশিষ্ট পণ্ডিতরা ইতিমধ্যেই মহাসভায় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। আমরা আশান্বিত হচ্ছি যে, মহাসভায় রাশিয়া, আমেরিকা এবং বুলগেরিয়ার খৃষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিও প্রতিনিধি পাঠাবেন।"

ডাঃ বারোজের দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনার সুষ্ঠুতা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মপালকে লেখা এক চিঠিতে। মহাবোধির মে সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়:[৫]

"আশা করি শিগ্‌গীর আপনার কাছ থেকে চিঠিব উত্তব পাবো এবং তাতে জানতে পারবো কি-ধারায় আপনি ভাষণ দেবেন। সার্বভৌম বৌদ্ধধর্ম মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে, মানবজীবনের কর্তব্য এবং চরমপরিণতি সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয় তা জানবার জন্য আমাদের যতটা আগ্রহ, উত্তর-ও দক্ষিণ-অঞ্চলের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পার্থক্য কি তা খুঁজে বেব করার আগ্রহ ততটা নেই। আশা করি

---

৫ "I hope to hear from you soon and learn along what line you are to speak It is not our desire so much to find out the distinctions between Northern and Southern Buddhism as to learn what universal Buddhism teaches of the great subjects of human life, duty and destiny I hope there will be enough Buddhists present at the Parliament to justify the holding of a Buddhists Conference in one of the smaller hall of the Art Palace where you may meet those who desire ampler information on the subjects to be treated. I think it would be an excellent thing to have choice passages from the Buddhist Scriptures read in English at some of the morning Conferences. I hope you will call upon Mr. Mazumdar and confer with him as to the time of his coming It would be very pleasant if all Indian Delegates could come from Liverpool to New York on the same Steamer In that I should be very glad to meet them, give them a personal welcome, and also provide for a cordial reception for them in New York City."

মহাসভায় যথেষ্টসংখ্যক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী উপস্থিত থাকবেন যাঁদের নিয়ে আর্ট প্যালেসের ছোট ঘরগুলির কোনটিতে একটি বৌদ্ধধর্মসভার অনুষ্ঠান অসঙ্গত হবে না; বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃততর সংবাদ যাঁরা জানতে চান, ইচ্ছে করলে আপনি তাঁদের কাছে সে সভায় এসব বিষয় আলোচনা করতে পারেন। আমার মনে হয়, বৌদ্ধশাস্ত্রের কয়েকটি বাছা বাছা উদ্ধৃতি ইংরেজী করে যদি পূর্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সভায় পাঠ করা হয়, তাহলে খুবই চমৎকার হবে। আশা করি মিঃ মজুমদারের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর আসার সময় সম্বন্ধে পরামর্শ করবেন। ভারতীয় প্রতিনিধিরা যদি সবাই একসঙ্গে লিভারপুল থেকে একই স্টীমারে নিউইয়র্ক আসতে পারেন, তাহলে খুবই সুখের বিষয় হবে। আমি তাহলে অতি আনন্দের সহিত স্টীমারে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে ব্যক্তিগত স্বাগত-সম্ভাষণ জানাতে পারি, নিউইয়র্ক শহরে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনার আয়োজনও করতে পারি।"

বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা, তার দ্বারা বিশ্ব-শান্তির পথ পরিষ্কার করার বিষয়ে ডাঃ বারোজের ব্যাকুল আগ্রহ এই সময়ে বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। মিনিস্টারের ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সংখ্যায় সে বিষয়ে লেখা হয়:[৬]

"একখানি সমসাময়িক পত্রিকা লিখছে: 'আচার্যস্থানীয় ধর্মযাজক এবং চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রেসিডেন্ট ডক্টর বারোজ আমাদের জানাচ্ছেন যে, আগামী ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য হল এইগুলি: তুলনামূলক ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করা; বিভিন্ন ধর্মগুলিকে পরস্পর-সন্নিহিত ও একত্র আলোচনারত করা; ভ্রাতৃত্ব-বোধের ভাবকে গভীরতর করা; প্রত্যেক ধর্মের বৈশিষ্ট্যমূলক সত্যকে সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করা; মানুষ কেন ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসী তা দেখানো; খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে, বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক জাতিগুলির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানের গহ্বর, তার ওপর সংযোগ-সেতু নির্মাণ করা; সব মানুষেরই যা সাধারণ উদ্দেশ্য, তা সফল করার জন্য সব সৎ লোককে কর্মে প্রবৃত্ত করানো, এবং আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের পথ প্রশস্ততর করা।" (ক্রমশঃ)

---

৬ "An English contemporary writes. "Dr. Barrows, a Presbyterian divine, and the President of the Parliament of Religions at Chicago, tells us that the object of the coming Parliament of Religions is to furnish a great school of comparative religions, to bring the different faiths into contact and conference, to deepen the spirit of brotherhood; to bring out the distinctive truth of each religion, to show why men believe in God, and in the future life; to bridge the chasms between Christians and different names and religious names of all names; to induce good men to work together for common ends, and to promote the cause of international peace"

প্রথম পরিচয় উদ্বোধনের সঙ্গে

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

প্রথম পরিচয় চিরকালই অপূর্ব। আকাঙ্ক্ষিত মানুষ-দেশ-বই—যে যাই হোক না—সমুদ্র, হিমালয়, কোনো মহাশিলা মন্দির কোনারকের মত, মহৎ ব্যক্তি, সাধুসন্ন্যাসী—সবই একটা অপূর্ব বিস্ময় আনন্দময় স্মৃতি হয়ে থাকে চিরকাল।

যদিও কোন্ বইটি সব আগে পড়েছি, কোন্ গলাটি সব আগে শুনেছি, কাকে কবে দেখেছি শৈশবে, তা মনে থাকে না কারুরই।

কিন্তু কবে প্রথম উদ্বোধন খুলে কোন্ গল্প খুঁজেছিলাম, তারিখ সাল মনে না থাকলেও সেই 'কবের' আনন্দটি মনে আছে।

বোধহয় আমাদের বাড়ীতেও উদ্বোধনের আবির্ভাব ১৩০৫ সালের মাঘমাসে। বাড়ীতে পাক্ষিক পত্র দেখেছি। আমাদের বয়স তখন ঠিক পাঁচ বছর। নিশ্চয় বর্ণপরিচয় হয়েছিল। হাতেখড়ি মেয়েদের না হলেও। সেকালে ছোটদের বিদ্যাসাগরী পাঠ্যপুস্তক বর্ণপরিচয় থেকে ১০।১১ বছর অবধি বোধোদয়, আখ্যান-মঞ্জরী অবধি পাঠ্যেই পড়াশোনা শেষ হত। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গেই ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবই-এর সঙ্গে থাকত একটি করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, একখানি স্তবস্তুতিসমন্বিত শিশুবোধক। কখনো কখনো মহাভারতের কাশীরাম দাস সংস্করণ। আমরা পেয়েছিলাম কালী সিংহের মহাভারতের মাসিক সংস্করণ। কাশীরাম দাস তখন দেখিনি। পড়তে লিখতে শিখেছি কিন্তু তখন।

এখনকার মত অনেক বই অসংখ্য মাসিক সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা সেকালে ছিল না। গোনাগাঁথা বঙ্কিমচন্দ্র, কয়েকখানি রবীন্দ্রনাথ, কিছু রমেশ দত্ত আমাদের পাঠ্য সম্বল বা সম্পদ। তাতেও কিঞ্চিৎ বিধিনিষেধ ছিল। তবে সাময়িক পত্র অনেক রকমের সেকালেও ছিল। সেই প্রবাসের রাজস্থানের বাড়ীতে সেগুলি কিছু নেওয়া হত। বঙ্গদর্শন, ভারতী, প্রচার, আর্যদর্পণ, জন্মভূমি, ধর্মতত্ত্ব, হিন্দু পত্রিকা, নব্যভারত ইত্যাদি তাদের কিছুর নাম। ও বইগুলো কবে থেকে ও কেন নেওয়া হয়েছে জানি না আমি। আসলে মনে হয় সেকালে প্রবাসী বাঙালীজীবনে মাতৃভাষার সান্নিধ্য দিয়েই তাঁরা দেশের অন্তরের সান্নিধ্য পেতেন।

কিন্তু উদ্বোধন প্রথম সংখ্যা থেকেই এলো কেন বাড়ীতে—দূর প্রবাসে—তা এখন মনে প্রশ্ন জাগে।

* *

মনে হয় ১৮৯১।৯২ সালে যখন স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত ভারত ভ্রমণ করছিলেন ছদ্ম নামে, সচ্চিদানন্দ ও বিবিদিষানন্দ নামের আড়ালে আত্মগোপন করে রাজস্থান আলো-য়ার উদয়পুর ইন্দোর আবু পাহাড় (যেখানে ক্ষেত্রীর দেওয়ান জগমোহনজীর সঙ্গে পরিচয়) ঘুরছিলেন, তখন গুজরাট কাথিয়া-ওয়াড় ও অন্য নানা স্থানের সঙ্গে জয়পুরেও আসেন। শোনা যায় মাস কয়েক থেকে এক পণ্ডিতের কাছে পাতঞ্জলদর্শন পড়েন।

তখনকার দিনে বাঙালী পথিক, পর্যটন-বিলাসী, তীর্থযাত্রী প্রায় সকলেই প্রবাসী

বাঙালীদের বাড়ীতে আতিথ্য নিতেন। জয়পুরে সে সময়েও কিছু বাঙালী ছিলেন। এক পিসিমার মুখে জিজ্ঞাসা করে কতকাল পরে এই গল্প শুনি—(স্বামীজীর শতবার্ষিকীর সময়ে)—তিনি তখন ৭।৮ বছরের বালিকা — বাইরের দালানে খেলা করছিলেন,—একজন সন্ন্যাসী এসে বললেন, 'খুকি, তোমার মাকে গিয়ে বল একজন অতিথি এসেছেন।'

সেই অশীতিপর পিসিমা এতকাল পরে বললেন সেই বিবেকানন্দ-দর্শনের কথা। এবং বললেন দিন-তিনচার সম্ভবতঃ স্বামীজী ঐ বাড়ীতে বাইরের চারচালা একখানি ঘরে ছিলেন। তখন মেয়েরা পর্দানশীন ছিলেন। গভীর রাত্রে তাঁর গানের সুর তাঁরা শুনেছেন। গানের কথা পিসিমা জননীর মুখে শুনেছেন "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।" আরো হয়ত। পরেও শুনেছেন ; ক্ষেত্রী ফেরত, আবার কোনো সময় অন্যত্র অতিথি, রাজ-অতিথি তখন।

এই সব ঘটনা ও কাহিনীর আশ্চর্য দিক হল এই যে, অত বড একটি বিরাট আশ্চর্য মানুষের কথা আমাদের কাছে তখন বা পরেও কখনো পৌঁছয়নি। গুরুজনরা পিতা পিতামহ পিতামহী কেউই গল্প করেননি। মাত্র একবার একদিন পিতার কাছে স্বামীজীর কাছে শোনা একটি ভৌতিক কাহিনীর কথা শুনি। আর শতবার্ষিকীর সময়ে শুনেছি জিজ্ঞাসা করে মা এবং পিসিমার কাছে স্বামীজীর গানের কথা। সেকথা স্বামীজীর শতবার্ষিকী উদ্বোধনে একটু বলেছিলাম। যদিও জানবার ও বলবার মত কথা কত ছিল আরো, কেউ সংগ্রহ করে রাখেননি। কৌতূহলও ছিল না কি সেকালে মানুষের?

কিন্তু স্বামীজীর ১৮৯৩ সালে সেপ্টেম্বরে আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভার ভাষণ বা বক্তৃতা প্রচারের পর তিনি আর স্বদেশে বা বিদেশে কোনখানেই অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। যেন অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মেঘ ভেদ করে এই বীর সন্ন্যাসীর কীর্তির মহাসূর্যোদয় হয়ে গিয়েছিল।

বাড়ীর পুরুষরা নিশ্চয় সে সব কথা পড়েছিলেন। বাড়ীর মেয়েরাও তখন কাগজে পড়তেন। গভীর লেখাও পড়তেন পরে বাড়ীতে দেখেছি। কিন্তু বিশেষ কোনো আলোচনা আমাদের কানে পৌঁছয়নি।

এই সময়ে পিতা ১৮৯৮-৯৯ সালে কিছু দিন কিষণগড় রাজ্যে একটি কাজ নিয়েছিলেন। এবং তখনই স্বামী কল্যাণানন্দজীও কিষণগড় রাজ্যে বেশ কিছুকাল ছিলেন শুনেছি। সেবারে কিষণগড়ে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। মনে হয় তারি কোনো সেবাকর্মভার নিয়ে তিনি ছিলেন। পিতা খুব শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে, প্রভাবিতও হয়েছিলেন। পরে কাকার কাছে শুনেছি। আমি নিজে তখন বছর ছয় সাত বয়সের। পিতার সঙ্গে টাঙ্গায় চড়ে কোনো কোনো জায়গায় গিয়েছি। হয়ত স্বামী কল্যাণানন্দজীকেও কখনো দর্শন করে থাকব। তখন স্বামী বিবেকানন্দ জগদ্বিখ্যাত। কাশ্মীর পাঞ্জাব রাজস্থান আবার ভ্রমণ করছেন বিদেশিনী শিষ্যা বন্ধুদের নিয়ে। ক্ষেত্রীতেও জয়পুরেও এনেছিলেন বোধহয়।

সেই সময়ের একটি উক্তি পড়ি তাঁর জীবন-কথায় ইহা "অবস্থা পূজ্যতে রাজন্"—! ৯।১০ বছর আগের কৃচ্ছ্র সন্ন্যাসজীবন, ভিক্ষান্নে, অনাহারে, অর্ধাশনে ভ্রমণ ও পথচারণের কথা স্মরণে পরবর্তীকালের সমাদর ও সম্মানে

বলা। তারপরই ১৮৯৯ সালে জানুয়ারীতে, ১৩০৫ মাঘ মাসে উদ্বোধনের আবির্ভাব।

মনে জিজ্ঞাসা জাগে, বাড়ীতে কবে এলো? প্রথম সংখ্যা পড়ার ও মনে রাখার বয়স নয় আমার (কিন্তু বাঁধানো প্রথম বর্ষ যেন ছিল), মাত্র পাঁচ বছর বয়স। মোট কথা স্বামী বিবেকানন্দের অখ্যাত দিনের জয়পুরে আতিথ্য-গ্রহণের পরে পৃথিবীখ্যাত দিনের এবং স্বামী কল্যাণানন্দজীব সান্নিধ্যই হলো এই উদ্বোধনের জয়পুরে 'আগমনী' কথা। কিন্তু পড়ার গোড়ার কথা বলি। ধর্মপুস্তক পড়ার বয়স তো তখন নয়। গল্প শোনার বয়স। সেকালে সন্ধ্যাবেলা পিতামহীর কাছে অনেকে বেড়াতে আসতেন প্রায়-নিরক্ষর কিংবা সামান্য সাক্ষর মেয়েরা। তাঁরা বাড়ীতে পড়াশোনা করতেন কিনা জানি না। জয়পুরের বাঙালী শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা একটু পড়াশোনা জানে। কিন্তু গোবিন্দজীর গোঁসাই বাড়ীর মেয়েরা প্রায় নিরক্ষর। সব বসে গল্প করতেন। আমরা জড় হতাম গল্পের গন্ধে।

কানে এলো—"সেই এক গামলা জলেই নানা রং কাপড় চুবিয়ে তুলছে একজন কাপড়-রংওয়ালা (রং রেজ)। এবং লাল নীল সবুজ হলুদ এক জলেই সব রং হচ্ছে।" শ্রোত্রীরা সবিস্ময় হাসিমুখে ঐ রূপক গল্প শুনছেন। পিতামহী কি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন কি 'কথামৃতে'র কথা? জানি না তা। শুধু শোনা হচ্ছে। কেমন করে রকম রকম রং হচ্ছে? সে প্রশ্ন কেউ করছে না। আমরাও নয়। গল্পে আবার কোথায় প্রশ্নোত্তরের স্থান। বোধ হয় শিশু আমরা আমাদের পুতুলের কাপড় রং করার কথা ভাবছিলাম। কি মজাই না হয় যদি আমরা ঐ রকম 'রং রেজ' পাই।

আবার তার পর এলো সেই আশ্চর্য জন্তুটার গল্প যাকে কেউ দেখেছে লাল রং, কেউ হলদে, কেউ সবুজ। কেউ তাকে ধরতে পারল না। সবাই তর্ক করে। কেউ বলে তুমি ভুল দেখেছ ওটা লাল।—অন্যজন বলে, না, নীল। তর্ক বাদ-বিতণ্ডা প্রমাণ করতে সবাই যায় গাছটার কাছে জন্তুটাকে দেখতে। আমরাও বাগানে গেলাম গিরগিটী মনে করে জন্তুটা খুঁজতে! যার রং বদলায়। জানতাম সে জন্তুটা আসলে কিন্তু কেউ দেখতে পায় না। ভাবি আরো কত গল্প ঐ কথামৃত ভাঁড়ারে আছে! এবার শিশুমনে প্রশ্ন এমন সব ভালো ভালো গল্প কোথায় কোন বইতে আছে? তখন ১৩০৬।৭। জয়পুরে ফিরে এসেছি আমরা। বইয়ের এবং গল্পের সন্ধানে ঠাকুমার ঘরেই সবাই ঢুকি। বই অনেক। কিন্তু সবই গুরুগম্ভীর বই। হিন্দু পত্রিকা। কালী সিংহের মহাভারত। মাসিক রাজস্থান বেরুতো তখন। পেলাম দেখতে 'উদ্বোধন'! কোন্ বছর তা মনে নেই। যা খুঁজছিলাম তা' পাওয়া গেল। গল্পের পর গল্প। উপমা-সমৃদ্ধ। কে এক শ্রী-ম লিখছেন। কে এক 'মাষ্টার' শুনছেন। আর কে একজন ঠাকুর বলছেন।

এবার এলো চমৎকার সহজবোধ্য গল্প একটা। স্পষ্ট। একজনের দোকান। দোকানী অসৎ, জুয়াচোর। তবু বিক্রি বেশ। কর্মচারীও অনেক কারণ দোকানীর গলায় মালা, কপালে তিলক, মুখে হরিনাম। লোকে বিশ্বাস করে। ভাবে ভক্ত। খদ্দের এসেছে। ভালমানুষ খদ্দের।

খদ্দের দেখে একজন বললে 'কেশব কেশব।' (কে সব? কে সব?) ঠাকুর সহাস্যে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন।

আর একজন বললে উত্তরে, 'গোপাল! গোপাল!' (গো পাল। গো পাল। গরুর (পাল সব!)

বিক্রেতা বললে, হরি! হরি! হরি! (অর্থাৎ হরণ করি) তিলকমালাধারী কর্তা বললেন, 'হর। হর। হর।' (হরণ কর। হরণ কর) কোন্ সংখ্যা কবে পড়েছি বড় হয়ে না সেই বয়সে সব আর মনে নেই। বইতে, উদ্বোধনে, তাও মনে নেই।

শুধু মনে আছে উদ্বোধনের 'কথামৃত।' এবং কথামৃতের গল্প। যে-গল্প ছোটবড় শিক্ষিত অশিক্ষিত পণ্ডিত মূর্খ শিশু নারী বৃদ্ধ সকলকে সমান মুগ্ধ করেছে। করে। হয়তো চির-কাল করবে। অন্ততঃ আমাদের তো করেছিল।

তারপর এ 'কথামৃত' অন্য পত্রিকায়ও বেরিয়েছে (প্রদীপ?)। 'কথামৃত' বই হয়ে বেরিয়েছে। সেও বার্তাতে দেখেছি পরে। তৃতীয় খণ্ড অবধি। (এবং কথামৃতকার 'শ্রী ম' যে মাতামহীর ভগিনীপতি তাও জেনেছি।) ঐ উদ্বোধনেই একটু বড় হয়ে ১০।১১ বছর বয়সে পড়লাম 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। 'ভাববার কথা', অন্য লেখাও। লেখার রস বুঝি আর না বুঝি মনে যে কি ছাপ পড়ে গেল সেই আশ্চর্য ভাষার। দেশবিদেশের চিত্রের। 'হাঙ্গর শিকারের'। চিত্রধর্মী বর্ণাঢ্য লেখা। কবে উদ্বোধনের পাক্ষিক রূপ বদলে মাসিক আকার হয়েছে মনে নেই। বই বাড়ীতে বাঁধাতে দেওয়ার ভার ছিল আমাদের বালিকা দুই বোনের উপর। বিজ্ঞাপনের পাতা ও মলাট ছিঁড়ে মাস সাজিয়ে সূচীপত্র সাজিয়ে সুতো বেঁধে হিন্দুস্থানী দপ্তরীকে গুছিয়ে সাজিয়ে দিতে হ'ত। পিতা দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়ে-ছিলেন। পড়ার নেশায় সে সময়েও আবার পড়তে চোখ নিবিষ্ট হত।

একবারকার 'উদ্বোধনে' একটি লেখার কথা আজও মনে আছে। সেটি কোন্ বছর তা মনে নেই। সেটিতে একটি বিতর্ক হয়েছিল একটি গান নিয়ে।—গানটি হ'ল, "হরি গেল মধুপুর হাম কুলবালা। পড়ল বিপথে সখি মালতীর মালা।" (বৈষ্ণব কবিতা) এই লেখা নিয়ে একটু আলোচনা হয় দু সংখ্যায়, তিন সংখ্যায়। উদ্বোধনের মত পত্রিকায় ওই ধরনের লেখা প্রকাশ ঠিক কিনা এই নিয়ে। নিষ্পত্তি কি হয়েছিল মনে নেই।

এখন 'চতুর্থ পুরুষ' চলেছে। পিতামহ পিতা ভাইদের কারু কারুর লোকান্তরের পর। বাঁধানো 'উদ্বোধন', কেশবসেনের 'ধর্মতত্ত্ব', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী', নানা ধরনের পুরাতন বই—বঙ্গদর্শন 'প্রদীপ' 'ভারতী' আর সে বাড়ীর আলমারীতে নেই। আর ছিল দু তিন তাক ভরা সারি সারি 'প্রবুদ্ধ ভারত' বাঁধানো হয়ত প্রথম বর্ষ থেকে। নামটি তখন পড়তে পারতাম। ভিতরে প্রবেশ করার মত বয়সও নয়, বিদ্যাও অর্জিত হয়নি। লুব্ধ চোখে ভেবেছি কখনো পরে যদি পড়তে পারি। এবারে বহুদিন পরে গিয়ে দেখলাম নেই। সেগুলিও নেই।

কোথায় গেল? শুধু নেই? নশ্বর আমাদের মানুষের মতই নেই? আরো গভীর গম্ভীর সহজ হালকা ইংরাজী বাংলা সংস্কৃত বইও ছিল। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সাময়িক পত্র। 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' কার সম্পাদনা জানি না। নেই। তারাও কোথাও নেই। আসলে তাদের সমাদর আর নেই।—তাই নেই। সবাই আজও শুধু হয়ত আমার একলার সশ্রদ্ধ স্মৃতির মধ্যেই রয়ে গেছে। মানুষের সবই বুঝি মনে—শ্রুতি আর স্মৃতির মধ্যেই বেঁচে থাকে! বস্তুতে নয়।

তাই মানুষ স্মৃতিকেই আবার ধরে রাখতে চায় শোনানোর পথে। এই আমার প্রথম পড়া চেনা উদ্বোধনের স্মৃতি যাতে কিষণগড় জয়পুর কলকাতা জড়িয়ে আছে তার স্তরে স্তরে সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, কৌতূহল, আনন্দময় প্রশান্ত স্পর্শ নিয়ে। যেন বিশ্বদেবের মহাপ্রসাদ। এবং এর সবচেয়ে আশ্চর্য কথা যে আজ 'উদ্বোধনে'র কথা উদ্বোধনকেই নিবেদন করে দিতে পারলাম।

শিলা-মন্দির [প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে]

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

সুদূর অতীতযুগে সভ্যতার প্রসন্ন প্রত্যুষে,
ঋষিকণ্ঠ যেই দিন উচ্চারিল নির্মেঘ আকাশে—
অনাদৃত মহামন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয় মানব-মহিমা,
"অমৃতের পুত্র তুমি, ভালে তব আলোর গরিমা।
পরম জীবন-সত্যে নিত্য তব আছে অধিকার,
অক্ষয় প্রকাশ আছে চিরন্তন বিদেহ-আত্মার।
কিবা ভয়? ঐ হের অপসৃত মৃত্যুর কালিমা,
অনন্ত জীবন-পথ, মিথ্যা কভু না টানিও সীমা!"

সেই কালে, সেই যুগে অভিনব আছে ইতিহাস,
হিমশীর্ষ, হিমগিরি যেথা দেব শিবের প্রকাশ,
স্তব্ধ বায়ু, স্তব্ধ স্থির—নিথর আকাশ।
সেই স্থানে একদিন মহাধ্যানে ছিল নিমগন,
পবিত্র কুমারী কন্যা, সুদর্শনা, অতি অনুপম।
বিশ্বপতি ভোলানাথ, সর্বকালে দেবের বাঞ্ছিত—
তাহারে লভিবে বালা, নিজ পতিরূপে, ছিল আকাঙ্ক্ষিত
আর কিছু ছিল না কামনা। অন্তর বাহির—
মহামৌন নিসর্গের ধ্যান সুগম্ভীর—
করি আহরণ, অগ্নিশিখা সম স্থির
ছিল সমাহিত। কালে তুষ্ট ভকত-শরণ,
নীলকণ্ঠ, মহাদেব দিল তারে দিব্য দরশন।
কহিল আশ্বাস-বাণী, নিত্য ধ্রুব শাশ্বত-বচন;

"এ গিরি-শিখর ছাড়ি, হে কন্যা কুমারি,
যাও তুমি দক্ষিণ-প্রদেশে, ভারতের শেষে,
যেথা তিন সাগরের বারি এক সাথে মেশে—
দূর চক্রবাল রেখা ছুঁয়ে ঐ নিঃসীম আকাশে।
সেথাকার অন্তরীপে, শান্তদ্বীপে, অত্যুচ্চশিখরে—
কর ধ্যান, কর আরাধনা, কর ধৈর্যে কঠোর সাধনা।
যথাকালে পাবে সিদ্ধি, অন্তরের পূরিবে কামনা,

আমারে লভিবে পতি—মনে কোন সন্দেহ রেখো না।"
তারপর কত যুগ, মন্বন্তর অতিক্রান্ত হল,
উদয় লগ্নের দিন, অস্তাচল-সায়াহ্নে মিশাল।
মানুষ লভিল কত নব জন্ম, নব জন্মান্তর,
উত্থান-পতন-চিহ্নে হের ঐ এল কালান্তর
বিঘোষিল নবযুগে নিপীড়িত জীবন-কামনা,
লক্ষকোটি মানুষের গূঢ়তম অন্তর-বেদনা।

দুঃখ দৈন্য প্রতিঘাতে ভারতেরও বুকে—
এল বিভীষিকা, কুশিক্ষার শত মসীরেখা।
এল ব্যাধি, অবিশ্বাস, জীর্ণ মরীচিকা।
ধর্মহীন, শক্তিহীন, স্তব্ধবাক্, শ্রান্ত, অসহায়,
সুপ্তিমগ্ন যেন এক বিড়ম্বিত প্রাণী মহাকায়।—
নির্বাপিত-প্রায় শীর্ণ, দগ্ধ দীপশিখা,
রূপ নিল ধূসরিত, ভাগ্যহত ভারত-মৃত্তিকা।

এরই মাঝে একদিন অকস্মাৎ বিগত শতকে—
হৃদিবান্ মহাযোগী ধ্যানমন্ত্রে স্মরিল তোমাকে!
এল তব পাদদেশে, ভাবাবেশে তীব্র ব্যথা বুকে,
বিলুপ্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম, ঘোর তমো হেরি চতুর্দিকে।
প্রাণে তাঁর দুঃখ, ক্ষোভ, প্রচণ্ড বেদনা,
তুচ্ছ মান, তুচ্ছ জ্ঞান—অতি তুচ্ছ মুক্তির বাসনা।
মানব-কল্যাণ তরে, প্রাণ তাঁর কাঁদে অনিবার,
ভারতের নবজন্ম, পূর্ণ জাগরণ—একমাত্র কামনা তাঁহার।

অদূরের শিলাখণ্ড উর্ধ্বমুখে তুলি নগ্নশির,
নিশিদিন মহানীলে মহামৌনে যেথা রহে স্থির—
মহাঋষি সেই স্থানে ধ্যানাসন করিল গ্রহণ,
সঞ্জীব কল্যাণ-মন্ত্র লভিবে জীবনে, অথবা মরণ।
কঠোর সঙ্কল্প এই, এই তার একক স্বপন।

তোমার আশিস ছিল, হে কুমারী, করি অনুমান,
মুহূর্তে গভীর ধ্যান মন্ত্র-অর্থ করিল প্রদান।
মুহূর্তে স্পন্দিত আলো, দিব্য উন্মাদনা,

নিষ্কলুষ প্রাণে তাঁর আনি দিল বিশুদ্ধ চেতনা।
উঠিল ঝঙ্কার এক অন্তহীন, প্রশান্ত আকাশে,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গশীর্ষে জলসিক্ত অশান্ত বাতাসে।
"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?"
এই মহামন্ত্র আর অমৃতের এই শুভবাণী,
উচ্ছ্বসিল অকস্মাৎ, এ কালের নব বেদধ্বনি ;
উচ্চকিত, সবিস্ময় সর্বংসহা শুনিল ধরণী।
জীবে প্রেম করে যেই জন, অনুক্ষণ—
দেব-সেবা করে সেইজন, শুধু সেই জন।
তন্ত্র, মন্ত্র, পূজা-আয়োজন—বৃথা আকিঞ্চন,
নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেম—এই শুধু অপার্থিব ধন ...
সমগ্র পৃথিবী ক্রমে অভিনব সে-বার্তা শুনিল,
গভীর মননে তার মর্ম-অর্থ আপনি লভিল
'বিবেক-আনন্দ শিলা'—প্রস্তরের অঙ্গে লিখি দিল।
জানাইল প্রাণের আকুতি, সশ্রদ্ধ প্রণতি,
গাহিল প্রভাতী গান, সামছন্দ মঙ্গল আরতি।
তীর্থমান দিল ঐ পুণ্যস্মৃতি ধূসর-প্রস্তরে,
ধ্যানমগ্ন হে কুমারি, শ্বেতশুভ্র তোমার মূর্তিরে।
তারপর আজ দেখি, —দীর্ঘ, অর্ধ শতাব্দীর পরে
প্রতিষ্ঠা করিল তার তৃণহীন অনুচ্চশিখরে—
পূর্ণমূর্তি স্বামীজীর অপরূপ স্মৃতি-নিদর্শন।
বিচিত্র মন্দির-গৃহে, অপূর্ব শোভন।
প্রীতির লাবণ্যে ভরা অকপট ভক্তি-নিবেদন,
শ্রদ্ধায়-মণ্ডিতরূপ, সর্বভাবে সার্থক সৃজন।
গাহিল বন্দনাগীতি এককণ্ঠে লক্ষ নরনারী,
অর্ঘ্যথালি নিবেদিল ভাবাবেগে হৃদয়-উৎসারি।
ধন্য তুমি, হে মনীষি, মহাঋষি অক্ষয়-জীবন,
শাশ্বত তোমার প্রেম, কালজয়ী তোমার সাধন।
ভারত-সমুদ্র বুকে অনির্বাণ তুমি দীপশিখা;
তব হস্তে ধৃত স্থির দ্যুতিময় কালের বর্তিকা।

'একৈবাহং জগত্যত্র'

স্বামী জীবানন্দ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তরচরিত্রে (তৃতীয় চরিত্রে) শুম্ভ-নিশুম্ভবধের বিস্তৃত কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। এই চরিত্রে আমরা দেখি আদ্যাশক্তি দেবী চণ্ডিকা বিভিন্ন মূর্তি ধারণ ক'রে অচিন্ত্য অলৌকিক অত্যাশ্চর্য লীলা করেছেন। একই মহাশক্তির নানা মূর্তিতে অসুরসংহার!

অতি প্রাচীন কালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুটি অতি বলগর্বিত ভয়ঙ্কর অসুর দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য হরণ করেছিল; দেবতাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত করেছিল। দেবতারা তখন দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের উপায় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁদের স্মৃতিতে উদিত হ'ল শ্রীশ্রীজগজ্জননীর অপার মাহাত্ম্য।

মহিষাসুরবধের পর দেবতাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে আদ্যাশক্তি মহাদেবী বর দিয়েছিলেন, 'বিপৎকালে যখনই তোমরা আমাকে স্মরণ করবে, আমি তোমাদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার ক'রব, তোমাদের সমস্ত বিপদ নাশ ক'রব।'

আবার নিদারুণ সঙ্কট উপস্থিত। তাই গিরিরাজ হিমালয়ের নিভৃত স্থানে সমবেত হয়ে দেবগণ বৈষ্ণবী শক্তি মহাদেবীকে অতি ভক্তিভরে স্তব করতে লাগলেন। দেবতারা যে স্তব করেছিলেন, সেটি শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিখ্যাত 'অপরাজিতাস্তব' বা তন্ত্রমতে সর্বফলপ্রদ দেবী-সূক্ত:

"নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম
তাম্॥" ইত্যাদি

দেবতারা যখন এইভাবে স্তবরত, তখন দেবী পার্বতী জাহ্নবীজলে স্নান করবার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা এখানে কার স্তব করছেন?' যিনি অন্তর্যামিনী তিনি যেন কিছুই জানেন না, এমনিভাবে প্রশ্ন করলেন। এই সময় এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘ'টল। তখন সেই দেবীর শরীর-কোষ থেকে আদ্যাশক্তি শিবা আবির্ভূতা হয়ে বললেন, 'নিশুম্ভাসুর কর্তৃক পরাজিত এবং শুম্ভাসুর কর্তৃক স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ সমবেত হয়ে আমারই স্তব করছেন।'

পার্বতীদেবীর দেহ-কোষ থেকে অম্বিকা উৎপন্না হয়েছেন ব'লে ত্রিজগতে তিনি 'কৌশিকী' নামে অভিহিতা।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয় তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট ক'রে বর লাভ করেছিল—তারা দেব দানব ও মানব সকল পুরুষের অবধ্য হবে। তাই দুর্ধর্ষ অসুরভ্রাতৃদ্বয়ের বধের জন্য অযোনিজা কৌশিকী দেবীর আবির্ভাব।

কৌশিকী দেবীর নির্গমনের পরই পার্বতী-দেবী কৃষ্ণবর্ণা হলেন এবং হিমালয়ে অধিষ্ঠান ক'রে 'কালিকা' নামে প্রসিদ্ধা হলেন।

অনন্তর শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড অতি মনোহরমূর্তিধারিণী অম্বিকা অর্থাৎ কৌশিকী দেবীকে দেখে শুম্ভের কাছে ছুটে এসে সংবাদ দিল—'মহারাজ! পরমাসুন্দরী এক রমণী হিমাচল আলোকিত ক'রে অবস্থান করছেন।'

অসুররাজ শুম্ভ চণ্ড-মুণ্ডের মুখে দেবীর অনুপম রূপের বর্ণনা শুনে ও তাদের দ্বারা

উৎসাহিত হয়ে মহাসুর সুগ্রীবকে দেবীর নিকট দূতরূপে পাঠালেন।

সুগ্রীব উদ্ধত দৈত্যরাজ শুম্ভের কথা দেবীকে নিবেদন ক'রল: 'হে দেবি। এই সংসারে আপনাকে স্ত্রীরত্ন ব'লে মনে করি। ত্রিলোকের সমস্ত রত্ন আমাদের অধিকারে। অতএব আপনি আমাকে বা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবিক্রম নিশুম্ভকে পতিরূপে গ্রহণ করুন।'

দূতের কথা শুনে ভগবতী দুর্গা গম্ভীর হয়ে গেলেন ও মনে মনে হাসতে লাগলেন। এ বলে কি।

সুগ্রীবকে বললেন—'তুমি ঠিকই বলেছ। শুম্ভ ত্রিভুবনের অধিপতি এবং নিশুম্ভও তার মতন শক্তিশালী। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা তোমায় বলছি, শোন—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে
যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে
স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥" ৫।১২০

'যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ করবেন এবং যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী, তিনিই আমার পতি হবেন।'

দেবী আরও বললেন, 'অতএব শুম্ভ বা নিশুম্ভ এখানে আসুক এবং আমাকে পরাস্ত ক'রে আমার পাণিগ্রহণ করুক। বিলম্বে আর কি প্রয়োজন?'

শুম্ভের দূত দেবীকে অনেক বোঝালো যে এরকম করা ঠিক হবে না, আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করলেও আমার পরামর্শ অনুসারে শুম্ভনিশুম্ভের নিকট গমন করুন; কেশাকর্ষণে অপমানিতা হবেন না—"কেশাকর্ষণনির্ধূত-গৌরবা মা গমিষ্যসি।"

দেবী বললেন: শুম্ভ বলবান্ এবং নিশুম্ভও অতিবীর্যবান্ সত্যিই। কিন্তু কি ক'রব বল আমি? আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি। তুমি শুম্ভের কাছে ফিরে যাও। আমি যা যা তোমাকে বললাম, সব কথা ভাল ক'রে তাকে বল। সে যা সমুচিত বিবেচনা করে, তাই করুক।'

অম্বিকাদেবীর কথা শুনে দূত ক্রুদ্ধ হয়ে দৈত্যরাজের কাছে গিয়ে দেবীর কথা নিবেদন ক'রল। শুম্ভ তখন ভীষণ রেগে গিয়ে দৈত্য-সেনাপতি ধূম্রলোচনকে সৈন্যপরিবৃত হয়ে দেবীকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বলা ক'রে নিয়ে আসতে আদেশ দিল। ব'লল, এ কাজে যদি কেউ বাধা দেয়, সে দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব যেই হোক না কেন, তাকে নিহত করবে।

ধূম্রলোচন আদেশ পেয়ে ষাট হাজার অসুর সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেল। ধূম্রলোচন দেবীর অভিমুখে ধাবিত হওয়ামাত্র অম্বিকাদেবী হুঙ্কারের দ্বারাই তাকে ভস্মীভূত করলেন। ধূম্রলোচনের অনুচরবর্গের সঙ্গে তখন ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। দেবীর বাহন সিংহ মহোৎসাহে অল্প সময়ের মধ্যেই দৈত্যসৈন্যদের ধ্বংস ক'রে ফেললো।

সসৈন্য ধূম্রলোচনের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে দৈত্যেশ্বর শুম্ভ মহাবলশালী চণ্ড মুণ্ড নামে দুটি মহাসুরকে আদেশ দিল দেবীকে ধরে আনতে।

সসৈন্য চণ্ড-মুণ্ড হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল—একটি বিরাট হিমাদ্রিশিখরে কাঞ্চনবর্ণা দেবী দিব্য প্রভায় চতুর্দিক উজ্জ্বল ক'রে বাহন সিংহের উপরে সমাসীনা। দেখা-মাত্র তারা দেবীর নিকট ছুটে গেল তাঁকে ধরতে। দেবী ভীষণ ক্রুদ্ধা হলেন। ক্রোধে তাঁর মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। তখন দেবীর ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটদেশ থেকে খড়্গধারিণী পাশহস্তা

করালবদনা কালী নির্গতা হলেন ; তিনি—

"বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা ॥"

চ, ৭।৭,৮

সেই কালী বিচিত্রনরকঙ্কালধারিণী, নৃমুণ্ড-মালিনী। তাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। অস্থি-চর্মমাত্রদেহা, অতি ভীষণা, ভয়প্রদা তিনি। তাঁর বিশাল বদন, লোলজিহ্বা, চক্ষু কোটর-গত। তিনি বিকট শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করছেন। তিনি দেবী চামুণ্ডা। শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গাপূজায় অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে তাঁর পূজা হয়। সেই দেবী কালী চতুরঙ্গ অসুরসৈন্য সব গ্রাস ক'রে ফেললেন। তার-পর চণ্ডাসুরের চুলের মুঠি ধ'রে খড়্গ দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। চণ্ডকে নিহত দেখে মুণ্ডও দেবীর দিকে ধাবিত হ'ল। দেবী সক্রোধে তাকেও খড়্গাঘাতে ধরাশায়ী করলেন।

কালী চণ্ডমুণ্ডের মাথাদুটি নিয়ে চণ্ডিকার কাছে এসে প্রচণ্ড অট্টহাস্য ক'রে বললেন, 'এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে আপনাকে মহাপশু চণ্ডমুণ্ডের মস্তকদ্বয় উপহার দিলাম। আপনি নিজেই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করবেন।'

কালী কর্তৃক আনীত মহাসুর চণ্ডমুণ্ডের মাথাদুটি দেখে কল্যাণী চণ্ডিকাদেবী তাঁকে মধুরবাক্যে বললেন :

হে দেবি! আপনি চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক দুটি আমার নিকট এনেছেন ব'লে জগতে আপনি "চামুণ্ডা" নামে বিখ্যাত হবেন।'

চণ্ড মুণ্ড এবং বহু সৈন্য নিহত হওয়ায় দৈত্য-রাজ শুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো। অসংখ্য অসুরসৈন্য যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধার্থে চ'ললো। অসুররা মিলিত হয়ে চণ্ডিকা, চামুণ্ডা ও সিংহকে ঘিরে ফেললো।

এই সময়ে অসুরদের বিনাশ ও দেবগণের বিজয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরাহ, নৃসিংহ, শিব, ইন্দ্র, কার্ত্তিকেয়াদি দেবগণের শক্তিসমূহ তাঁদের শরীর থেকে বহির্গত হয়ে দেবাদির অনুরূপ দেবীমূর্তি ধারণ ক'রে চণ্ডিকার সমীপে উপস্থিত হলেন। যে দেবতার যেরূপ আকার, ভূষণ ও বাহন তাঁর শক্তিও সেইরূপ আকৃতি, ভূষণ ও বাহন নিয়ে অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীর হস্তে জপমালা ও কমণ্ডলু ; তিনি হংসযুক্ত বিমানে সমাসীনা। মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী বৃষভবাহনা, ত্রিশূল-ধারিণী ; তাঁর ললাটে অর্ধচন্দ্র সুশোভিত, হস্তে তক্ষক ও অনন্ত নাগ বলয়রূপে ভূষিত। কার্ত্তিকেয়ের শক্তি কৌমারী ময়ূরবাহনা। বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী গরুড়বাহনা ; তাঁর চারি-হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা শার্ঙ্গ'ধনু। বারাহী শক্তি হচ্ছেন যজ্ঞস্থলে বরাহমূর্তিধারণকারী বিষ্ণুর শক্তি। নারসিংহী হলেন বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহদেবের শক্তি। ঐন্দ্রীর হস্তে বজ্র, বাহন ঐরাবত ; তিনি সহস্রনয়না।

তখন মহাদেব সেই সকল দেবশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে চণ্ডিকাকে বললেন—'আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ এঁদের সহযোগে আপনি শীঘ্র অসুরদের বিনাশ করুন।' অনন্তর চণ্ডিকা দেবীর শরীর থেকে অতিভীষণা মহাশক্তি আবির্ভূ'তা হলেন। সেই দেবী মহাদেবকে বললেন, 'ভগবন্‌! আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট বার্ত'বহরূপে গমন করুন এবং তাদের বলুন—পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করবেন, দেবগণ পূর্বের মতো যজ্ঞ'হুতি গ্রহণ করতে থাকবেন। তোমরা

অসুররা যদি বাঁচতে চাও পাতালে যাও ; আর যদি যুদ্ধ করতে চাও তবে এস ; আমার শৃগালীরা তোমাদের মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত হোক।'

সাক্ষাৎ শিবকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন ব'লে এই জগতে এই দেবী 'শিবদূতী' নামে প্রসিদ্ধা হয়েছেন। মহাদেব-কথিত বাক্য শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে অসুররা দেবীর নিকট গেল এবং নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ও বাণ নিক্ষেপ ক'রে তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রল। তখন কালী অনায়াসে তাদের বাণ ও অস্ত্রাদি নিজের বাণদ্বারা ছেদন করলেন। কালী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, বারাহী, নারসিংহী, শিবদূতী মহাসমরে মহাবীর্য প্রকাশ ক'রে অসংখ্য অসুর নিপাত করলেন।

এর পর রক্তবীজ ভীষণ সংগ্রাম ক'রে নিহত হয়। রক্তবীজ-বধের সময় এক অদ্ভুত ঘটনা হয়েছিল। ভূমিতে পতিত রক্তবীজের রক্ত থেকে শত শত সহস্র সহস্র তার মতো যোদ্ধা উৎপন্ন হ'তে লাগলো। তখন দেবী চামুণ্ডা রক্তবীজের ও তাদের রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই খেয়ে ফেলতে লাগলেন। তখন নিরক্ত রক্তবীজ চণ্ডিকা কর্তৃক নিহত হ'ল। রক্তবীজবধের পর নিশুম্ভ যুদ্ধ করতে এল। সেও ভীষণ যুদ্ধে নিহত হল। দেবীর বাহন সিংহও বহু অসুর নাশ ক'রল।

প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা মহাসুর নিশুম্ভকে নিহত এবং সৈন্যবল বিনষ্টপ্রায় দেখে শুম্ভ ক্রোধভরে ব'লল :

"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী"॥

চ, ১০।৩

'বলগর্বে উদ্ধতা দুর্গে! তুমি গর্ব ক'রো না। কারণ অতি গর্বিতা তুমি অন্যান্য দেবীর বল আশ্রয় করেই যুদ্ধ ক'রছ।'

চণ্ডিকাদেবী বললেন :

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।"

চ, ১০।৫

'একা আমিই এই জগতে বিরাজিতা। আমি অদ্বিতীয়া। আমি ছাড়া আমার সহায়ভূতা দ্বিতীয়া আর কে আছে? রে দুষ্ট, ব্রহ্মাণী প্রমুখ এই সব দেবী আমারই অভিন্না শক্তি—আমারই বিভূতি। আমি আর আমার শক্তি অভেদ, কোন পার্থক্য নেই। এই দ্যাখ্, আমার শক্তিসমূহ আমাতেই বিলীনা হচ্ছেন।'

অনন্তর চণ্ডিকার সমস্ত শক্তি অর্থাৎ যুদ্ধরতা ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা—এই অষ্টমাতৃকা দেবীর শরীরে বিলীন হলেন, কারণ তাঁরা আদ্যাশক্তি থেকে অভিন্না।

"ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসাৎ তদাম্বিকা॥"

চ, ১০।৬

দেবী বলিলেন : 'এই যুদ্ধে আমার মায়া দ্বারা আমার শক্তিপ্রভাবে আমি যে-সকল মূর্তিতে অবস্থান করছিলাম, সবই আমার ভেতরে গুটিয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে একাকিনী আমিই রইলাম। তুমি যুদ্ধে স্থির হও। এস, এইবার আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।'

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো
ভব॥" চ, ১০।৭

এইবার আদ্যাশক্তি মহামায়া দেবী চণ্ডিকা সমস্ত দেবতা ও অসুরগণের সমক্ষে দৈত্যরাজ শুম্ভাসুরের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর দেবী তার বুকে শূল বিঁধে

তাকে ভূপাতিত করলেন।

দুরাত্মা শুম্ভ নিহত হ'লে নিখিল বিশ্ব অত্যন্ত প্রসন্ন ও সুস্থ হ'ল এবং আকাশও নির্মল হ ল।

"ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্মলঞ্চাভবন্নভঃ॥"
চ, ১০।২৮

মা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রাম নিয়ত চলেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য অহংকার, অভিমান, কামনা, বাসনা, হিংসা এসবই তো অসুর! এরা প্রবল হলেই মহা অনর্থ ঘটতে থাকে। এ সব মহাসুর নিপাত না গেলে মাতৃকৃপা লাভ হয় না, মহামায়া ভগবতীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারা যায় না। কাম-ক্রোধ-লোভের প্রতীক বলা যেতে পারে ধূম্রলোচন-চণ্ড-মুণ্ডকে। রক্তবীজ তো মরেও মরে না। এ হ'ল কামনা-বাসনার প্রতীক। কামনা-বাসনারও শেষ নেই। একটি কামনা পূরণ হতে না হতেই তার স্থলে একশটি এমনকি হাজারটি কামনা এসে জোটে। এই কামনা-বাসনাই রক্তবীজ। নির্বাসনা হ'তে পারলেই জ্ঞানলাভ হয়। বাসনাতেই বদ্ধ করে। নির্বাসনা মুক্তি আনে। কামনা-বাসনা নির্মূ'ল হ'লে তবেই মাতৃদর্শন। অহংকার-অভিমানের প্রতীক হচ্ছে শুম্ভ-নিশুম্ভ। অহংকার শেষ পর্যন্ত থাকে। অহংকার গেলেই জগজ্জননী স্ব-রূপ প্রকটিত করেন। সবই মহামায়ার—আদ্যা-শক্তির লীলা। তিনিই বদ্ধ করে রেখেছেন, তিনিই আবার মুক্তি প্রদান করছেন। বন্ধন আর বিমুক্তি সবই মায়ের হাতে। তাঁর শরণাগত হ'তে পারলে তিনি আমাদের ভিতরকার সব অসুরকেই নিধন করবেন। চাই শরণাগতি! ঐকান্তিকী ভক্তি!! চাই মহামায়ার প্রতি অগাধ বিশ্বাস!!!

'একৈবাঽহং জগত্যত্র' মহামায়ার এই মহাবাণীর মর্ম অনুধাবন ক'রে সাধক সর্বত্র মাতৃসত্তা, এমনকি অণু-পরমাণুতেও তাঁরই অস্তিত্ব অনুভব করেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই, এই উপলব্ধি হচ্ছে মাতৃসাধনার চরম পরিণতি। জয় মা! জয় মা!! জয় মহাশক্তিময়ী মা!!!

"ওঁ শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

তাই তো মায়েরে শুধু ডাকি

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

আমার মায়েরে তুমি ব'লে দাও আমি ডাকি তাঁরে,
এই শরতের দিনে মাকে মনে পড়ে বারে বারে।
শ্রাবণ ভাদ্রের দিন চ'লে গেল কান্নার আবেশে,
এক যুগ অন্ধকার কে যেন দিয়েছে ঢেলে দেশে।

উঠলে আশ্বিনে চাঁদ এ আঁধার জানি যাবে নাকো,
মা এলে বলতে হ'বে,—'আঁধারে তোমার হাত রাখো,—
তবেই আঁধার যাবে:' মার স্পর্শে জানি সব যায়;
হৃদয়ের মৃগমদ মা এলেই চৌদিকে ছড়ায়।

তিমিরাস্ত দিন চেয়ে তাই তো মায়েরে শুধু ডাকি,
মায়ের স্নেহের উৎসে কান পেতে শুধু ব'সে থাকি।

তারকার জন্ম ও মৃত্যু

শিবদাস

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের দূর, সুদূর প্রদেশে একটির পর একটি নতুন নতুন আবিষ্কার করে চলেছেন। যেমন 'কোয়াসার' (quasar), পালসার (pulsar), 'মুমূর্ষু তারকা' (collapsing star) ইত্যাদি। এসব তথ্যের ভিত্তিতে জ্যোতির্বিদদের বিশ্ব-সৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে যা আধুনিক ধারণা, তার সবগুলিকে একটা সংহতিসূত্রে গেঁথে দেওয়া হল এখানে।

সৃষ্টিনাট্যের রঙ্গমঞ্চ : মহাশূন্য

'স্পেস' বা দেশ বলতে যা বুঝি আমরা, এ যাবৎ তার যতদূর পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছেছে তারই বিস্তার যে কি বিপুল, সৃষ্টিনাট্যের রঙ্গমঞ্চের পরিসর যে কতখানি ধারণাতীত, আমরা সর্বাগ্রে তা বোঝার একটু চেষ্টা করবো।

মনে করা যাক আমরা বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়েছি, আর কোথাও এক মুহূর্তও না থেমে সমানে এগিয়ে চলেছি আলো যে বেগে ছোটে সেই বেগে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে আমরা ২,৯৯,৩০৮ কিলোমিটার (১,৮৬,০০০ মাইল) পথ অতিক্রম করছি। পথে প্রথমে পাবো চাঁদকে। চাঁদে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগলো? মাত্র ১.৩ সেকেণ্ড। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি এবং তারও পরের গ্রহগুলি ছাড়িয়ে সৌরজগতের বাইরে গিয়ে পৌঁছলাম পাঁচ ঘণ্টা পরে। আরো এগিয়ে চলেছি, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছরও কেটে যাচ্ছে কিন্তু পথে আর কিছুই পড়ছে না। মহাশূন্য। চার বছর এভাবে সমানে এগিয়ে চলার পর গিয়ে পৌঁছব আমাদের সবচেয়ে কাছে যে তারকাটি আছে, সেখানে। আমাদের সূর্যও একটি তারকা। এমনি কোটি কোটি তারকা নিয়ে তারকার এক একটি ঝাঁক আছে, যার নাম ছায়াপথ (galaxy)। আমাদের সূর্য যে ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত সেটি হল দশ হাজার কোটি তারকার একটি ঝাঁক। আমরা তো সবে এর একটি তারকা (সূর্য) থেকে আর একটি তারকায় এলাম এতক্ষণে। সেখান থেকে এই ছায়াপথের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি যখন, তখন মহাশূন্যে চলতে চলতে গড়ে প্রতি পাঁচ বছর পর পথে একট করে তারকা ছাড়িয়ে যাবো। আর আমাদের এই ছায়াপথ ছেড়ে বেরুতে পারবো ৮০ হাজার বছর পর।

তা হলেই বা, এতক্ষণ তো আমরা আমাদের পাড়াতেই ছিলাম বলা চলে, যেখানে সূর্য বা সৌরজগৎ আমাদের বাড়ী, অপর তারকাগুলিও যেন এই পাড়ারই এক-একটি বাড়ী, আর সমগ্র ছায়াপথটি একটি পাড়া। পাড়া বেড়াবার সময় মিনিটে এক কোটি আশি লক্ষ কিলোমিটার (এক কোটি বার লক্ষ মাইল) বেগে চললেও তবু তো আমরা পাঁচ বছর অন্তর পথে একটা করে তারকা পাচ্ছিলাম। একে মহাশূন্য বললে চলবে কেন? আসল মহাশূন্যে পড়বো আমরা আমাদের এই পাড়া,

* Reader's Digest, August, 1970-তে প্রকাশিত Ira Wolfert-লিখিত 'New Visions of the Universe' প্রবন্ধটি অবলম্বনে এবং 'An Approach to Modern Physics' (Andrade) গ্রন্থ হইতে পারমাণবিক তথ্য লইয়া রচিত।

আমাদের ছায়াপথ 'মিল্‌কি ওয়ে' ছাড়িয়ে যাবার পর। বিশ লক্ষ বছর সমান বেগে এগিয়ে চলার পর আমরা অপর পাড়ায়, আমাদের ছায়াপথের পরবর্তী ছায়াপথ 'এ্যাণ্ড্রোমেডা'য় পৌঁছব। এই পাড়িকে অবশ্য মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে আসা বলতে পারেন।

এখন বলছেন বটে, কিন্তু পরে আর হয়তো একেও মহাশূন্য বলবেন না। ছায়াপথগুলির কয়েকটি একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে থাকে। আমাদের দলে আছে ১৭টি ছায়াপথ। এই সতেরোটি ছায়াপথ, সতেরোটি পাড়া নিয়ে মহাশূন্যে যেন আমাদের গ্রাম। আমরা তো সবে এই গ্রামের এক পাড়া থেকে অপর পাড়ায় এলাম। সমান বেগে চলে যখন আমরা আমাদের দলের সব ছায়াপথগুলিকে, আমাদের গ্রামকে ছেড়ে বের হব, তখন অবশ্যই বলতে পারেন আমরা আসল মহাশূন্যে এসে পড়েছি। সে মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে অপর গ্রামে, বৃহত্তর ছায়াপথের দল 'হারকিউলিস'-এ গিয়ে পৌঁছতে পারব ৩০ কোটি বছর পরে!

এই হারকিউলিস হল দশ হাজার ছায়াপথ নিয়ে গড়া একটি দল, যার প্রত্যেক ছায়াপথে আছে কোটি কোটি তারকা। বিশ্বের যতটুকুর খবর আমরা রাখি তার ভেতরই আছে অন্তত: এক হাজার কোটি ছায়াপথ। এখন একবার মনে মনে হিসেব করে নিতে পারেন, আমাদের জানা বিশ্বেরই শেষপ্রান্তে পৌঁছতে কতদিন লাগবে, যদি আলোর বেগে চলার শক্তি এবং কোটি কোটি বছর বেঁচে থাকার পরমায়ু আদৌ কখনো পাই আমরা। তাছাড়া এখানেই তো আর শেষ নয়, এর পরও তো আছে। কতদূর আছে? কেউ জানে না। বলতে পারেন মহাশূন্য অনন্তবিস্তৃত; ওটা তো শব্দ মাত্র, যার সঠিক ধারণাই হয় না।

সৃষ্টিনাট্যের প্রথম অঙ্ক:
ধূলি-মেঘ; হাইড্রোজেন-পরমাণু সৃষ্টি

এতক্ষণ আমরা বিশ্বের বাইরের বিস্তারের দিকে ছুটছিলাম, এবার বিশ্বসৃষ্টির আলোচনা-প্রসঙ্গে তার অন্তরের দিকে চাইতে হবে একটু। এতক্ষণ সত্যের সন্ধানে ফিরছিলাম বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর বিস্তার পার হয়ে, এখন যেতে হবে অণুপ্রমাণ থেকেও ক্ষুদ্রতর পরিসরের ভেতর দিয়ে।

এখন পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে তো বিশ্ব বলতে সপরিবার তারকাদের জন্মানো, বিভিন্নভাবে দলবদ্ধ হয়ে থাকা, পরিবর্তিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, পুনর্জন্ম বা নবকলেবর লাভ প্রভৃতি ঘটনাসমন্বিত মহাশূন্যকেই বোঝায়। মহাশূন্যে এই সব ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটেই চলেছে। তাই বিশ্ব-সৃষ্টির প্রসঙ্গ আমরা আরম্ভ করছি একটা তারকার জন্ম দিয়ে,—জন্মপ্রক্রিয়ার সেই অংশ থেকে যখন তারকাটির দেহের উপাদান-গুলি তার দেহগঠনের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

সে উপাদানগুলি কি? এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, সেগুলি পরমাণু-চূর্ণ—পরমাণু-ভাঙা ধূলিকণা। ধূলিকণাগুলি মহাশূন্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে—স্ফুলিঙ্গের মতো চতুর্দিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।[১] এই ধূলিমেঘে থেকেই বিশ্বের তারকা, সূর্য, পৃথিবী, পৃথিবীর বহুবিচিত্র পদার্থ, আপনার আমার সকল প্রাণীর জটিল দেহযন্ত্র প্রভৃতি সব কিছুরই জন্ম। আবার একসময়

১ দুটি তারকার মধ্যবর্তী মহাশূন্যে প্রতি ঘন সেন্টি-মিটারে একটি ক'রে পরমাণু রয়েছে। আমরা যে বাতাসের মধ্যে আছি, তাতে এই হার প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে পাঁচ লক্ষ কোটি কোটি।

এ সবই পরিণত হবে এই ধূলিতেই! ইচ্ছে করলে মহাশূন্যকে লক্ষ্য করে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সবাই গাইতে পারে, 'তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার, তোমার ধূলিতে পুনঃ মিশাবে আবার'; তাতে কোন বৈজ্ঞানিকই 'কল্পনাবিলাসী' ব'লে তাদের উপহাস করবেন না। এ ধূলিকণাগুলি মহাশূন্যে কোথা থেকে এল, এগুলির জন্ম কি থেকে, বিজ্ঞানীরা আজও তা জানেন না।

এই ধূলিকণার ভেতর কতকগুলির নাম 'প্রোটন', কতকগুলির নাম 'ইলেকট্রণ'।[২] প্রোটনগুলি ধন-বিদ্যুৎযুক্ত, ইলেকট্রণগুলি ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন। দুটি বিপরীতবিদ্যুৎযুক্ত বস্তু কাছাকাছি হলে পরস্পরকে কাছে টানতে চায়, আর সমবিদ্যুৎসম্পন্ন হলে পরস্পরকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। তাই একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রণকণা কাছাকাছি হলে পরস্পরকে কাছে টানে, আর খুব কাছাকাছি হলে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা হয়ে যায় তাদের জীবন—ইলেকট্রণকণাটি প্রোটনকণার চারদিকে প্রচণ্ড-বেগে ঘুরতে থাকে, যথেচ্ছ ছুটোছুটি করে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা তার আর থাকে না। দুটি মিলে তারা একটি কণার সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রোটনকে ঘিরে যতটা স্থান জুড়ে ইলেকট্রণটি ঘোরে, সেই সবজায়গাটাই, ইলেকট্রণের গতি-পথরূপ জালতিঘেরা মাহাশূন্যের সেই ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অংশটাই একটি কণার মতো ব্যবহার করে। সেই কণার নাম পরমাণু। মাত্র একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রণ দিয়ে গড়া এই যে পরমাণুটির সৃষ্টি হল, এটি বিশ্বের সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থের, হাইড্রোজেনের পরমাণু। হাইড্রোজেনের পরমাণুসৃষ্টিই হল বিশ্বের পরমাণুসৃষ্টির প্রথম ধাপ। অন্য ভাষায়, বিশ্বের মৌলিক পদার্থসৃষ্টির প্রথম ধাপ (পরমাণু শুধু মৌলিক পদার্থেরই হয়)।

বাকী পরমাণুগুলির সৃষ্টি হয় তারকার গর্ভে। বলা যায়, এই পরমাণুসৃষ্টির জন্যই তারকার জন্ম। জন্মের পর তারকাটি তার গর্ভের তাপ ও চাপ বাড়িয়ে বাড়িয়ে এই হাই-ড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীণে (কেন্দ্রস্থ কণা বা কণাগুলির সমষ্টির নাম কেন্দ্রীণ) একটি একটি করে প্রোটন-কণা জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে নতুন নতুন পরমাণু সৃষ্টি করতে থাকে। এই পরমাণু সৃষ্টির ইতিহাসই তারকার জীবনেতিহাস। সেটি সৃষ্টিনাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক।

সৃষ্টিনাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক: তারকার জন্ম ও জীবন

মহাশূন্যে ভাসমান হাইড্রোজেন-পরমাণুপুঞ্জ পাতলা কুয়াশার আকারে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে কোন সময় এরকম আরো অনেকগুলি পুঞ্জের কাছাকাছি হয়ে, তাদের সঙ্গে একত্র হয়ে হাইড্রোজেন-বাষ্পের মেঘ সৃষ্টি করে। যথেষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন-পরমাণু যদি এভাবে মিলিত হয়, তাহলে পরস্পরের প্রতি মাধ্যাকর্ষণের মিলিত শক্তিতে সেগুলি একসঙ্গেই থেকে যায়; মাধ্যা-কর্ষণশক্তিই একত্র বেঁধে রাখে তাদের, দল ছেড়ে কাউকে পালাতে দেয় না। তখন বলা যায়, তারকাসৃষ্টির কাজ শুরু হল। মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে এইরকম আরো বহু মেঘের সঙ্গে জুড়ে যখন তার পরিসর হয়ে দাঁড়ায় ষোললক্ষ কোটি কিলোমিটার (দশলক্ষ কোটি মাইল—আমাদের সৌরজগতের ব্যাসের প্রায় তিন হাজার গুণ), তখন তার মাধ্যা-

২ পজিট্রণ, মেসন প্রভৃতি আরো কয়েকটি কণার সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সৃষ্টির উপাদান প্রধানতঃ ইলেকট্রণ ও প্রোটন।

কর্ষণশক্তি এত বেশী হয়ে ওঠে যে, তা হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলিকে জোর করে কেন্দ্রের দিকে টেনে আনতে শুরু করে। ফলে পরমাণুগুলি ক্রমশঃ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়, মেঘের আকার ছোট হয়ে আসতে থাকে।

তখন তারকাসৃষ্টির নতুন অধ্যায় শুরু হয়। পরমাণুগুলির ক্রমবর্ধমান ঘনসন্নিবেশজনিত চাপের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। পরমাণুগুলি যত বেশী ঘনসন্নিবিষ্ট হতে থাকে, মেঘের আকার তত ছোট হতে এবং তাপ ও চাপ তত বাড়তে থাকে। এভাবে কেন্দ্রের তাপ যখন ৫০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ওঠে (ফুটন্ত জলের তাপ ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড), তখন সেখানকার হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলি তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে দেয়; এতে তারা পরস্পরের সঙ্গে এত জোরে ধাক্কা খেতে থাকে যে সেগুলি ভেঙে যায়—বহুলাংশে আবার সেই পরমাণু-চূর্ণে, ইলেকট্রণ আর প্রোটনে পরিণত হয়। মেঘটি এখন হাইড্রোজেন পরমাণু, ইলেকট্রণ ও প্রোটনকণার সমষ্টি হয়ে ওঠে। পদার্থের এই অবস্থার নাম 'প্লাজমা'[৩]—দুটি বিপরীতবিদ্যুৎযুক্ত পরমাণু-চূর্ণ-গ্যাসের মিশ্রিত অবস্থা। কেন্দ্রের কাছে প্রচণ্ড দাপাদাপি শুরু করে কণাগুলি—ইলেকট্রণ কণাগুলি পরস্পর থেকে দূরে যেতে চায়, প্রোটন কণাগুলিও তাই (সমবিদ্যুৎসমন্বিত কণাগুলি পরস্পরকে দূরে রাখতে চায়), কিন্তু প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণশক্তির হাত ছাড়িয়ে আগের মতো যেখানে খুশি চলে যেতে পারে না, কেন্দ্রের কাছে হুটোপুটি করাই সার হয়। এই হুটোপুটি চলে প্রায় এককোটি বছর ধরে। ইতিমধ্যে মেঘের ব্যাস ক'মে ক'মে দাঁড়িয়েছে ষোল লক্ষ কিলোমিটারে (দশলক্ষ মাইল), আর কেন্দ্রের তাপ বাড়তে বাড়তে উঠেছে এককোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। তখন সেখানে বেধে যায় অতি বিরাট আকারের তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ (Thermonuclear War)—প্রতি সেকেণ্ডে কোটি কোটি হাইড্রোজেন বোমা ফেটে চললে যা হয়, তাই। প্রোটনগুলি পরস্পরের সঙ্গে এত জোরে ধাক্কা খায় যে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে যায়। এভাবে চারটে প্রোটন জোড়া লেগে হিলিয়ামের কেন্দ্রীণ সৃষ্টি করে।[৪] কেন্দ্রীণের দানাগুলি এভাবে জোড়া

---

৩ পদার্থের চতুর্থ অবস্থা, প্রথম তিন অবস্থায়, কঠিন জলীয় ও বাষ্পীয় অবস্থায় পদার্থের অণু বা পরমাণুগুলি সবই অ-চূর্ণ অবস্থায় থাকে।

৪ হিলিয়ামের পরমাণুর কেন্দ্রে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন জোড়া থাকে, আর তার চারপাশে ঘোরে দুটি ইলেকট্রণ। নিউট্রণগুলিকে বলা যায় বিদ্যুৎহীন প্রোটন; একটি ইলেকট্রণ ও একটি প্রোটন জোড়া লাগালেই নিউট্রণ হয়, আবার নিউট্রণ থেকে একটি ইলেকট্রণ বের করে নিলে প্রোটন হয়ে যায়। ইলেকট্রণ আর প্রোটন পরস্পর বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুৎ-সম্পন্ন বলে দুটি জোড়া লাগলে কণাটি বিদ্যুৎহীন হয়। সব পদার্থই বিদ্যুৎ-ভরা, কোন পদার্থে ধনবিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুতের পরিমাণ সমান থাকলেই সেটিকে বিদ্যুৎহীন (neutral) বলা হয়, আর দুটির মধ্যে একটি বেশী থাকলে সেই বিদ্যুৎসম্পন্ন বলা হয়। নিউট্রণের ওজন প্রোটনের সমানই, সামান্য বেশী। ইলেকট্রণকণার ওজন প্রোটনকণার ওজনের ১৮৫০ ভাগের একভাগ মাত্র। মোটামুটিভাবে বস্তুর ওজন হিসেব করার সময় ইলেকট্রণের ওজন তাই বাদ দিলেও চলে।

কোন পরমাণুর কেন্দ্রীণের চারপাশে কতগুলি ইলেকট্রণ ঘুরবে, তা নির্ভর করে কেন্দ্রীণে ক'টি প্রোটন আছে তার ওপর, নিউট্রণের সংখ্যার ওপর নয়। পরমাণুর কেন্দ্রীণে যতগুলি প্রোটন থাকে তার চারপাশে ততগুলি ইলেকট্রণ ঘোরে (পরমাণুটির বিদ্যুৎসাম্য এতে রক্ষিত হয়)। কেন্দ্রীণে একটি করে প্রোটনের সংখ্যা বাড়লে এক একটি করে নতুন নতুন পরমাণু, নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্ট হয়। সেগুলির গুণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, ওজনও স্বাভাবিক কারণেই বেড়ে বেড়ে যায়। কেন্দ্রীণে সংলগ্ন নিউট্রণগুলি এই ওজন আরও বাড়িয়ে দেয়। নিউট্রণ শুধু ওজনই বাড়ায়, পদার্থের মৌলিক গুণ নয়। কেন্দ্রীণে ১ থেকে ৯২ পর্যন্ত সংখ্যার প্রোটনযুক্ত ৯২ টি মৌলিক পদার্থ আছে আমাদের পৃথিবীতে (আরো কয়েকটিকে নিয়ে এই সংখ্যা বর্তমানে ১০৩)। প্রথমটি হাইড্রোজেন, দ্বিতীয়টি হিলিয়াম, ৯২তমটি ইউরেনিয়াম।

লাগার সময় বিপুল শক্তির স্ফুরণ হয়। (হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে ঠিক এই ঘটনাই ঘটানো হয়; তবে আজ পর্যন্ত মানুষ যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করেছে, তার বিস্ফোরণে মোট-উৎপন্ন হিলিয়ামের কেন্দ্রীণের ওজন কিলোগ্রামের মধ্যেই সীমিত, আর এখানে তারকার গর্ভে তা তৈরী হয়ে চলে সেকেণ্ডে ছাপান্ন কোটি চল্লিশলক্ষ টন হারে!)

এই কেন্দ্রীণ জোড়া লাগাবার কাজ যখন শুরু হল, বলা চলে তখনই একটি তারকা জন্ম নিল—মেঘটি তারকার রূপ নিল। কারণ তখন মেঘটির কেন্দ্রের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-জনিত শক্তি কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ঠেলা দেয়, আর বাইরে থেকে ভেতরের দিকে তার সমপরিমাণ চাপ দেয় মেঘটির মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি। ফলে এই দুটি বিপরীতমুখী চাপের সমতা রক্ষা হয় এবং মেঘটি স্থায়ী বর্তুলাকার—তারকার (বা সূর্যের) যে আকার, সেই আকার ধারণ করে। আমাদের সূর্যটি তারকাজীবনের এই অবস্থাতেই, প্রায় সদ্যোজাত বা বাল্য অবস্থাতে আছে এখন। তার ভেতর সারাক্ষণ চলেছে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণ জুড়ে জুড়ে হিলিয়ামের কেন্দ্রীণ তৈরীর কাজ। সূর্যের ব্যাস এখন ষোল লক্ষ কিলোমিটার (দশলক্ষ মাইল)। তারকার গড়-পড়তা মাপই এই রকম।

তারকা কিন্তু চিরদিন এই অবস্থায় থাকে না। বহু, বহু যুগ এ অবস্থায় থাকার পর তার কেন্দ্রে যখন হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণ প্রায় ফুরিয়ে যায়, জোড়া লেগে লেগে প্রায় সবটাই হিলিয়ামের কেন্দ্রীণে রূপান্তরিত হয়, তখন কেন্দ্রের বিস্ফোরণ থেমে যায়। এতদিন এই বিস্ফোরণজনিত বহির্মুখী চাপই কেন্দ্রাভিমুখী মাধ্যাকর্ষণশক্তির চাপকে ঠেলে রেখে সমতা রক্ষা করছিল, তারকাটির আয়তন কমতে দিচ্ছিল না। এখন বিস্ফোরণ থেমে যাওয়ার ফলে সে চাপও আর না থাকায় মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবার আগের মতো তারকাটিকে চেপে চেপে তার আয়তন ছোট করে দিতে থাকে। আর তার ফলে কেন্দ্রের দিকে অতি প্রচণ্ড, প্রায় দশকোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ সৃষ্ট হয়। আর সেই তাপে হিলিয়ামের ভারী কেন্দ্রীণগুলিও (হাইড্রোজেনের চেয়ে চারগুণ বেশী ভারী) পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে আরো ভারী, হাইড্রোজেনের চেয়ে বারোগুণ বেশী ভারী আর একটি মৌলিক পদার্থের, কার্বণের,* কেন্দ্রীণ তৈরী করতে শুরু করে।

এর পর তারকাটির ভাগ্য নির্ভর করে তার আকারের ওপর। তারকাটি যদি বৃহদায়তন হয় এবং মাধ্যাকর্ষণশক্তি দিয়ে নিজেকে আরো ছোট করতে করতে কেন্দ্রের তাপমাত্রা ধাপে ধাপে আরো বাড়িয়ে যেতে পারে, তাহলে তার ভেতর সেই সব ক্রমোচ্চ তাপমাত্রায় পূর্বোক্ত-ভাবে কেন্দ্রীণ জোড়া লেগে লেগে আরো ভারী ভারী নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্ট হতে থাকে। তারকাটি যদি এত বৃহদায়তন হয় যে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চাপের ফলে তার কেন্দ্রের তাপমাত্রা ত্রিশকোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ওঠে তাহলে তার কেন্দ্রস্থ কার্বণের কেন্দ্রীণ-গুলি জোড়া লেগে আরো ভারী ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীণ সৃষ্ট হয়। তারকাটি খুব বড় হলে এভাবে পর্যায়ে পর্যায়ে আরো ভারী, আরো ভারী কেন্দ্রীণ, এমন কি আমাদের পৃথিবীতে যতগুলি মৌলিক পদার্থ

---

* কার্বণ-পরমাণুর কেন্দ্রে ৬টি প্রোটণ ও ৬টি নিউট্রণ থাকে।

আছে তার সবগুলিরই কেন্দ্রীণ তৈরী হতে পারে।

সৃষ্টিনাট্যের তৃতীয় অঙ্ক : তারকার মৃত্যু ; তারকার দেহাবশেষ থেকে গ্রহ সৃষ্টি

কোন অতি বৃহৎ তারকার গর্ভে লোহার কেন্দ্রীণ* গড়ে ওঠার পর তার বিস্ফোরণশক্তির বহির্মুখী চাপ স্তিমিত হতে থাকে ; আর বর্ধিত মাধ্যাকর্ষণশক্তি খুব চেপে তারকাটির আয়তন খুব বেশীমাত্রায় কমাতে থাকে। শেষে এই চাপের চোটে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে, তারকাটি তাতে ভেঙে যায়—তারকাটির মৃত্যু হয়। তারকাটি এতদিন ধরে তার ভেতর যে সব মৌলিক পদার্থের পরমাণু তৈরী করেছিল, এই বিস্ফোরণের ফলে সেগুলি চতুর্দিকে ক্রমবিস্তৃত আয়তনে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে সেগুলি আবার মেঘের আকার নেয় ; তবে এ মেঘ প্রাথমিক ধূলিমেঘের মতো কেবল ইলেকট্রণ-প্রোটন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর সমষ্টি নয়—এ মেঘে আগের তারকাটি যতগুলি মৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্টি করেছিল সেগুলিও থাকে।

তারকার মৃত্যু এভাবে একটি তারকার ভেঙে ছড়িয়ে পড়া প্রথম লক্ষ্য করেন চীনের একজন জ্যোতির্বিদ, ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে। তারকাটির সেই মেঘাকার দেহাবশেষ এখনো মহাশূন্যে রয়েছে। সেটির নাম 'কর্কট নেবুলা' (Crab nebula)। এটির আয়তন সেকেণ্ডে ১,৬০০ কিলোমিটার (১,০০০ মাইল) করে বেড়ে চলেছে। অনন্তবিস্তৃত মহাশূন্যে এ বাড়ার হার অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

* লোহার পরমাণুর কেন্দ্রীণে ২৬টি প্রোটন ও ৩০টি নিউট্রণ থাকে ; ওজন হাইড্রোজেনের চেয়ে ৫৬ গুণ বেশী।

সৃষ্টিনাট্যের প্রথম অঙ্কে আমরা দেখেছিলাম রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ-আবির্ভূত ইলেকট্রণ ও প্রোটন কণা, আর হাইড্রোজেন পরমাণু। এরও আগের ইতিহাস আমাদের এখনো জানা নেই বলেই সৃষ্টিনাট্যে একেই প্রথম অঙ্ক বলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখে এলাম, ইলেকট্রণ, প্রোটন ও হাইড্রোজেন-পরমাণু —এই উপাদান নিয়ে একটি তারকা নিজ অভ্যন্তরের চাপ ও তাপ বাড়িয়ে বাড়িয়ে তৈরী করে রেখে গেছে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি। সৃষ্টির ব্যাপারে এই পরমাণু-গড়ার কাজটিই সবচেয়ে কঠিন কাজ।[৭] তারপর এই পরমাণুগুলি নিয়ে এটার সঙ্গে ওটা মিলিয়ে নানাভাবে নানাসংখ্যায় জুড়ে, আমাদের গ্রহ-উপগ্রহাদিতে যে-সব যৌগিক পদার্থ আমরা দেখি সেগুলি সৃষ্টির কাজ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। এগুলি সবই পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন। এতে পরমাণু গড়ার মতো অতো চাপ বা তাপ প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের বহু পরিবর্তন তো আমরা চোখের সামনে নিত্যই ঘটতে দেখি—লোহা মরচে হয়ে যাচ্ছে, কাঠ পুড়ে ধোঁয়া, অঙ্গার, ছাই হয়ে যাচ্ছে, আমরা যা খাচ্ছি দেহযন্ত্র তা দিয়ে আমাদের রক্ত মাংস ইত্যাদি গড়ছে, আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন টেনে নিচ্ছি আর দেহযন্ত্র তাতে কার্বণ জুড়ে কার্বণ-ডাই-অকসাইড তৈরী করে প্রশ্বাসের সঙ্গে বের করে দিচ্ছে ; এমনি কতো।

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি ৪৫০ কোটি বছর আগে হয়েছে বলে

৭ ইলেকট্রণ-প্রোটনগুলি কিভাবে তৈরী হয় সেটা বিজ্ঞানীদের এখনো জানা নেই ব'লে সে কাজ, বা তারও আগের কাজ পরমাণু গড়ার চেয়ে কঠিন না সহজ, তাও জানা নেই। তবে যা দেখা যাচ্ছে তাতে একথাই মনে হয় সে-সব কাজ অধিকতর কঠিনই হবে, কারণ তা পদার্থের ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অবস্থার ব্যাপার।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এদের জন্ম একটি মৃত তারকার দেহাবশেষ-মেঘ থেকে হয়েছে বলে অনেকের অনুমান; সে মেঘে আমাদের পৃথিবী যে ৯২টি মৌলিক উপাদানের সমবায়ে গঠিত, তার সবগুলিরই পরমাণু তারকাটি গড়ে রেখে গিয়েছিল। সেগুলিই জুড়ে জুড়ে ক্রমে পৃথিবীর সবকিছুর, জটিল জীবদেহেরও রূপ নিয়েছে।[৮]

তারকার নবকলেবর :
শ্বেত বামন ও নিউট্রণ-তারকা

একটি তারকার মৃত্যু এবং তার দেহাবশেষ থেকে গ্রহ-উপগ্রহাদির জন্মের, তারকাটির পরজন্মের এই হল ইতিহাস। তারকাটি যদি খুব বেশী বড় আয়তনের হয়, তাহলে মৃত্যু-কালে বিস্ফোরণের সময় তার দেহের সবটাই এভাবে পরমাণু মেঘ (নেবুলা) হয়ে যায় না; বাইরের অংশটা তাই হয়ে যায় বটে, তবে কেন্দ্রের কাছাকাছি অংশটা বর্তুলাকারে থেকেই যায়, আর ক্রমান্বয়ে আকারে ছোট হতে থাকে; তার ঘনত্ব, তাপ আর ঔজ্জ্বল্য বাড়তেই থাকে। ছোট হতে হতে তার আয়তন যখন আমাদের এই পৃথিবীর মতো হয় (ব্যাস আট হাজার মাইল), তখন তাকে বলা হয় 'শ্বেত বামন' (White dwarf)। এই শ্বেতবামনের দেহের ঘনত্ব এত বেশী যে, এর এক চামচা বস্তুর ওজন একটনেরও বেশী।

আবার অনেক ক্ষেত্রে তারকাটির ক্রমশঃ ছোট ও ঘন হওয়া এখানেও থামে না—আরো ছোট হয়ে মাত্র ১৫ থেকে ৩০ কিলোমিটারে (৯½ থেকে ১৯ মাইলে) এসে দাঁড়ায়। তখন এর এক চামচা বস্তুর ওজন হয় একশো কোটি টন। এর নাম 'নিউট্রণ তারকা' (neutron star)। তারকাটি এর চেয়ে আর ছোট হতে পারে না।

কেন পারে না? আর কেনই বা তার ওজন এত অবিশ্বাস্য রকমে বেড়ে যায়?

আমরা আগেই দেখেছি, সৃষ্টিতে যা কিছু জড়বস্তু আছে, তা সবই ইলেকট্রণ, প্রোটন ও নিউট্রণ কণা দিয়ে তৈরী; আসলে ইলেকট্রণ আর প্রোটন দিয়েই তৈরী, কারণ একটি ইলেকট্রণ ও একটি প্রোটন কণা জোড়া লেগেই নিউট্রণ কণা হয়।[৯] পরমাণুর ভেতরটা আর একবার দেখি আমরা। কেন্দ্রে যখন এক বা একাধিক প্রোটন ও নিউট্রণ কণা জোড়া লেগে থাকে, আর তার অনেকখানি দূর দিয়ে কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন আছে তার সমসংখ্যক ইলেকট্রণ কণা ঘুরতে থাকে, তখন ঐ ইলেক-ট্রণ কণা বা কণাগুলির গতিপথ বা গতিবেগ দিয়ে ঘেরা মহাশূন্যের অংশটুকুকেই বলা হয় পরমাণু। পরমাণু আমাদের কাছে নীরেট কণার মতোই মনে হয়, ব্যবহারিক দিক থেকে। কিন্তু আসলে তার ভেতরটা সবই প্রায় ফাঁকা। কতটা ফাঁকা, তার একটা মোটামুটি ধারণা আমরা করতে পারি,—পরমাণুর কেন্দ্রে যে কণাগুলি দানা বেঁধে থাকে, তা যদি একটা মটরদানার আকারের হয়, তাহলে তার দেড়শো ফুট দূর দিয়ে ইলেক-

৮ আমাদের সৌরজগৎ থেকে নিকটতম তারকায় যেতে লাগে চার বছর, আলোর বেগে যেতে পারলে; আর একটি কাছের তারকায় যাওয়া যায় ছয় বছরে; সেটিতে দুটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর কোন তারকায় সৌরজগতের মতো গ্রহ আছে কি না এখনো জানা যায় নাই; জানা কঠিনও, কারণ তুলনায় গ্রহগুলি এত ছোট যে, বহু দূরের তারকায় গ্রহ থাকলেও রেডিও-টেলিস্কোপ দিয়েও সেগুলিকে ধরা কঠিন।

৯ একটি প্রোটন কণার ব্যাসার্ধ $১\cdot৪ \times ১০^{-১৩}$ সেন্টি-মিটার, ওজন $১\cdot৬৭২৫ \times ১০^{-২৪}$ গ্রাম। একটি ইলেকট্রণ কণার ব্যাসার্ধ ও ওজন যথাক্রমে এর ১৮৫০ ভাগের একভাগ। একটি নিউট্রণ কণার ওজন $১\cdot৬৭৪৮ \times ১০^{-২৪}$ গ্রাম।

ট্রণগুলো ঘুরে বেড়াবে,; আর আমাদের মনে হবে ৩০০ ফুট ব্যাসের পরমাণুটি একটি নিশ্ছিদ্র গোলক। তার মানে ৩০০ ফুট ব্যাসের যে গোলকটিকে আমাদের নীরেট বলে মনে হয়, তার ভেতর 'বস্তু' জায়গা জুড়ে থাকে একটি মটরদানা যতটুকু, ততটুকু মাত্র, বাকী সবটাই ফাঁকা (মোটামুটি হিসেবে ইলেকট্রণ-গুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, কারণ সেগুলো তো প্রোটনের ১৮৫০ ভাগের একভাগ মাত্র)। এমনি কয়েকটা পরমাণু যখন জোড়া লেগে কোন পদার্থের অণু তৈরী করে, তখন সেগুলি জোড়া লাগে বাইরের ইলেকট্রণের গণ্ডীর সীমায়—পরমাণুর ইলেকট্রণগুলো যেন হাত ধরাধরি করে, ভেতরের ফাঁক যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়। বহু, বহুসংখ্যক অণু একত্র হলে তবে কোন পদার্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।[১০] এই অণুগুলির মাঝখানেও আবার ফাঁক থাকে; পদার্থের কঠিন অবস্থায় এ ফাঁক কম, তরল অবস্থায় তার চেয়ে বেশী, বায়বীয় অবস্থায় আরো বেশী। তাই বায়বীয় অবস্থা থেকে কোন পদার্থ তরল অবস্থায় এলে তার আয়তন কমে, কঠিন হলে আরো কমে; কিন্তু ওজন একই রকম থাকে। কারণ কোন পদার্থের ওজন তো নির্ভর করে তার ভেতরকার 'বস্তু'র—ইলেকট্রণ, প্রোটন ও নিউট্রণ কণার—ওজনের ওপর; আর এগুলোর সংখ্যা তো থাকে সব অবস্থাতেই এক। এখন, কোন রকমে যদি কোন কঠিন পদার্থের সব ইলেকট্রণ প্রোটন নিউট্রণগুলোকে ঠেলে নিয়ে একত্র জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে পদার্থটির ওজন একই থাকবে কিন্তু তার আয়তন যাবে বিপুল পরিমাণে ক'মে; কারণ পদার্থের 'বস্তু'গুলির, কণাগুলির মাঝখানকার ফাঁক আর কিছুই তখন থাকবে না। ৩০০ ফুট ব্যাসের একটি নীরেট লোহার গোলক তখন হয়ে যাবে একটা ছোট মটরদানার আকারের, অথচ ওজন তার থাকবে আগের মতোই—বত্রিশ লক্ষ টন।[১১] ঐ মটরদানার আকারের 'বস্তু'ই ছড়িয়ে থাকে ৩০০ ফুট ব্যাসের গোলকটি জুড়ে আর আমাদের মনে হয় ঐ ৩০০ ফুট ব্যাসের গোলকটি নিশ্ছিদ্র 'বস্তু'তে, নীরেট কঠিন লোহায় ভরা।

পদার্থটিকে আর ছোট করা যায় না, কারণ তার ভেতর আর ফাঁক থাকে না। আর, তার ভেতরকার সব কণাগুলিই তখন নিউট্রণ কণা; কারণ, যে কোন পদার্থে ইলেকট্রণ ও প্রোটন কণার সংখ্যা সমান থাকে ব'লে ইলেকট্রণ ও প্রোটনগুলি একত্র জুড়ে গিয়ে সবই তখন নিউট্রণ হয়ে যায়, একটিও ইলেকট্রণ বা প্রোটন বাড়তি থাকে না।

'নিউট্রণ-তারকায়' ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে। তারকাটি যত ছোট হয় তত ভারী হয়, মাধ্যাকর্ষণের চাপও তত বাড়ে, শেষে সেই চাপ ইলেকট্রণ কণাগুলোকে ঠেলে কেন্দ্রীণে মিশিয়ে দেয়, আর সব কেন্দ্রীণগুলোকে ঠেলে একত্র করে জুড়ে দেয়। তখন সমগ্র তারকাটিই একটি মাত্র কেন্দ্রীণ হয়ে ওঠে, যা কেবল নিউট্রণ দিয়ে গড়া। সেইজন্যই এই তারকার নাম দেওয়া হয়েছে নিউট্রণ-তারকা।

এই নিউট্রণ-তারকা প্রথম আবিষ্কৃত হয়

১০ খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এগুলি 'দেখা' সম্ভবই নয়, কারণ এগুলির ব্যাস আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়েও ছোট। এগুলির সঙ্গে ধাক্কা খেলে আলোক-তরঙ্গ চূর্ণ হয়ে যায়, প্রতিহত হ'য়ে আমাদের চোখের দিকে ফিরে আসে না।

১১ পৃথিবীতে লোহার (steel) ওজন: একঘন ফুট—৪৯০ পাউণ্ড, বা প্রায় ২২৩ কিলোগ্রাম।

কেম্ব্রিজে, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে। তারপর এই তিন বছরের মধ্যে আরো ৪০টি নিউট্রণ-তারকা আবিষ্কৃত হয়েছে।

এগুলিকে 'পালসার'-ও (pulsar) বলে। এগুলি নিয়মিত ভাবে, নিয়মিত ব্যবধানে ক্রমাগত অবিশ্বাস্য রকমের শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ মহাশূন্যে ছড়িয়ে চলেছে। পৃথিবীতে প্রথম যেদিন সেগুলি ধরা পড়ল, অনেকেই তখন ভেবেছিলেন বিশ্বের কোন প্রান্ত থেকে আধুনিক মানুষের চেয়েও বিজ্ঞানে বহু উন্নত কোন প্রাণী বুঝি এই প্রবল শক্তিশালী বেতার সংকেতগুলি পাঠাচ্ছে।

তারকার মহামৃত্যু : 'কালো গহ্বর'

এ পর্যন্ত তারকার মৃত্যু সম্বন্ধে যা কিছু বলা হল, তা আসলে তার দেহের রূপান্তর মাত্র। একে যদি মৃত্যু বলা হয়, তাহলে তারকার মহামৃত্যুও আছে—যার পর তার আদি অবস্থা পরমাণুচূর্ণও অবশেষ থাকে না, তার সঙ্গে পরমাণুর মিশ্রণের মেঘও না, এ-সবগুলির একত্রীভূত অবস্থা কেবল নিউট্রণও না; বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে যে উপাদানগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার কিছুই থাকে না। তারকাটি শূন্যগর্ভ, 'কালো গহ্বর' (black hole) হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, নিউট্রণ-তারকার নিজের প্রচণ্ড চাপের ফলেই এরূপ ঘটে। অবশ্য এই 'কালো গহ্বর'-এর ধারণাটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমানমাত্র; কালোগহ্বর এখনো একটিও আবিষ্কৃত হয় নাই। কি অনুমান করেন তাঁরা? নিউট্রণ তারকার উপাদান নিউট্রণগুলি কি হয়ে যায় তখন? শূন্য তো আর হয়ে যেতে পারে না, কোন বিজ্ঞানীই তা বলবেন না—বিজ্ঞান-জগতে আজ পর্যন্ত কোন নজির নেই যে শূন্য হতে কিছু হয়েছে, বা কোন পদার্থ শূন্য হয়ে গেছে। যা হোক অন্য একটা কিছু সত্তা বা 'বস্তু'তে কোন 'বস্তু' রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র; বিশ্বে তাই-ই ঘটছে অবিরাম। তাহলে নিউট্রণ-তারকাটি এ কালো গহ্বরে লুকালো কোথায়? বা, এখন কিছুতে রূপান্তরিত হল কি, যা ইলেকট্রণ-প্রোটন-নিউট্রণেরও উপাদান, যা চুম্বক-বিদ্যুৎ-তরঙ্গমাত্র, বা তার চেয়েও সূক্ষ্ম কিছু, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এখনো? অনেকে অনুমান করেন, তা হতেও পারে। কিন্তু যাই-ই হোক, তাঁদের অনুমান এ গহ্বর অতলস্পর্শী, এর আকর্ষণও এত বেশী যে, এর ভেতর থেকে শব্দ, আলোক-তরঙ্গ, তাপ প্রভৃতি কোন কিছুই এর আকর্ষণ কাটিয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। আবার বাইরে থেকে কিছু এর ভেতর একবার পড়লে আর বেরুতেও পারে না। এ কালো গহ্বর সর্বগ্রাসী। কাজেই রেডিও-টেলিস্কোপ দিয়েও এর অস্তিত্ব জানার কোন উপায় নেই।

তাই যদি হয়, তাহলে এ কালো গহ্বরের অস্তিত্বের কথা আদৌ অনুমান করা হয় কেন?

অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, বিশ্বের সর্বাধিক উজ্জ্বল আলোক, রহস্যময় 'কোয়াসার'-গুলিই কালো গহ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোয়াসারগুলি (quasars বা quasi-stellar objects) আমাদের রেডিও-টেলিসকোপের ধরা ছোঁয়ার সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত। প্রথম কোয়াসার আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে; তারপর শত শত কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বলেই মনে হয়; কারণ এগুলি আয়তনে আমাদের সূর্যের চেয়ে দশলক্ষগুণ বড়, আর আমাদের সমগ্র ছায়াপথের ঔজ্জ্বল্য এক করলে যা হয়, তার চেয়ে শতগুণ বেশী উজ্জ্বল। কি হতে পারে

এগুলি ?

পৃথিবীর অতি সুবিদিত জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে কয়েকজন মনে করেন, কোন 'কালো গহ্বর' কর্তৃক বিরাট আকারের একটা বিপর্যয় সৃষ্টির ফলেই এই কোয়াসারগুলির উৎপত্তি। যখন প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একটা তারকা-জগৎকে প্রচণ্ডভাবে চেপে 'নিঃশেষ' করে ফেলে, এবং তার পর সে শক্তিকে বাধা দেবার মতো কিছুই আর থাকে না, তখন সে বিপুল শক্তি বাইরে হাত বাড়িয়ে কাছাকাছি যত তারকা থাকে সবগুলিকে টেনে এনে নিজের করাল গ্রাসে পুরে নিঃশেষ করে দেয়। এর ফলে কালো গহ্বর আরো বড়, আরো শক্তি-শালী হয়ে ওঠে।

এভাবে বড় হতে হতে কালো গহ্বর যখন এতখানি বড হয়ে ওঠে যে একটা ছায়াপথের সবটাকেই বা কিয়দংশকে টেনে এনে পেটে পোরার মতো শক্তিশালী হয়, তখন ছায়াপথের নিযুত নিযুত তারকা সমবেত ভাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই করাল গ্রাস থেকে নিজেদের বাঁচবার জন্য। কালো গহ্বরের আকর্ষণের সঙ্গে তারকাপুঞ্জের এই সংগ্রামের ফলেই কোয়াসার-রূপ বৃহদায়তন বিপুল জ্যোতির উদ্ভব।

আমরা দেখলাম, আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্ব-সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছে, খালি চোখেই হোক আর যন্ত্রের সাহায্য নিয়েই হোক, তার বাইরের দিকে তাকিয়ে তার বিস্তারের কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় নাই; আবার ভেতরের দিকে তাকিয়েও তার ক্ষুদ্রতম ও সূক্ষ্মতম সত্তার সন্ধান এখনো মেলে নাই। আমাদের দৃষ্টি যত দূরপ্রসারী এবং যত সূক্ষ্ম-দর্শী হচ্ছে বিশ্ব যেন সৃষ্টির মূল রহস্যকে তত বেশী জটিল করে তুলছে।

নমো সুন্দর নিরুপম*

পদ্মশ্রী নলিনীবালা দেবী

[অনুবাদিকা : শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা]

নমো সুন্দর নিরুপম
সুরভি বিহীন বন কুসুমের
দীন পূজা আয়োজন
সুন্দর নিরুপম।

তোমার চরণধূলির পরশে
প্রাণশতদল ফুটিছে হরষে
প্রেমের মহান মন্ত্র-ধ্বনিতে
মোর সঙ্গীত অনুপম
সুন্দর নিরুপম।

পরম তৃষায় তনুতে নৃত্য-ছন্দ
মুগ্ধ প্রাণে যে সুরের অগরু-গন্ধ
পুষ্প-পরাগে চর্চিত মোর
সুরভিত চন্দন
সুন্দর নিরুপম।

* সুবিখ্যাত অসমীয়া নারী কবি শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর 'সাহিত্য একাদেমী'-পুরস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 'অলকানন্দা' থেকে মূল কবিতাটি গৃহীত।

দেবী কন্যাকুমারী*

ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে দেবী কন্যাকুমারীর মন্দির। শহরটিরও নাম কন্যাকুমারী। মন্দিরাভ্যন্তরে দেবী কুমারী জপমালা হস্তে পূর্বাস্য হইয়া দণ্ডায়মান।

তামিলসংগম গ্রন্থে পাওয়া যায়, দেবী কুমারী পাণ্ড্যান রাজাদের গৃহদেবী ছিলেন; এ মন্দির নির্মাণ করেন রাজারাই।

কেরল অঞ্চলের উৎপত্তি এবং দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত। শ্রীভগবানের ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম একদা তাঁর সমস্ত ভূমি প্রজাদের বিলিয়ে দিলেন, নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না। যখন দেখলেন সব প্রজাই জমি পেয়েছে, তখন সমুদ্র-দেবতা বরুণের অনুমতি নিয়ে গোকর্ণ থেকে ছুঁড়ে নিজের কুঠারখানি সমুদ্রে ফেলে দিলেন। সেই কুঠারের আঘাতেই সমুদ্রগর্ভ থেকে কেরল অঞ্চল জেগে উঠল। জনশ্রুতি যাই হোক, কেরলের মাটি দেখে কিন্তু মনে হয় তা একদিন সমুদ্রতলই ছিল।

দেবী কন্যাকুমারীর আখ্যান হল এইরূপ:

একদা দানবরাজ বনাসুরের অত্যাচারে ত্রিভুবন ভরে যায়। ন্যায় ধর্ম সব লোপ পায়। দেবতা, ঋষি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের দুর্গতির আর শেষ থাকে না। এর প্রতীকারের জন্য তাঁরা সবাই মিলে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু পরা-শক্তির আরাধনা করতে বললেন। তাঁর কথা-মত দেবতা ও ঋষিরা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। দেবী প্রসন্না হয়ে দেখা দিলে সকলে প্রার্থনা জানালেন, 'মা, বনাসুরকে বধ কর।' দেবী অভয় দিয়ে অন্তর্হিতা হলেন।

তারপর দেবী কুমারীমূর্তি ধারণ করে সাগরমধ্যস্থ শিলাখণ্ডের উপর তপস্যা করতে লাগলেন। কুমারীর বিবাহযোগ্য বয়স হলে সেখান থেকে দশমাইল দূরবর্তী সুচিন্দ্রম্-মন্দিরের শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেবার সিদ্ধান্ত হয়। শিবের অনুমতি নিয়ে বিবাহের দিনস্থির হল, বিবাহান্তে ভূরিভোজনেরও আয়োজন চলতে লাগল।

এদিকে নারদ ভাবলেন, এ তো ঠিক হচ্ছে না। কারণ বিষ্ণুর কাছে তিনি শুনেছেন বনাসুর কেবল কুমারীর বধ্য। কন্যাকুমারীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়ে গেলে তো বনাসুরবধ আর হবে না! নারদ কৌশলে এ বিবাহ ভেঙ্গে দিতে মনস্থ করলেন। তিনি এসে ঘোষণা করলেন, বিবাহের সব চেয়ে ভাল লগ্ন রয়েছে নির্ধারিত তারিখে মধ্যরাত্রে।

শিব তো ভোলানাথ। নারদের কথামত বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি মন্দির থেকে যাত্রা করলেন, যাতে মধ্যরাত্রের আগেই কন্যাকুমারীতে পৌঁছান যায়। শিব যখন বাঝুকম্পরাই পৌঁছেন, গন্তব্যস্থল যখন আর তিন মাইল মাত্র দূরে, নারদ তখন কাকের রূপ ধরে পথের ধারের একটি গাছে বসে ডাকতে শুরু করলেন। কাকের ডাক শুনে শিব ভাবলেন তা হলে তো ভোর হয়ে গেছে, বিবাহলগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখন আর গিয়ে লাভ নেই। তিনি সেখান থেকেই ফিরে এলেন।

এদিকে শিব না আসায় কন্যাকুমারীর বিবাহ তো হতেই পারল না, বিবাহান্তে

---

* সংগ্রহ।—সঃ

ভূরিভোজনের আয়োজনও সব ভণ্ডুল হল। সব খাদ্য বালুকায় পরিণত হয়ে গেল। সেই নানাবর্ণের, নানা আকারের বালুকাকণাগুলিই তো আজও ছড়ানো রয়েছে কন্যাকুমারীর মন্দিরের সামনের বেলাভূমিতে! অনেকগুলির আকার আবার চালের মতো। সেই থেকে দেবী কুমারীই আছেন।

এদিকে বনাসুর কন্যাকুমারীর অপরূপ রূপের কথা শুনে তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাল। কন্যাকুমারী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় বনাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে এসে হাজির হল কন্যাকুমারীকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। কন্যাকুমারীর সঙ্গে বনাসুরের ভীষণ যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে দেবী বনাসুরকে বধ করলেন।

এখনো প্রতি বছর নবরাত্রি উৎসবের সময় এই বনাসুরবধ-স্মরণে আনন্দোৎসব করা হয়। মন্দির হতে মাইল দুয়েক দূরে মহাদনপুরম্-এ শোভাযাত্রা করে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দেবীর পুরোহিতগণ বনাসুরবধ অভিনয় দেখান।

যে শিলাটির উপর দেবী তপস্যা করেছিলেন তার উপর একটি চিহ্ন দেবীর পদচিহ্ন বলে খ্যাত। আমেরিকা যাত্রার কিছু পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ এই শিলাটিরই উপর বসে ধ্যান করেছিলেন। শিলাটি এখন তাই বিবেকানন্দ-শিলা নামে পরিচিত। এই শিলাটির উপর নির্মিত বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন হয় কিছুদিন আগে। দেবীর পদচিহ্নের উপর নির্মিত মণ্ডপটির উদ্বোধন হয়েছে তার কয়েকদিন পূর্বে।

নমো বিবেকানন্দায়

শ্রীসুধীরকুমার কর

অতীতে চ হি যো ভাবি-
কালে নিরুপমো ভবে।
তমোঘ্না যস্য ধীরে কা
শ্রীহীনো যো কদাপি ন॥
তস্মৈ নিত্যং মহানন্দ-
দায়িনে হৃত্তমোহৃতে।
বীরেশ্বরাখ্য ভীহীন
বিবেকানন্দ তে নমঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিজন ভবনাথ

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ

'কথামৃত' গ্রন্থে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বহুরূপে বহুভাবে আমরা ভবনাথের দর্শন পাই। নরেন্দ্র-ভবনাথ যেন এক বৃন্তে দুই পুষ্প, শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় একান্তভাবে নিবেদিত। কিন্তু পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ সত্যই নরশ্রেষ্ঠ, দেশে বিদেশে বন্দিত; আর ভবনাথ ভবার্ণবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই জানতে পারা যায় তিনি মাষ্টার মশায়ের (শ্রীম) আগেই দক্ষিণেশ্বরের শ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত।

কথামৃত প্রথম ভাগ ৭ম খণ্ডে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল এরা সব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি।' [১৮৮২ খ্রী: মার্চ মাস]

'কথামৃতে' ১৮৮৩ খ্রী: এপ্রিল মাসের অপর চিত্রে দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা করে ভক্ত বলরামের গৃহে মধ্যাহ্নে প্রসাদগ্রহণে গিয়েছিলেন। তখন বলরামবসুকে তিনি বলেছিলেন—নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল ও আরও দু-একটি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করতে। আর বলেছিলেন—"এদের খাইও, তাহলেই অনেক সাধুকে খাওয়ানো হবে।"

১৮৮৫ খ্রী: অপর চিত্র: ২৩শে ডিসেম্বর কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলছেন—"এ অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ, আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই' জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ। ভবনাথকে দেখলে না, শ্যামপুকুরে বরটি সেজে এলো। জিজ্ঞাসা করল কেমন আছেন, তারপর দেখা নাই। নরেন্দ্রর খাতিরে তাকে ঐ রকম করি কিন্তু মন নাই।"

ভবনাথ সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার ইচ্ছায় অনুসন্ধানে জানতে পারলাম তাঁর একমাত্র কন্যা এখনও জীবিত আছে। তাঁর কাছে কোন নতুন তথ্যাদি হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

সেই বর্ষীয়সী মহিলার (ভবনাথ-কন্যা) নাম শ্রীমতী প্রতিভা দেবী বর্তমান বাসস্থান ভবানীপুর বিহারী ডাক্তার রোডে। একদিন (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮) শীতকালের সন্ধ্যার পরে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম, শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-সহচর ভবনাথের জীবন-কাহিনী জানবার জন্য, নতুন কিছু তথ্য পাবার আশায়।

পশ্চিমমুখো বাড়ীর ফটকের ভেতর দিয়ে আমাদের পৌঁছিয়ে দেওয়া হল বৃদ্ধার সমীপে দোতলার ঘরে। একখানা খাটে তিনি বসে আছেন; তাঁরই ভাসুরপুত্র আমাকে তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে বললেন—ইনি আপনার কাছ থেকে আপনার পিতা কথামৃতের 'ভবনাথ' সম্বন্ধে কিছু জানতে আর শুনতে চান।

আমাদের বসতে দিলেন বৃদ্ধা। এ বয়সেও তাঁর দেহের গৌরবর্ণের লাবণ্য ক্ষীণ হয়নি।

তিনি বললেন—'আমার কি আর অতো পুরানো দিনের কথা স্মরণে আছে! বয়স তো প্রায় আশির কাছাকাছি।'

বললাম, 'আপনাকে দেখে তো মনে হয়, আপনার দেহকান্তি দেখে বার্ধক্য ভয়ে আপনার

কাছ থেকে দূরে পালিয়ে আছে। আর আমরা যা তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পেরেছি কথামৃত আর উদ্বোধন পত্রিকা থেকে, তাতে এখন আপনার বয়স ৭৬ বছর পার হতে চলেছে।'

বৃদ্ধা—'তোমরা জানলে কি করে?'

বললাম, 'কেন, উদ্বোধনের এক প্রবন্ধে আছে ভবনাথের জন্ম ১২৭৪ সালে. আর মৃত্যু ১৩০৪ সালে, তখন ভবনাথের কন্যার বয়স মাত্র ছয় বছর।'

বৃদ্ধা হেসে বললেন—'তা হলে দেখছি আমার কোষ্ঠী তোমাদের হাতে রয়েছে!'

বৃদ্ধার এ কথায় আমরা হেসে ফেললাম আর বললাম—'চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি দেখি শুক্লকৃষ্ণপক্ষে, কিন্তু চাঁদের নিজের কিছু হয় না। কিন্তু তা দেখে জগতের লোক নিজেদের তিথি-নক্ষত্রের করণীয় ঠিক করে নেয়। কথামৃতে পাই ভবনাথ সুপুরুষ ছিলেন। 'আপনার সে-সব কিছু মনে আছে?'

বৃদ্ধা হাসতে হাসতে বললেন—'আমার মা বাবা দুজনেরই দেহের রূপ-লাবণ্য আর নিটোল স্বাস্থ্য ছিল। বাবার যেমনি গৌরবর্ণ দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান চেহারা, তেমনি সুকণ্ঠ। মায়ের গায়ের রং ছিল বেশ ফর্সা। আমি তাঁদের কোনো গুণের অধিকারী তো হইনি, রূপেরও কিছু পাইনি। বাবা কিন্তু চাকরী উপলক্ষে পূর্ববঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্য নষ্ট করে ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে হীনস্বাস্থ্য হয়ে পড়েছিলো।'

বিয়ের পরে শ্বশুরকুলে এসে রামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগও কমে যায়। শ্রীশ্রীমাকে দেখেছি, কিন্তু শ্রীমকে দেখা ভাগ্যে হয়নি।

আমার ঘরের দেয়ালে ঐ দেখ আমার মা-বাবার ছবি। ঘরের পশ্চিমের দেয়ালে একখানা বড় ফটো। তিনজনের। একটি ছোট্ট বালিকা, ফ্রকপরা, চেয়ারের মধ্যে পা গুটিয়ে বসা; আর একজন গলাবন্ধ জামাপরা, দস্তুরমত সুপুরুষ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তাঁর বামে ঐ যে পুরানো দিনের সর্বঅঙ্গ জামায় ঢাকা, মাথায় শাড়ী টেনে দেওয়া মহিলা, তিনিও চেয়ারে বসা।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'ছবিখানি বুড়ো হয়েছে, আপনি কিন্তু এ বয়সেও বুড়ো হতে পারেননি।'

বৃদ্ধা বলতে লাগলেন, 'সেদিনের ফ্রকপরা ঐ ছোট্ট মেয়েটিই তোমাদের সামনে থান-পরা বুড়ী আর ঐ ভদ্রলোকই শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই সঙ্গে আমার মাতা।'

এই ফটো দেখেই মনে পড়ল, ফটো-সংক্রান্ত ব্যাপারেই ভবনাথ রামকৃষ্ণলীলায় বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অপরূপ চিত্র নিজ অন্তরে গ্রহণ করেছেন, আর ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় উপবিষ্টাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের যে ফটোচিত্র সর্বত্র সর্বজনের শ্রদ্ধা গ্রহণ করে, সেই ফটোও ভবনাথের উদ্যোগে তোলা হয়েছে। ভবনাথ কৌশল করে বরাহনগরের অবিনাশচন্দ্র দাঁ দ্বারা দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুমন্দিরের সামনের রোয়াকে সমাধিস্থ (বসে থাকা) শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো তুলেছিলেন। এই একটি কাজের দ্বারাও ভবনাথ রামকৃষ্ণলীলায় বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ফটোটিই আজ ঘরে ঘরে পুজিত হয়।

ভবনাথই বরাহনগরের পুরানো মঠবাড়িটি (মাত্র দশ টাকা ভাড়ায়) খুঁজিয়া দিয়াছিলেন।

কথার স্রোত অন্যদিকে গড়াতে লাগলো। আমি বললাম, 'আপনার পরিবারের অপর সকলের নাম জানতে পারি কি?'

বৃদ্ধা বললেন—'আমার নাম প্রতিভাদেবী। হালকালের বদলানোর পাল্লায় মুখার্জি হইনি। বাবার নাম তোমরা জান, স্বামীর নাম, ভাসুরের নাম তোমরা সংগ্রহ করবে। তবে একটি কথা—মায়ের নামটা বলব না।'

'কেন বলবেন না?'

'ঠাকুরের সেই গল্পটি জান তো? একটি মেয়েছেলের ভাসুরদের নামে হরি কৃষ্ণ ইত্যাদি থাকাতে সে জপ করত···ফরে ফ্ষ্ট ফরে ফ্ষ্ট ফ্ষ্ট ফ্ষ্ট ফরে ফরে·। আমারও প্রায় সে অবস্থা। চাঁদের মধ্যে আমার মা আর ভাসুর লুকিয়ে আছেন। বল তো কি নাম হবে?'

'তবে কি তাঁর নাম চন্দ্রমুখী, চন্দ্রকণা, শশীবালা এরকম কিছু?'

'হাঁ, প্রায় কাছাকাছি এসেছ, মায়ের নাম ছিল কিরণশশী। শেষ অংশটুকু ভাসুরের নাম কিনা, তাই নিতে সঙ্কোচ। তাই চাঁদ দেখলে মা আর ভাসুরকে একসঙ্গে মনে পড়ে। আর আমি মুখে উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ বোধ করি। তোমরা আমাকে হয়তো সেকেলে বলে উপহাস করতে পার।

ঠাকুরমার নাম ইচ্ছাময়ী দেবী। মামাবাড়ী মল্লিকপুরে (ডায়মণ্ড-হারবার লাইনে)।

আমার কর্তা মেয়ের নাম রেখেছিলেন রাণী; আর ছেলেদের নাম রেখেছিলেন কামজিৎ ক্রোধজিৎ লোভজিৎ মোহজিৎ। কাম ক্রোধ লোভ আমার সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে। মোহকে নিয়েই এখন সংসারে বদ্ধ হয়ে বেঁচে আছি।'

'আমরা কিন্তু সংগ্রহ করেছি আপনার স্বামীর নাম ৺শরৎচন্দ্র মুখার্জি, ভাসুরের নাম ৺শশিভূষণ মুখার্জি।

আপনার বাবার সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন।'

'নতুন কি আর বলব। যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে। কথামৃতে যা আছে, তার বাইরে কিছু বলতে গেলে সে সব হবে বাজে কথা।

বাবার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন মায়ের বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। আমি তাঁদের একমাত্র কন্যা; এটি একদিক দিয়ে ঠিক, কারণ আমার অপর এক ভগ্নী আড়াই বছরে মারা যায়। তাকে হিসাবের মধ্যে কেউ ধরেনি।

বেলুড় মঠ থেকে যখন আমার কাছে ভবনাথের বড় ফটো চাওয়া হয়েছিল, তখন আমি ঐ গ্রুপ ফটো তাঁদের দেখাই। তাঁরা সন্ন্যাসী, মেয়েছেলের সঙ্গে ছবি পছন্দ করলেন না। তাঁর অপর একটি ছবিও আমার কাছে ছিল, যে ছবিতে ভবনাথের কাঁধে স্বামীজীর হাতের ছাপশুদ্ধো উঠেছে। তাঁরা সে ছবি গ্রহণ করলেন। সেই ছবির বৃহদাকার (enlarged) ফটো কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আছে। মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের কাছে ঐ ফটো দেওয়া হয়েছিল।

স্বামীজীর ভালবাসার তো তুলনা নেই, তিনি ভবনাথকে ভালবাসতেন আন্তরিকভাবে। যে জন্য ভবনাথের মেয়েকেও তিনি স্নেহ করতেন। সেকারণে বাবার অবর্তমানে আমার বিয়েতে বেলুড় মঠ থেকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। মনে পড়ে, আমি স্বামীজীর আদর পেয়ে কোলেও উঠেছিলাম।'

এইটুকু বলেই বৃদ্ধার চক্ষু বাষ্পাকুল হল, আমাদের মুখের ভাষাও স্তব্ধ হয়ে গেল।

সোনার মানুষ

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

"কে যে কৃষ্ণ রাধাকান্ত—কে যে রাধা কৃষ্ণবিনোদিনী,"
এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে খুঁজে অখণ্ড মেদিনী
ভক্তেরা ব্যাকুল যবে, জন্ম নিয়ে তুমি বাঙ্গলায়
নদীয়ার মিশ্রগৃহে, ব্রজভাব-কদম্ব তলায়
দেখালে তা জানালে তা ওহে রাধা-প্রেমাব্জ-মধুপ
শিখালে তা জনে জনে ; পরিতৃপ্ত হলো ভক্তগণ
হেরিয়া তোমার মাঝে রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন।

কৃষ্ণ যে লুকাতে চায় আপনারে রাধার ছায়ায়—
রাধা চায় ডুবে যেতে ষোলআনা কৃষ্ণের কায়ায়
সে খেলা দেখায়ে নিজ ভাবে, ধর্মে, কর্মে, আচরণে
বিশ্বাস আনিয়া দিলে অভিমানী সংশয়ীর মনে।

বিশ্ব যাহা পারে নাই, হে মহান্, নিজ মহিমায়
তুমি তাহা করিয়াছ, অসীমেরে এনেছ সীমায় !
একত্ববাদের ঋষি, "ভগবান্ এক না অনেক"—
বুঝিতে পারে নি যাহা বড় বড় জ্ঞানীর বিবেক—
যাহা নিয়ে এত কথা, এত তর্ক, এত আলোড়ন,
তাহাই বুঝায়ে দিল হে প্রেমিক, তোমার জীবন !

ত্যাগপূত চিত্তে তব অদ্বয় অরূপ পারাবারে
মেশে লীলা, ভাসে পুনঃ অতিশুদ্ধ ভক্তির আধারে !
দীনার্ত্ত জনের বন্ধু, কে তুমি হে সোনার মানুষ—
পুণ্য, প্রেম, নাম-মূর্তি নবদ্বীপচন্দ্র নিষ্কলুষ।
তোমার শীতল, স্নিগ্ধ, উচ্ছ্বসিত চন্দ্রিকা ধারায়
অবগাহি ইন্দ্র চন্দ্র দেবাদিও ধন্য হতে চায় !

সমালোচনা

জগদ্‌গুরু বিবেকানন্দ: ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক: সাধনা সোম, সবিতা প্রকাশন, সি ৩২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা: ২২১। মূল্য: পাঁচ টাকা।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উপর স্বামীজীর ভাবের প্রভাব পড়ে ছাত্রজীবনেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের কয়েক জনের, বিশেষ করিয়া স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলি পুনরায় পড়িয়া তিনি এই জীবনীটি রচনা করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ছোট বড় অনেক জীবনী বাহির হইয়াছে, তবে আবার এই নূতন প্রচেষ্টা কেন? ইহার উত্তরে লেখক বলিয়াছেন, 'ভাল জিনিস যত বিভিন্ন ভাবে লোকের সামনে ধরা যায়, ততই ভাল।' সেদিক দিয়া আদর্শনিষ্ঠ-জীবন ডঃ ঘোষের লেখা এই 'জগদ্‌গুরু বিবেকানন্দ' বইটির যথেষ্ট মূল্য আছে বলিয়া মনে করি।

বইটির প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী সংক্ষেপে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ ইহারই মধ্যে স্বামীজীর জীবনের সব প্রধান ঘটনাগুলিকে লেখক স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন। রচনাভঙ্গী সহজ ও সাবলীল।

জীবনী আরম্ভের পূর্বে ২৪ পৃষ্ঠার ভূমিকায় লেখক তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী স্বামীজীর একটি ভাবমূর্তি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই অংশে এবং জীবনী অংশের মধ্যেও মাঝে মাঝে ঘটনার উপর এবং কোথাও কোথাও স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করিয়া লেখক মন্তব্য করিয়াছেন। সেগুলির অধিকাংশই আমাদের ভাল লাগিল। তবে, স্বামীজীকে 'ভক্তিপ্রধান' (পৃঃ ৬) বলা, 'নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী স্বামীজী এর (সেবার) ওপর বেশী জোর দিয়েছেন' (পৃঃ ১০), ইত্যাদি জাতীয় দু-চারটি মন্তব্যের সহিত আমরা একমত নই। কয়েকটি তথ্যগত মন্তব্য পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্তিত করিলে ভাল হয়। যেমন, স্বামীজী 'এই সময় মা সারদাদেবীর প্রেরণায় সংসার ত্যাগ করাই স্থির করেন' (পৃঃ ২৩) (এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নেই), 'ডেট্রয়েটে বিষ খাইয়ে মারতে পারে এমন ধারণাও হয়েছিল স্বামীজীর' (পৃঃ ৯২), '১৮৯০ সালের পর উভয়ের মধ্যে (স্বামীজী ও প্রমদাদাস মিত্র) কোন চিঠির আদান-প্রদান হয় নি' (পৃঃ ৪৭)। ডেট্রয়েটে স্বামীজী পানীয়-গ্রহণে উদ্যত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখা দিয়া উহা খাইতে নিষেধ করেন; কাজেই পূর্বে এ বিষয়ে তাঁহার কোনওরূপ 'ধারণা' হইবার অবকাশ নাই। প্রমদাদাস মিত্রকে ৩০শে মে, ১৮৯৭-এ লেখা স্বামীজীর একটি চিঠি আছে, এবং উহাতে স্বামীজী লিখিতেছেন যে, ইহার পূর্বে ৪।৫ বছর উভয়ের মধ্যে কোন চিঠির আদান-প্রদান ছিল না; অর্থাৎ ১৮৯২-৩ পর্যন্ত ছিল।

এই রকম সামান্য দু-চারটি বিষয় ছাড়া সমগ্র গ্রন্থটি খুব সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ : (তৃতীয় খণ্ড) : স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। প্রকাশক : রাম কৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, পোঃ বারাসত, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৪৭৬ ; মূল্য ৬'৫০।

মানবজীবনের সেরা তিনটি সৌভাগ্য —মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয়। এ তিনের শুভ সম্মেলন যদি কারু জীবনে ঘটে তাহলে তিনি নিজে যেমন ধন্য, তেমনি তাঁর সংস্পর্শে এসেও মানুষ ধন্য হয়। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর পুণ্যস্মৃতিচারণের যে-ব্রত স্বামী অপূর্বানন্দজী গ্রহণ করেছিলেন, তৃতীয় খণ্ড স্মৃতিসংগ্রহে এসে সে ব্রত পূর্ণাঙ্গ। তবু, পাঠক হিসাবে আমাদের আশা এ মহা-জীবনে আরো যদি অজানা স্মৃতি কিছু থাকে, তাহলে চতুর্থ খণ্ডে আমরা যেন সেগুলি সংগৃহীত দেখি। কারণ যতই দিন যাবে ততই শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের সংখ্যা কমে আসবে।

এ-জাতীয় স্মৃতিকথায় ঘটনা এবং বাণী —দুই-ই মিশে থাকে। মাঝে মাঝে লেখকের আত্মকথনও অপরিহার্য। কোনো কোনো লেখায় শুধু মাত্র লেখকের ভক্তি-আবেগই দেখা দেয়, তথ্য বিশেষ কিছু থাকে না। তবু স্মৃতিপূজার উপকরণে এ সবই সার্থক উপকরণ। আচার্য শঙ্কর তো লিখেছেন,

'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥'

সন্দেহ নেই, জীবনতরণীর কর্ণধারকে একবার দেখতে পাওয়াও অপরিমেয় পুণ্যফল। সুতরাং সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের স্মৃতিচারণে যেখানে যতটুকু স্বর্ণরেখা অঙ্কিত হয়ে আছে, পাঠকের কাছে তা পরম মূল্যবান।

আর ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবনের ইতিহাস-রচনায় তাঁর সন্তানদের ব্যক্তিত্ব-মাধ্যমে বিচ্ছুরিত আলোকরাশি মানব-জাতিকে কল্যাণের আমোঘ নির্দেশ দেবে —একথাও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। পূর্ববর্তী দুটি খণ্ডের মতো এই তৃতীয় খণ্ডের সংকলয়িতা স্বামী অপূর্বানন্দজী তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

চরিতাম্ভ : শ্রীঅক্ষয়কুমার ভাণ্ডারী : প্রকাশক : যুগপ্রবর্তক প্রকাশিকা। পোঃ রাজপুর (মিশ্রপাড়া রোড) ২৪ পরগণা। দাম - ৫'০০ ; পৃষ্ঠা : ১৯৭।

যীশুখৃষ্টের অমর জীবনকথা অবলম্বনে শ্রীঅক্ষয়কুমার ভাণ্ডারী বাংলা সাহিত্যে একটি চরিতকাব্য উপহার দিয়েছেন। এ যুগে চরিতকাব্য-রচনার উদাহরণ বিরল। গদ্যসাহিত্য এসে কাব্যের এক বিশেষ উপকরণকে একেবারে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। তবু এখনও কেউ কেউ শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য চরিতকাব্য-রচনার পন্থা অনুসরণ করে থাকেন। কারণ অনুভূতির গভীর থেকে যা সৃষ্টি হয় তাই কাব্য। এ-ক্ষেত্রে গদ্য ও পদ্যে কোনো তফাত নেই।

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশটির যথাযথ অনুসরণে মূলতঃ ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে লেখা এই কাব্য যীশুজীবনীর পূর্ণাঙ্গ রূপ। ভক্তজনদের আনন্দের কারণ এবং সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসুর পক্ষে উপকারী। ভাষা ও ছন্দ আরো মার্জিত হলে পাঠকদের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী হতো। কিন্তু এ-জাতীয় প্রচেষ্টার আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

—নীলাঞ্জন সোম

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবা

গত জুনমাসে চারদিনব্যাপী প্রবল বারিবর্ষণ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার বিরাট অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত করিয়া জনগণকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে ফেলিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন গত ৪ ৯.৭০ হইতে এই সব-বিপন্ন বন্যার্তদের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন।

৪.৯.৭০ হইতে ১৬ ৯.৭০ পর্যন্ত হাওড়া জেলার লিলুয়া, বালী ও হাওড়ায়; কলিকতার ট্যাংরা, তপসিয়া ও বালিগঞ্জ অঞ্চলে; এবং রহড়া, বেলঘরিয়া, বরাহনগর, সাতগাছি, লাহা মার্কেট, দক্ষিণপাড়া, সরিষা ও টাকী অঞ্চলে এই সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন দৈনিক গড়ে প্রায় ৮০ হাজার ব্যক্তিকে সাহায্যদান করিয়াছেন।

বর্তমানে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া, জগৎবল্লভপুর, আমতা (১নং ব্লক) এবং দক্ষিণমানসিংহপুরে, হুগলী জেলার খানাকুল অঞ্চলের ৩০টি গ্রাম, আরামবাগ মিউনিসিপালিটির সমগ্র এলাকা জুড়িয়া (প্রায় ১০০ বর্গমাইল), এবং ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর ও বারুইপুর থানার ৭০টি গ্রামে (৮০ বর্গমাইল এলাকায়) এবং ডায়মণ্ড হারবারে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য চালাইতেছেন; সাহায্য পাইতেছেন দৈনিক গড়ে ১,২৭,০০০ জন।

প্রথমদিকে বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা হইতে বন্যার্তদের উদ্ধার করিবার কাজে মনোনিবেশ করা হইয়াছিল। বর্তমানে তাঁহাদের চাল, ডাল, গম, গুঁড়া দুধ, কাপড়, কম্বল, লণ্ঠন প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে।

আরো কিছুদিন ধরিয়া এই সেবাকার্য চালাইতে হইবে। এই সেবায় জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। যে কোন প্রকার সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে সাদরে গৃহীত হইবে:

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পো: বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

২। ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪

৩। কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন আফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৪। সম্পাদক, ইনস্টিটুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯

৫। সম্পাদক, সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বোস রোড, কলিকাতা-২৬

বেলুড় মঠ
২৭. ৯. ৭০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবা

অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চল গোবরা, ট্যাংরা তপসিয়া ও বালিগঞ্জে, হাওড়া জেলার বেলুড়, লিলুয়া ও বালি এলাকায়, এবং ২৪পরগণার রহড়া, বেলঘরিয়া, বরানগর সাতগাছি, লাহা-মার্কেট, দক্ষিণপাড়া, সরিষা ও টাকি অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৪. ৯. ৭০ হইতে ১১ ৯. ৭০ পর্যন্ত যে সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে দৈনিক গড়ে ১৯,৭৮৬ জন দুঃস্থ ব্যক্তির সেবা করা হইয়াছে।

বর্তমানে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বন্যার্ত-সেবাকার্য চলিতেছে :

(ক) **হাওড়া জেলায়** ডোমজুড়, উলু-বেড়িয়া, জগৎবল্লভপুর, আমতা ব্লক নং ১, এবং দক্ষিণ মানসিংপুর অঞ্চলে ;

(খ) **হুগলী জেলায়**—গোঘাট, খানাকুল (৩০টি গ্রামে), আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটির সমগ্র এলাকায় (১০০ বর্গমাইল স্থান) ;

(গ) **২৪ পরগণায়**—সোনারপুর ও বারুই-পুর থানায় ৮০ বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়িয়া এবং ডায়মণ্ড হারবার এলাকায়।

সেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা দৈনিক গড়ে ১,২৭,০০০।

সেবাকার্যের ধারা : বন্যাপ্লাবিত বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিপন্ন জনগণকে উদ্ধার করার পর বর্তমানে তাঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক চাল, আটা, ডাল, গুঁড়া দুধ এবং কাপড় জামা, প্যাণ্ট ইত্যাদি, কম্বল, ত্রিপল, লণ্ঠন ও ঔষধপত্র বিতরণ করা হইতেছে। কয়েকটি স্থানে বাসগৃহ নির্মাণের সরঞ্জামও সরবরাহ করা হইতেছে। গত ৪. ৯. ৭০ হইতে ২১.৯.৭০ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রদত্ত জিনিসপত্রের পরিমাণ :

চাল ৩০৮ কুইণ্ট্যাল, আটা বা গম ২,১৭১ কুঃ, ডাল ৩২০ কুঃ, চিড়া ১১কুঃ, গুড় ৩কুঃ, গুঁড়া দুধ ৫ কুঃ, রুটি ৩,৩৭৫ পাউণ্ড, পুরাতন বস্ত্রাদি ৪,০০০ খানি, নূতন বস্ত্রাদি ৩০০ খানি, কম্বল ১,৫০০ খানি, ত্রিপল ১০৮টি, লণ্ঠন ১৩৯টি।

হাসনাবাদ ও বসিরহাট উদ্বাস্তু ত্রাণ কেন্দ্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে ৩০. ৮. ৭০ পর্যন্ত মোট শরণার্থী আসিয়াছেন ১,৫৪,৭১৫ জন। তাঁহাদের মধ্যে ১৩. ৪. ৭০ হইতে ৩০. ৮. ৭০ পর্যন্ত বিতরিত ডোলসংখ্যা ৩৩,৯১,৪২২। অগস্ট মাস পর্যন্ত দেয় বস্তুর পরিমাণ : চাল ১১,০১০ কুইণ্ট্যাল ২৮ কেজি ; ডাল ১,১২৬ কুইণ্ট্যাল ৬০ কেজি ; আলু ৭৪ কুইণ্ট্যাল ৬১ কেজি ৪৪২ গ্রাম ; গুঁড়া দুধ ৯১ কেজি ৩০৮ গ্রাম ; চিনি ৪ কুইণ্ট্যাল ১১ কেজি ৫০০ গ্রাম ; লবণ ৭৬৮½ বস্তা ; পেঁয়াজ ৮৫৬½ বস্তা ; বার্লি ৪ ১½ পাউণ্ড।

সৌরাষ্ট্রে বন্যার্তসেবা

রাজকোট : প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বন্যা হয়। বন্যাপীড়িত নরনারীর সেবায় রাজকোট রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্থানীয় সাহায্যে ২৮ অগস্ট থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৯,৫৪০ জনের মধ্যে প্রস্তুত খাদ্য বিতরণ করেন। এ-ছাড়া ৪১৫ খানি কম্বল, ২৭১ সেট তৈজসপত্র ও ১৬ খানি শাড়ী

বিতরিত হইয়াছে।

মালিয়া :—খাদ্যবিতরণ ছাড়াও ৪২ মিঃ মার্কিন কাপড়, ১টি ধুতি, ১টি ছাপানো শাড়ী, ১টি ব্লাউজ, ১টি তপেলি, ১টি থালি, ১টি ভাটকা, ১টি গ্লাস এবং ১টি বড় চামচ সহ একটি করিয়া সেট প্রতি পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে; মোট ৫০০টি পরিবার এই সাহায্য পাইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনগর ও মালিয়ায় সেবাকার্যের বিস্তারসাধন সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করা হইয়াছে, শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। (২৭.৯.৭০)

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রমগুলির অন্যতম। সুদীর্ঘকাল এই সেবাশ্রম জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে অকুণ্ঠভাবে আর্তনারায়ণের সেবায় নিরত রহিয়াছে।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের ৬৩তম বর্ষের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৯—মার্চ, ১৯৭০) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ তীর্থ বৃন্দাবনে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই সেবাশ্রমে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, রেডিওলজি, এক্স-রে, ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রভৃতি সুপরিচালিত বিভাগে অ্যালোপ্যাথিক মতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান-সম্মত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বৃন্দাবন সেবাশ্রম বর্তমানে বিভিন্ন-বিভাগ-সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল।

সেবাশ্রমের দুইটি বিভাগ : ইনডোর এবং আউটডোর।

ইনডোর : অন্তর্বিভাগে ১০২টি শয্যা আছে। এই বিভাগে চক্ষুরোগী সহ আলোচ্য বর্ষে ২,৪৬৬ জন রোগী ভরতি হয় এবং ২,০৭৮ জন আরোগ্যলাভ করিয়া চলিয়া যায়। বর্ষশেষে ৫৭ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকে। অন্তর্বিভাগে চক্ষু-অস্ত্রোপচারসহ মোট ১,৩৩৩টি অস্ত্রোপচার করা হয়।

আউটডোর : আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ১,৪১,৭৮৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ২৬,৫৫৭। এই বিভাগে চক্ষুরোগী-সহ মোট ১,২১৫ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়। আউটডোরে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৮২।

আলোচ্য বর্ষে এক্স-রে বিভাগে ১,৭৮৬টি এক্স-রে ছবি তোলা হইয়াছে এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ২৫,১৭৫টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হইয়াছে। ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২৩০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ : সেবাশ্রমের হোমিওপ্যাথিক বিভাগটি একজন অভিজ্ঞ হোমিও-চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সুপরিচালিত; সাধারণত: এখানে শিশুদের এবং বহুপুরাতন রোগীদের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৭১৮ ও ১৬,৯৫৪।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের বিভাগগুলির মধ্যে চক্ষুবিভাগটিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। চক্ষু-বিভাগটি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। সুপরিচালিত এই বিভাগে সহস্র সহস্র চক্ষুরোগী নিরাময় হইতেছে।

রোগীদের জন্য সেবাশ্রমে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার করা হইয়াছে; এখানে উপযুক্ত পুস্তকাবলী এবং পত্রপত্রিকা রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে চিকিৎসকগণের জন্য একটি মেডিক্যাল লাইব্রেরিও রহিয়াছে।

পরলোকে স্বামী রামেশ্বরানন্দ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১-২০ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী রামেশ্বরানন্দজী (ভাব মহারাজ) ৭৭ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অর্শজনিত রক্তক্ষরণ এবং অত্যধিক রক্তাল্পতাই তাঁহার দেহ-ত্যাগের কারণ। বৎসর খানেক হইতে তিনি রক্তাল্পতায় ভুগিতেছিলেন। বেলুড় মঠ হইতে সপ্তাহকাল পূর্বে তাঁহাকে সেবা প্রতিষ্ঠানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

স্বামী রামেশ্বরানন্দ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ঐ বৎসরই তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে মন্ত্র-ও ব্রহ্মচর্যদীক্ষা লাভ করেন; তাঁহার নিকট হইতেই সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে।

তিনি জামতাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন। জনৈক ভক্ত কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়া জামতাড়ায় একটি আশ্রম করিবার জন্য বেলুড় মঠকে অনুরোধ জানাইলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। জামতাড়ায় বেশ কয়েক বৎসর কাটাইবার পর তিনি জীবনের বাকী অংশ প্রধানতঃ বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করেন। ইহার মাঝে মাঝে তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দুর্গম হিংলাজ তীর্থ যেগুলির অন্যতম।

স্বামী রামেশ্বরানন্দের দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ একজন মধুরভাষী, অমায়িক প্রকৃতির প্রাচীন সন্ন্যাসীকে হারাইল। তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

লুনা-১৬ মহাকাশযানের সাফল্য

রাশিয়ার মনুষ্যহীন মহাকাশযান লুনা-১৬ চাঁদের মাটি এবং অন্যান্য বহু তথ্য লইয়া গত ২৪শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা ৫৬ মিনিটে (ভারতীয় সময়) জেথাজগানের কজাক শহরের ৫০ মাইল দক্ষিণপূর্বে ধীরভাবে ভূমি স্পর্শ করিয়াছে। নামিবার পর চাঁদের মাটি এবং তথ্যসংগ্রাহক যন্ত্রগুলি হেলিকপটার করিয়া মস্কো লইয়া যাওয়া হয়।

লুনা-১৬ গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ১৭ই সেপ্টেম্বর চাঁদকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। পরে চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্বনিম্ন ১০ ও সর্বোচ্চ ৬৭ মাইল দূরত্বের একটি ডিম্বাকার পথে স্থাপিত হইয়া দুইদিন এভাবে চন্দ্রপ্রদক্ষিণের পর ২০শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০-৪৮ মিনিটের সময় চাঁদের 'উর্বর সাগরে' অবতরণ করে। আমেরিকার অ্যাপোলো-১১ চাঁদের 'নিস্তরঙ্গ-সমুদ্রের' যেস্থানে অবতরণ করিয়াছিল, লুনা-১৬-র অবতরণস্থল তাহার ২৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। অবতরণের পরই এই মনুষ্যহীন যানটি স্বয়ংচালিত যন্ত্রসহায়ে চাঁদের মাটিতে গর্ত করিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেকটা

নীচের মাটি সংগ্রহের ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগিয়া যায়। কাজ শেষ হইবার পর লুনা-১৬-র একাংশ চন্দ্রপৃষ্ঠের ১২ ফুট নীচ হইতে সংগৃহীত মাটি ও তথ্যবাহী যন্ত্রাদি সহ গত ২১শে সেপ্টেম্বর সেখান হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রা করে।

রাশিয়ার লুনা-১৬র এই সাফল্য মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; গ্রহগুলি হইতেও এভাবে মাটি আনিবার দ্বার ইহাতে উন্মুক্ত হইল। যানটি মনুষ্যহীন হওয়ায় এরূপ অভিযানে সময়ের প্রশ্ন এবং বিপদের সম্ভাবনা তো নাই-ই, তাছাড়া খরচও অনেক কম—মনুষ্যসহ এরূপ একটি অভিযানের খরচ ইহা অপেক্ষা ২০ হইতে ৫০ গুণ অধিক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ রাশিয়া হইতে উৎক্ষিপ্ত লুনা-২ পৃথিবী হইতে পাঠানো চন্দ্রপৃষ্ঠস্পর্শকারী প্রথম যান; এটি অবশ্য চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ভাঙিয়া যায়। রাশিয়ারই মনুষ্যহীন যান, লুনা-৯, সর্বপ্রথম ধীরভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে (৩. ২. ৬৬)।

উৎসব-সংবাদ

মাথোয়া হাট (জলপাইগুড়ি) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৮ই ও ১৯শে আষাঢ়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত উৎসবে জাতিধর্মনির্বিশেষে অগণিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যোগদান করেন এবং দেড় হাজার দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী ইজ্যানন্দ সভাপতির এবং শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তর বঙ্গের বিভাগীয় কমিশনার) প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথি ও সভাপতির সহিত সভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন শ্রীহরিগোপাল রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার সিংহ এবং শ্রীক্ষীরেন্দ্রমোহন মিত্র।

বন্যাত্রাণসেবা

বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘ হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাচলা থানার রাণীহাট প্রাইমারী স্কুল, ঘোষালপাড়া, হাকলা প্রাইমারী ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে প্রায় ১১০০ জন বন্যার্তের মধ্যে রুটি, তরকারি, আটা, চিড়া, গুড, বেবীফুড, চাল এবং পুরানো জামাকাপড় ইত্যাদি বিতরণ করিয়াছেন। একটি মেডিক্যাল ইউনিটও লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

পরলোকে অমিয়কুমার মজুমদার

গত ২৬শে জুলাই, ১৯৭০ অমিয়কুমার মজুমদার ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে অমিয়বাবু কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরপূজায় নিযুক্ত ছিলেন। কামারপুকুর মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসেও তিনি কিছুকাল ছাত্রদের দেখাশুনা করিয়াছিলেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী অমিয়বাবুর পূর্ব নিবাস নদীয়া জেলার খোকসা গ্রাম। প্রার্থনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ভ্রমসংশোধন

গত ভাদ্র সংখ্যা উদ্বোধনের ৪৪০ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের চতুর্দশ লাইনে '১৯৮০' স্থলে '১৯০০' হইবে।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ২।৫৯

(সংযম সাধন তরে কিম্বা দেহ-বিকলতা হেতু)
বিষয় সম্ভোগ হতে বিরত যে জন,
বিষয় এলেও কাছে ইন্দ্রিয়-দুয়ার হতে তার
প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় ফিরিয়া তখন।
'ভোগ সুখকর' এই বোধটুকু মনে তার রয়ে যায় তবু।
প্রত্যক্ষ করিলে সেই চরম পরম সত্যে, প্রভু পরমেশে
এই রসবোধও যায় চিত্ত হতে মুছিয়া নিঃশেষে ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ৬।২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ৬।২৩

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

যাহা পেলে মনে হয় জীবনের অন্য পাওয়া অতি অকিঞ্চিৎ,
ভীষণ দুঃখেরো মাঝে প্রশান্তি হইতে চিত্ত না হয় স্খলিত,
'যোগ' তাহা ; দুঃখসনে সংযোগসূত্রই তাহা চিরছিন্ন করে।
উদাসী না হয়ে তায় অবিরাম প্রচেষ্টায়
রত হও সেই যোগ, সত্য সনে সে সংযোগ লভিবার তরে ॥

কথাপ্রসঙ্গে

মানুষ ও তাহার মন

১

কোন কার্যসিদ্ধির জন্য শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহার ফল নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপর। একটি হইল, যে-শক্তি প্রয়োগ করা হইতেছে তাহার পরিমাণ, অপরটি হইল শক্তি-প্রয়োগের দিক। মাঠে একটি ফুটবল পড়িয়া আছে, আমি সেটিকে আঘাত করিয়া সরাইয়া দিলাম। বলটি কোন্‌দিকে কতদূর যাইবে, তাহা নির্ভর করে আঘাতপ্রয়োগের শক্তির পরিমাণ ও দিকের উপর।

এই নিয়ম কেবল জড়শক্তির বা জড়বস্তুর উপর নয়, আমাদের মানসিক শক্তি ও জীবনের সাফল্যের উপরও প্রযুক্ত। তাই এই দুইটি বিষয়েই যাঁহারা সজাগ তাঁহারাই জীবনে সফল হন: মনের শক্তি বা ইচ্ছাশক্তি বাড়াইবার প্রচেষ্টা এবং জীবনের যথার্থ কল্যাণপথের দিঙ্‌নির্ণয়।

ইচ্ছাশক্তিকে না বাড়াইলে মানুষ কখনো কোন বিষয়েই বড় হইতে পাবে না। তবে নিজশক্তিকে সে জগতের কল্যাণ কি অকল্যাণ সাধনে প্রয়োগ করিবে, সে দেবতা হইবে কি অসুর হইবে, তাহা নির্ভর করে তাহার শক্তি-প্রয়োগের দিকের উপর।

সেজন্য ব্যক্তিগত জীবনকে ও সমাজকে কল্যাণমণ্ডিত করিতে হইলে যেমন জনসাধারণের জীবনে ইচ্ছাশক্তির বর্ধন এবং জীবনের যথার্থ কল্যাণের দিঙ্‌নির্ণয় উভয়ই সমভাবে প্রয়োজন, তাহার সহস্র গুণ অধিক প্রয়োজন সমাজ বা রাষ্ট্র-নেতাদের জীবনে। কারণ দেশ বা সমাজের সমষ্টি-শক্তির প্রয়োগ তাঁহাদেরই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বলিয়া বহুজনের কল্যাণ বা অকল্যাণও তাঁহাদেরই উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে, যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাধনার সাফল্যে অমিতপ্রভাব আণবিক শক্তি মানুষের করতলগত, এই কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের সীমা আজ জগতের কোন ক্ষেত্র-বিশেষে আবদ্ধ নাই, সমগ্র জগৎই উহার ক্ষেত্র। মানবজাতিরই অস্তিত্ব, মানবসভ্যতারই অস্তিত্ব আজ নির্ভর করিতেছে শক্তিমানদের মানসিক প্রবণতা কোন্ দিকে, তাহার উপর —মানুষের কল্যাণ বলিতে তাঁহারা কেবল স্বদেশের বা স্বমতানুগ মানুষের না সব দেশের সব মানুষের কল্যাণ বুঝেন, তাহার উপর। আমরা জানি, দেশ জাতি-বর্ণ-মত-বাদের বেড়া ভাঙ্গিয়া আমরা এখনো হৃদয়ে সব মানুষকে একাসনে বসাইতে পারি নাই।

অথচ মানবজাতির এই চরম বিপদের আশঙ্কা বুঝিয়াও মানুষের মনকে কল্যাণমুখী করিবার জন্য কার্যকরী কোন পন্থার কথা কেহই ভাবিতেছেন না, বরং কোথাও কোথাও ইহার বিপরীত প্রচেষ্টার সাহায্যেই, মানুষের মনে সহজাত মানবপ্রেম এবং শুভসংস্কার-টুকুকেও নষ্ট করিয়া সেখানে মানুষের প্রতি ঘৃণা ও জিঘাংসার উদ্রেক করাইয়া বিশ্বমানবের কল্যাণের, সাম্যস্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে!

মানবজাতির এই বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করিয়া আর্নল্ড টয়েনবী ইহাকে "মানব-ইতিহাসের চরম বিপজ্জনক মুহূর্ত" বলিয়াছেন,—যখন পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যা

"পৃথিবীর মানুষের হাতে বিপুলবিধ্বংসী অস্ত্রসমূহ তুলিয়া দিয়াছে, পৃথিবীর দেশগুলির দূরত্ব কমাইয়া পরস্পরের উপর সরাসরি আঘাত হানিবার মতো অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে, অথচ যখন তাহারা পরস্পরকে ভালরূপে বুঝিতে ও ভালবাসিতে শিখে নাই।" মানসিক উন্নয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা ছাড়া পরস্পরকে বুঝা ও ভালবাসা কোনদিনই সম্ভব হইবে না; কারণ ইহার জন্য প্রয়োজন উন্নত বুদ্ধিমাত্র নয়, উন্নত —সমবেদনাশীল ও নিঃস্বার্থ বা কম স্বার্থপর —মন। তিনি বলিয়াছেন, "মানবেতিহাসের এই চরম বিপজ্জনক মুহূর্তে ভারতীয় পন্থাই মানবজাতির মুক্তির একমাত্র পথ।" ইহা স্বামী বিবেকানন্দের সাবধানবাণীরই প্রতিধ্বনি: পাশ্চাত্যকে বাঁচিতে হইলে তাহার সভ্যতাকে জড়বাদের ভিত্তি হইতে সরাইয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে। আধ্যাত্মিকতা বলিতে আমাদের নিজ দেহ-মন-চৈতন্য প্রভৃতির অন্তর্নিহিত সত্যের অনুসন্ধানমুখতা, বা সহজ কথায় অন্তর্মুখতা বোঝায়, সংযম ও একাগ্রতার সাধনা যাহার মূল কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় সভ্যতার জীবনচর্যা অর্থাৎ ভারতীয়তা বলিতে যাহা বোঝায় তাহা হইল জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সংযম এবং একাগ্রতার সাধনারই বিভিন্নরূপ প্রয়োগ।

একমাত্র এই সাধনাই মানুষের ইচ্ছাশক্তি বাড়াইয়া দিতে, এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন-প্রচেষ্টাকে কল্যাণমুখী করিতে সমর্থ। ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার নিয়ামকগণ তাই হাজার হাজার বছর ধরিয়া রাষ্ট্র ও সমাজের সর্ববিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথোচিত প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থন দিয়াও সর্বাধিক জোর দিয়াছেন এই অধ্যাত্মসাধনার উপর। কারণ, ইহার অভাব ঘটিলে সমাজ জাগতিক বিষয়ে যত উন্নতই হউক না কেন, উহা মানব-সমাজ না হইয়া দানবসমাজে রূপায়িত হইবে, যাহার অনিবার্য পরিণাম পরস্পরের সহিত স্বার্থ-সংঘাতের ফলে জাতির মৃত্যু। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জড়বাদের ভিত্তি বালির ভিত্তি; উহার উপর গঠিত সভ্যতার আয়ু বড় জোর দুইশত বৎসর। তিনি তাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যে কোন আন্দোলনের পূর্বে সমগ্র দেশকে আধ্যাত্মিকতার ভাবে প্লাবিত করিতে হইবে; কেবল আধ্যাত্মিক সাধনা বা কেবল জাগতিক প্রয়োজন মিটাইবার বা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকারী হইতে পারে না—উভয় সাধনারই সমন্বয় ঘটাইতে হইবে জাতীয় জীবনে। স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের' মিলন, 'ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের', সত্ত্বগুণের সহিত 'শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণের' মিলন প্রভৃতি কথার ইহাই তাৎপর্য। শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্যই ইহা প্রয়োজন; বিশেষ প্রয়োজন বর্তমান যুগে, যখন কোন দেশ বা জাতির কল্যাণ-অকল্যাণের সহিত শুধু সেই দেশ বা জাতি নয়, সমগ্র পৃথিবীই জড়িত। তবে, একমাত্র ভারতই এ সমন্বয়ের আদর্শ জগতে স্থাপন করিতে পারে। (এই কারণেই ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁহার প্রাণ এত ব্যাকুল ছিল, ভারত শুধু জন্মভূমি বলিয়াই নহে।) তিনি বলিয়াছেন, যদিও 'আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন'—যদিও আধুনিক ভারতবাসীর জীবন প্রাচীন ঋষিদের মতো আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমুজ্জ্বল নহে, তথাপি 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আনিকধু

ভারতবাসীতেও পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান।' এবং 'মহাশক্তির কৃপায় যথাকালে তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।' যদি আমরা বাঁচিতে চাই, যদি যথার্থ সাম্য এবং বিশ্বপ্রেমে বিশ্বাসী হইয়া সারা জগতের মানুষকেও বাঁচাইতে চাই, তাহা হইলে আমাদের এই দুইটিরই সাধনা একসঙ্গে করিতে হইবে—আমাদের অন্তরে আচ্ছাদিত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের এবং পাশ্চাত্যজাতিগুলির মতো সর্ববিষয়ে জাগতিক উন্নতির সাধনা।

মানুষের মানসিক শিক্ষাকে অবহেলা করিয়া, মানুষকে দেহসর্বস্ব ভাবিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান সহায়ে কেবল তাহার দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আজ যে পথে চলাকে প্রগতির পথ ভাবা হইতেছে, সে পথ জাতির মৃত্যুরই পথ। আর, ভারতীয়তাকে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে শুধু উপেক্ষা মাত্র নয়, ধ্বংস করিয়া প্রগতির পথ সৃষ্টির সে অপপ্রয়াস আজ স্থূল ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে, তাহা অবাধিত হইলে এই মৃত্যু হইবে অতি আসন্ন।

ভারতীয় জাতির মৃত্যু, ভারতীয়তার মৃত্যু মানেই সমগ্র পৃথিবীতে মানবতারই মৃত্যু, যাহার অনিবার্য পরিণাম মানবসভ্যতার ধ্বংস; স্বামীজীর ভাষায়, তখন "দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ সে পূজার পুরোহিত, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার পূজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা তাহার বলি।"

অবশ্য ভবিষ্যদ্‌-দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ আশ্বাসবাণী শুনাইয়া গিয়াছেন, "তাহা হইবার নহে"।

আজ জনগণের পর্যাপ্ত অন্নবস্ত্রের সংস্থান, ও সম-বণ্টন, জাগতিক জীবনের মান-উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য আমরা যতখানি আগ্রহশীল, ততখানিই বা ততোধিক আগ্রহশীল হইতে হইবে ইহারই সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মানসিক উন্নয়নের জন্য। ইহারই অভাবে আজ শুধু দরিদ্র দেশের নয় বিপুল সম্পদশালী দেশেরও অগণিত মানুষ, বিশেষ করিয়া যুবকগণ জীবনের কোন উদ্দেশ্য না পাইয়া, আনন্দের কোন স্থায়ী অবলম্বন না পাইয়া বিপথগামী হইতেছে, উন্মাদের মতো উচ্ছৃঙ্খল প্রচেষ্টায় ইহার সন্ধানে ফিরিতেছে, এবং বোধ হয় বলিলে ভুল হইবে না, ইহারই অভাবে আমরা আজ দেশের সমস্যাগুলির সুসমাধানের কোন নিশ্চিত পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

২

মনই জীবনের চালক

শরীরের অতিরিক্ত মন বলিয়া কোন সত্তা আছে কিনা—ইহা শরীর জন্মাইবার পূর্বেও ছিল, শরীরের বিনাশের বা মৃত্যুর পরও থাকিবে, অথবা শরীরের সঙ্গেই ইহার জন্ম ও মৃত্যু ঘটে—এ বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও এবং সাধারণ অবস্থায় ইহা আমাদের অপ্রত্যক্ষ হইলেও আমরা মাঝে মাঝে অনুভব করি শরীর ব্যতিরিক্ত 'একটা কিছু' আছে। আমরা সকলেই একথা স্বীকার করি যে মনই আমাদের শরীরের চালক, মনের হাতেই জীবনরথের অশ্ববল্গা। যাহা আমাদের মনের ভাল লাগে, মন তাহাই পাইতে চায়; যে পথে চলিলে তাহা পাওয়া যাইবে, মন সে পথেই আমাদের টানিয়া লইয়া যায়। বলিতে পারি, সে মন নয়, বুদ্ধি; বুদ্ধি কল্যাণের পথ চিনিতে না পারিলে, দিঙ্‌নির্ণয়ে ভুল করিলেই জীবন বিপথে চলে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, শুধু তাহাই নয়, বুদ্ধি শুধু পরামর্শ

দিতে পারে, কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা নয়, তাহা বলিতে পারে—কিন্তু মনকে সেই মতো কাজ করাইতে হইলে শুধু ভালমন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্য-বোধই যথেষ্ট নয়, ইহার অতিরিক্ত একটি শক্তির, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। শুভপথ চেনা এবং সে পথে চলার শক্তি, দুই-ই প্রয়োজন। মন যদি বুদ্ধির কথা শুনিয়াই সেই মতো চলিত, অর্থাৎ মনের ইচ্ছামতো না চলিয়া মনকে আমরা চালাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা প্রায় সকলেই মহামানব হইয়া যাইতাম। জীবনের ভালমন্দ বুঝিতে না পারার জন্য যে আমরা জীবনে উদ্দেশ্য লাভে বিফল হই, তাহা নহে; আমাদের এই বিফলতার একমাত্র কারণ আমরা যাহা ভাল বলিয়া বুঝি, মনের তাহা সব সময় ভাল লাগে না, আর মনকে আমরা সব সময় জোর করিয়া নিজের মতো চালাইতেও পারি না।

ইচ্ছাশক্তির তারতম্য লইয়াই মানুষ জন্মায়, ঠিক কথা। কিন্তু চেষ্টা করিয়া, অভ্যাসের দ্বারা আমরা মনের শক্তিকে বাড়াইতেও পারি। যেমন পারি বুদ্ধির যথোপযুক্ত প্রয়োগে জীবনের দিঙ্‌নির্ণয় করিতে।

মনের ভাল লাগা

কোন কিছু মনের ভাল লাগে কেন? কারণ মন তাহাতে সুখ পায়, আনন্দ পায়। মন যাহা কিছু চায়, ভালমন্দ যাহা কিছু করাইতে চায় আমাদের দিয়া, তাহার পিছনে কোনও না কোনও ভাবে এই ভাললাগার, আনন্দলাভের ইচ্ছা বর্তমান। মন যদি আনন্দের আস্বাদ না পাইত, জীবনে আনন্দ বলিয়া যদি কিছু না থাকিত, তাহা হইলে জীবনে কোন কাজে, সৎ অসৎ কোন কর্ম সাধনের জন্য কোন প্রেরণাই কাহারো আসিত না—

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"—হৃদয়ে যদি আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কে-ই বা জীবনের ধারক প্রাণক্রিয়া করিত, কে-ই বা অপানক্রিয়া করিত?—অর্থাৎ জীবনকে ধরিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা কেহ করিত না। কবির ভাষায়, 'আকাশ আনন্দপূর্ণ না হইত যদি / জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।'

তবে ভাললাগা দুই রকমের আছে। একটি হইল ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগের ফলে উৎপন্ন। এ ভাললাগার সহিত সব মানুষই, সব প্রাণীই পরিচিত, প্রাণীমাত্রেই এ সুখ সাধারণ। দেহের মাধ্যমে বাহিরের বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া মন এই আনন্দের রূপ লয়। ইহার জন্য মনের কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, এভাবে আনন্দ লাভ করিবার প্রবৃত্তি প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক। মানুষের আর এক ধরনের আনন্দ আছে; যেমন বিদ্যাচর্চার আনন্দ সম্মানলাভের আনন্দ, প্রতিপত্তি বা অন্য কিছুর অধিকারবোধের আনন্দ ইত্যাদি। অন্য প্রাণী এ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। এগুলি কিন্তু স্থূল না হইলেও সূক্ষ্মভাবে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-জনিত আনন্দই, যাহা বাহিরের কোন কিছু প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। আনন্দলাভের সহজ ও স্বাভাবিক উপায় বলিয়া এবং আনন্দলাভের অন্য উপায় না জানার জন্য এই পথকেই, বিষয়ভোগের পথকেই আমরা একমাত্র বাস্তব পথ বলিয়া মনে করি, এ পথে চলিতেই সর্বাধিক উৎসুক হই।

বিষয়ভোগ মনকে শান্তি দিতে পারে না

কিন্তু জীবনে শান্তি বা তৃপ্তি আসে কি এ পথে? মনের চাহিদা যতটা, ততটা আনন্দ

সে পায় কি? আমরা জানি, ইহার উত্তর, না। মনের চাওয়ার কোন সীমা নাই, যতই তাহাকে দেওয়া যাক, সে আরো চাহিবে—'যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্যাপ্তং'—পৃথিবীতে যত ধন সম্পদ-শস্য-স্ত্রীলোকাদি আছে, একজন মানুষের মনের তৃষ্ণা মিটাইবার পক্ষেও তাহা যথেষ্ট নহে—মহাভারতের একথা অতি সত্য। এখন যাহা পাইলে তৃপ্ত হইবে বলিয়া আমাদের মন ভাবিতেছে, তাহা পাইলে কিছুদিন মাত্র তৃপ্ত থাকিয়াই সে আরও চাহিবে; সেটুকু পাইলে আরো বেশী চাহিবে; যতই পাউক, তাহার চাওয়া কোনদিন থামিবে না—সমগ্র পৃথিবীর সবকিছুকেই সে করায়ত্ত করিতে চাহিবে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের মন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এবং পৃথিবীর যে কোন দেশের দিকে, যে কোন সমাজের দিকে, যে কোন কর্মক্ষেত্রের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইলেই মানুষের মনের এই চির-অতৃপ্ত তৃষ্ণাকে স্পষ্টরূপে, বর্তমান জগতে তো অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

পৃথিবীতে সব মানুষের জন্যই আজ যদি জীবনধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজন মতো থাকা-খাওয়া-পরার ব্যবস্থা সমানভাবে করা সম্ভবও হয়, তাহা হইলেই কি মানুষের মনের সমস্যার সমাধান হইবে? তাহা হইলেই কি তাহার জীবনসমস্যার সমাধান হইবে? হইবে না যে, তাহা তো প্রমাণ করিতেছে যেসব দেশে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হয়, সে দেশগুলিরও আরো চাওয়ার এবং ন্যায় অন্যায় যেভাবেই হউক তাহা পূরণের প্রচেষ্টার বিকট রূপ। আর পৃথিবীর সব মানুষের ভাণ্ডারই যদি কুবেরের ঐশ্বর্যে ভরাইয়া দেওয়াও সম্ভব হয় কখনো, তাহা হইলেই কি মানুষের মনের চাহিদা সেখানে সীমারেখা টানিবে? টানিবে না যে, তাহাতেও জীবনকে যতখানি চায় ততখানি আনন্দে ভরপুর ভাবিতে পারিবে না যে, তাহার সাক্ষ্য বর্তমান জগতের অতি সমৃদ্ধ দেশগুলির মানসিক অস্থিরতা।

বরং, সর্বত্রই এই কথারই সমর্থন আজ পাওয়া যাইতেছে যে, বিষয়ভোগের মাধ্যমে যে সুখ মন আহরণ করে, তাহার পরিমাণ-বৃদ্ধিই মানুষের মনকে তৃপ্ত করিতে পারে না; বরং তাহা মনের অশান্তি আরও বাড়াইয়া দেয়, তাহার চাহিদাকে বর্ধিত করিয়া।

অবশ্য, আমাদের একথা বলার উদ্দেশ্য কখনই এই নয় যে, মানুষের অন্নবস্ত্রাদির অভাব মিটাইবার বা তাহার জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের জন্য উদ্যমের প্রয়োজন নাই; বলার উদ্দেশ্য, উহা তো করিতেই হইবে, কিন্তু মানুষের মানসিক উন্নতিকে উপেক্ষা করিয়া তো নয়ই, সে-বিষয়ে বরং অধিকতর সজাগ থাকিয়া।

তাছাড়া যে-কোন বিষয়ভোগের আনন্দই ক্ষণস্থায়ী, অধিকতর বুভুক্ষাসৃষ্টিকারী, মনের আনন্দ-উপভোগের চাহিদার তুলনায় অত্যল্প, এবং সর্বক্ষেত্রেই অবসাদ ও বিষণ্ণতা তার অনুগামী। আবার অত্যধিক ভোগের পরিণামও বিষময়। মানুষের ভোগতৃষ্ণার তুলনায় ভোগের শক্তিও সীমিত। একটি জীবন সে তৃষ্ণা মিটাইবার পক্ষে কিছুই নয়। এদিকে শরীর জীর্ণ হয়, ভোগতৃষ্ণা কিন্তু সেইসঙ্গে জীর্ণ হয় না, 'ন সা জীর্যতি জীর্যতঃ'। তাই, মানুষের দেহাতীত সত্তায় অবিশ্বাসীর কাছে, বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের সন্ধান যে পায় নাই তাহার কাছে ইহার পরিণাম অধিকতর বিষময়।

তবু মন, ঘা খাইয়াও, পরিণাম জানিয়াও এই আপাতসুখলাভের পথেই জীবনকে বার বার পরিচালিত করে, কারণ আনন্দলাভের অন্য কোনও পথ তাহার জানা থাকে না। জানা থাকা মানে কেবল শোনা, বা 'সত্য হইতেও পারে' ভাবা নয়, বিষয়ভোগে আনন্দ পাওয়া যায় এ বিশ্বাস তাহার যতখানি দৃঢ়, ততখানি দৃঢ় বিশ্বাস। যে ভাবেই হউক এ বিশ্বাস যদি মনে একবার আসে, যদি সে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয় যে, বিষয়ভোগ ছাড়াও আনন্দ লাভ সম্ভব, যে আনন্দ বিষয়ভোগে পাইতেছি তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী আনন্দ, প্রতিক্রিয়াহীন স্থায়ী আনন্দ লাভ সম্ভব, তাহা হইলে সে আনন্দলাভের জন্য বিষয় আহরণার্থে উদগ্র লালসা লইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া আর কখনো অগ্রসর হইবে না, অন্ততঃ সে-ইচ্ছাকে যথেষ্ট সংযত রাখিতে পারিবে। মানুষের সমস্যা মিটাইবার জন্য তাই মূল কথা হইল মনকে এই আনন্দের আস্বাদ একটু দিয়া মনের বিশ্বাস উৎপাদন।

৩

মনকে উন্নত করার সার্বজনীন উপায়

কিন্তু সত্যই কি বিষয়ভোগ ছাড়া আনন্দলাভের অন্য পথ কিছু আছে? মনকে তাহাতে আকৃষ্ট করা যায়? নিশ্চয়ই আছে, এবং নিশ্চয়ই যায়।

কিন্তু ইহার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা জোর করিতে হয়। ইহার জন্য ভারতের মনস্তাত্ত্বিকগণ শুধু অনুমান সহায়ে নয়, মন দেখিয়া, উহার প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া কয়েকটি সার্বজনীন পদ্ধতি দিয়া গিয়াছেন। যেগুলির মধ্যে প্রধান হইল দুইটি—নিয়মিতভাবে মনকে স্থির করার এবং মন যাহা চায় তাহাকে উহা না দিবার অভ্যাস; যাহার অপর নাম, একাগ্রতা ও সংযম অভ্যাস। দুটি নাম ভিন্ন হইলেও এদুটি মূলতঃ একটি চেষ্টারই দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ মাত্র—চিন্তার ক্ষেত্রে এবং কর্মের ক্ষেত্রে মনকে তাহার ইচ্ছামত চলিতে না দিয়ে নিজের বশে লইয়া আসিবার চেষ্টা।

কোন একটিমাত্র বিষয়ে মন স্থির করিতে যাইলেই প্রাথমিক অবস্থায় দেখা যায়, মন কোন্ ফাঁকে আমাদের অজ্ঞাতসারেই সেখান হইতে সরিয়া অন্য বহু চিন্তায় চলিয়া গিয়াছে—অবশ্য যে-বিষয়চিন্তা মনের ভাল লাগে তাহাতে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিছুক্ষণ লাগিয়া থাকে। অর্থাৎ সে আমাদের কথা শুনিবে না, নিজের ইচ্ছামত চিন্তা করিবে! চেষ্টা করিয়া কোন একটি বিষয়ে উহাকে স্থির করিবার সময় যখনই আমরা টের পাই যে, সে অন্য চিন্তায় চলিয়া গিয়াছে, তখনই তাহাকে পূর্ব চিন্তায় ফিরাইয়া আনিতে হয়। ইহাই একাগ্রতার অভ্যাস। চেষ্টা-আরম্ভ মাত্রই মন স্থির হইবে না সত্য কথা, কিন্তু নিয়মিতভাবে এই অভ্যাসের ফলে ক্রমে স্থির হইয়া আসে। এবং এই চেষ্টার ফলেই ক্রমে মানুষ মনের অধীশ্বর হইয়া উঠে। যতবার আমরা মনকে ধরিয়া আনিয়া পূর্ব চিন্তায় নিয়োগ করি, ততবারই, যত অল্পই হোক, আমাদের ইচ্ছাশক্তি—মনকে বশে আনার শক্তি—কিছুটা বাড়িয়া যায়।

আবার সংযমের বেলাও তাই। মন যখন যাহা চাহিতেছে, তখন তাহাকে তাহা না দিলে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাশক্তি কিছুটা বাড়িবেই। ছোট-খাট জিনিস লইয়া, যেমন বিশেষ দিনে উপবাস, কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ-পালন, ইত্যাদি লইয়া ইহা আরম্ভ করিতে হয়, যাহা

আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। ইহা ইচ্ছাশক্তি বাড়াইবার একটি উপায়।

একাগ্রতা অভ্যাসের ফলে মন একটু স্থির হইলেই সে বিমল আনন্দের আস্বাদও একটু পায়। এ আনন্দ তাহার সচরাচর পরিচিত বিষয়ভোগজনিত আনন্দ হইতে পৃথক। কারণ ইহা আমাদের ভিতর হইতেই আসে। আমাদের মন সচরাচর যে আনন্দের সহিত পরিচিত তাহার জন্য বহির্জগতের কোন কিছু পাওয়ার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়—কোন স্থূল ভোগ্যবস্তু, অথবা প্রশংসা আধিপত্য ইত্যাদি; কিন্তু একাগ্রতাজনিত আনন্দের জন্য বাহিরের কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তাই এ আনন্দ লাভের জন্য ভোগ্যবস্তুর আহরণ, সংরক্ষণ ও অধিকার লইয়া অপরের সহিত কোন সংঘর্ষেরও প্রশ্ন উঠে না, অপরকে ভালবাসার পথে কোন প্রতিবন্ধকও ইহা আনে না।

অবশ্য সব আনন্দ ভিতর হইতেই আসে, আনন্দ বা দুঃখ মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। বিষয়ানন্দের ক্ষেত্রে বহির্বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে মনে এই পরিবর্তন আসে, একাগ্রতা-জনিত আনন্দের ক্ষেত্রে বিষয়নিরপেক্ষ ভাবেই, মন আপনা-আপনি পরিবর্তিত হয়, এই মাত্র প্রভেদ।

আমাদের মন সাধারণতঃ এই আনন্দের সহিত পরিচিত নয় বলিয়াই বিষয়ানন্দের জন্য উন্মত্ত হয়। একাগ্রতাজনিত আনন্দ বিষয়া-নন্দের চেয়ে উচ্চতর, প্রতিক্রিয়াহীন ও দীর্ঘকালস্থায়ী আনন্দ। একবার এই আনন্দের আস্বাদ পাইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মন নিজেই উহা পুনরায় লাভের জন্য চেষ্টা করিবে, যেমন সে করিয়া থাকে বিষয়ানন্দের লাভের ক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, মিছরীর পানার আস্বাদ একবার পাইলে কেহ আর চিটে গুড়ের পানা খাইতে চাহিবে না।

মনের শক্তি বাড়ানো এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি-গত যথার্থ কল্যাণের দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য এই সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস তাই অপরিহার্য। ইহা ছাড়া মানুষের ভোগলালসা কমানো যায় না। আর সেই জন্য মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ কমানো যায় না, কারণ সর্ববিধ বিদ্বেষ এবং সংঘর্ষ মূলতঃ উদ্ভূত হয় ভোগ্যবস্তুর অধিকার লইয়াই।

৪

ভারতীয় জাতির নিয়ামকগণ সর্বসাধারণের মানসিক উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি সজাগ রাখিয়াই সামাজিক প্রথাগুলি প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, যাহার মধ্যে সাবলীলভাবে সংযম ও একাগ্রতার সাধনা ওতপ্রোত। প্রথাগুলির বাহ্য পরিবর্তন যুগে যুগে হইয়াছে, কিন্তু সেগুলির মূল তত্ত্বকে অপরিবর্তিত রাখিয়াই; হাজার হাজার বছর ধরিয়া সেসব তত্ত্বের ভিত্তি সামাজিক প্রথায় অটল হইয়া রহিয়াছে। ইহারই বলে অতীতে বারংবার সে বহু দুর্যোগ কাটাইয়া উঠিয়াছে, বর্তমানেও ইহারই বলে জড়বাদের দুর্যোগও কাটাইয়া স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই। জাগতিক দুঃখমোচন আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন সন্দেহ নাই; অধিকার- এবং ভোগ-সাম্যেরও প্রয়োজন। কিন্তু ইহার জন্য পথ আমাদের করিতে হইবে এই সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই দাঁড়াইয়া। বিদেশাগত অগভীর চিন্তায় প্রভাবান্বিত হইয়া এগুলির মূল্য সম্বন্ধে যেন বিভ্রান্তি না আসে আমাদের। মণিকে যেন কাঁচখণ্ড ভাবিয়া তাহার মূল্যায়ন না করি। জীবনে গ্রহণযোগ্য কোন কিছুর মূল্য-নির্ণয় সাময়িক ফল দেখিয়া বা অগভীর কয়েকটি যুক্তির সাহায্যে করা যায় না,—কালের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা দ্বারাই তাহা সঠিকভাবে করা সম্ভব।

ওঙ্কার

স্বামী ধ্যানানন্দ

ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় ক'রে 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ধর্মের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হ'ল—যা ধারণ করে। রক্ষণার্থক 'অব্' ধাতুর উত্তর ঐ 'মন্' প্রত্যয় করেই আমরা 'ওম্' শব্দটি পাই। ওম্-এর অর্থ হ'ল—যিনি রক্ষা করেন, অর্থাৎ ঈশ্বর।

এখন, প্রথম প্রশ্ন হ'ল, ধর্ম-শব্দটি অ-কারান্ত; কিন্তু ওম্-শব্দটি ম্-কারান্ত কেন? 'ওম' হওয়াই তো উচিত ছিল।

এর উত্তর এই যে, ব্যাকরণের একটি সূত্র রয়েছে—'অবতেষ্টিলোপশ্চ' অর্থাৎ অব্-ধাতুর বেলায় বিশেষ নিয়ম এই যে, তার উত্তর মন্-প্রত্যয় করলে, মন্-এর 'অন্' অংশ লোপ পাবে, থাকবে শুধু 'ম্'।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, 'ও' এল কোথা থেকে? এর উত্তর: পাণিনির ঈষৎ দীর্ঘ ও দুরুচ্চার্য সূত্র, 'জ্বরত্বর……' ইত্যাদির দ্বারা, 'অব্'-এর 'অ' ও 'ব্' এই উভয় স্থানেই 'ঊ' হবে। সুতরাং 'অব্+মন্' দাঁড়াল 'ঊ+ঊ+ম্'। সন্ধি ক'রে হ'ল 'ঊম্'। 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ'—সূত্রানুসারে ঊ-কারের গুণ 'ও' হওয়ায় 'ঊম্' রূপান্তরিত হ'ল 'ওম্'-এ।[1]

'ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিদগ্ধ টীকাকার শান্তনু চক্রবর্তীও ওম্-এর এই ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি বলেছেন, পাণিনির 'কৃন্মেজন্তঃ' সূত্র অনুসারেই 'ওম্' একটি অব্যয়। এ বিষয়ে তিনি ভট্টোজী দীক্ষিত বা উজ্জ্বল দত্তকে অনুসরণ করেননি।

ব্যাকরণ-সূত্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচা গেল মনে হলেও, 'ওম্' যে 'অব্' ধাতু থেকে এসেছে এবং এর ধাতুগত অর্থ যে রক্ষাকর্তা ঈশ্বর, এই সারটুকু পাওয়ার জন্য বৈয়াকরণদের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করতেই হবে।

কেউ কেউ আরও সহজে 'ওম্' পদটি সিদ্ধ করেন। তাঁদের মতে 'অ' 'উ' 'ম্' দ্বন্দ্বসমাস-বদ্ধ হলে 'ওম্' হয়।[2] এইভাবে পদটি সিদ্ধ করার উপযোগিতাও যথেষ্ট রয়েছে, কারণ বৈদিক যুগ থেকেই অকার, উকার ও মকারকে ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা, পাদ, বা অবয়ব রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত অকার উকার ও মকারের নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেকগুলি ব্যাখ্যারই একটি সারসংক্ষেপ প্রসিদ্ধ শিবমহিম্নঃস্তোত্রের ২৭-সংখ্যক শ্লোকটিতে পাওয়া যায়—

ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরান্
অকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্॥

আক্ষরিক অনুবাদ করলে শ্রুতিকটু হবে, তাৎপর্যও সম্ভবতঃ সুপরিস্ফুট হবে না, তাই শ্লোকটির ভাবানুবাদ দেওয়া হচ্ছে।

হে শরণদাতা শিব! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ তোমারই মূর্তি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও

১ সিদ্ধান্তকৌমুদী, উণাদি প্রকরণ

২ শিবমহিম্নঃস্তোত্র (Arthur Avalon Edn.) শ্লোক ২৭, সারার্থদীপিকা টীকা, পৃ: ৫৭

সুষুপ্তি তোমারই অবস্থাত্রয়। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্লোকও তুমি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রও তোমারই রূপ। আর যেহেতু ওঙ্কারের তিনটি অবয়ব—অকার, উকার ও মকার যথাক্রমে ঐ ঋগাদি তিন বেদ, জাগ্রদাদি তিন অবস্থা, পৃথিবী আদি তিন লোক ও ব্রহ্মাদি তিন দেবতার বাচক সেই হেতু ওঙ্কার পৃথক্ পৃথক্ ঐ তিন বর্ণের দ্বারা তোমার স্তুতি করছে। আবার ঐ তিন বর্ণের একত্র সমাবেশে যে সূক্ষ্ম ওঙ্কার নাদ স্ফুরিত হয়, তা তোমারই তুরীয় স্বরূপের স্তুতি করছে।

এখন আমরা অকার, উকার ও মকারের কয়েকটি ব্যাখ্যার বিশদ আলোচনা করছি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভক্তিযোগ[৩] ও রাজযোগ[৪] গ্রন্থ দুটিতে অকার, উকার ও মকারের একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে সেই ব্যাখ্যা সাধারণভাবে আলোচিত হচ্ছে। অকার সমস্ত বিশেষবর্জিত একটি ধ্বনি যা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ যদিও কণ্ঠ্য অন্যান্য বর্ণ রয়েছে, যেমন 'ক' 'খ' 'গ' ইত্যাদি, তবু সেগুলির উচ্চারণে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছেই। —একটু মনঃসংযোগ করে 'অ' এবং 'ক' 'খ' 'গ' প্রভৃতি উচ্চারণ করলে অনায়াসেই বোঝা যায় যে, এই গুলির উচ্চারণস্থান কণ্ঠ হলেও, কণ্ঠের ঠিক একই জায়গা থেকে এরা উচ্চারিত হয় না।

অনুরূপভাবে, উকার ও মকার উভয়ই ওষ্ঠ্য বর্ণ হলেও, উচ্চারণ-প্রযত্নের পার্থক্য আছে। উকারের ধ্বনি কণ্ঠ থেকে ওষ্ঠ অবধি গড়িয়ে যায়। মকারের উচ্চারণস্থান শুধু ওষ্ঠ।

অকার, উকার ও মকারের উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় যথাক্রমে উন্মুক্ত থাকে, সঙ্কুচিত বা সন্নিহিত হয়, ও সম্পূর্ণ মিলিত হয়। সুতরাং শব্দোচ্চারণের সমগ্র প্রক্রিয়াটিই 'অউম' উচ্চারণের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। অতএব যে কোনও শব্দ আমরা উচ্চারণ করি না কেন, তা' 'অউম' অর্থাৎ ওঙ্কার ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকটি বস্তুরই একটি রূপ আছে এবং সেই রূপের একটি বা একাধিক নাম আছে। কিন্তু যত নামই থাকুক না কেন, সব নামই পূর্বোক্ত প্রকারে ওঙ্কারধ্বনির অন্তর্গত। সুতরাং ওঙ্কার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাচক। আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরেরই বাহ্যরূপ ব'লে ওঙ্কার ঈশ্বরেরও বাচক। ব্যক্তিতে যেমন একটি দেহের অন্তরালে দেহী রয়েছেন, দেহটি দেহীরই রূপ এবং তার একটি নাম রয়েছে, সমষ্টিতেও ঠিক সেই রকম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী ঈশ্বর রয়েছেন এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই রূপ।

আচার্য নিম্বার্ক ওঙ্কারের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে অকারের অর্থ 'ব্রহ্ম' (অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি, গীতা ১০।৩৩) উকারের অর্থ 'গুরু' (উন্নয়তি ইতি উঃ—নেতা গময়িতা, ঈশ্বরের নিকট যিনি পৌঁছে দেন এবং মকারের অর্থ হ'ল 'জীব' অর্থাৎ সাধক (বর্গীয় বর্ণসমূহের মধ্যে 'ম' হচ্ছে পঞ্চবিংশতি-তম বর্ণ; সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হচ্ছে প্রকৃতি, এবং পুরুষ বা জীব হচ্ছে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব; শ্রুতিতেও আছে—'পঞ্চবিংশোঽয়ং পুরুষঃ')। এখন, গীতার 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি-র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্'—ইত্যাদি শ্লোক (৪।২৪) অনুসারে ওঙ্কার-জপকে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপ একটি যজ্ঞে পরিণত করতে হবে। হোমকালে

---

৩ বাণী ও রচনা ১ম সং, ৪।৩৬৩-৮

৪ ঐ ১।৩১৮

যেমন প্রথমে ঘৃত অর্পণে অর্থাৎ স্রুবাদি যজ্ঞপাত্রে (হাতায়) রাখা হয় এবং তারপর অগ্নিতে অর্পিত হয়, ঠিক সেই রকম সাধক প্রথমে হবিঃস্থানীয় মকাররূপী নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যজ্ঞপাত্রস্থানীয় উকাররূপী গুরুতে নিহিত করে অবশেষে অগ্নিস্থানীয় অকাররূপী ব্রহ্মে আহুতি দেবেন। অর্থাৎ সাধক যে শ্রীগুরুর মাধ্যমেই নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করছেন, এইভাব তাঁর হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক থাকবে ওঙ্কার-জপের সময়ে। এইভাবে আচার্য নিম্বার্ক ওঙ্কারের তিনটি বর্ণ যে উপাসনার তিনটি অবয়ব—ঈশ্বর, সদ্‌গুরু ও সাধকের প্রতীক তা বলেছেন এবং উপাসনা-তত্ত্বের ও প্রণালীর সারকথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছেন।[৫]

আচার্য শংকর তাঁর রচিত 'পঞ্চীকরণ'-এ ওঙ্কারের ভিতর সমগ্র অদ্বৈতবেদান্ত অনুপ্রবিষ্ট দেখিয়েছেন। 'পঞ্চীকরণ' শংকররচিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তিমাত্র। তার উপর তাঁর শিষ্য সুরেশ্বরাচার্যের ৬৪ শ্লোকের একটি বার্তিক আছে এবং আনন্দগিরি-রচিত একটি টীকাও আছে। শংকর অবশ্য পঞ্চীকরণের বিষয়বস্তু মাণ্ডূক্য উপনিষৎ থেকেই নিয়েছেন। তবে ওঙ্কার সহায়ে কি ভাবে নির্গুণোপাসনা করতে হয়, তার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। শংকর বলেছেন: অকারের অর্থ হ'ল—(১) জাগ্রৎ অবস্থা, (২) স্থূল শরীর এবং (৩) জাগ্রৎ অবস্থা ও স্থূল শরীরে অভিমানী চৈতন্য, যাকে 'বিশ্ব' বলা হয়; উকারের অর্থ হ'ল—(১) স্বপ্নাবস্থা, (২) সূক্ষ্ম শরীর এবং (৩) স্বপ্নাবস্থা ও সূক্ষ্মশরীরে অভিমানী চৈতন্য, যাকে 'তৈজস' বলা হয়; মকারের অর্থ হ'ল—(১) সুষুপ্তি অবস্থা, (২) কারণ শরীর এবং (৩) সুষুপ্তি অবস্থা ও কারণ শরীরে অভিমানী চৈতন্য যাকে 'প্রাজ্ঞ' বলা হয়।

আরও কথা এই যে, ব্যষ্টিতে যে চৈতন্যকে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বলা হয়, সমষ্টিতে তাকেই যথাক্রমে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর বলা হয়। এজন্য অকার, উকার, মকার বলতে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরকেও বোঝায়।

নির্গুণ উপাসনার প্রণালী হচ্ছে স্থূলকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মকে কারণে এবং কারণকে নির্বিশেষ চৈতন্যে লয় করতে হয়। অর্থাৎ অকারকে উকারে, উকারকে মকারে এবং মকারকে সর্বাভিমানবর্জিত আত্মাতে—শুদ্ধ চৈতন্যে লয় করতে হয়। এই শুদ্ধ চৈতন্যই ওঙ্কারের তুরীয় বা চতুর্থ মাত্রা, মাণ্ডূক্য উপনিষদে যাকে 'অমাত্র' বলা হয়েছে—'অমাত্রঃ চতুর্থঃ অব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ অদ্বৈতঃ এবম্ ওঙ্কারঃ আত্মা এব' (১।১২)।

বস্তুতঃ মাণ্ডূক্য উপনিষদে যে নির্গুণ উপাসনার কথা বলা হয়েছে তার অনুষ্ঠান-প্রণালী আচার্য শংকর পঞ্চীকরণে বিবৃত করেছেন। পঞ্চদশীকারও ঐ কথাই বলেছেন:

মাণ্ডূক্যাদৌ চ সর্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিতা।
অনুষ্ঠানপ্রকারোঽস্যাঃ পঞ্চীকরণ ঈরিতঃ॥

৯।৬৩-৬৪

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ওঙ্কারোপাসনা কেবল যে নির্গুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা, তা পঞ্চদশীকারের মত নয়। পঞ্চদশীতে আছে:

প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নির্গুণা এব বেদগাঃ।
ক্বচিৎ সগুণতাপ্যুক্তা প্রণবোপাসনস্য হি॥

৯।১৪৭

অর্থাৎ, বেদে যে সব ওঙ্কারোপাসনার

৫ মন্ত্ররহস্যষোড়শী, শ্লোক ৩, ৭০৯

কথা বলা হয়েছে, সে সব প্রায়ই নির্গুণোপাসনা ; তবে কোন কোন জায়গায় সগুণোপাসনার কথাও বলা হয়েছে।

মাণ্ডূক্যের পরই আমরা প্রশ্নোপনিষদের উল্লেখ করছি। এতে ওঙ্কারের তিনটি মাত্রার কথা বলা হয়েছে। এই উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে ওঙ্কারোপাসনা ও তার ফল সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। যদিও মূলে অকার, উকার ও মকারের কোনই উল্লেখ নেই, তবু আচার্য শংকর তাঁর ভাষ্যে পরিষ্কারভাবে অকার, উকার ও মকারের উল্লেখ করেছেন। ভাষ্যে এই উল্লেখ না থাকলে আমরা এখানে এই উপনিষদের অবতারণা করতুম না, কারণ আপাততঃ অকার উকার ও মকারের ব্যাখ্যাই আমাদের বর্ণনীয় বিষয়। এই উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে যে, ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকারের অর্থ হ'ল পৃথিবী ও ঋগ্বেদ ; দ্বিতীয় মাত্রা উকারের অর্থ হ'ল অন্তরিক্ষ ও যজুর্বেদ এবং তৃতীয় মাত্রা মকারের অর্থ হ'ল সূর্য ও সামবেদ। অকারমাত্রার উপাসক দেহান্তে অকারমাত্রারূপা ঋগ্বেদপ্রভাবে অচিরেই পুনরায় এই পৃথিবীতে মানুষ হয়েই জন্মগ্রহণ করেন এবং তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাসহায়ে বিভূতিমান হন ; অকার* ও উকারমাত্রার উপাসক দেহান্তে উকারমাত্রারূপী যজুর্বেদ কর্তৃক অন্তরিক্ষে চন্দ্রলোকে নীত হন এবং সেখানে ঐশ্বর্যভোগান্তে তাঁর পুনরাবর্তন হয়। কিন্তু যিনি অকার, উকার ও মকার এই তিন মাত্রাযুক্ত ওঙ্কারকে পরব্রহ্মের প্রতীক জেনে উপাসনা করেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মলোকে যান এবং সেখানেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ ক'রে মুক্তি পেয়ে থাকেন, তাঁর আর পুনরাবৃত্তি হয় না। বেদান্তদর্শনেও 'ঈক্ষতি কর্মব্যপদেশাৎ সঃ'—সূত্রে (১।৩।১৩) এই উপাসনা সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে।

বহু উপনিষদেই ওঙ্কারের অকার, উকার, মকার—এই তিনটি মাত্রার ব্যাখ্যা রয়েছে। মাণ্ডূক্য, প্রশ্ন, ধ্যানবিন্দু, নৃসিংহতাপনী, যোগচূড়ামণি প্রভৃতি বিভিন্ন উপনিষৎ থেকে ওঙ্কারের মাত্রাত্রয়ের যে সব অর্থ পাওয়া যায় তা' নীচে দেওয়া হ'ল :

	অ	উ	ম	
১।	স্থূল	সূক্ষ্ম	কারণ	(শরীর)
২।	জাগ্রৎ	স্বপ্ন	সুষুপ্তি	(অবস্থা)
৩।	বিশ্ব	তৈজস	প্রাজ্ঞ	(ব্যষ্টি চৈতন্য)
৪।	বিরাট	হিরণ্যগর্ভ	ঈশ্বর	(সমষ্টি চৈতন্য)
৫।	ঋক্	যজুঃ	সাম	(বেদ)
৬।	ভূঃ	ভুবঃ	স্বঃ	(লোক)
৭।	ব্রহ্মা	বিষ্ণু	রুদ্র	(দেবতা)
৮।	সৃষ্টি	স্থিতি	লয়	(ক্রিয়া)
৯।	রজঃ	সত্ত্ব	তমঃ	(গুণ)
১০।	রক্ত	শুক্ল	কৃষ্ণ	(বর্ণ)
১১।	গায়ত্রী	ত্রিষ্টুভ্	জগতী	(ছন্দঃ)
১২।	গার্হপত্য	দক্ষিণ	আহবনীয়	(অগ্নি)

এ ছাড়াও আরও অনেক ত্রিপুটি বা ত্রয়ীর উল্লেখ দেখা যায়, যাতে ওঙ্কারদৃষ্টি করতে বলা হয়েছে, যদিও সেই সব জায়গায় অকার উকার ও মকারকে যথাক্রমে স্থাপিত বা চিহ্নিত করা সমস্যার ব্যাপার। সম্ভবতঃ ত্রিপুটিস্থ-

* এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আনন্দগিরির মতে কেবল উকারমাত্রার কথা এই দ্বিতীয় উপাসনায় বলা হয়েছে। তবে তিনি তাঁর টীকাতেই উল্লেখ করেছেন যে, দীপিকাতে মাত্রাদ্বয়ের মিলিত উপাসনার কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রীভাষ্য এবং 'বেদান্ত-কৌস্তুভ'-এও মিলিত উপাসনা গৃহীত হয়েছে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনও এই অর্থই গ্রহণ করেছেন (The Principal Upanisads : p. 664)। যে ধারায় উপাসনাগুলি কথিত হয়েছে, তাতে মিলিত উপাসনাই সমীচীন মনে হয়।

উভয়ত্র সমান বলেই ঐ ভাবে ওঙ্কারদৃষ্টির প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন মৈত্রী উপনিষদে —স্ত্রী, পুং ও নপুংসক; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান; অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য; প্রাণ, অপান ও ব্যান; প্রাণ, অগ্নি ও সূর্য; অন্ন, জল ও চন্দ্রমা, বুদ্ধি, মন ও অহংকার ইত্যাদি ত্রিপুটিগুলিকে যথাক্রমে আত্মার লিঙ্গবতী তনু, কালবতী তনু, ভাববতী তনু, প্রাণবতী তনু, প্রতাপবতী তনু, আপ্যায়নবতী তনু ও চেতনবতী তনু ইত্যাদি বলা হয়েছে এবং মাত্রাত্রয়রূপী ওঙ্কারের উচ্চারণ দ্বারা আত্মার এই সব বিভিন্ন রূপের স্তুতি ও পূজা করা হয়, বলা হয়েছে।[৭]

মূল কথা এই যে ওঙ্কার সগুণ ও নির্গুণ দ্বিবিধ ব্রহ্মেরই বাচক—যিনি বিশ্বরূপী তাঁরও বাচক এবং যিনি বিশ্বাতীত তাঁরও। যিনিই বিশ্বরূপী, তিনিই বিশ্বাতীত। কিন্তু প্রথমেই বিশ্বাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করা যায় না। তাই বিশ্বরূপী ব্রহ্মতত্ত্বকে ওঙ্কারসহায়ে বুদ্ধিতে আরূঢ় করতে হয়। তা'ও প্রথমে সম্ভব হয় না, তাই প্রত্যেক ত্রিপুটিতে—বিশেষ বিশেষ বস্তুতে ওঙ্কারদৃষ্টি করতে বলা হয়েছে। এই সাধনার ফলশ্রুতি হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের দর্শন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উদ্দেশ্যেই বিভূতিযোগের কথা মুখ্যত: দশম ও অংশত: সপ্তম, নবম ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলেছেন। উপনিষদ্‌গুলিতেও ঐ একই ব্যবস্থা দেখা যায়।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে যাকে অমাত্রা বলা হয়েছে, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাকেই অর্ধমাত্রা বলা হয়েছে। অর্ধমাত্রার অন্য রকমের ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু চণ্ডীর অধিকাংশ টীকাকার অর্ধমাত্রাকেই ওঙ্কারের তুরীয়মাত্রা বলে উল্লেখ করেছেন। হরির যোগনিদ্রা ভঙ্গের জন্য ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করছেন: বলছেন—তুমি 'ত্রিধামাত্রাত্মিকা' অর্থাৎ অকার-উকার-মকার-রূপিণী এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলছেন—'অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ' অর্থাৎ, তুমি নিত্যা, তুরীয়মাত্রারূপিণী, উচ্চারণ করে তোমায় উচ্ছিষ্ট করা যায় না। এখানে অকারের অর্থ সৃষ্টি, উকারের অর্থ স্থিতি এবং মকারের অর্থ প্রলয়। পূর্বে উল্লিখিত স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত, অকার-উকার-মকারের বিজ্ঞান-ভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে, এই অর্থ খুবই স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। উপনিষদ্‌-গুলি থেকেও আমরা এই অর্থ পূর্বেই পেয়েছি। দেবীভাগবতেও আছে—'অকারো ভগবান্ ব্রহ্মাপ্যুকারঃ স্যাদ্ হরিঃ স্বয়ম্, মকারো ভগবান্ রুদ্রঃ' ইত্যাদি (৫।১।২২-২৩)। সুতরাং লক্ষণার দ্বারা 'ত্রিধামাত্রাত্মিকা'র অর্থ হয়—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। 'অর্ধ-মাত্রাস্থিতা'র অর্থ তুরীয়া—যখন এই তিনটি কাজ করেন না, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়া। মা কালীর ধ্যানচিত্র এই তত্ত্বেরই প্রতীক। শিবরূপে যিনি মায়ের পদতলে শায়িত তিনিও নিষ্ক্রিয়া মা ই। 'একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নাম-রূপ-ভেদ'—এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা।[৮] তত্ত্ব একটিই, দু'টি নয়। গীতার ১৪শ অধ্যায়ে অন্তিম শ্লোকের 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' এই অংশের শংকর যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন, তা'তে বলেছেন—'অহম্' অর্থাৎ আমি নির্গুণ

৭ Dr. Radhakrishnan: The Principal Upanisads. pp. 818-19

৮ কথামৃত, ১।২।৪

ব্রহ্ম, 'ব্রহ্মণঃ' অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের—'প্রতিষ্ঠা' (pedestal)—সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। শংকরের এই ব্যাখ্যা উপরে উক্ত মায়ের ধ্যানচিত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এখানে pedestal statue (মূর্তি) থেকে পৃথক বস্তু নয়। 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'

'শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি'—এখানে ত্র্যম্বকার প্রচলিত অর্থ হ'ল ত্রিনয়না। তবে 'ওঙ্কার-প্রতিপাদ্যা', অর্থাৎ ওঙ্কারের প্রতিপাদ্যা যিনি —এই অর্থও হয়। অম্বা শব্দের অর্থ বর্ণ। তিনটি বর্ণ—অকার, উকার ও মকার যাতে আছে, তিনি ত্র্যম্বকা। 'ত্রয়ো বর্ণাঃ অকারোকারমকারাঃ প্রতিপাদকা যস্যাঃ। প্রণবপ্রতিপাদ্যা ইত্যর্থঃ। স্বার্থে কঃ'।[৯]

শ্রীশ্রীচণ্ডী যে-পুরাণের অংশবিশেষ, সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণেই 'ওঙ্কারস্বরূপকথন' নামে একটি অধ্যায় (৪২শ) রয়েছে। তাতে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য এবং অকার, উকার ও মকারের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই সব ব্যাখ্যা অধিকাংশই উপনিষৎ-প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একটি মাত্র প্রসিদ্ধ পুরাণের ওঙ্কার-প্রসঙ্গ এখানে দিগ্‌-দর্শনরূপে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হ'ল, নচেৎ প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হয়ে পড়বে।

ওঙ্কারের তিনটি ও চারটি মাত্রার কথা আমরা উপনিষৎ ও পুরাণসহায়ে আলোচনা করেছি। এই আলোচনাই এখানে যথেষ্ট মনে করি। তবু উল্লেখ্য এই যে, ওঙ্কারের ৮টি মাত্রা, ১২টি মাত্রা ও ১৬টি মাত্রার কথাও আমরা উপনিষদ্‌গুলিতে পাই। বরাহোপনিষদে[১০] ওঙ্কারের অ, উ, ম এবং অর্ধমাত্রাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ এবং সাক্ষী অংশক্রমে এইভাবে বিভক্ত করা হয়েছে :

অ=জাগ্রদ্‌বিশ্ব, জাগ্রৎ-তৈজস, জাগ্রৎ-প্রাজ্ঞ, জাগ্রৎ-তুরীয়

উ=স্বপ্নবিশ্ব, স্বপ্নতৈজস, স্বপ্নপ্রাজ্ঞ, স্বপ্ন-তুরীয়

ম=সুষুপ্তিবিশ্ব, সুষুপ্তিতৈজস, সুষুপ্তিপ্রাজ্ঞ, সুষুপ্তিতুরীয়

অর্ধমাত্রা=তুরীয়বিশ্ব, তুরীয়তৈজস, তুরীয়প্রাজ্ঞ, তুরীয়-তুরীয়

মোট এই ১৬টি মাত্রার অতীত অর্থাৎ ষোড়শ মাত্রা তুরীয়-তুরীয়েরও অতীত, একটি মাত্রা আছে।

অকারের ৪র্থমাত্রায় অর্থাৎ জাগ্রৎ-তুরীয় অবস্থায় থাকেন মুমুক্ষুরা—এঁদের তিনটি ভূমি, 'শুভেচ্ছা', 'বিচারণা' ও 'তনুমানসী' (১ম, ২য়, ৩য় ভূমি); উকারের ৪র্থ মাত্রায় অর্থাৎ স্বপ্নতুরীয় অবস্থায় থাকেন ব্রহ্মবিদ্‌রা এঁদের ভূমি হচ্ছে 'সত্ত্বাপত্তি' (৪র্থ ভূমি); মকারের ৪র্থ মাত্রায় অর্থাৎ সুষুপ্তি-তুরীয় অবস্থায় থাকেন ব্রহ্মবিদ্‌বরেরা, এঁদের ভূমি হচ্ছে 'অসংসক্তি' (৫ম ভূমি); অর্ধমাত্রার ৪র্থ মাত্রায় অর্থাৎ তুরীয়-তুরীয় অবস্থায় থাকেন ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্‌রা—এঁদের ভূমি হচ্ছে 'পদার্থভাবিনী' (ষষ্ঠভূমি); এটি ওঙ্কারের ষোড়শ মাত্রা। এরও অতীত অবস্থায় থাকেন ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠরা ; তাঁদের ভূমি হচ্ছে 'তুরীয়গা' (৭ম ভূমি)। ওঙ্কার ছাড়া যখন কিছুই নেই, তখন এই সপ্তম ভূমিকে ওঙ্কারেরই একটি মাত্রাহীন মাত্রা বা মাণ্ডূক্যোপনিষদের ভাষায় 'অমাত্রা' বলতে হবে। এইভাবে

৯ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৯, বংশোদ্ধার টীকা

১০ নির্ণয়সাগর প্রেস : ১০৮ উপনিষদ্‌, ৪র্থ অধ্যায়, পৃ : ৫৩১-৩২

ওঙ্কারকে মুমুক্ষু ও মুক্তপুরুষদের সাতটি অবস্থার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাদবিন্দু[১১] উপনিষদে ওঙ্কারের ১২ মাত্রার এবং তারসার[১২] উপনিষদে ওঙ্কারের ৮ মাত্রার উল্লেখ ও বিশদ বিবরণ আছে। বাহুল্যভয়ে এখানে তা' আলোচিত হ'ল না।

অকারাদি মাত্রার দিক থেকে আমরা ওঙ্কারের কয়েকটি ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছি। এখন শাস্ত্রে সাধারণভাবে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে সব কথা পাওয়া যায়, তার কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ শুরু করা হয়েছে ওঙ্কার উপাসনার কথা দিয়ে এবং প্রথম অধ্যায়ে নানাভাবে ঐ প্রসঙ্গের অবতরণা ক'রে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে।

ঐ উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শংকর লিখছেন: 'ওঁ' এই অক্ষরটি পরমাত্মার 'নেদিষ্ঠ অভিধান', অর্থাৎ পরমাত্মার বাচক অন্যান্য শব্দ রয়েছে বটে, তবে ওঙ্কার তাঁর নিকটতম বাচক; ওঙ্কারের প্রয়োগে পরমাত্মা প্রসন্ন হন, লোকে যেমন প্রিয় নামে সম্বোধিত হ'লে হয়ে থাকে; এটি পরমাত্মার প্রতীকও বটে; এইভাবে নাম ও প্রতীক এই উভয় হওয়াতে পরমাত্মার উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন হচ্ছে ওঙ্কার—সর্ব বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত। জপাদি কার্যে এবং বেদপাঠের আদিতে ও অন্তে বহুল প্রয়োগ হেতু ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব অতি প্রসিদ্ধ, ইত্যাদি।

প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে যেমন ওঙ্কারকে পর ও অপর ব্রহ্মের বাচক ও প্রতীক বলা হয়েছে, কঠোপনিষদেও তাই বলা হয়েছে:

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
১।২।১৬

এই ওঙ্কারই অপর ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), এই ওঙ্কারই পরব্রহ্ম। এই ওঙ্কারকে জেনে যিনি যা ইচ্ছা করেন, তাঁর তাই সিদ্ধ হয়।[১৩]

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥
১।২।১৭

এই ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এবং অপর-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মবিষয়ক। এই অবলম্বনকে জেনে সাধক ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হ'ন অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।[১৪]

এখানে লক্ষণীয় এই যে, নচিকেতা যখন সমস্ত প্রলোভনকে দূরে সরিয়ে কালত্রয়েও যা পরিচ্ছিন্ন হয় না, সেই পরম সত্যকে জানতে চাইলেন, তখন যম প্রথমেই তাঁকে ওঙ্কার উপদেশ দিলেন:

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
১।২।১৫

বেদসমূহ যে অভীষ্ট বস্তু প্রতিপাদন করেন, সমস্ত তপস্যা যাঁকে ঘোষণা করে, যাঁর প্রাপ্তির ইচ্ছায় লোকে ব্রহ্মচর্য পালন করে, আমি সংক্ষেপে সেই প্রাপ্য বস্তু সম্বন্ধে তোমায় বলছি—, সেটি ওঁ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাধ্যায়ের অষ্টম অনুবাকে দশটি ছোট ছোট বাক্য আছে। তার নয়টি বাক্যেরই আদিতে ওঁ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে:

---

১১ নির্ণয়সাগর প্রেস: ১০৮ উপনিষদ্, মন্ত্র ১—১৬, পৃ: ২৪২

১২ ঐ ২য় অধ্যায়, পৃ: ৫০৭

১৩, ১৪ শঙ্করভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যে-তদ্ অনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥

এর শাংকরভাষ্যের মর্মার্থ এইরকম :

'ওমিতি ব্রহ্ম' (ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবে) এই প্রথম বাক্যটির দ্বারা শ্রুতি, সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওঙ্কারের উপাসনার বিধান দিয়েছেন। 'ওমিতীদং সর্বম্' এই দ্বিতীয় বাক্যে কেন ওঙ্কারোপাসনা করতে হবে তার কারণ দেখানো হয়েছে; শব্দরূপ এই সব কিছুই ওঙ্কারের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—এই হ'ল কারণ। অবশিষ্ট ৮টি বাক্যে ওঙ্কারের স্তুতি করা হয়েছে —ওঙ্কারপুটিত সমস্ত ক্রিয়া ফলবতী হয়, সুতরাং ওঙ্কার ব্রহ্মরূপে উপাসনীয়, এই হ'ল বাক্য-গুলির তাৎপর্য—'ওঙ্কারপূর্বং প্রবৃত্তানাং ক্রিয়াণাং ফলবত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাৎ ওঙ্কারং ব্রহ্ম ইতি উপাসীত, ইতি বাক্যার্থঃ।' (শাংকর ভাষ্য)।

এই ৮টি বাক্যে বৈদিক যুগে ওঙ্কারের বহুল প্রয়োগের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় :

ওম্ এই শব্দটি সম্মতিজ্ঞাপক ব'লে প্রসিদ্ধ। (দর্শ,[১৫] পূর্ণমাস আদি যজ্ঞে) 'ও শ্রাবয়' ('ও', 'ওম্'-এরই আদ্য অংশ—সায়ণ) এই প্রৈষ[১৫] মন্ত্র যজুর্বেদীয় ঋত্বিক উচ্চারণ করলে, অন্যান্য ঋত্বিকরা দেবগণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করেন। ওম্ উচ্চারণ করেই সাম-বেদীয় ঋত্বিক সামগান করেন। 'ওঁ শোম্' উচ্চারণ ক'রে ঋত্বিকেরা শস্ত্র নামক স্তোত্র-সমূহ (গীতরহিত সামসমূহ) পাঠ করেন। ওম্ উচ্চারণ ক'রে অধ্বর্যু প্রতিগর (শোং সামো দৈবম্[১৬]—এই উৎসাহবর্ধক মন্ত্র) উচ্চারণ করেন। ওম্ উচ্চারণ ক'রে ব্রহ্মা (যজ্ঞ-পরিচালক প্রধান ঋত্বিক) যজ্ঞের অনুজ্ঞা দেন। যজমান ওম্ ব'লে অধ্বর্যুকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুমতি দেন। (সেই রকম, ব্রহ্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েও) বেদ অথবা পরমাত্মাকে লাভ করব মনে ক'রে বেদ-পাঠক বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ওম্ উচ্চারণ করেন এবং তার ফলে তিনি অবশ্যই বেদ বা পরমাত্মাকে লাভ ক'রে থাকেন।

মুণ্ডকোপনিষদে আছে :

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥
২।২।৪

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ২।২।৬

অর্থাৎ, ওঙ্কারই ধনু, জীবাত্মাই বাণ, ব্রহ্মকে ঐ বাণের লক্ষ্য বলা হয়। প্রমাদহীন হয়ে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। বাণের মতো তন্ময় হতে হবে—লক্ষ্যের সঙ্গে একীভূত হতে হবে।

আত্মাকে ওঙ্কারসহায়ে ধ্যান করো। অজ্ঞান-অন্ধকারের অতীত দেশে যাওয়ার পথে তোমাদের মঙ্গল হোক। (ক্রমশঃ)

---

১৫ দর্শ, পূর্ণমাস, প্রৈষ ইত্যাদির সরল বিবরণ ও ব্যাখ্যার জন্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'যজ্ঞকথা' দ্রষ্টব্য।

১৬ স্বামী গম্ভীরানন্দ : উপনিষৎ গ্রন্থাবলী ১।১৭৫

'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যানের একটি কবিতা পড়তে পড়তে ভগবদ্গীতার যেটি পরমতত্ত্ব, সেই তত্ত্বের কথা মনে হচ্ছিল। আমি কবির Prayer of Columbus পড়ছিলাম। এই কবিতাটি একজন সমালোচকের মতে The poetic autobiography of a soul. 'কলম্বাসের প্রার্থনা' কবিতাটিতে কবি কাব্যের ভাষায় নিজের পরিচয়কে অবারিত করেছেন। এই কাব্যময় আত্মজীবনীর মুকুরে কবিকে আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনসায়াহ্নের পরিপ্রেক্ষিতে। শালপ্রাংশু মহাকায় কবি দুশো পাউণ্ড ওজনের সুকঠিন বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে হেঁটে চলেছেন ওয়াশিংটনের রাজপথ দিয়ে। যেন মূর্ত গণতন্ত্র। এই ছিলো কবির জীবন-মধ্যাহ্নের ছবি। সেই ছবি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি জীবনসন্ধ্যায় চলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। দুঃখের মধ্যেই তাঁর দিনগুলি অতিবাহিত হয়। সে দুঃখ অপরিসীম —নিঃসঙ্গ নির্যাতিত কলম্বাসের শেষজীবনের দুঃখের মতোই সীমাহীন। কবির ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের গভীর থেকে মর্মান্তিক বেদনা বেরিয়ে এসেছে :

I am too full of woe!
Haply I may not live another day:
I cannot rest, O God, I cannot eat
or drink or sleep.

"আমার বেদনা সহ্যের সমস্ত সীমাকে অতিক্রম ক'রে গেছে, সৌভাগ্যের কথা, আমি হয়তো কাল পর্যন্ত বাঁচবো না, হায় ভগবান, আমি যদি একটু বিশ্রাম নিতে পারতাম, আমি খেতে পারিনে, কিছু পান করতে পারিনে, ঘুমাতে পারিনে।"

কবির জীবনসন্ধ্যা যখন দুঃসহ ব্যথায় এমনি ক'রে ভরে উঠেছে কানায় কানায় তখন ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে তিনি আশ্রয় খুঁজেছেন ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বোঝাকে হালকা করবার জন্য। কবি নম্র নত একটি নমস্কারে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন ক'রে দিয়েছেন তাঁরই চরণমূলে যাঁকে অনুক্ষণ চেতনায় রেখে জীবনের সমস্ত অভিযান শুরু করেছেন তিনি, সমস্ত দুঃখ-ব্যথাকে যাঁর দান ব'লে তিনি গ্রহণ ক'রে এসেছেন মনের মধ্যে কুণ্ঠার বিন্দুবিসর্গও না রেখে। ভগবানের কাছে কবির এই আত্ম-নিবেদন Prayer of Columbus কবিতাটির মধ্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

ভগবানকে সম্বোধন ক'রে কবি বলছেন :

"তুমি জানো, আমি একটিবারের জন্যও তোমাতে হারাইনি আমার বিশ্বাস অথবা প্রত্যয়। শৃঙ্খলিত, কারারুদ্ধ, অপমানিত—কোনো অবস্থাতেই আমি হা-হুতাশ করিনি, সবই গ্রহণ করেছি তোমার দান ব'লে, তোমার প্রেরিত আমার প্রাপ্য ব'লে।" ঈশ্বরে কবির বিশ্বাস এতই গভীর, প্রত্যয় এতই অবিচলিত যে শত নির্যাতনের, শত লাঞ্ছনার মধ্যেও তাঁর মনে উদ্বেগের ছায়ামাত্রও নেই। কেন মনে উদ্বেগের ছায়া পড়বে? হালের কাছে যে মাঝি রয়েছে! সেই মাঝিতে শক্তিরই শুধু পরিপূর্ণতা? তাঁর প্রেমের মধ্যেও কি পরিপূর্ণতা নেই? সেই মাঝিই জীবনতরীকে

পৌঁছে দেবেন দুঃখ-জলধির পারে। কবির মনে অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। ভুবনের ভার কি মানুষের হাতে? Man proposes, God disposes. আমরা শুধু চাইতে পারি। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? 'যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' আমাদের দৌড় চাওয়া পর্যন্ত। আমরা পরিকল্পনা করতে পারি, স্বপ্ন দেখতে পারি, স্বপ্নকে ফলবান করবার জন্য চেষ্টাও করতে পারি। বাস্, ঐ পর্যন্ত। ফল তাঁরই হাতে, যাঁর হাতে রয়েছে ভুবনের ভার। মা ফলেষু কদাচন। Prayer of Columbus কবিতায় কবি তাই বলেছেন:

Intentions, purports,, aspirations mine, leaving result to Thee.

আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, ব্যাকুলতা আমার, ফল সমর্পণ ক'রে দিয়েছি তোমারই হাতে।

গীতায় কর্তব্যের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। অর্জুনের ভিতরে একটি নিদারুণ দ্বন্দ্ব চলেছে। আত্মীয়স্বজনের রুধির ঝরাতে পার্থের মন কুণ্ঠিত। মমতায় অভিভূত হয়ে পার্থ যুদ্ধ করতে নারাজ। কৃষ্ণ বললেন, মমতার মুখোস প'রে ক্লৈব্য বাসা বেঁধেছে তোমার মনে। নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। তুমি ক্ষত্রিয়। দুষ্টের দমন ও ধরিত্রীর উদ্ধার তোমার কর্তব্য। ওঠো, যুদ্ধ করো। কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করার উপদেশ গীতায়। এর মধ্যে হৃদয়াবেগের কোনো স্থান নেই। ফলের দিকে আকুল অঞ্জলি বাড়ানোকে কৃষ্ণ আদৌ সমর্থন করেননি। নিরাসক্ত হয়ে কর্তব্য করে যেতে হবে। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং। গীতায় কর্মের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। কর্মে মানুষের অধিকারকে কৃষ্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু ফলে নয়।

ভগবদ্গীতায় দুটি মৃত্যুহান শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরমতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের এই দুটি শ্লোকের প্রথমটির শুরুতে মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ। দ্বিতীয়টি শুরু হয়েছে সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য দিয়ে। শ্লোকদুটির মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। ভগবদ্গীতার উদ্গাতা এই দুইটি শ্লোকের অর্থকে সম্প্রসারিত করবারও চেষ্টা করেননি। কেন? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভাষ্যে এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন: গীতার এই বাণীগুলির মধ্যে যে তাৎপর্য অনুস্যূত হয়ে আছে তা অসীম, তা কোনোকালেই ফুরোবার নয়। সেই অসীম *অর্থ তো ভাষ্যে পরিস্ফুট হবার নয়।* এই দুটি শ্লোকের অর্থ মর্মের গভীর থেকে গভীরে বসে যাবার জন্য। আত্মার অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতার আলোতেই শুধু শ্লোক দুটির অর্থকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

গীতার পরমতত্ত্বের উপরে শ্রীঅরবিন্দের এই যে মন্তব্য এর মধ্যে চিন্তার খোরাক প্রচুর আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বাস আর শরণাগতির কথা বলেছেন। শরণাগতির কথা, ভগবদনুগ্রহের কথা কি গীতারও চরম কথা নয়? আর নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ—এ বোল সহজে মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরুতে চায় না। জীবনের নিষ্করুণ রথচক্রে মানুষের সমস্ত অহংকার ধূলায় রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে গেলে তখনই সে অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে বলে, 'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।' মানুষের গর্ব সহজে চূর্ণ হবার নয়। তা চূর্ণ হবার জন্য অপেক্ষা করে অজানা দিগন্ত থেকে আকস্মিক আঘাতের পর আঘাতের। যে-সকল অভিজ্ঞতার জন্য আমরা কোনদিনই প্রস্তুত ছিলাম না, যে নৈতিক অধঃপতনের কথা স্বপ্নেও কখনো

ভাবতে পারিনি তাদের বজ্রাগ্নিশিখার আলোয় একদিন আসল সত্যটি আমাদের উপলব্ধিতে ধরা দেয়। আর এই সত্যটি হোলো, যাকে আমরা ইচ্ছাশক্তি ব'লে থাকি, যে ইচ্ছাশক্তিকে অপরাজেয় বলতে আমাদের একটুও বাধে না, তা আসলে কত ক্ষণভঙ্গুর! এত যে নৈতিক এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বাঁধ-বাঁধার প্রয়াস ইতিহাসের কোন্ আদিপর্ব থেকে আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলির প্রবল জলোচ্ছ্বাসকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য—সে বাঁধ আচম্বিতে কখন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ভিতরের শৃঙ্খলিত পশুরা খাঁচা ভেঙে বাইরে আসে বেরিয়ে। জীবনের আকাশে ঘনিয়ে আসে নৈতিক দুর্গতির গাঢ়তম অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে নিঃসহায় মানুষ কার চরণপ্রান্তে আশ্রয় নেবে? ভিতরের অশান্ত সমুদ্রের ক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাসকে থামিয়ে দেবে কে? যে ইচ্ছাশক্তিতে ভর দিয়ে এতদিন সে জীবনে অভিযানের পর অভিযান চালিয়ে এসেছে সেই শক্তি যে কত ঠুনকো, তা জানা হ'য়ে গেছে তার। এখন সমুদ্রের দেবতা বরুণের শরণ নওয়া ছাড়া তার গতি কোথায়? যুক্তিকে আশ্রয় ক'রে যে-ঈশ্বরের কোনো পাত্তাই সে পায়নি, জীবনের কঠিন কঠিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্রমাগত ধাক্কার পর ধাক্কা খেতে খেতে সে অবশেষে সেই ঈশ্বরের দিকেই তার ব্যগ্র বাহু দুটি বাড়িয়ে দেয়।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গীতাভাষ্যে ঠিকই বলেছেন, The last, the closing supreme word of the Gita expressing the highest mystery is spoken in two brief, direct and simple slokas and these are left without further comment or enlargement to sink into the mind and reveal their own fulness of meaning in the soul's experience. বাছুর কি সাধে হাম্বা হাম্বা ডাক ছেড়ে তুহুঁ তুহুঁ বলতে শুরু করে? বাছুরটা ম'রে যায়। তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে নাড়িভুঁড়ি শুকিয়ে ফেলা হয়। সেই নাড়ি ধুনুরির তুলো-ধোনা ধনুকের ছিলায় রূপান্তরিত হ'লে বাছুর তখন নূতন বোল শুরু করে—তুহুঁ তুহুঁ, ওগো আমি নই, আমি নই; তুমি, ওগো তুমি। সকল অহঙ্কারকে ডুবিয়ে দাও আমার চোখের জলে। হৃদয়-পদ্ম-দলে তুমি এসে দাঁড়াও আমাকে আড়াল ক'রে। অহঙ্কার যে কত মিথ্যা এবং শরণাগতি যে কত সত্য সে তো মন্মনা ভব এবং পরবর্তী শ্লোকটির টীকাটিপ্পনি দিয়ে বুঝাবার নয়। কেন ভগবান শ্লোক দুটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে শরণাগতির অর্থ বুঝাবার চেষ্টা করলেন না? গীতাভাষ্যে শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: For it is alone this inner incessantly experience that can make evident the infinite deal of meaning with which are forever pregnant these words in themselves apparently so slight and simple. সত্যই তো শ্লোক দুটি আপাতদৃষ্টিতে কতই না সহজবোধ্য! বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় না। দুটি শ্লোকের মধ্যে ভগবান বলেছেন, অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা আমাকে ভজনা করো, সমস্ত হৃদয়কে আমার দিকে উন্মুখ রাখো, প্রত্যেক কর্মকে আহুতি দাও আমাতে। তার পর জীবনতরীর হাল আর তোমার হাতে রেখো না। আমাকে তোমার জীবন, আত্মা, কর্ম

সব সঁপে দাও। তোমার মন নিয়ে, হৃদয় নিয়ে, জীবন নিয়ে, কর্ম নিয়ে আমার যা খুশি তাই করতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। আমার হাতে জীবনতরীর হাল তুলে দেবার পর জীবনে যা কিছু ঘটুক তাতে উদ্বিগ্ন হোয়ো না, 'সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা'—আমাকে সংশয় কোরো না। গীতার এই পরমতত্ত্ব মগজের বুদ্ধির আলোয় আমরা একরকম ক'রে বুঝতে পারি; জীবনের আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুঃখ-ব্যথার অন্ধকারের মধ্যে এই দুইটি শ্লোকের তাৎপর্যকে উপলব্ধির নূতন আলোয় উদ্ভাসিত দেখে চমৎকৃত হ'য়ে যাই।

গীতার অরবিন্দ-ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে হুইট্‌ম্যানের Prayer of Columbus পাঠ করলে মনে হবে, ঐ কবিতায় গীতারই পরম তত্ত্বটি যেন একটি নবতর সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। কবি বলছেন:

All my enterprises have been fill'd with Thee, / My speculations, plans began and carried on in thoughts of Thee, / Sailing the deep or journeying the land for Thee.

"আমার যত কিছু প্রয়াস সমস্তই পূর্ণ ছিলো তোমারই চিন্তায়, আমার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত পরিকল্পনা শুরু হয়েছে তোমাকে স্মরণ করে, তাদের কার্যে পরিণত করার চেষ্টার মধ্যেও তোমারই চিন্তা ছিল অনস্যূত হয়ে, সমুদ্রে সমুদ্রে তরী বেয়েছি, স্থলপথে ভ্রমণ করেছি - সেও তোমারই জন্য।" এই লাইনগুলির মধ্যে গীতার মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু—এই কথাগুলির প্রতিধ্বনি কি আমরা শুনতে পাইনে এবং আত্মার পরম উপলব্ধিগুলির মধ্যে একই শাশ্বত মানবাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখে চমৎকৃত হয়ে যাইনে? ঐ শ্লোকের শ্রীঅরবিন্দ অনুবাদ ক'রে তাঁর গীতাভাষ্যে লিখেছেন: Turn all thy mind to me and fill it with the thought of me and my presence. Turn all thy heart to me; make thy every action whatever it be a sacrifice and offering to me. হুইট্‌ম্যান্ যেন লাইনগুলিকে কাব্যের ভাষায় নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন! কূলহীন সাগরবক্ষের অজানায় তরী বেয়ে চলেছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—সে তো তোমারই জন্য প্রভু! সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্যে নাম-যশের কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না, ছিল না স্বার্থবুদ্ধির কোন গন্ধ। অচেনা দেশের বিপদসঙ্কুল স্থলপথে পদব্রজে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ভ্রমণ করেছি—সেও তো প্রভু আত্মপ্রীতির বশে নয়, সে পরিভ্রমণও তোমারেই ভালোবেসে, তোমারই জন্য। তোমাকে অনুক্ষণ আমার ভাবনায় রেখে সব কাজে হাত দিয়েছি, চরম বিপদের মধ্যেও আমার স্বপ্নকে ফলবান করতে সচেষ্ট থেকেছি।

পাশ্চাত্য দেশের আর কোনো কবির লেখায় গীতার মর্মবাণীর এই ঝঙ্কার শুনেছি বলে মনে হয় না। ব্রাউনিং-এর কাব্যেও ঈশ্বরের অসীম করুণায়, প্রার্থনার অমোঘ শক্তিতে একটা জীবন্ত বিশ্বাস প্রভাতী তারার মতোই জলজল করছে। ব্রাউনিংও মরমী ভক্ত কবি। কিন্তু হুইটম্যানের Prayer of Calumbus কবিতায় ভগবদ্‌গীতার মূল সুর যেমনটি প্রকাশ পেয়েছে এমনটি আর কোনো পাশ্চাত্য কবির কবিতায় পাইনি।

জীবনের নাট্যলীলায় ভগবানের ভূমিকা—অঙ্কে অঙ্কে, দৃশ্যে দৃশ্যে। আমাদের দুঃখ-সুখ

লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, আমাদের জীবনের তুচ্ছতম প্রতিটি ঘটনা—সমস্তের উপরেই তাঁর চরণচিহ্ন জলজল করছে। আমাদের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির মধ্যেও তাঁরই শুভ্রহস্তের স্পর্শ রয়েছে! তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই নেই। ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ "ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও তাঁহার দর্শন লাভ করাই হিন্দুদের সমুদয় সাধনপ্রণালীর লক্ষ্য।" এই একটি বাক্যের মাধ্যমে স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের মর্মবাণীকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন।

জীবনের নাট্যলীলায় তা'হলে মানুষের কি কোনো ভূমিকা নেই? আছে, নিশ্চয়ই আছে। কী সে ভূমিকা? অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা তাঁকে ভজনা করা। তিনি তো আমার দিকে দশ পা এগিয়ে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। কিন্তু আমাকেও তাঁর দিকে অন্ততঃ এক পাও এগিয়ে যেতে হবে। মানুষ ভগবানের জন্য কোনো সাধনাই করবে না, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে চুপচাপ ব'সে থাকবে এবং তাঁর করুণা-ধারা আপনা থেকেই মানবজীবনে নেমে আসবে, এমনটি হবার নয়। ঠাকুর শুধু ভগবদনুগ্রহের উপরে জোর দিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি। বারংবার সাধনার কথাও বলেছেন, নির্জনে প্রার্থনার উপরে কত জোর দিয়েছেন। এই সাধন আসলে স্মরণেরই সাধন। ভগবানের পায়ে ষোলো আনা মন ঢেলে দেবার কথাই ঠাকুর বলেছেন। নানা উপমার সাহায্যে ঐ একই কথা ভক্তদের মনের মধ্যে ঘা মেরে মেরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ষোলো আনা মনের এক কড়া-ক্রান্তিও কম নয়। সুতোর একটি মাত্র ফেঁসোও বাইরে থাকলে ছুঁচের মধ্যে সুতো যাবে না কখনো। ভগবান মানুষের ভালোবাসা পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। মানুষের হৃদয়ের দরজায় নিত্য তিনি জেগে ব'সে আছেন উপবাসী অতিথির মতো সেই শুভ মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় যখন মানুষ রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে তাঁকে ভিতরে ডেকে নেবে অসীম প্রেমে।

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরেছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছো জাগি।

বেদ বলছেন, তাঁর ভয়ে অগ্নি তাপ দিচ্ছে, সূর্য কিরণ বর্ষণ করছে, মেঘ জল ঢালছে, বায়ুর চলাচল অব্যাহত রয়েছে। মৃত্যুর ঘরে ঘরে যাওয়ার বিরাম নেই। তবে তিনি দুয়ার ভেঙে মানুষের হৃদয়মন্দিরে ঢুকলেই তো পারেন। তা পারেন ঠিকই। কিন্তু জোর ক'রে তিনি ঢুকবেন না। তিনি মানুষের ভালোবাসার শুধু ছিটে-ফোটাতে খুশী নন। তিনি চান, মানুষ শুধু তাঁকেই ভালোবাসবে। গীতায় কি তিনি এই কথাই বলেননি, মন্মনা ভব? অর্জুন, তোমার সমস্ত মনকে আমার দিকে তুলে রাখো। 'মন্মনা'র পরই আছে মদ্ভক্তঃ। শুধু তোমার মনকে আমার চিন্তা দিয়ে ভরিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়। তোমার সমস্ত হৃদয়কেও আমার দিকে কি উন্মুখ ক'রে রাখবে না? মদ্ভক্ত হও এই কথাটি বলেও ভগবান ক্ষান্ত থাকলেন না। বললেন মদ্‌যাজী হও অর্থাৎ তোমার জীবনের ছোট বড়ো সমস্ত কর্মই আহুতিস্বরূপ সমর্পণ করো আমাকে। বাইবেলেও খ্রীষ্টের বাণীতে ঠিক গীতারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়: "তোমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসো সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে, সমস্ত মন

দিয়ে।" ভগবান শিশুর মতোই নম্র। তাই জোর করেন না। দরজার গোড়ায় চুপ ক'রে বসে আছেন। মাঝে মাঝে দুয়ারে মৃদু করাঘাত করছেন। দরজা খোলার নাম নেই। দুয়ার খুলে ভগবানকে যে ভিতরে অভ্যর্থনা করবে তার মন তো ধনে জনে জড়িয়ে রয়েছে; চিত্ত ছড়িয়ে রয়েছে পার্থিব কত তুচ্ছ বিষয়ে। ভগবান মাঝে মাঝে দরজায় টোকা দিচ্ছেন। অকস্মাৎ মানুষ চমকে উঠে শুনতে পায় হৃদয়ের দরজায় কার করাঘাতের মৃদু শব্দ! যে-আনন্দকে চেয়ে সে জীবন ভরে আসক্তির ডালা ভরিয়ে তুলেছে কাঙালের মতো, ছায়া থেকে ছায়ার পিছনে ছুটে ছুটে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করেছে শুধু ক্লান্তির দুঃসহ ভারে, মৃত্যু থেকে মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ ক'রে ফেলেছে অশ্রুজল আর দীর্ঘশ্বাস—সেই আনন্দের অনন্ত নির্ঝর পরমানন্দঘনমূর্তি বাসুদেব স্বয়ং এসেছেন তার দ্বারে। দরকার নেই ধনে, দরকার নেই পুত্রে পৌত্রে, দরকার নেই সুন্দরী ভার্যায় আর পাণ্ডিত্যে। যাঁকে এতদিন ধরে খুঁজে বেরিয়েছি নানা আনন্দের মধ্যে তিনিই তো এসেছেন মানুষের প্রেমের কাঙাল হ'য়ে!

দরজা খুলে যায়! মানুষের সেই জন্মান্তরের শুভলগ্নে ভগবানের কোলে মাথাটি রেখে মানুষ শুধু বলে, এখন থেকে আমি শুধু তোমারই, শুধু তোমারই। "দুঃখ-সুখের বিচিত্র জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।"

জীবনের নাট্যে মানুষের ভূমিকা ভগবানের দিকে সমস্ত মনকে তুলে রাখা, সমস্ত হৃদয়কে তাঁর দিকে তুলে ধরা, সমস্ত কর্মকে তাঁর চরণপদ্মে আহুতিস্বরূপ অর্পণ করা। তার আর কিছু করার নেই। মানুষের এই স্মৃতিসাধনের কথাই কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে গীতাঞ্জলির নানা কবিতায় নানা ছন্দে নানা ভঙ্গীতে। যথা—

কেবল থাকা কেবল চেয়ে থাকা,
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা,
সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
সকল দিনের কাজেরি মাঝখানে।

অথবা,

এমন করে মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ ক'রে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই।

সাধনার দুর্গম ক্ষুরধার পথকে অতিক্রম করতে হয় মানুষকে একা একা। এ পথে তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই। কবির ভাষায়,

Not I, not any one else can travel that road for you, you must travel it for yourself.

ঐ রাস্তা তোমার হয়ে পর্যটন করবার শক্তি আমার অথবা আর কারও নেই, তোমাকে নিজেই ঐ পথ পর্যটন করতে হবে।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে, কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতেই সেই আঁধার ঘরের রাজার কাছে পৌঁছাতে হয়। কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ পূর্ণ ক'রে রাখা কি সহজ? ভগবান, বললেন, 'মন্মনা হও। আমার কাছে তা'হ'লে আসবেই।' কিন্তু প্রভু, 'তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।' মন যে বায়ুর মতো, কারও শাসন মানে না। ভগবান আশার বাণী শুনিয়ে অর্জুনকে আবার বললেন 'অভ্যাসের এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মন-করীকেও বশে আনা যায়।'

মনকে ম্যামনের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত

ক'রে তাকে ভগবদ্‌চিন্তায় অনুক্ষণ পূর্ণ ক'রে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে ! তখন মানুষের সাধনার পালা শেষ হোলো। সমস্ত মনকে, সমস্ত হৃদয়কে তাঁর দিকে উন্মুখ রাখার সাধনা সাফল্যে যেই মুকুটিত হোলো আর তো সাধকের করার কিছু রইলো না। 'জীবনখানি উজাড় ক'রে স'পে দে তাঁর চরণমূলে।' আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত ভূমিকা মানুষের। That done, leave me to do my will with thy life and soul and action. সেই ভূমিকা শেষ হলে জীবনবাঁশী আমার হাতে তুলে দাও। সেই বাঁশীকে বাজতে দাও আমার সুরে। জীবন-তরীর হাল তুলে দাও আমার হাতে। তাকে চলতে দাও আমার ইঙ্গিতে। যদি দুঃখ আসে, বিপর্যয় ঘটে—মা শুচঃ।

দুখের রাতে নিখিল ধরা
যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

মানুষের দিক থেকে পুরুষকারের ভূমিকা অনুক্ষণ ভাবনার ভজনার মধ্যে সমাপ্ত হ'লে জীবনের নাট্যলীলায় দৈবের ভূমিকা শুরু হয়ে গেলো। সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয় যখন ভগবানের দিকে উন্মুখ হয়ে আছে, ব্যক্তিগত চেতনার ক্ষেত্র থেকে উত্তমপুরুষের একবচন যখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কর্মের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধির যখন নামগন্ধ আর রইলো না, মানবীয় ইচ্ছা-শক্তিতে সেই অটুট বিশ্বাস যখন ধূলিতলে লুণ্ঠিত তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে আসে করুণার ধারা। নেমে আসে অফুরন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা, নেমে আসে অপরাজেয় ইচ্ছা-শক্তির দৃঢ়তা, নেমে আসে দৈববাণী যাকে উপেক্ষা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। Prayer of Columbus-এ কবির কণ্ঠে এই ভগবদনুগ্রহের অকুণ্ঠ জয়ধ্বনি।

O I am sure they really came from Thee,
The urge, the ardour, the unconquerable will,
The potent, felt, interior command stronger than words,
The message from the Heavens whispering to me even in sleep,
These sped me on.

"আমি নিঃসংশয়ে জানি ওরা সত্যই এসেছিল তোমারই কাছ থেকে,

ঐ উদ্দীপনা, ঐ উৎসাহ, ঐ অপরাজেয় সংকল্প,

ঐ যে ভিতরের অমোঘ আহ্বান—বাক্যের চেয়েও কঠিনতর, যা শুধু অনুভব করা যায়, ঐ আকাশবাণী যা ঘুমের মধ্যেও চুপে চুপে এসেছে আমার কানে, এরাই তো আমাকে সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।" কবি, দরিদ্র এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি যেখানে তাঁর প্রার্থনা শেষ করেছেন সেখানে ভাষায় উপনিষদের ঋষিদেরই যেন প্রতিধ্বনি :

"আমার জীবনে আলো জ্বালিয়েছিলে
তুমিই প্রভু,
অকম্পিত অবর্ণনীয় ঐ আলোকরশ্মি
এসেছিলো তোমারই কাছ থেকে।"

ভগবানকে কবি বলেছেন, অনির্বচনীয় দুর্লভ জ্যোতিস্বরূপ তুমি, lighting the very light. আলোর তুমি আলো। উপনিষদের সেই কথা 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ গণ-আন্দোলন ও ধর্ম-আন্দোলনের যে একাত্মতা অনুধাবন করেছিলেন, 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসচেতনা-প্রসঙ্গে তা বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। আধুনিককালে প্রধানতঃ মার্কস্ ও এঙ্গেল্সের চিন্তাধারার অনুসরণ-কারীরা ধর্মচিন্তাকে মানব-ইতিহাসের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় মনে করে থাকেন। পৌরাণিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন ধর্মসংস্কৃতিকে বর্তমানকালের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করতে না পেরে একদিকে অতীতের যা-কিছু পূজা-অর্চনা, মন্ত্র-তন্ত্র সব কিছুরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রবণতা যেমন ঊনবিংশ-শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল, তেমনি এ যুগে অর্থনীতির বিবর্তনেই সমাজচেতনার প্রাণসত্তাকে নির্দিষ্ট করে দেখাবার ফলে যা-কিছু সাময়িক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অননুমোদিত তাকেই উপহাস করার প্রবণতা সমাজে দেখা দিয়েছে। এদিক থেকে ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর সমাজ-বিশ্লেষণে এক ভাবে নয় আর এক ভাবে সমাজচেতনার সমগ্র স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে সমকালীন মতবাদ-গুলিই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তাৎপর্য সম্বন্ধেও এযুগের সমাজশাস্ত্রীদের চিন্তায় তাই অনিশ্চয়তার নিদর্শনই বেশী। একদল মনে করেন, প্রাচীন ও প্রচলিত হিন্দুয়ানির অন্ধ অনুকরণই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের পরিণামফল, আর একদল মনে করেন সর্বধর্মসমন্বয়ের পর থেকে আর আমাদের কোনো ধর্মানুসরণেই নিষ্ঠার প্রয়োজন নেই, ভাসাভাসা ভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মগুরুদের বচনসংগ্রহেই ধর্মচিন্তার চরিতার্থতা। তাছাড়া মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক বলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের ফলে আমাদের পাশ্চাত্যমুখী প্রগতির দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে—এ-জাতীয় মতবাদের সমর্থক 'আধুনিক' পণ্ডিত তো শিক্ষিত সমাজে অনেকই মেলে।

সেদিক থেকে ভারত-ইতিহাসের পর্যালোচনাকালে 'বর্তমান ভারত'-গ্রন্থে স্বামীজীর ইতিহাস-বিশ্লেষণে ভারতের বিভিন্ন যুগের মানস-সংঘাতে "সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ"[১] —এই বিশ্লেষণটি অবশ্যস্মরণীয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভারতের ধর্মচেতনার দ্বৈত থেকে অদ্বৈত সব কয়টি স্তরকে মর্যাদার সঙ্গে সুবিন্যস্ত করে মানবচিন্তার সোপান-পরম্পরা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় সাকারবাদী ঈশ্বর-উপাসনার অন্তর্নিহিত মহাসত্যই যে যোগীঋষিদের ধ্যানে পরমতত্ত্বের নিরঞ্জন নিরাকার অদ্বৈত চেতনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে—এ কথাটি শুধু দার্শনিক সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা তাঁরা ভারতবাসীর সামনে প্রমাণ করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-আন্দোলনে রাম-মোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম

---

১ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বর্তমান ভারত : পৃ : ২৩৭

চিন্তানায়কেরা যখন সমগ্র দেশের ঐতিহ্যকে তাঁদের নিজস্ব বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে চাইছিলেন, তখন বিশেষ কিছুসংখ্যক পাশ্চাত্যশিক্ষিতের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার বাইরে চিরন্তন ভারতবর্ষের যে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির রূপ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনায় প্রতিভাত হ'লো তারই ফলে ভারতীয় জীবনপ্রবাহের মূল স্রোতস্বিনী 'আর্য'-সভ্যতার ধারায় নূতন গতিবেগসঞ্চার। সেই সঙ্গে ইসলাম ও খৃষ্টীয় সাধনার অন্তরঙ্গ সত্যের সম্মেলনে নবযুগের ধর্মচেতনার বিশ্বতোমুখী প্রসার।

পাশ্চাত্যের ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনধারা—এসব কিছুর প্রবল প্রভাবে আত্মস্থতার প্রয়োজনেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা আমাদের অন্তরে যথার্থ আদর্শগত গৌরববোধ জাগিয়ে নবজাতীয়তার পথ প্রশস্ত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিল তার পিছনে ইতিহাসের আরো অনেক উপকরণের কথা মনে রেখেও বলা চলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জাতির আত্মস্থতার মূল ভিত্তিটি এযুগে নূতন-ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন বলেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এ জাগরণ সম্ভব হতে পেরেছিল।

আবার স্বাধীনতালাভের পর আধুনিক-কালে যখন "অভাবের হাত থেকে" আমরা মুক্তি চাইছি, তখনও গণ-জাগরণের আহ্বানে স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের বাণী ভারতের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত— "…নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"[২]

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই 'নূতন ভারত' বলতে কি আজকের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহে মত্ত শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন বোঝাবে? বলা বাহুল্য, সাম্প্রতিক কালের গণজাগরণ নিশ্চয় বিবেকানন্দ-আদর্শের বিপ্লব নয়। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই সব আন্দোলনও যে সাধারণ মানুষের অন্তরে নানা প্রশ্ন তুলছে, সচেতনতা এনে দিয়েছে—তাও অস্বীকার করা যায় না। এখন প্রয়োজন, এই গণচেতনাকে ভারতীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে যুক্ত করে ভবিষ্যৎ-সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে তোলা।

* * *

হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'Education' গ্রন্থে ইতিহাসের যে গণভিত্তিক রূপ দেখতে চেয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে দু'চারটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহ-ই ইতিহাসের মূল বিষয়,—এ সিদ্ধান্ত আজকের দিনে অনেকেই মেনে নেবেন। কিন্তু এই সাধারণ মানুষেরই মধ্যে বিভিন্ন গুণের তারতম্যে সাধক, মহাপুরুষ, রাজা, সেনাপতি, নেতা—এঁরা দেখা দিয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে কেউ ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ সমাজে বা রাষ্ট্রে নানাভাবে নূতন চিন্তা ও কর্মের তরঙ্গ তুলে যান। পরবর্তীকালের অনেক মানুষ তাঁদেরই চিন্তাপদ্ধতিকে রূপায়িত করতে গিয়ে সভ্যতার বিভিন্ন যুগ গড়ে তোলে। সুতরাং স্পেন্সারের মন্তব্য—"রাজ্যশাসন কি প্রকারে হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন, শাসকদিগের

২ তদেব : পরিব্রাজক : পৃঃ ৮২

ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া কি করিব?"[৩] —কতদূর সমর্থনযোগ্য তাও ভেবে দেখা দরকার। আসলে গণচেতনার প্রবক্তারা একথা ভুলে যান যে সমাজে যেমন সাধারণ মানুষ আছে, তেমনি আছে সাধারণ মানুষের পরিচালক নেতৃস্থানীয় মানুষ। প্রথম দল যদি ইতিহাসের উপকরণ হয়ে থাকেন, তাহলে দ্বিতীয় দলও ইতিহাসের উপকরণ। বরং যাঁদের জীবনে ও মননে অন্যদের উদ্বুদ্ধ, প্রভাবিত ও পরিচালিত করার শক্তি আছে, তাঁদের কথা ইতিহাসে বিশেষভাবেই আলোচ্য। সাম্যবাদী দেশগুলির ইতিহাসেও দলনেতাদের জীবনবৃত্তান্ত এই কারণেই অনেক পাতা জুড়ে থাকে। তবে মতবাদের অনুরোধে ইতিহাসকে প্রভাবিত বা আচ্ছন্ন করার চেষ্টা সাম্যবাদী দেশগুলির ক্ষেত্রে একটু বেশী পরিমাণে দেখা দেয়।

সুতরাং রাজ্যশাসনের পদ্ধতিও যেমন জানা দরকার তেমনি জানা দরকার কাদের মননে ও প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের বিশিষ্ট রূপ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কোনো মতবাদ বা রাষ্ট্রনীতিকে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যহীন ভাবমূর্তির দ্বারা পুরোপুরি জানা যায় না। অতীতের কীর্তিগাথা বর্তমানকেও ভালোবাসতে শেখায়। সুতরাং গণচেতনার স্বাক্ষর যেমন ইতিহাসে প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনচরিত। হয়তো সেযুগে তাঁরা রাজা বা সেনাপতি, এযুগে দলনেতা বা অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক—এই পার্থক্য।

দেশের ইতিহাসকে আমরা বিশিষ্ট আদর্শের প্রকাশরূপে যদি দেখতে চাই, তাহলে সেই বিশিষ্ট আদর্শ যাঁদের জীবনে রূপায়িত হয়েছে তাঁদের জীবন-কাহিনী থেকেই আমাদের অনুসরণযোগ্য সম্পদ আহরণ করতে হবে। ভারতের ইতিহাস যদি ধর্মপ্রাণতার ইতিহাস হয়ে থাকে তাহলে সুদূর অতীত থেকে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিলয়ের কাহিনীর দ্বারাই ভারতীয় চেতনার বিশ্লেষণ সম্ভব! আবার এক একটি বিশেষ ধর্মান্দোলনের প্রাণপুরুষকে অবলম্বন করেই জাতির অন্তরের বাণীটি উপলব্ধির আলোকে ধরা দেয়।

এদিক থেকে বেদ বা উপনিষদের ঋষিদের প্রত্যক্ষ জীবনচরিত না থাকাটা আমাদের জাতীয় অভাব। কিন্তু বেদ-উপনিষদের সেই উপলব্ধিই তো যুগে যুগে বুদ্ধ, শংকর, রামানুজ, দাদূ, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মতো মহামানবদের জীবনে রূপায়িত। সুতরাং এঁদের জীবনেতিহাস বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা ভারতীয় মানসের ক্রমবিকাশ যেমন ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করতে পারি, তেমনি আবার রাজনৈতিক ইতিহাসের ছিন্নসূত্রগুলি উদ্ধারের দ্বারা রাষ্ট্রীয় চেতনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও পেতে পারি।

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই রাজনৈতিক ইতিহাসের অনুসন্ধানী ছিলেন। আর বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' খুঁজেছেন অধ্যাত্ম তথা গণচেতনার ইতিহাস। কারণ ধর্মই ভারতের মর্মবাণী। ভারত-ইতিহাসের মর্মসূত্র নিহিত রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনের উত্থানপতনে। (ক্রমশঃ)

---

৩ শিক্ষা: হার্বার্ট স্পেন্সার: স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত: শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত বসুমতী সংস্করণ: পৃ: ৩২

ঋষি মার্কণ্ডেয়

শ্রীদ্বারকানাথ জ্যোতির্ভূষণ

[মৃকণ্ডু ঋষির পুত্র বলিয়া ইঁহার নাম মার্কণ্ডেয়। ইঁহার আয়ু ছিল মাত্র ১২ বৎসর, পরে দৈব কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন। নৃসিংহপুরাণে আছে, মৃকণ্ডু ঋষি ও তাঁহার পত্নী পুত্রের স্বল্পায়ুর কথা জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেন। পিতামাতাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া ও ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বালক মার্কণ্ডেয় নিজ স্বল্পায়ুর কথা জানিতে পারেন। পিতা-মাতাকে তিনি বলেন, 'আপনারা ভাবিবেন না, দেখিবেন আমি দীর্ঘজীবী হইব।' এই বলিয়া তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সম্মুখে কঠোর তপস্যায় রত হন এবং নিজ তপস্যাবলে দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

পদ্মপুরাণে আছে, পুত্রের স্বল্পায়ুর কথা জানিয়া পিতা মৃকণ্ডু কমবয়সেই তাঁহার উপনয়ন দেন। উপনয়নের পর বালক যখন ঋষিদের প্রণাম করিতেছিলেন, তখন ঋষিরা "চিরায়ু হও" বলিয়া আশীর্বাদ করেন। পরে বালকের স্বল্পায়ুর কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে দীর্ঘজীবনের বর দেন।

মার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্বে স্বল্পায়ু ছিলেন, পরে যে ভাবেই হউক, দৈব প্রভাবে তাঁহার আয়ু বাড়িয়া যায়—ইহারই ভিত্তিতে আখ্যানগুলি রচিত হইয়াছে। বর্তমান আখ্যানটিও তাই।]

হিন্দুদিগের যতগুলি পবিত্র ভাবগ্রাহী পৌরাণিক গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে দুইখানি গ্রন্থ। প্রথমখানি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অপরখানি শ্রীশ্রীচণ্ডী। এই দুইখানি গ্রন্থ অতি পবিত্র। এই দুইটি গ্রন্থের মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডী শ্রীমৎ মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে এক বিভীষিকার পরিবেশে তিনি দেবীর দর্শনলাভ এবং তাঁহার নিকট হইতে দেবীমাহাত্ম্য-কথনের জন্য বরলাভ করেন।

পুরাকালে কোন কোন দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর দস্যুদল লুণ্ঠন করিতে বাহির হইবার পূর্বে দেবী কালিকা বা চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিয়া যাইত। সে-সময় তাহাদের অনেকে আবার নরবলি দিতেও দ্বিধা করিত না।

সেই যুগের এক মঙ্গলবারে এমনি একটি দস্যুদল চণ্ডিকাদেবীর নিকট বলি দিবার জন্য বহু অনুসন্ধানের পর একটি হৃষ্টপুষ্ট অক্ষতদেহ ব্রাহ্মণ বালককে পাইয়া লইয়া আসিয়াছে। এই বালকই ভাবী কালের ঋষি মার্কণ্ডেয়। বালক একটি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্তভাগে একখানি ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটিরে বিধবা মাতার স্নেহশীতল বক্ষে প্রকৃতির সহজ মনোরম পরিবেশে চন্দ্রকলার ন্যায় ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। দস্যুগণ এই বালককে তাহার মাতার নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া যায়। অসহায় দুঃখিনী মাতা পুত্র-শোকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া হাহাকার করিতেছেন, আর কায়মনোবাক্যে কাতরকণ্ঠে বিপত্তারিণী মহামায়া চণ্ডীকে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। দস্যুরা যখন কাড়িয়া লইয়া যায় তখন তিনি পুত্রকে বলিয়া দিয়াছিলেন,

'আমার তো শক্তি নাই, কিন্তু মহামায়া তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। এ মহাবিপদে তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহাকে ডাক।'

অমাবস্যার গভীর রাত্রি, গাঢ় অন্ধকারে ধরণী আবৃত। দস্যুদল বালককে লইয়া আসিল শ্বাপদসঙ্কুল এক ভীষণ অরণ্যে। চারিদিক নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে ঝিল্লীরবমাত্র স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। ঈষৎ আলোক-স্পন্দনে মাঝে মাঝে বনস্থলী যেন চমকিয়া উঠিয়া বালকের মনে আরও ভীতি-সঞ্চার করিতেছে। বনেরও যেন শেষ নাই, অন্ধকারেরও অন্ত নাই। এই বিরাট বিভীষিকার মধ্যে বালক মার্কণ্ডেয় একটি বৃক্ষকাণ্ডের সহিত দৃঢ় রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া মাতৃ-আদেশে সারাক্ষণ মহামায়া চণ্ডীকে স্মরণ করিতেছেন। দস্যুগণ অদূরে মদ্যপানে রত। দস্যুসর্দার পূজায় ব্যস্ত। কিন্তু বলি দিবার পূর্বক্ষণে একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। বিদ্যুৎবরণী মহামায়া চণ্ডিকা সহসা সেখানে আবির্ভূতা হইলেন। সমস্ত বনভূমি তাঁহার অঙ্গের প্রভায় আলোকিত ও পদ্মগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল। মাতা চণ্ডিকা মার্কণ্ডেয়কে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, ভয় নাই। তোর কাতর আহ্বান আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, তোকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি।" বালকের চক্ষুদ্বয় দরবিগলিত অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া উঠিল। মাতা চণ্ডিকা মার্কণ্ডেয়ের মস্তকে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দস্যুগণ ভীতিবিহ্বল চিত্তে সাষ্টাঙ্গে মাতৃপাদপদ্মে পতিত হইল।

কিন্তু সহসা যমরাজ সেখানে আবির্ভূত হইয়া করজোড়ে দেবীকে কহিলেন, "মার্কণ্ডেয়ের আজ মৃত্যুর দিন, মার্কণ্ডেয়ের আয়ুষ্কাল সমাপ্ত হইয়াছে। দেবি! আপনি মার্কণ্ডেয়কে পরিত্যাগ করুন।"

দেবী ব্যথিতা হইয়া কহিলেন, "যমরাজ! মার্কণ্ডেয় এখন আমার আশ্রিত, আমি তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছি। নিয়ম আমার সৃষ্টি, আমি নিয়মের অধীন নই। মৃত্যুপতি, সে আর তোমার অধিকারভুক্ত নহে। তাহার আশা পরিত্যাগ কর।"

কিন্তু নিজ অধিকারে অহঙ্কৃত যমরাজ তৎকালে বিস্মৃত হইলেন যে, মহামায়ার শক্তিতেই তিনি শক্তিমান। নিজ অধিকার স্থাপনের জন্য মহামায়ার নিকট হইতে বল-পূর্বক মার্কণ্ডেয়কে লইয়া যাইবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। তখন ব্রহ্মা নারায়ণাদি দেবগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া যমরাজের এই চপলতাকে নিরস্ত করেন। নারায়ণ মার্কণ্ডেয়কে এই সময় বরদান করেন, "তুমি আজ হইতে শতবর্ষ বাঁচিয়া থাক।" মহামায়া বর দিলেন, "তুমি আমার মহিমার কথা প্রচার করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করিবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

কোন বস্তুরই সমগ্র সত্তার নাগাল পাওয়া সীমিত মনের সাধ্য নয়। তাই আমরা প্রায়ই অন্ধহস্তিন্যায়ে দেখে থাকি। শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে মন চোখের দেখাকে বিশ্বাস করে না। প্রশ্ন করে: "ইনি কি মানুষ, না ভগবান?" কিন্তু এটা কোনও সমস্যা নয়। যিনি অনেকের চেয়ে বেশী করে তাঁকে দেখেছিলেন, সেই বিবেকানন্দ বলেছেন, "তাঁকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার বল, আপনার-আপনার ভাবে নাও। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।"

Max Muller শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন: "He was a wonderful mixture of God and man." এতে অবশ্য পূর্বোক্ত আপাতসমস্যা এড়ানো যায়—ভগবান মানুষ হয়েছিলেন, না মানুষ ভগবান হয়েছিলেন—"As if," Max Muller-এর ভাষাতেই, "there could be priority in philosophical or religious truth" কিন্তু এমন "mixture"-এর কল্পনা এ দেশের মানসে কষ্টকল্পনামাত্র। তার কারণটাও তাঁর ভাষাতেই প্রকাশ করছি: "In India the distance between deity and humanity is very small; gods are believed to become men, and men gods, without much ado about it."

"ভারতবর্ষে দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের পার্থক্যটা নিতান্তই কম; বেশী হৈচৈ না করেই সেখানে দেবতারা মানুষ হয়ে দেখা দেন, আবার মানুষও দেবত্ব লাভ করেন।"

আজ যখন পৃথিবীর মানুষ একদিকে চন্দ্র ও গ্রহতারকার দিকে হাত বাড়াচ্ছে আর অন্যদিকে আন্তর আকাশের মহাশূন্যে দিশাহারা তখন এই দেবমানব-প্রসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। আজ সমস্ত জগৎ এক বিরাট সভ্যতাসংকটের সম্মুখীন। Hamlet-এর প্রসিদ্ধ প্রশ্ন "to be or not to be" নতুন রূপ নিয়েছে—"to bomb or not to bomb!" Old Testament-এর আস্তিক্যসূচক প্রশ্ন, "Have we not all one Father?"—আজ বড় পুরাতন। মানুষ ভুলেছে: "পিত্রৈকভাবান্ ন চ জাতিভেদঃ।"

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত চিকাগো ধর্মমহাসভার পঞ্চসপ্ততিতম বার্ষিকী উপলক্ষে চিকাগো শহরেই অনুষ্ঠিত ধর্মালোচনাচক্রে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ Father Robert Campbell আক্ষেপ করে বলেছেন, "It seems to me that there has developed a crisis in Christianity, the worst crisis in its history." "আমার মনে হয় খৃষ্টধর্মে এর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকট দেখা দিয়েছে।" তিনি খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আরও বলেন, "The liberal Christian outlook is sympathetic to a great extent to the Hindu outlook. As a matter of fact, on many points, I think, you will find the liberal Christian outlook moving in the direction of the East in much of its philosophy—both in its concept of an impersonal God and in the concept that we are all divine." "উদার খৃষ্টান

দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু দৃষ্টির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। আমার মনে হয়, বস্তুত অনেক বিষয়ে আপনারা দেখবেন উদারনৈতিক খৃষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে - এর দর্শনের দিকে অনেকখানিতে,—নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের কল্পনায় বা আমরা সকলেই দেবত্ব-সম্পন্ন এ চিন্তায়।"

আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি উদারমতাবলম্বী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এ নতুন চিন্তাধারার কারণ কোথায়। এমন কি Father Campbell এ কথাও বলেন, "This concept [original sin] is very offensive to liberal Christianity which holds that man is perfectable by training and proper education." "নব্য খৃষ্টান চিন্তাধারায় প্রাথমিক পাপের কল্পনাটিও নিতান্ত অপ্রীতিকর, কেননা এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ প্রকৃত শিক্ষা ও চেষ্টার দ্বারা পূর্ণতালাভে সক্ষম।" বিষয়গুলি বিচার করলেও সহজেই প্রতীয়মান হয় বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের পাশ্চাত্ত্যে প্রচারের ফলেই এ সকল নতুন দৃষ্টির সৃষ্টি। "With five words he (Vivekananda) conquered the world, so to say, when he addressed men and women as 'ye divinities on earth !—Sinners ?' " যেন পাঁচটি কথায় বিবেকানন্দ জগৎ জয় করলেন, 'মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা! পাপী ?'—প্রথম চারটি প্রাচ্যের কথা—আশার কথা, উৎসাহের কথা। শেষটি পাশ্চাত্ত্যের কথা—নৈরাশ্যের কথা, অবসাদের কথা। বিবেকানন্দের জয় প্রাচ্যের জয় পাশ্চাত্ত্যের ওপর, উৎসাহের জয় অবসাদের ওপর, আশার জয় নৈরাশ্যের ওপর। Romain Rolland ও স্বীকার করেছিলেন, "It is incontestable that a relationship reveals itself between the Vedantic ideas and many of the ideas and tendencies which are appearing now in the West." "এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বৈদান্তিক চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্ত্যের কিছু কিছু আধুনিক চিন্তাপ্রবণতার মধ্যে বেশ একটা সম্বন্ধ রয়েছে।" কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল যে, এই চিন্তার পরিবর্তনের জন্য বৈদান্তিক চিন্তাধার আধুনিক কালের প্রচার দায়ী। স্বামী অশোকানন্দজী **The Influence of Indian Thought on the Thought of the West**-এ Romain Rolland-এর এ সন্দেহের নিরাকরণ করেছেন।

এই নতুন প্রচারের কথা বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন :

"The present upheaval of the spiritual tide, the waves of which, traversing nearly half of the world, have touched the shores of America, was produced by the Christlike character and divine personality of Bhagavan Sri Ramakrishna—revered and worshipped in India today as an ideal manifestation of the divine glory." "আজ অধ্যাত্মচেতনার যে নতুন জোয়ার উঠেছে, যার ঢেউ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অতিক্রম করে আমেরিকার তটে তটে আছড়ে পড়ছে, তার কারণ খৃষ্টের মতো চরিত্র ও ও ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি আজ ভারতে ভগবদৈশ্বর্যের এক আদর্শ প্রকাশ বলে সম্মানিত ও পূজিত।" Max Muller লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর সময়েই : "Some Vedantist missionaries, such

as Vivekananda, Abhedananda, Saradananda, and others, who were sent to America, are lecturing there before large audiences, and have actually made some converts who accept the Vedantic view of the world." "কিছু বৈদান্তিক প্রচারক, যেমন বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ, এবং অন্যান্যরা যাঁদের আমেরিকায় পাঠানো হয়েছে, বিরাট শ্রোতৃবর্গের সামনে বক্তৃতা করছেন এবং বেশ কিছু ব্যক্তিকে তাঁদের মতে নিয়েছেন, যাঁরা জগৎ সম্বন্ধে বৈদান্তিক ভাবকে গ্রহণ করেছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকীর সময়ে আমাদের দেশের মনীষী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারও দেখেছিলেন: "Today in 1936 it is possible to observe objectively that among all the agencies that are contributing to the expansion of the intellectual horizon both in the East and the West, and the establishment of international **rapprochement** none is more substantial and profound as a world force than the Vedanda. centres in the U. S. A." "আজ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বাস্তবসাক্ষ্যে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব যে, যুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানসিক দিগন্তের সম্প্রসারণে ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের স্থাপনায় যে-সকল মাধ্যম কাজ করছে, তাদের মধ্যে বিশ্বশক্তি হিসাবে আমেরিকার বেদান্ত কেন্দ্রগুলি অপেক্ষা অন্য কোন সংস্থা গভীরতর ও উপযুক্ত কাজ করেনি।"

যে মানুষটির জীবন ও চরিত্রই মুখরিত হয়ে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে এই নব-উদ্বোধন সৃষ্টি করেছিল, যিনি নিরক্ষর হয়েও অক্ষর সত্যের কথা 'বহতা নীরের' মতো গ্রাম্য ভাষায় প্রকাশ করে তথাকথিত শিক্ষিতের বিদ্যামদোন্মত্ত অভিমানকে লজ্জিত করেছিলেন, যিনি 'আপনি আচরি ধর্ম' লোকারণ্যের বনস্পতিস্বরূপ তিনি ভগবান্ হ'ন বা না হ'ন, এই যুগন্ধর মহাপুরুষকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। ভারতের সনাতন ধর্মের জয়ধ্বজা যখন ভূলুণ্ঠিত, ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে জনমানসে যখন সন্দিগ্ধতা ভিন্ন সকল আস্তিক্যবুদ্ধিই অবলুপ্ত,– বক্তৃতা, গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-রচনা বা সমাজসংস্কার তখন ভারতের মাটিতে কার্যকর হবার নয়। তাই এর কোনটিই করেননি রামকৃষ্ণ। সংশয়িত মনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন বিশ্বাস জন্মায় না। জীবনেই যেখানে অনাস্থা সেখানে জলন্ত জীবন ভিন্ন আর সকলই নিষ্ফল। রামকৃষ্ণ এই মহাসংকটকালে সকল নাস্তিক্যের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে সংশয়াকীর্ণ জনমানসের সামনে আপন জীবনবেদটিকে খুলে ধরলেন। রামমোহন থেকে শুরু করে (আত্মীয়সভা, ব্রাহ্মসমাজ, ধর্মসভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, প্রার্থনা-সভা, আর্যসমাজ ইত্যাদি ইত্যাদি) এ দেশের ভাবজগতে সে যুগে যে নতুন নতুন তরঙ্গ উঠেছিল যাকে আমরা ভারতের নবজাগরণ বা রেঁনেসাস বলে থাকি, তা কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, শুধু জাগরণই—চলা নয়, কোন নতুন পথে ঠিক ঠিক চলা নয়। নবজাগরণ ও পুনরুজ্জীবনে এই খানেই পার্থক্য। সেই হিসাবে পুনরুজ্জীবন অপেক্ষা করেছিল রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের জন্য। কারণ দীপই দীপকে জ্বালাতে পারে। জীবনই উজ্জীবনের কারণ হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশব সেনের স্মরণসভায় কলকাতার টাউন হলে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন: "It has been truly said that a great man is the product of his age and that

he is made by his age. But, in a larger and far truer sense, he makes the age and impresses upon it his genius and his character." "ঠিকই বলা হয় যে, কোন বিরাট পুরুষকে তাঁর যুগই সৃষ্টি করে। কিন্তু আরও এক বৃহত্তর সত্য-দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায় যে, তিনিই তাঁর যুগকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর মনীষা ও চরিত্রের ছাপ রেখে যান তাঁর সৃষ্ট সেই যুগের বুকে।" রামকৃষ্ণের পক্ষে এ কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এখানে স্মরণ হয় **Origin and Evolution of Religion** গ্রন্থে E. W. Hopkins-এর মন্তব্য: "Every great thinker adds to home and heritage something not be interpreted in terms of either, what he hands on to posterity is the old religion **plus himself**, which may be the most important factor of all." "প্রত্যেক চিন্তানায়কই তাঁর দেশ ও তাঁর ঐতিহ্যে এমন একটা কিছু যোগ করেন, যা এগুলির কোনটি দিয়েই ব্যাখ্যা হয় না; তিনি তাঁর উত্তরসূরীদের হাতে যা দিয়ে যান তা সেই প্রাচীন ধর্ম আর তার সঙ্গে আপনাকে—আর এই যোগটিই হয়ত দেখা দেয় সবচেয়ে মূল্যবান্ উপাদান হিসেবে।" রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত এই বার্তা:

"জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।"

সুপ্তির ঘোরে ঢলে পড়া দেশবাসীর কাণে নবজাগরণের বাণী যাঁরা শুনিয়েছিলেন তাঁরা স্মরণীয়, তাঁরা বরণীয়। সে বাণী তাদের উদ্‌ভ্রান্ত পথের যাত্রাকে 'তিষ্ঠ' বলে শুরু করেছে, কিন্তু নবযাত্রার পথিকৃতের হাতছানি ছিল না সে বাণীর সামনে। কারণ তখনও সেখানে যে জীবনের যোগ হয়নি যাতে ফুটে উঠেছিল 'দুহাজার বছরের ভারতের সুমহান্ সাধনা।' তাই বলছিলাম নবজাগরণ এলেও পুনরুজ্জীবনের তখনও ছিল বাকী! বিবেকানন্দের মন্তব্য—'শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গেই শুরু হয়েছে সত্যযুগ'—এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ঐতরেয় ঋষি ব্রাহ্মণে বলছেন:

"কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্॥
চরৈবেতি চরৈবেতি॥"

মোহনিদ্রার কালই কলিকাল। জেগে ওঠার নাম দ্বাপরে বাস। আত্মবিশ্বাসে দাঁড়িয়ে উঠলে হয় ত্রেতাযুগ। আর এগিয়ে চলাই সত্যযুগের লক্ষণ। এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো। "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" বলে দ্বাপরের কৃষ্ণের মত আহ্বান জানিয়ে ছিলেন নবজাগরণের যুগের নবঋষিরা। প্রত্যক্ষ জীবনের গতি যখন যুক্ত হল তখনই এল এগিয়ে চলার যুগ। তাই রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবকে সত্যযুগের প্রবর্তন বলার সার্থকতা।

এখন দেখা প্রয়োজন—এ পথ-চলা কেমন, এ পথ চলার লক্ষ্য কি? এই আলোচনার শুরুতেই বিনয় সরকারের আর একটি কথা মনে পড়ছে: "His **Kathamrita**, 'the nectar of words' has turned out to be the most dynamic social philosophy of the age, and this has created for him a position of one of the greatest 're-makers' of mankind."

"তাঁর (রামকৃষ্ণের) 'কথামৃত', অমৃতময়ী বাণী, এ যুগের সবচেয়ে গতিশীল সমাজদর্শন হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তাঁকে দিয়েছে

মানবজগতের শ্রেষ্ঠ পুনর্গঠকদের অন্যতম আসন ?"

"দয়া কিরে ? শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" নবজাগরণের পর শিবজ্ঞানে দাঁড়িয়ে ওঠা ও জীবসেবায় এগিয়ে চলা। এই হল এ নব যুগের সাধনা ও লক্ষ্য। রামকৃষ্ণের সমাজদর্শনের প্রথম প্রবক্তার মুখে তাই শুনি—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—নিজের মুক্তি ও জগতের হিত। 'Philosophy' কথাটা আজকাল বহু ব্যবহারে ধার হারাতে বসেছে! এমন কি আমরা উচ্ছৃঙ্খলতারও philosophy বার করার একটা চেষ্টা করি। কিন্তু যখন আমরা রামকৃষ্ণের philosophy বা দর্শনের কথা বলি তখন আমাদের প্রাচীন অর্থের দর্শনের কথাই বলি। ভারতীয় চিন্তায় দেবত্ব-মনুষ্যত্বের মত দর্শন ও ধর্ম অবিভাজ্য।[১] —"Philosophy or religion, the two being really inseparable from the Hindu point of view." (Max Muller). প্রযুক্তি বা ব্যবহারই এখানে আসল কথা। দর্শন-লাভ ও দর্শনদান উভয় ক্ষেত্রেই তাই জীবনের স্পর্শের একান্ত আবশ্যকতা। কথার ফুল-ঝুরিতে দর্শন হয় না। এ কথা স্মরণ না থাকায় আমরা অনেক সময় ভাবি, রামকৃষ্ণের আবার দর্শন কি ? তিনি তো প্রায় নিরক্ষর। 'He did not know a word of Sanskrit, and it is doubtful whether he knew enough Bengali,' 'he was ignorant of English', 'Ramakrishna never wrote a philosophical treatise.'—এই সব কথা, আবার যদি কয়েকটা বিদেশীর কথা হয়, তবে আমাদের পক্ষে অবশ্যই সন্দেহ হয় তাঁর দর্শন আছে কিনা। আবার এর পর যখন Max Muller-এর কাছে শুনি: "Ramakrishna was in no sense of the word an original **thinker**, the discoverer of a new idea or the propounder of any new view of the world," তখন আমরা ধরেই নিই এখানে নতুন কিছু নেই; তাই খুঁজে দেখি কোন্ দার্শনিকের সঙ্গে (অর্থাৎ যাঁর লেখা বই আছে) তাঁর কথা কতটা মেলে। Max Muller-এর কথা না মেনে অনেক কথাই যুক্তি দিয়ে বলা যায়, তবে এ কথা মেনে নিয়েও একটা কথা কিন্তু এই যে, ওঁদের দেশে যাঁরা thinker (চিন্তা করেন) তাঁরা philosopher, আর আমাদের দেশে যাঁরা 'দর্শন' করেন (দেখেন) তাঁরা দার্শনিক। সত্যিই রামকৃষ্ণ নতুন কিছু 'চিন্তা' করেননি, নতুন তত্ত্ব 'দর্শন' করেছিলেন এবং জগৎকে দেখার নতুন ভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আশ্চর্য, Max Muller কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত কথার পরেই বলেছেন: 'But he **saw** many things which others had not seen, he recognized the Divine Presence where it was least suspected, **he was a poet.**"

কিন্তু তিনি এমন অনেক জিনিস 'দেখে-ছিলেন' যা অন্যে দেখেননি, যেখানে কেউ ভাবেও নি, সেখানেও তিনি ঐশ্বরিক সত্তাকে চিনেছিলেন, তিনি ছিলেন এক কবি।" যিনি মনের অগোচর তাঁকে তিনি চিন্তা দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেননি, কিন্তু যা অনেকে দেখেননি তা তিনি দেখেছেন। তাই তাঁর চেয়ে আর বড় দার্শনিক কে ? তারপর Max Muller তাঁকে কবি বলেছেন, আরও বলেছেন,

---

১ লেখকের 'ধর্ম ও দর্শন', বিশ্ববাণী, ১৩৭২, পৃ: ৭০১

'a dreamer of dreams', যদিও এই স্বপ্নাবলীর প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। আমরাও রামকৃষ্ণকে কবি বলি, এক যথার্থ কবি। কেননা তিনি দর্শনক্ষম। 'কাব্য-কৌতুকে' ভট্টতৌত বলেছেন :

"নানৃষিঃ কবিরিত্যুক্তমৃষিশ্চ কিল দর্শনাৎ।"

—যিনি ঋষি নন তাঁকে কবি বলা যায় না, আর যাঁর দর্শনশক্তি আছে তিনিই ঋষি।

"দর্শনাদ্ বর্ণনাচ্চাপি রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ।"

—দর্শনের পর বর্ণন করলে তবেই দার্শনিক কবিখ্যাতি লাভ করেন। এই অর্থেই রামকৃষ্ণ কবি। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কবি ও দার্শনিককে সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী বলে মনে করেন। আমরা তাঁদের কথায় সায় দিই না। ঋষিকবির কাব্যই তাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

এমন ঋষিকাব্যে কোথাও দেখি দেহবৃক্ষে দুটি পাখীর কথা। একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে, অপরটি উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। Goethe-এর Faust-এ এর প্রতিধ্বনি শুনি :

"Two souls contend
In me, and both souls strive for masterdom."

দ্রষ্টা কবি রামকৃষ্ণের ভাষায় এরাই দুটি 'আমি'র রূপে দেখা দেয়, 'কাঁচা আমি' 'পাকা আমি'। একেই বলি কাব্য। যে দেখেছে তার প্রকাশে থাকে না কোনও অস্পষ্টতা। এমন ঋষিকবিই অন্যের গুরু হতে পারেন, অর্থাৎ অন্ধকার দূর করতে পারেন। যাঁর দেশ দেখা আছে তিনিই অন্যকে সে দেশের পথ দেখাতে পারেন। "ক্ষেত্রবিদ্ধি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে।"—(ঋগ্বেদ); যে দেখেনি তার কথায় ধাঁধা লাগে। রামকৃষ্ণ বলতে পারেন : "ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি।"—(রবীন্দ্রনাথ); ঋষিকবির মত তিনি বলতে পারেন : 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্'—"সেই মহান পুরুষকে জেনেছি।" তার পরেও বলতে পারেন, "তোমাকেও দেখাতে পারি।" কারণ তাঁর যে দেখা আছে, ভাবা নয় যে (not speculation) কথার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাবে। তাই তিনি বলতে পারেন, "এখানকার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অনুভূতি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।"

(ক্রমশঃ)

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানীরা বলেন, তরঙ্গের ব্যাপ্তি অসীম। একবার কোন তরঙ্গ উঠলে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে, ব্যোমে। ভাবতরঙ্গের বেলাতেও কি তাই নয়? ব্যোমে ব্যাপ্ত না হ'লেও তা কি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে না? চোদ্দ শতকে উত্তর ইতালীতে যে ভাবতরঙ্গ উঠেছিল এবং যা ষোল শতকে ফ্রান্স জার্মানী হল্যাণ্ড স্পেন ও ইংল্যাণ্ডকে প্লাবিত করেছিল তার কি পরিসমাপ্তি ঐখানেই ঘটেছিল? স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, না, ঐ তরঙ্গপ্রবাহ ষোল শতক বা ইয়োরোপে—কোনখানেই ফুরোয়নি; ঐ ভাবজলোচ্ছ্বাসই এসে উনিশ শতকে আঘাত করেছিল ভারতের উপকূলে।[১]

ভারতের নবজীবন :

ভারতে এই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন লোকমান্য তিলক (১৮৫৬-১৯২০), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), গোপালকৃষ্ণ গোখেল (১৮৬৬-১৯১৫), শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০) প্রভৃতি লোকোত্তর প্রতিভা ও যুগাবতার পুরুষ।

এই সময়ের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : আমি যে সময় জন্মগ্রহণ করি সেই সময়টা ছিল বাংলা দেশের এক মহাযুগ। তিনটি আন্দোলনের ধারা তখন আমার দেশের জীবনে মিশেছিল : রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ধর্ম-আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদর্শিত পথে সাহিত্য-আন্দোলন এবং একরকম জাতীয় আন্দোলন যাকে ঠিক পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলন বলা যায় না।[২] আন্দোলন তিনটির মধ্যে রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্তিত আন্দোলনকে ঠিক 'ধর্ম-আন্দোলন' না ব'লে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন' ব'লে অভিহিত করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত।

যা হোক উল্লিখিত আন্দোলন তিনটি কোনমতেই স্বতন্ত্র আন্দোলন ছিল না, ছিল একই আন্দোলনের তিনটি বিভিন্ন দিক। এই আন্দোলনকেই বলা হয় ভারতীয় রেনেসাঁ বা ভারতের নবজীবন। অনেক সময় অবশ্য নবজীবন না ব'লে 'নবজাগরণ', 'নবযুগ' বা 'জাগৃতি'[৩] ব'লেও অভিহিত করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ নবমন্ত্রের ধারক না স্রষ্টা?

উনিশ শতকের এই ভাব-আলোড়নের যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিরাট পুরুষকে রেনেসাঁ বা নবযুগের সন্তান বলেই ধরা হয়। অর্থাৎ বলা হয়, নবজীবনের মন্ত্র আগেই পুঁথিবদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, এবং এঁরা ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তন্ত্রধারকের। এ রকম ধারণাকে বড়জোর অর্ধসত্য ব'লে স্বীকার করা চলে।

---

১ The East and the West

২ My Life—A lecture delivered in China in 1924

৩ Renaissance-এর বাংলা 'জাগৃতি' বোধ হয় করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়

এই সব প্রতিভাধর পুরুষ শুধু নবমন্ত্রের উদ্‌গাতাই ছিলেন না, নবমন্ত্রের স্রষ্টা বা (জ্ঞাননেত্রে দেখে থাকলে) দ্রষ্টাও ছিলেন। শুধু মন্ত্রপ্রচারই নয়, অন্ততঃ মন্ত্রের শুদ্ধিকরণ (sublimation) এবং সুসংবদ্ধকরণে (synthesis) এঁদের ভূমিকা ছিল সমগুরুত্বপূর্ণ। এই শেষোক্ত ভূমিকায় যাঁদের দেখা গিয়েছিল তাঁদের তালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করলে মোটেই ভুল হয় না। কারণ-হিসেবে এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, শ্রীঅরবিন্দ যাকে 'পূর্ণতর রূপে আমাদের সংস্কৃতিতে পুনরাবর্তন' ব'লে অভিহিত করেছেন[৪] তা বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দই সম্ভব করেছিলেন। মনীষী রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় "তাঁকে (বিবেকানন্দকে) দ্বিতীয় স্থানে দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেখানেই তিনি কোন ভূমিকা নিয়েছেন, সেখানে তিনিই ছিলেন প্রথম।"[৫] ভারতীয় রেনেশাঁ বা ভারতের নবজীবনের প্রসঙ্গে উক্তিটি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য ব'লেই ধরা যায়।

এই অভিমতের সপক্ষে ভারতের নবজীবনের চরিত্র সামান্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এবং তার জন্যে প্রয়োজন হ'লো রেনেশাঁর কিছুটা চরিত্র-বিশ্লেষণের।

রেনেশাঁ শব্দের অর্থ ও রেনেশাঁর চরিত্র

রেনেশাঁ বলতে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ এবং পরস্পরসম্পর্কিত ঐতিহাসিক বস্তুনিচয় (historical category)—উভয়ই বুঝায়। এই সন্ধিক্ষণ হলো, যাকে বলা হয় মধ্যযুগ তার এবং যাকে আধুনিক যুগ ব'লে অভিহিত করা হয় তার যোগসূত্র ; আর পরস্পরসম্পর্কিত বস্তুনিচয় বলতে পাশ্চাত্য দেশবাসীদের নৈতিক ও বুদ্ধিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে যে যে পরিবর্তন বৈশিষ্ট্য হিসাবে ঐ যুগসন্ধিক্ষণকে সূচিত করেছিল তাদেরই বোঝায়।

শব্দগত অর্থে রেনেশাঁ হ'লো নবজন্ম (Renascence বা Rinascita)। এইজন্যে অনেক সময় রেনেশাঁকে শিক্ষাসংস্কৃতির পুনর্জন্ম ব'লেই ধরা হয়। কিন্তু এরকম সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে রেনেশাঁকে দেখা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে রেনেশাঁ বলতে বোঝায় ব্যক্তির নবজন্ম বা ব্যক্তিত্বের মুক্তি। এইজন্য মানবতা বা humanismই হলো রেনেশাঁর কেন্দ্রীয় ধারণা।[৬]

রেনেশাঁ ও আধুনিকতা

অনেক সময় রেনেশাঁ ও আধুনিকতাকে একই অর্থে ধরা হয়। এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ রেনেশাঁ হ'লো যুগসন্ধিক্ষণ—মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ। অতএব, রেনেশাঁ আধুনিক যুগের প্রবেশদ্বার—প্রতিশ্রুতি মাত্র। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে, আধুনিক যুগে সূচিত হয় দুইটি প্রধান পরিবর্তনধারা : বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রভুত্ব এবং ফলে, ধর্মীয় অনুশাসনের ক্রমহ্রাসমান কর্তৃত্ব।[৭] ইতালীয় রেনেশাঁর যুগেই খৃষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ক্রমহ্রাসমান হ'তে শুরু করেছিল সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান কিন্তু বিশেষ প্রভুত্ব বিস্তার ক'রতে সমর্থ হয়নি। ঐ রেনেশাঁর পুরোহিতরা দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা স্বীকারের মধ্যে বিজ্ঞানের পথে যতটুকু পদসঞ্চার সম্ভাবনা নিহিত ঠিক

---

৪ The Renaissance in India

৫ Prophets of the New India

৬ Encyclopaedia Britannica, Vol, XIX, article by Preserved Smith.

৭ History of Western Philosophy

ততটুকুই করেছিলেন। রেনেশাঁ যাঁকে প্রথম আধুনিক ব্যক্তি ব'লে অভিহিত করেছেন সেই পেত্রার্কও[৮] এর বেশী কিছু করেননি।

আরও বলা যায়, আধুনিক দু'টো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হ'লো গতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিকতা। রেনেশাঁ গতিশীলতার বাণী বহন করলেও গণতান্ত্রিকতাকে বিশেষ আখিথেয়তা প্রদর্শন করেনি। অন্যভাবে বলতে গেলে, রেনেশাঁ এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেও ঠিকমত পথনির্দেশ—সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা বা সমবায়ের পথনির্দেশ করতে পারেনি। আর আপামর সাধারণের প্রতি সহানুভূতিও রেনেশাঁরই কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। অর্থাৎ, কি ইতালীয় কি বৃহত্তর ইয়োরোপীয় রেনেশাঁ কখনই জনপ্রিয় আন্দোলন ছিল না, কারণ ঐ আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিবাদভিত্তিক আন্দোলন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শুরুতে ভারতীয় রেনেশাঁ বিশেষ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও পরে ব্যাপ্তিতে সম্প্রসারিত হ'য়ে জনগণকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল, এবং এই রূপান্তর বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দেরই দান।

রেনেশাঁ এবং ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ

রেনেশাঁর যুগে ইতালীয়রা শিল্পসংস্কৃতি এবং মানবতার পুনরুদ্ধার নিয়েই ব্যস্ত ছিল, ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। খৃষ্টান ধর্মগুরুদের মার্জিত ল্যাতিন সংস্কৃতির আবরণে ঢাকা ছিল শত সহস্র অনাচার। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডির বাইরে মানবতাবাদিগণ অতি-অহংবাদ দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে এই সব অনাচারকে মোটামুটি মেনেই নিয়েছিলেন। এককথায় বলা যায়, তাঁদের ছিল নীতিবোধের সহিত সম্পর্কহীন দৃষ্টিভঙ্গি (amoral attitude)। এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রসারিত হয়েছিল বৃহত্তর ইয়োরোপীয় রেনেশাঁর ক্ষেত্রে।

রেনেশাঁর মানবতাবাদিগণ কোন ধর্মসংস্কারও করতে সমর্থ হননি এবং এর ফলে মানব-শ্রেষ্ঠত্বের (apotheosis) ধারণাও সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করেনি।

যাজকরা মানুষের বিচারশক্তিতে আংশিক বিশ্বাস করতেন। তাঁদের অভিমত ছিল, মানুষ বিচারবুদ্ধি ও পাপের সমন্বয়। স্বর্গ থেকে আদমের পতনের ফলে মানুষের মূল প্রকৃতি এতটা বিনষ্ট হয়েছে যে, চার্চের বিশেষ সহায়তা ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি লাভ করা অসম্ভব।[৯]

মানবতাবাদিগণ অবশ্য ধর্মযাজকদের এই বক্তব্য মেনে নেননি, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিবাদভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির তাঁরা এই বিশেষ সক্রিয় বিরোধিতাও করেননি।

ইয়োরোপকে অবশ্য ধর্মবিশ্বাসের মুক্তির জন্যে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি, কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল ধর্মসংস্কার বা টিউটনিক রেনেশাঁর দ্বারা, ইতালীয় রেনেশাঁর দ্বারা নয়। ঐতিহাসিকদের মতে, সতর শতকের যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব তার মূলে রেনেশাঁর চেয়ে ধর্মসংস্কারের দানই বেশী।

তবুও বলা যায়, উভয় আন্দোলনের উৎস ছিল একই—মানবতার মুক্তির তাগিদ।

ভারতীয় নবজীবন ও ইয়োরোপীয় রেনেশাঁ। যদিও জেমস কাজিনস (James H.

৮ Will Durant: Renaissance (The Story of Civilisation, III)

৯ F. M. Watkins: The Age of Ideology

Cousins) প্রভৃতির মতে, ভারতের প্রসঙ্গে রেনেশাঁ বা নবজীবন শব্দটির ব্যবহার সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তবুও ভারতীয় রেনেশাঁ কথাটি ইতিহাস সাহিত্য দর্শনে বিশেষ সুপ্রচলিত। যেমন কাজিনসের বক্তব্য হ'লো : ভারত সকল সময়ই জাগ্রত ছিল। সুতরাং সুপ্তি থেকে জাগরণের কোন প্রশ্নই ছিল না। যুক্তিটি মাত্র আপাতদৃষ্টিতে সত্য, কারণ আঠার শতকে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষের আগে ভারত যে বিশেষভাবে সুপ্তিমগ্ন হ'য়ে পড়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সুতরাং নব-জাগরণের প্রয়োজন ছিল এবং ভারতের প্রসঙ্গে রেনেশাঁ বা নবজীবন শব্দটির ব্যবহারে আপত্তির কিছুই নেই। আরও বলা যায়, এই ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনা বা একটু পৃথক ধরনের ঘটনাকেও একই নামে অভিহিত করা হয়।

এর পর বিরাট বিষয় হ'লো, ইয়োরোপীয় রেনেশাঁ এবং ভারতের নবজীবনের মধ্যে সাদৃশ্য কতটুকু আর বৈসাদৃশ্যই বা কতটুকু।

সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় উদ্ভবগত দিক দিয়ে, তাও অবশ্য পুরোপুরি নয়। ইয়োরোপীয় রেনেশাঁর জন্ম হয়েছিল ফ্লোরেন্স নগরীতে এবং তারপর উত্তর ইতালী থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে। ভারতীয় রেনেশাঁর উদ্ভব হয়েছিল কলকাতা নগরীতে এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের অন্যান্য প্রদেশে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতিগত দিক থেকেও দেখা যায় যে, ইয়োরোপীয় রেনেশাঁর ন্যায় ভারতীয় রেনেশাঁও ছিল সুপ্তি থেকে জাগরণ এবং নবজীবন-গঠনের প্রচেষ্টা।

এর পর কিন্তু সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন। ছাপাখানা ও পুঁথিপত্রের পুনরাবিষ্কারের দরুন প্রাচীন গ্রীসীয়-রোমান সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের ফলে ইয়োরোপীয় রেনেশাঁর সূত্রপাত হয়েছিল। ভারত কিন্তু নবজীবনের প্রেরণা পেয়েছিল পাশ্চাত্য ভাবধারার আমদানি এবং বিস্মৃত অতীতের পুনরুদ্ধার—উভয়ের ফলে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় রেনেশাঁ আন্দোলন ছিল যুক্তি, নীতিবোধ এবং ধর্মবিশ্বাস—এই তিনেরই মুক্তি-আন্দোলন। এর দরুনই ভারতীয় রেনেশাঁ শুরু থেকেই ধর্ম ও সামাজিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ, ইয়োরোপের মতো নীতিবোধের মুক্তি উপেক্ষিত হয়নি, আর ধর্মসংস্কারের প্রচেষ্টা পরে মূল-রেনেশাঁর ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। যুক্ত হয়েছিল রেনেশাঁর পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় থেকেই।

আরও দেখা যায়, নীতিবোধের সহিত সম্পর্কহীন হওয়ার দরুন ইয়োরোপীয় রেনেশাঁ কোনদিন জনপ্রিয় আন্দোলন হ'য়ে ওঠেনি, ভারতীয় রেনেশাঁ নীতিবোধেরও মুক্তি আন্দোলন অল্পসময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় রূপ গ্রহণ করেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটা প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দেরই অবদান।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের নবজীবন

এইবার আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় যে, ভারতীয় নবজীবনের পূর্ণতর রূপদানে যে যে প্রতিভাধর অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের নামই সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া উচিত। তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ইয়োরোপীয় জীবনধারা ও খৃষ্টধর্মের মন্ত্র-তন্ত্র যখন এদেশে প্রথম আমদানি হ'লো তখন তার ছটায় রাজা রামমোহনের মতো দু-এক-জন ছাড়া সকলেরই চোখ ঝলসে গিয়েছিল। আধুনিক যুগের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ফলে যাকিছু আপন, যাকিছু জাতীয় তা ভেঙে

ফেলার প্রবণতাটাই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছিল।

তারপর দৃষ্টি কতকটা ফিরল যা কিছু নিজস্ব তার দিকে। এর ফলে অনেকটা উপেক্ষা অবজ্ঞা অস্বীকারের ভাব এলো আমদানিকরা সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি।

তৃতীয় পর্যায়েই এলো পূর্ণতর পদ্ধতিতে নিজস্ব সংস্কৃতিতে পুনরাবর্তন। এই পূর্ণতর পদ্ধতি হ'লো প্রথমোক্ত পদ্ধতি - পদ্ধতি দু'টোর সার্থক সমন্বয়। অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার ক'রে এই সমন্বিত পদ্ধতি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মূলসূত্রটি খুঁজে বের ক'রবার প্রচেষ্টা করেছিল। এই প্রাচীন সংস্কৃতির রূপ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা ক'রলেও প্রয়োজনমত তাকে ঢেলে সাজতে দ্বিধা করেনি। বৃহত্তর বিবর্তনের প্রয়োজনে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সার্থক সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় কোনকিছুই বাদ দেয়নি।

শ্রীঅরবিন্দ এই প্রচেষ্টাকে 'পুনর্গঠনের মাধ্যমে সংরক্ষণ' (preservation through reconstruction) ব'লে অভিহিত করেছেন, এবং তাঁর মতে, এতে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্পূর্ণ অতুলনীয়।[১০]

এখন প্রশ্ন, এই ভূমিকাগ্রহণের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নবজীবনকে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে কতটা সমৃদ্ধ করেছিলেন? ওপরের আলোচনা থেকেই এর বেশ খানিকটা উত্তর পাওয়া যাবে। বলা হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় রেনেশাঁর জনপ্রিয় রূপদান করেছিলেন; ফলে নবজীবনকে দিয়েছিলেন গণতান্ত্রিকতার ছাপ। একা কোন সংস্কার সাধন করা যায় না, নূতন জীবনধারার পথে চলা যায় না; এর জন্যে প্রয়োজন হ'লো সমবায়ের এবং আপামর সাধারণের মধ্যে আশা-উদ্দীপনা সঞ্চারের—আধুনিক জীবনের এই মৌলিক শিক্ষা স্বামী বিবেকানন্দেরই দান।

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নবজীবনকে দিয়েছিলেন আধুনিকতার প্রধানতম উপাদান গণতান্ত্রিকতা।

মানব-শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় যে ভারতীয় রেনেশাঁ ইয়োরোপীয় রেনেশাঁকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাও স্বামী বিবেকানন্দের জন্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হ'লো, মানুষ অপূর্ণাঙ্গ হলেও কখনও পাপী নয়। এই বাণীকেই স্বামী বিবেকানন্দ পরিণত করেছিলেন তাঁর জীবনবেদের অন্যতম প্রধান সূত্রে।

পাপী যখন নয় তখন ধর্মীয় সহায়তা বা পুরোহিতের সাহচর্যের প্রশ্ন ওঠে না। মানুষ তার স্বীয় প্রচেষ্টার ফলে, স্বীয় পুরুষকারের বলে আত্মার উদ্বোধন সম্ভব ক'রে দেবত্ব লাভ করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। এর জন্যে যা দরকার তা হ'লো অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের বা 'বিদ্যামায়ার' আবাহনের।

আবার পথ নির্দিষ্ট নয়। প্রত্যেক আত্মাতেই ঐশীশক্তি নিহিত; লক্ষ্য হ'লো এই অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন সার্থক করা। কর্মের মাধ্যমেই হোক, পূজার্চনা উপাসনার মাধ্যমেই হোক, যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হোক আর দার্শনিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই হোক—লক্ষ্য ঐ একই। এই হ'লো ধর্মের মূলকথা, তত্ত্বসূত্র মন্ত্রতন্ত্র মন্দির বিগ্রহ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক বিস্তার মাত্র।[১১] অতএব, তোমার পথ তুমি নিজেই বেছে নাও। চল

১০ The Renaissance in India, op. cit.

১১ স্বামী বিবেকানন্দ : রাজযোগ

সেই পথে—উদ্বোধনের পথে। বল আমিই ঈশ্বর—আমিই পরিপূর্ণতা; তুমিই ঈশ্বর, তুমিই পূর্ণাঙ্গতা।

মানবের এই পরিপূর্ণতা, এই পূর্ণাঙ্গতা হ'লো রেনেশাঁর মৌলিক মন্ত্র। কিন্তু ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের আগে এই মৌলিক মন্ত্র আর কেউ কি এমন ভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, আর কেউ কি রেনেশাঁর জীবনদর্শনের এমন ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন? উত্তর 'না' বলা হ'লে নবজীবনের রূপদানে স্বামী বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ না ক'রে উপায় নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত জীবন-দর্শনের এই যে নূতন ব্যাখ্যা, একে বলা যায় 'নয়া বেদান্ত'। এর ব্যাখ্যা বারান্তরে বা স্থানান্তরে ক'রব। (ক্রমশঃ)

জননী সারদামণি

শ্রীনৃপেন আকুলি

নিখিল ধরার দুঃখ ও শোক, স্মরণ করিয়া এলে—
যত ব্যথাভার করিতে মোচন অসীম করুণা ঢেলে।
অতি সাধারণ মাটির কুটির, তুমি সেথা এলে যবে—
জ্বলেনি সেদিন আলোকের মালা বরণের উৎসবে।
স্নেহ-করুণার অলকানন্দা ছিল ও বুকের তলে,
স্মরিতে সে কথা নয়নের কূল উছলিয়া ওঠে জলে!
নিষ্ঠা ও ত্যাগে দীপময়ী তুমি, মূর্ত পবিত্রতা;
যেন নারীত্বে শত দল মেলি লভিয়াছ পূর্ণতা।
দিয়েছ নূতন পূজার মন্ত্র কায়-মনে জনসেবা;
দেখায়েছ তুমি অমৃতের পথ, তোমারে ভুলিবে কেবা?
স্মৃতির বেদীতে আসন দিয়েছি সীতা ও সাবিত্রীরে,
দাঁড়াতে পেরেছি কি সৌভাগ্য, তোমার চরণ ঘিরে!
নিশীথলগ্ন, আকাশ-বাতাস, আজি বিভীষিকাময়;
জননী তোমার অভয় অঙ্কে পেতে দাও আশ্রয়।
নূতন উষার মঙ্গলরবি জাগুক পূর্বাচলে,
পারিজাতরাজি হোক বিকশিত এধরার ধূলিতলে।

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

(৩)

পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তা বুদ্ধিজীবীদিগের intellectual gymnastic (বুদ্ধির ব্যায়াম)। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদিগকে ভিত্তি করিয়া বুদ্ধিসহায়ে একটি সামগ্রিক world theory (জাগতিক তত্ত্ব) প্রতিপাদনের চেষ্টা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ করিয়া থাকেন। সেজন্য তাঁহাদের মতবাদগুলি সমসাময়িকভাবে সত্য এবং বুদ্ধিপ্রসূত বলিয়া problematic (সংশয়াত্মক); incontrovertible certitude (অকাট্য নিশ্চয়তা) ইহাদের নাই বলিলেই চলে। তাই বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'। History of Western philosophy is history of exploded theories (প্রতীচ্যের দর্শনেতিহাস ভ্রমাত্মক তত্ত্ববহুল প্রমাণিত সুতরাং বহু তত্ত্ব পরিত্যক্ত)—ইহা বলা চলে।

প্রাচ্যদর্শনের মূল্যায়ন অন্যরূপ। ইহা বোধিপ্রসূত সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভব। ইহা অবিসংবাদিত, অবাধিত এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলক। অবশ্য যুক্তি-অবলম্বনে এই তত্ত্বগুলিকে logic (তর্কশাস্ত্র)-এর ছাঁচে ফেলিয়া সর্বসাধারণ বুদ্ধির এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাছে অযৌক্তিক কিছু নহে বলিয়া প্রমাণিত করিতে হয়। প্রাচ্য-দর্শনালোচনার ক্ষেত্রে যুক্তি শ্রুতিমূলক এবং শ্রুতি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ইহাই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার দিক-নির্ণায়ক মূল সূত্র।

আমাদের দেশে যে সকল প্রতিভাবান দার্শনিক ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শ্রুতিকে অপৌরুষেয় ও চরম সত্যানুসন্ধানের একটি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাই এই ধর্মপ্রবর্তক দার্শনিক ব্যক্তিগণ স্বানুভবের সহিত মিলাইয়া শ্রুতিকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং জগৎ ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণে শ্রুতিপ্রতিপাদিত তত্ত্বরাশির উপর নিজেদের দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। একমাত্র গৌরপাদকারিকায় যে আত্ম-স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে তাহা সবটাই যুক্তিমূলক। সেখানে গৌরপাদ জীবের প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের বিশ্লেষণ করিয়া সাক্ষী তুরীয় সত্তাকে নির্দেশিত করিয়াছেন। বৌদ্ধ শূন্যবাদের বিরুদ্ধে চিরবর্তমান স্বসংবেদ্য প্রত্যক্‌চৈতন্যকে প্রমাণিত করিতে গিয়া তিনি এই যুক্তিমূলক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তবে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 'মাণ্ডূক্যকারিকা' 'মাণ্ডূক্যশ্রুতি'কে অবলম্বন করিয়াই বিরচিত হইয়াছে।

এই প্রাচ্য দার্শনিক সমীক্ষার ধারা অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য তাঁহার প্রসন্নগম্ভীর শ্রীভাষ্যের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে নিজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"অখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গাদিলীলে
বিনতবিবিধভূতব্রাতরক্ষৈকদীক্ষে।
শ্রুতিশিরসি বিদীপ্তে ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে
ভবতু মম পরস্মিন্ শেমুষী ভক্তিরূপা ॥"

এই শ্লোকানুসারে বলা যাইতে পারে

শ্রীশ্রীরামানুজাচার্যের মতে জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তু সৃষ্ট জগতের ভূতগ্রামের স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও প্রতিপালয়িতা। যদি প্রশ্ন তোলা হয়—কেন তিনি জগতের স্রষ্টা ইত্যাদি হইলেন? শ্রীরামানুজের মতে ইহা অচিন্ত্য—ব্যষ্টিমন সমষ্টিমনের স্বরূপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অপারগ। Intrinsically (বস্তুত:) এই মাত্র বলা যাইতে পারে 'সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়' তাঁহার creative self-expression (সৃজনকারী আত্মপ্রকাশন)—সৃষ্টি অর্থে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে যাহা যাহা অব্যক্ত ছিল তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। 'অসৎ' কিছু হইতে 'সৎ' হইতে পারে না। কারণ আচার্য 'সৎকার্যবাদী' ছিলেন। ইহা বিজ্ঞানসম্মতও বটে।

এই সৃষ্টি তাঁহার মতে 'বিরামহীন'—ব্রহ্ম অধিষ্ঠান-কারণ, উপাদান-কারণ এবং efficient cause (নিমিত্ত-কারণ); সবই তিনি একাধারে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব এই যে, বৈচিত্র্য ও বহুত্ব এক সত্তায় বিধৃত হইয়া আছে—unity in diversity (বহুত্বে একত্ব) হচ্ছে চরম সত্য। 'Bare identity' বা 'নির্গুণ সত্তা' চরম সত্য মানিয়া লইলে 'বৈচিত্র্য ও বহুত্বে'র কোন ন্যায়-সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। শ্রীশঙ্কর-প্রচারিত মায়াবাদ-খণ্ডনপ্রসঙ্গে ইহা বিস্তারিত আলোচিত হইবে। জগৎ ও জীবের বৈচিত্র্যকে উড়াইয়া না দিয়া প্রত্যক্ষানুভূতিসিদ্ধ বিষয় শ্রুতিপ্রমাণবলে মানিয়া লইয়া একটি জগদ-তীত সত্তার লীলাবিকাশরূপে ভাবিলে সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে কোন বাধা সৃষ্টি হইতে পারে না। যদি অন্য কোন উচ্চতর থাকে আপনিই প্রকাশিত হইবে—কালেন।

এই প্রসঙ্গে ইহা বিচার্য যে, ব্যবহারিক অদ্বৈতসাধনায় শ্রীশঙ্করাচার্য 'শূন্যবাদ'কে প্রত্যাখ্যান করিয়া বাদরায়ণের 'জন্মাদ্যস্য যত:' মানিয়া লইয়া জগৎকারণরূপে ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সেই কারণে বলা যাইতে পারে আধ্যাত্মিকজীবন-দর্শন প্রতিপাদনে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজের মধ্যে মতানৈক্য নাই বলিলেই চলে।

তৃতীয় তত্ত্ব—আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষীভূত দুইটি সত্তা আছে। জড় প্রকৃতি ও অজড় ভোক্তা জীব—শ্রীরামানুজের ভাষায় চিৎ ও অচিৎ—ভোক্তা বা ভোগ্যরূপে জড়িত আছে। কিন্তু এই দুইটি সত্তাই পরমপুরুষ ব্রহ্ম বা অন্য ভাষায় শ্রীবিষ্ণুর অপার্থিব চিন্ময় সত্তায় বিধৃত হইয়া আছে। যেমন গীতায় আছে—'এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়'। এই তিন সত্তার সম্বন্ধ 'অপৃথক্‌সিদ্ধি'-সম্বন্ধ—যেমন বৃক্ষ ও তাহার শাখাসমূহ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, নীলত্ব ও পদ্মবস্তু সম্বন্ধযুক্ত। শ্রীরামা-নুজের Theory of Knowledge (জ্ঞানতত্ত্ব) অনুসারে substance (বস্তু) এবং attribute (গুণ) পৃথক করা যায় না। বিশেষণের জ্ঞানের মাধ্যমে বস্তুসত্তা প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মবস্তু চিৎ ও অচিৎকে লইয়াই সত্তাযুক্ত। এক এবং বহু অপৃথকসিদ্ধি তত্ত্ব—ইহা অনস্বী কার্য। কারণ শ্রুতিতে আছে 'একোঽহং বহু স্যাম্'—তিনি ইচ্ছা করিয়া বহু হইয়াছেন। 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' এক ও বহু নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছে। উক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে রামানুজদর্শনকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা দরকার যে নিম্বার্কের 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদের' সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতের সাদৃশ্য বহুল; কিন্তু ভাস্কর ও যাদবের 'ভেদাভেদবাদে'র সঙ্গে বহু বিষয়ে অনৈক্য আছে। যদিও শ্রীশঙ্করের 'মায়াবাদ'

খণ্ডনে এই তিনটি দার্শনিক মতই এক-পর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থ তত্ত্ব—শ্রীরামানুজাচার্য ব্রহ্মবস্তুকে 'শ্রীনিবাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'শ্রী' অর্থ 'লক্ষ্মী'—ইহা ঈশ্বরকৃপা সূচিত করে। এই মতানুসারে ব্রহ্ম অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর এবং কৃপাশক্তিযুক্ত হইয়া জীবের আশ্রয়স্থল, মুক্তিদাতা এবং চিৎ ও অচিৎ বস্তুর নিয়ন্তা ও লয়স্থান। এই ভাবমূলক বলিয়া শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়কে 'শ্রীসম্প্রদায়' আখ্যা দেওয়া হয়।

পঞ্চম তত্ত্ব—আচার্য প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন, আমার জ্ঞান ভক্তিরূপা হউক। আচার্যের মতবাদে জ্ঞান ও ভক্তি আলাদা নহে। যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তিতে পর্যবসিত হইবেই। এই বিষয়ে পরপর্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

উক্ত প্রসঙ্গে শ্রীরামানুজাচার্য-বিরচিত 'লঘুসিদ্ধান্ত' কিয়দংশ বিবৃত হইল।

১। পরমাত্মা—চিৎশক্তি, আনন্দশক্তি ও প্রেমশক্তি-যুক্ত অক্ষয় সত্তা। ইনি সর্বজ্ঞ ও অন্তর্যামিরূপে সর্বভূতে বিদ্যমান—জীবাত্মারও আত্মা তিনি।

২। জগৎ এবং কর্তা ও ভোক্তা জীব তাঁহার শরীর। তিনি ইহাদের অন্তরাত্মা, সর্বনিয়ন্তা। তিনি নিত্য ও অপরিবর্তনীয় সত্তা। তবে জীবের জ্ঞান ও কর্মের নিত্য পরিবর্তন হয়।

৩। প্রকৃতি—প্রকৃতিও নিত্য পরিবর্তন-শীল। সুখ ও দুঃখ দিয়া জীবাত্মাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহজীবনের ঘটনা-বলী জীবের শিক্ষার স্থল। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া শ্রীভগবান বিষ্ণু প্রত্যেক জীবাত্মাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহা তাঁহার কৃপার নিদর্শন।　　　(ক্রমশঃ)

শ্যামা মা

শ্রীমতী জয়ন্তী বসু

তুমি কালো,
আবার রূপেরও আলো—
চিন্ময়জ্যোতিঃরূপা!
সব বাতায়ন বন্ধ করে
হৃদয় অন্ধকার করে
আমি তোমায় সেখানে খুঁজে বেড়াই।
আবার প্রেমের আলো জ্বেলেও খুঁজি।
তুমি লুকিয়ে থাকো, খুঁজে পাই না;
তুমি নিজে দেখা না দিলে কি কেউ
　　　　খুঁজে পায় তোমায়?
কৃপা করে দেখা দিয়ে
জীবন সার্থক কর, পূর্ণ কর মা!

জননী কুন্তী

শ্রীমতী জয়ন্তী সিংহ

পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ। যুগে যুগে এই পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন কত মহাপুরুষ, কত শত মহীয়সী নারী—যাঁদের অনবদ্য চরিত্র, অম্লান গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি-কাহিনীর কথা আজও ভারতের মহাকাব্যের—ভারত-ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত—ভারতবাসীর চিত্তপটে চিরসমুজ্জ্বল। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন অগণিত নরনারী আজও শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে স্মরণ করে তাঁদের কথা, আর ভাবে 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'

বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে একমাত্র এশিয়া ভূখণ্ডই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনকাল থেকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত, সুপ্রাচীন গৌরবময় সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী, আবার সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যে দেশ এত অধিকসংখ্যক মহামানব আর মহীয়সী নারীর জন্মদাত্রী। ভারত ছাড়া আর কোন্ দেশ এই মহান সৌভাগ্যলাভের গর্ব করতে পারে?

বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী সত্যদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে তাই একদা উচ্চারিত হয়েছিল—"আমাদের মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ, ধর্মবীরগণের জন্মস্থান, ত্যাগের ক্ষেত্র। শুধু এই দেশেই সুদূর অতীত হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব-জীবনের মহত্তম আদর্শগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। ..... জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর, যেখানেই সুমহান আদর্শের সন্ধান মিলিবে দেখিতে পাইবে উহার জন্ম ভারতবর্ষে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত মানবসমাজের কাছে অমূল্য ভাবসমূহের খনি হইয়া রহিয়াছে। যখন গ্রীসের জন্ম হয় নাই—রোমের কথা কেহ ভাবে নাই—বর্তমান ইউরোপীয়দের পূর্ব-পুরুষগণ বিচিত্র অঙ্গরাগে রঞ্জিত অরণ্যবাসী মাত্র ছিল—সেই সুদূর যুগেও ভারত তাহার সংস্কৃতি-সাধনায় মুখর। তাহারও পূর্বে যে অতীতের খবর ইতিহাসে পাওয়া যায় না—যাহার কুয়াসা ভেদ করিতে কিংবদন্তীও সংকুচিত, সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত কত উচ্চ উচ্চ ভাব শান্তি ও শুভেচ্ছার 'বাণী' বহন করিয়া ভারত হইতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।...সত্যই আমাদের জন্মভূমির কাছে জগতের ঋণ অপরিসীম।"

যাঁদের আবির্ভাবে বিশ্বের দরবারে ভারত এমন গৌরবময় স্থান লাভ করেছে, ভারত-বাসীর কুল পবিত্র হয়েছে, কৃত-কৃতার্থ হয়েছে, সেই অগণিত প্রণম্য পূত-চরিত্র মহামানব এবং মহীয়সী নারীদের মধ্যে অন্যতমা হয়েও যাঁর চরিতকথা বর্তমানকালে সর্বজনসমক্ষে ততখানি সমুজ্জ্বল নয়, সেই মহিমময়ী দেবী কুন্তীর কথাই আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

পুষ্পের সৌন্দর্য বা সৌরভ যেমন অপরের দেখা না দেখা, বলা না বলার উপর নির্ভর করে না—আপন সৌন্দর্য ও সৌরভে সে জগৎকে আমোদিত করে, জনচিত্তে আনে আনন্দের স্পর্শ—আদর্শচরিত্র মানুষও তেমনই তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে, তাঁর

অনন্যসাধারণ প্রতিভায়, অনবদ্য চরিত্রে মুগ্ধ করেন বিশ্বজনকে। তাঁদের জীবনই তাঁদের বাণীর মূর্ত রূপ। এমনই এক আদর্শ-চরিত্রা মহীয়সী নারী ছিলেন মহাকাব্য মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্ররাজির মধ্যে অন্যতমা জননী কুন্তী।

ধর্মাত্মা, সুধীর, প্রাজ্ঞ বসুদেবের পিতা যদু-শ্রেষ্ঠ মহারাজ শূরের কন্যা পৃথা পালিত হলেন ভোজরাজগৃহে। রাজা কুন্তিভোজের নামানুসারে রাজপুত্রী পৃথা পরিচিত হলেন কুন্তী নামে। জন্মেছেন রাজগৃহে, লালিত পালিত হয়েছেন রাজপ্রাসাদে, রাজকন্যার উপযুক্ত আদর-যত্নেই কেটেছে তাঁর শৈশবের দিনগুলি। বিবাহান্তে রাজকুলবধূরূপেই তিনি এলেন সেকালের বিখ্যাত রাজবংশ কুরুকুলে।

মহারাজ বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠপুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্মা পাণ্ডুর হাতেই তাই সমর্পিত হল কুরুবংশের রাজদণ্ড। কিন্তু রাজকন্যা, রাজকুলবধূ, পাণ্ডুপত্নী মহারাণী কুন্তীর এ সুখের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হল না। অচিরেই অস্তমিত হল তাঁর সৌভাগ্যসূর্য। মহারাজা পাণ্ডু অকালে অতি অল্পবয়সেই দেহত্যাগ করলেন। 'পতিঃ হি পরমো গুরুঃ।' ভারতীয় নারীর এই সনাতন আদর্শে যাঁর জীবন গড়া, সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী যাঁর জীবনের আদর্শ, প্রিয়তমের বিরহে তিনি জীবনধারণ করবেন কেমন করে? পতির সঙ্গে সহমৃতা হবার—স্বেচ্ছায় চিতাগ্নিতে জীবন-বিসর্জনের সঙ্কল্প করলেন কুন্তী দেবী। সহমরণে যাত্রার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করার পূর্বে তাই সপত্নী মাদ্রীর হাতে নাবালক পুত্রদের ভার অর্পণ করে স্বীয় সঙ্কল্প ব্যক্ত করে বললেন, "আমি জ্যেষ্ঠা পত্নী, ভর্তার সহমৃতা হব। তুমি এই নাবালক পুত্রগণকে পালন কর।' কিন্তু এ গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করতে সম্মতা হলেন না মদ্ররাজতনয়া। সহমরণে যেতে তিনিও কৃতসঙ্কল্প।

মাদ্রীদেবী বললেন, 'আমি তোমার পুত্রদের আমার নিজপুত্রের সঙ্গে সমদৃষ্টিতে দেখতে পারবো না; তুমি কিন্তু আমার পুত্রদের নিজ-পুত্র জ্ঞানে পালন করতে পারবে।'

শোকের চেয়েও কর্তব্য বড়। ভগিনী-প্রতিম স্নেহে একদিন যাঁকে সপত্নীরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন, আজ সহমরণে যাবার মহান গৌরবটুকু তাঁকে দিয়ে নীরবে সরে দাঁড়ালেন পতিবিয়োগবিধুরা কর্তব্যপরায়ণা দেবী কুন্তী। সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'রামায়ণী কথা'য় বলেছেন, "প্রাণ-দান অপেক্ষা জীবনদানের গৌরব সমধিক, প্রাণ একবার বই দেওয়া যায় না, যদি বহুবার প্রাণ দেওয়ার কোনো পথ থাকে তবে তাহাকেই জীবনদান বলা যাইতে পারে।" (রামায়ণ ও সমাজ)। দেবী কুন্তীর সমাজ-জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সহমৃতা হবার গৌরবে বঞ্চিত হলেও এই জীবনদানের গৌরবে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কুন্তী-চরিত্র।

কুরুকুলপ্রদীপ মহারাজ পাণ্ডু মহাপ্রয়াণ করেছেন সহমৃতা হয়েছেন রাজ্ঞী মাদ্রী, পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র আজ অনাথ, অসহায়। কে তাদের মানুষ করে তোলবার ভার গ্রহণ করবে? কে কুরুবংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারি-রূপে ভারতের আদর্শ সন্তানরূপে গড়ে তোলবার গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় স্বীয় স্কন্ধে বহন করবে? ব্যক্তিগত শোকদুঃখের কথা ভুলে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিলেন কুন্তী দেবী। কৌরব-বংশপ্রদীপ এই শিশুদের রক্ষার ভার আজ তাঁকেই নিতে হবে, শোকে মুহ্যমান হয়ে

থাকলে তো চলবে না। কুরুকুলদীপশিখাকে সমুজ্জ্বল করে রাখার জন্য মনের দুঃখ মনে চেপে বুক বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন ধৈর্যময়ী জননী কুন্তী—নিজের তিনটি শিশুপুত্রের সঙ্গে মাদ্রীর দুটি তনয়কেও সমান স্নেহে কোলে তুলে নিলেন তিনি।

তারপর কত ঝড়-ঝাপটা, কত ঘাত-প্রতিঘাত এলো তাঁর জীবনে। সর্বংসহা অচঞ্চলা ধরিত্রীর মতো সব নীরবে সহ্য করে তিনি পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেন। কতবার প্রাণপ্রিয় পুত্রদের এমন কি তাঁর নিজের জীবননাশেরও নানা চক্রান্ত হয়েছে, পুত্রদের কল্যাণার্থে শেষ পর্যন্ত ভারতগৌরব, বিখ্যাত কুরুকুলবধূ ভোজরাজকন্যা পৃথাকে পরগৃহে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ পর্যন্ত করতে হয়েছে—কিন্তু কি মহান্ চরিত্র এই মহীয়সী নারীর! খাঁটি সোনার মতো দুঃখাগ্নির দহনে তা' যেন আরও উজ্জ্বল, পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে। "না পোড়ালে সোনা খাঁটি হয় না, না ঘষলে চন্দনের গন্ধ বেরোয় না"—এ প্রবাদবাক্যটি কুন্তী-চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সামান্যা রমণীর মত কখনও তিনি অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করছেন না, নিজের দুর্ভাগ্যে বিলাপ করছেন না, প্রসন্নভাবে সব কিছু সহ্য করে স্বীয় আদর্শের পথে অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন তিনি। গীতামুখে শ্রীভগবান বলেছেন, 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়' (২।৪৮)—এই যোগযুক্ত কর্মের পরিচয় পাই কুন্তীদেবীর সারাজীবনে।

রাজার প্রাসাদ থেকে শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্য, দরিদ্রের পর্ণকুটীর—কোথায় না বাস করতে হয়েছে তাঁকে, নানাবিধ সুস্বাদু মনোহর রাজভোগে যিনি আশৈশব অভ্যস্তা, বনের ফলমূল এমন কি ভিক্ষালব্ধ অন্নেও জীবনধারণ করতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু সব পরিবেশেই শান্তভাবে নিজেকে মানিয়ে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল এই মহীয়সী নারীর আর এই adjustment-ই তো শিক্ষা। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ করে, নানা 'ডিগ্রী' লাভ করেও যে শিক্ষা আজ আমরা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারি না, তথাকথিত আধুনিক উচ্চশিক্ষা লাভ না করলেও জননী কুন্তীর চরিত্রে দেখি সেই প্রকৃত শিক্ষারই বাস্তব রূপায়ণ।

সব পরিবেশেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি, ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে, নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁর, কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে গিয়ে আপন ব্যক্তিত্বকে খর্ব করেননি কখনও, বিসর্জন দেননি নিজ জীবনের মহান আদর্শকে। তাই দেখি প্রাণপ্রতিম যে পুত্রগণের প্রাণরক্ষার্থে কুরুকুলবধূ রাজ্ঞী কুন্তীকে পরগৃহে ছদ্মবেশে দীন জীবন যাপন করতে, এমন কি ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ করতে হয়েছে, আশ্রয়দাতার জীবনরক্ষার্থে সেই প্রাণপ্রিয় পঞ্চপুত্রের মধ্যে অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ ভীমকে রাক্ষসের করালগ্রাসের সম্মুখে প্রেরণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হননি তিনি, বরং নিজেই সোৎসাহে উত্থাপন করেছিলেন এই নিদারুণ প্রস্তাব। বিপদে পরম সহায়, মহাপরাক্রমশালী ভীমকে রাক্ষস-সকাশে প্রেরণের প্রস্তাব ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির পর্যন্ত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারেননি। জননীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "যাঁর বাহুবলের ভরসায় আমরা সুখে নিদ্রা যাই, যাঁর ভয়ে দুর্যোধন প্রভৃতি বিনিদ্র থাকে, যিনি জতুগৃহ থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন, আপনি কোন্ বুদ্ধিতে তাঁকে ত্যাগ

করছেন ?" প্রত্যুত্তরে কুন্তীদেবী ধীরকণ্ঠে শুধু জানিয়েছিলেন, 'ভীম বলবান, তাছাড়া আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার করা মানুষের কর্তব্য।'

আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার করার জন্য, পরের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপ্রিয় পুত্রকে এমন করে মৃত্যুমুখে পাঠাতে সাহস করবেন কোন্ মা ? ভারত ছাড়া আর অন্য কোনো দেশের ইতিহাসে এমন মহিমোজ্জ্বল নারীচরিত্রের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। হয়তো কেউ বলতে পারেন, 'ভীম অসাধারণ পরাক্রমশালী—এই সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই জননী কুন্তীর পক্ষে ভীমকে রাক্ষস-সকাশে প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছিল।' একথা যে আংশিকভাবে সত্য তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয়, ভীম যে অমর নন, এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রাণহানিও যে ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা কি তাঁর মাতৃহৃদয়ে জাগেনি ? মায়ের প্রাণ স্বভাবতই সন্তানের জন্য সদা উদ্বিগ্ন। সদাসতর্ক সদাশঙ্কিত তাঁর স্নেহদৃষ্টি চায় সন্তানকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করতে—পুত্রের দেহে কণ্টক বিদ্ধ হলে মাতৃহৃদয়ে সে ব্যথা বাজে বজ্রসম, মাতা কুন্তীও তার ব্যতিক্রম নন নিশ্চয়ই। কিন্তু 'মা' হলেও তিনি যে শুধু পাণ্ডবজননী নন, তিনি লোকমাতা, স্বার্থলেশশূন্যা কর্তব্যপরায়ণা নির্ভীকহৃদয়া ক্ষত্রিয়রমণী, একথা তিনি মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি, আর এই খানেই তাঁর অসাধারণত্ব' তাই স্ত্রীজাতিসুলভ সকল দুর্বলতাকে সর্বতোভাবে পরিহার করে, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সানুনয় অনুরোধ উপেক্ষা করে এমন কি অপর চারিপুত্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি পুত্র ভীমকে পাঠালেন ভীমদর্শন নরখাদক বকরাক্ষসের কাছে। মাতৃ-আশীর্বাদে ভীম জয়লাভ করলেন, দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, দেশে শান্তি ফিরে এলো। এমন বীরহৃদয়া না হলে কি ভীমার্জুনের মতো মহাবীর পুত্রের মা হওয়া সম্ভব ?

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে। নরেন্দ্রনাথ তখন শিশু। ছোট্ট 'বিলে' (নরেন্দ্রনাথের ডাক নাম) সঙ্গী সাথীদের নিয়ে চড়কের মেলা দেখে বাড়ী ফিরছেন। হঠাৎ দলভ্রষ্ট হয়ে 'ফুটপাথ' থেকে রাস্তায় নেমে পড়লো একটি ছেলে আর ঠিক সেই সময়েই তার সামনের দিক থেকে ছুটে এলো একটা ঘোড়ার গাড়ী। 'গেল !' 'গেল !' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো সবাই কিন্তু কারও সাহস হল না অসহায় শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে যেতে। এমন সময় সকলকে অবাক করে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলো আর একটি শিশু, অপর ছেলেটির হাত ধরে প্রায় অশ্ব-পদতল থেকে টেনে আনল তাকে। বিলের পরার্থপরতা বন্ধুপ্রীতি অসম সাহস দেখে মুগ্ধ হল সবাই। বাড়ী পৌঁছে মা ভুবনেশ্বরী দেবীকে সব কথা বলতেই তিনি বিলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সব সময় এই রকম মানুষের মতো কাজ ক'রো, বাবা !' বহু সাধনায় লব্ধ, পরম স্নেহাস্পদ নয়নের মণি স্বীয় একমাত্র পুত্রের প্রাণও যে বিপন্ন হয়েছিল, সে চিন্তার চেয়ে পুত্র যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অপরের প্রণরক্ষা করতে পেরেছে, সেই গর্বে মাতৃহৃদয় তখন গর্বিত। আধুনিক যুগেও দেখি পৌরাণিক যুগের শাশ্বত ভারতের একই মহান আদর্শের পুনরভিব্যক্তি।

জননী কুন্তী জানতেন একতাই বল। পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যাতে কখনও মনোমালিন্যের অবকাশ না ঘটে সেদিকে ছিল তাঁর অতন্দ্র

দৃষ্টি। সপত্নীর পুত্রদ্বয় এবং স্বীয় পুত্রত্রয়ের প্রতি তাঁর ব্যবহারে বৈষম্য দেখা যায়নি কখনও।

রাজকন্যা, রাজবধূ, রাজমাতা কুন্তীর জীবনে দুঃখের যেন শেষ ছিল না। তাই কৌরবদের নানা ষড়যন্ত্র, নানা চক্রান্ত এড়িয়ে বহু দুঃখ-কষ্টভোগের পর পাণ্ডবরা আবার রাজ্যের অধীশ্বর হলেও সে সুখ বেশীদিন ভাগ্যে সইল না তাঁদের, কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে রাজ্য ধনসম্পত্তি সব হারিয়ে দ্রুপদনন্দিনী সহ পঞ্চপাণ্ডবকে পুনরায় বনবাসে যেতে হল। কিন্তু কী অদ্ভুত সহনশীলতা দুঃখভারজর্জরিতা কুন্তীদেবীর! নিয়তির এই নিষ্ঠুর বিধানে বুক ভেঙ্গে গেলেও সাধারণ নারীর মতো বিলাপ করছেন না তিনি! বনবাসযাত্রার প্রাক্কালে আদরিণী বধূ দ্রৌপদী বিদায় প্রার্থনা করলেন। অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল উঠল, বাক্যস্ফুরণ হল না কারও, ধৈর্যময়ী কুন্তীদেবী ধীরকণ্ঠে শুধু বললেন—'কৌরবগণ ভাগ্যবান, তাই তোমার কোপে তারা ধ্বংস হয়নি। নির্বিঘ্নে যাত্রা কর—আমি সর্বদাই তোমাদের শুভ-চিন্তা করব। সহদেবকে দেখো সে যেন এই বিপদে অবসন্ন না হয়।' নিরাভরণ বন-গমনোদ্যত পুত্রগণকে বিদায়কালে আশীর্বাদ করে শোকার্তা মাতা পুত্রদের সঙ্গে বনগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন—'তোমরা ধার্মিক, সচ্চরিত্র, ভগবদ্ভক্ত ও যজ্ঞপরায়ণ, তোমাদের ভাগ্যে এই বিপর্যয় হল কেন?' দুঃখে জর্জরিত হয়েও দুর্যোধনাদির কূটবুদ্ধির নিন্দা করছেন না, পুত্রদের অন্যায়ভাবে প্রতিশোধগ্রহণের জন্য উত্তেজিত করছেন না, বরং তারা যে ধর্ম-পরায়ণ সে কথাটিরই বিশেষ করে উল্লেখ করছেন। চরম বিপদে কী আত্মসংযম!

কিন্তু সহনশীলতা আর কাপুরুষতা সমার্থক নয়। তাই দেখি দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরান্তে শ্রীকৃষ্ণ যখন যুধিষ্ঠিরের দূতরূপে শান্তিস্থাপন-প্রয়াসী হয়ে এসে ব্যর্থমনোরথ হলেন তখন তাঁর মাধ্যমে ক্ষাত্রধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরকে এই গল্পটি বলে পাঠালেন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে:

বিদুলা নামে এক তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়া রাণী ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম সঞ্জয়। বারংবার শত্রুহস্তে পরাজিত হয়ে সঞ্জয় উৎসাহহীন হলেন এবং যুদ্ধ না করাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। পুত্রকে হতোদ্যম দেখে রাণী বিদুলা তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে বললেন, '……নিজেকে অবজ্ঞা কোরো না। নির্ভীক হও। লোকে যার মহৎ চরিত্রের আলোচনা করে না, সে মানুষের সংখ্যা বাড়ায় মাত্র। নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় ধূমায়িত হয়ো না, মুহূর্তকালের জন্যও জ্বলে ওঠো, শত্রুকে আক্রমণ কর।'

হতোদ্যম সঞ্জয় কাপুরুষের মতো উত্তর দিলেন, 'আমার যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয় তবে সমগ্র পৃথিবী পেয়ে আপনার কি লাভ হবে?' সত্যই সসাগরা ধরণীর চেয়ে, ত্রিভুবনের চেয়েও জননীর কাছে প্রিয় তার সন্তান। কিন্তু মা হলেও বিদুলা সামান্য নারী নন, ভাবের ললিত ক্ষেত্রে অলস বিহারের চেয়ে তেজোদীপ্ত কর্মময় জীবনই তাঁর কাছে শ্রেয়। তাই পুত্রের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'যুদ্ধের ফলে তোমার সমৃদ্ধি-লাভ হবে কিংবা ক্ষতি হবে তার বিচার না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, মনে রেখো তোমার শত্রু সিন্ধুরাজ অজেয় নন। যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন অথবা শত্রুর বিনাশ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের শান্তিলাভ হতে পারে না।' এভাবে বারবার উৎসাহিত হয়ে সঞ্জয় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং জয়লাভ করেন। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

ছন্দে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অনন্ত নাম ও কবিতাবলী—রাজেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশক: শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু। পো: ও গ্রাম—সরিষা, জেলা—২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৬৮; মূল্য দুই টাকা।

সরলপ্রাণ ধর্মনিষ্ঠ এক ব্যক্তির মনোগত ভাব বাল্যকাল হইতে বিভিন্ন সময়ে ছন্দোবদ্ধ হইয়াছিল, সেগুলির সংকলন-রূপে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটিতে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অনন্ত নাম', 'মায়ামুদ্গর', ও 'কবিতাবলী'—এই তিন ভাগে কবিতাগুলিকে সাজানো হইয়াছে। কয়েকটি কবিতায় গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতার ছাপ আছে। একটি নিদর্শন:

'নিজ দোষে অন্ধ তুমি দেখ পরদোষ।
পরনিন্দা ক'রে তুমি থাক হে সন্তোষ॥
নিজে তুমি বুঝে চল, পরে কেন মন্দ বল,
পরগ্লানি শুনিলেই বড় পরিতোষ।
আত্মকুৎসা শুনিলেই অতিশয় রোষ॥'

Ramakrishna Mission Vidyapith Souvenir (March, 1970). Published by Swami Suddhasattwananda, R.K. Mission Vidyapith, Deoghar (S.P.), Bihar.

ইংরেজী ও বাংলায় সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধাবলী সংবলিত এই স্মরণিকার আত্মপ্রকাশ বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম দেওঘর বিদ্যাপীঠ শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ক্রমোন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে, স্মরণিকার কয়েকটি রচনায় তাহা পরিস্ফুট। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ: Swami Vivekananda's Call to the Youths of India, Facts About Apollo 11 & 12, India's Role in the Present World Crisis, My Second Innings at the Vidyapith, প্রথম পরিচয়, বৈদ্যনাথধামে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিদ্যাপীঠ (১৯৭০), প্রকাশক: সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর। পৃষ্ঠা ৮০।

দেওঘর বিদ্যাপীঠের এই বার্ষিক পত্রিকাটিতে ১৩টি ইংরেজী, ১২টি বাংলা, ৮টি হিন্দী এবং ৫টি সংস্কৃত রচনা স্থান পাইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্নভাষাভাষী ছাত্র বিদ্যাপীঠে যে একসঙ্গে শিক্ষালাভ করিতেছে তাহার ছাপ পত্রিকার মধ্যে বিদ্যমান। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি রচনা ছাত্রদের সাহিত্যপ্রীতি- এবং ভবিষ্যৎসম্ভাবনা-সূচক। শিক্ষকগণের প্রবন্ধাবলী সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী। ছাত্রদের আঁকা চারখানি ছবিই এবং 'Mathematical Puzzle' বেশ ভাল লাগিল।

দীপশিখা (বার্ষিক পত্রিকা, ১৯৬৯) আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়, পো: আসানসোল, জেলা বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৯৪।

'দীপশিখা' নামটি যেমন সুন্দর, তেমনি ছাত্রদের অন্তরে পত্রিকার লেখাগুলির মাধ্যমে জ্ঞানের দীপ জ্বালাইবার প্রচেষ্টাও সুন্দর। প্রচ্ছদটিও 'দীপশিখা' নামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রদের যত্নসহকারে লিখিত এবং সুসম্পাদিত লেখাগুলির মধ্যে 'বালক বিবেকানন্দ', 'যারা এনে দিল আলোর বন্যা', 'হয়তো ভবিষ্যতে', 'A True Father' আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। শিক্ষক মহাশয়গণের রচনাগুলি সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী। 'আমাদের সায়েন্স ক্লাব', 'বিদ্যালয়-প্রসঙ্গ' ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্যালয়-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিজ্ঞাপিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহানন্দে প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিন বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু পূজার অন্যান্য দিন আবহাওয়া ভাল থাকায় ভক্ত-সমাগম বেশ হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন প্রায় ১৬,০০০ ভক্ত হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

শাখাকেন্দ্রসমূহে দুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্ন-লিখিত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, কাঁথি, গৌহাটি, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর. নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বালিয়াটী, বোম্বাই, মালদহ. মেদিনীপুর, রহড়া, রেঙ্গুন. শিলং. শিলচর, শেলা. (চেরাপুঞ্জী, খাসিহিল) ও শ্রীহট্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বাৎসরিক সাধারণ সভা

গত ২৫শে অক্টোবর ১৯৭০, বেলুড় মঠে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৬১তম সাধারণ বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠের ব্রহ্মচারিগণ মঙ্গলা-চরণ করিবার পর সভার আনুষ্ঠানিক কাজ আরম্ভ হয়। স্বামী বুধানন্দ গত অধিবেশনের কার্যবিবরণী, স্বামী ভুতেশানন্দ ১৯৬৯-৭০ সালের মিশনের কার্যসংক্রান্ত গভর্নিং বডির বিবরণী এবং স্বামী ভাস্করানন্দ আলোচ্য বর্ষের হিসাব পাঠ করিবার পর স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বর্তমান পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শেষে প্রেসিডেন্ট মহারাজের ভাষণের পর শ্রী কে. কে. ঘোষের ধন্যবাদজ্ঞাপন ও শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি হয়।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বলেন, বর্তমানে জগতে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নিম্নাভিমুখী, আমাদের জাতীয় জীবন সংঘর্ষময়—যাহার আঁচ রামকৃষ্ণ মিশনেও লাগিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন নবযুগের উদ্বোধনের জন্য. সে যুগ আসিতেছে ; এখন যুগসন্ধিক্ষণ।

৭০ বৎসর পূর্বে স্বামীজী বলিয়াছেন, দরিদ্র জনগণের উন্নতি ছাড়া দেশ উন্নত হইবে না। স্বাধীন ভারতে এতদিন দরিদ্র জনগণের উন্নতি-বিধান প্রায় অবহেলিত হইয়াছে, এই সংঘর্ষ তাহারই ফলে উদ্ভূত। স্বামী বিবেকানন্দ যাহা চাহিয়াছিলেন, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে উন্নত করিয়া তোলা—তাহা করা হয় নাই, তাই এই সংঘর্ষ। এখনো এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় আছে। রামকৃষ্ণ মিশন তাহার সাধ্যমত সীমিত ক্ষেত্রে এই কাজ করিয়া আসিতেছেন।

কম্যুনিজমের কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই। স্বামীজীর প্রদর্শিত পথই যথার্থ সাম্যস্থাপনের পথ। তাঁহার সাম্যের ভিত্তি মানুষের দেব-স্বরূপতার উপর প্রতিষ্ঠিত—কাহারো কোনওরূপ

বিশেষ অধিকারের স্থান সেখানে নাই।

বর্তমান সময়ে বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইলেও উহার সমাধান আমরা করিবই—শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি আমাদের পিছনে রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণীই সারা জগৎ জুড়িয়া রূপগ্রহণ করিতে উদ্যত—কাহারো ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা কর্মের উপর উহা নির্ভরশীল নয়, উহা সারা জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবেই। ভারত সম্বন্ধে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণীয়: আর কখনো সে নিদ্রিত হইবে না, জগতের কোন শক্তিই আর তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সভাপতির ভাষণে বলেন, আজিকার জগৎ সম্বন্ধে একটা হতাশার দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকট, কিন্তু সাবধানে দেখিলে দেখা যায়, ধ্বংসের পাশাপাশি একটি সংগঠনী শক্তিও ক্রিয়াশীল। একটি নবযুগের অভ্যুত্থান ঘটিতেছে।

আমরা এখন বাস করিতেছি যুগসন্ধিক্ষণে। আধ্যাত্মিক শক্তিই সভ্যতার চালক। সভ্যতার একটি বিশেষ অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে মানুষ কেবল জাগতিক উন্নতি চাহিতেছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর দিকেই তাহার দৃষ্টি পূর্ণনিবদ্ধ। কেবল ইহার দ্বারা কিন্তু জগতের সমস্যার সমাধান হইবে না—মানুষের অন্তর পরিবর্তিত না হইলে সমস্যা থাকিয়াই যাইবে। মানুষ যন্ত্রমাত্র নয়, ভিতরের মানুষটিকে পরিবর্তিত করিতে পারিলে তবে সব ঠিক হইবে।

ইহার জন্য ঠাকুর-স্বামীজী ভাবাদর্শ দিয়া গিয়াছেন। তাহা শুধু ভারতের জন্য নয়, সারা জগতের জন্যই। সমাজকে সেভাবে গড়িতে হইবে। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবাদর্শা-নুযায়ীই জগতের দৃষ্টিভঙ্গী পালটাইতে হইবে।

ঠাকুর-স্বামীজী সারা জগতে শান্তি স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন। প্রকাশন, আলোচনাদির মাধ্যমে, সর্বোপরি নিজ জীবনে সে আদর্শকে প্রতিফলিত করিয়া আমাদের তাহা প্রচার করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন সে শক্তি আমাদের দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৯-৭০ সালের কার্যবিবরণী

গত দুই বৎসর ধরিয়া যে চাপের মধ্য দিয়া মিশনকে কাজ চালাইয়া যাইতে হইতেছে, ১৯৬৯-৭০ সালে তাহা খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল; এ চাপের অবস্থার কথা পূর্ববর্তী বিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি কয়েক মাস ধরিয়া বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে মিশনকে শ্রমিক- ও ছাত্র-আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে এ সমস্যা এত প্রবল হইয়াছিল যে, মিশনের কয়েকটি কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষা করাই দায় হইয়া উঠিতেছিল—যে কেন্দ্রগুলি সুদীর্ঘ দুই-দশকব্যাপী বিপুল শ্রম ও ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে, যেগুলি আন্তরিকভাবে জনসাধারণের সেবা পর্যাপ্ত পরিমাণে করিয়া আসিতেছে এবং জনগণের শ্রদ্ধাও অর্জন করিয়াছে। এই সব সমস্যায় জড়িত হইয়া পড়ার ফলে মিশনের অনেকখানি শক্তি ইহাতে ব্যয়িত হইতেছে।

আধুনিক সমাজচিন্তার একটি প্রবণতা হইল অধিকতর দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতি এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকাগুলির উপর কার্যকর ভাবে অধিক মনোযোগ দেওয়া। আমাদের মহান প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাই বহু পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন।

গভর্ণিং বডি সব সময়ই এ বিষয়ে পূর্ণ সজাগ ; কিন্তু বিশেষভাবে এই কার্যের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের স্বল্পতা, অন্যান্য কার্যের জন্য প্রতিশ্রুতি এবং প্রয়োজনানুরূপ সাধু-কর্মীর অভাবের জন্য স্বামীজীর এই ভাবকে কার্যে পরিণত করা বহুল পরিমাণে বিঘ্নিত হইয়াছে। তাই বলিয়া একথা ভাবিলে ভুল হইবে যে, চোখে পড়ার মতো কিছুই আমরা করি নাই। নিম্নে যে সব পরিসংখ্যান দেওয়া হইল, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে যথেষ্ট কিছু করা হইয়াছে; মিশনের সভ্যগণ এবং জনসাধারণও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মিশন গ্রামাঞ্চলের কাজ অধিকতর প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে, এবং সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় এক-টানা কোন-না-কোন প্রকার ত্রাণকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই জাতীয় কাজের জন্য আরো সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেন এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবার যোগ্যতর যন্ত্ররূপে আমাদের গড়িয়া তোলেন। সেই সঙ্গে একথাও আমাদের ভোলা চলে না যে, আমাদের মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আন্তর্জাতিকতা-বোধ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েরও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছিলেন। মিশনকে এসব ক্ষেত্রেও কাজ করিতে হইবে। স্বামীজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের মাধ্যমে সকলকে ব্রাহ্মণত্বের স্তরে তুলিয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন; একই নিম্নতর স্তরে সকলকে টানিয়া নামাইতে চান নাই। জনসাধারণের জন্য কাজ করিবার সময় এই আদর্শকে আমাদের দৃষ্টিপথে সদা ভাস্বর রাখিতে হইবে।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৮ জন সাধু সদস্য এবং ৬ জন গৃহস্থ সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে মিশনের মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৭০৬ (সাধু ৩৬৭, ভক্ত ৩৩৯)।

কর্মপ্রসার

আলোচ্য বর্ষে সমাজবিরোধী পরিবেশের সহিত মোকাবিলা করা এবং আরব্ধ কর্মগুলির সংহতিতে প্রধানতঃ ব্যাপৃত থাকায় জন্য মিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রসার সম্ভব না হইলেও প্রধান কেন্দ্র ও অনেকগুলি শাখা-কেন্দ্রে কিছু কর্মবিস্তৃতি হইয়াছে। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে সারগাছি আশ্রমের নূতন অতিথি ভবন উদ্বোধন করা হয়। নভেম্বরে রায়পুরে বিবেকানন্দ সৎসঙ্গ ভবনের উদ্বোধন হইয়াছে। ডিসেম্বরে আলং-এ নূতন বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের উদ্বোধন হয়। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লক্ষ্ণৌ-এ বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকের এবং মার্চ মাসে দেওঘর বিদ্যাপীঠে নবনির্মিত প্রার্থনাভবনের উদ্বোধন উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সিংহলের কলম্বোতে স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতিভবনের উদ্বোধন হয়।

এই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠের কর্মপ্রসার বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কাঞ্চীপুরমে নূতন মন্দিরের উদ্বোধন এবং ডিসেম্বরে মহীশূরে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায়তনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বিদেশে কর্মপ্রসারের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গঙ্গা নগরীরে (Ganges Town) আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভা কেন্দ্র কর্তৃক নিজস্ব ভবনের জন্য জমিসংগ্রহ

উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যবিভাগ

প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ব্যতীত ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিশনের ৭৩টি শাখাকেন্দ্র ছিল; তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া, অবশিষ্ট ৬০টি ভারতে। এতদ্ব্যতীত ৬২টি মঠকেন্দ্র আছে— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি, পূর্বপাকিস্তানে ৮টি এবং সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও আরজেন্টিনায় একটি করিয়া; বাকী ৪১টি ভারতে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক কথিত ও তাঁহার জীবনে রূপায়িত বৈদান্তিক সত্যসমূহের ভিত্তিতে নিঃস্বার্থ সেবাই রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট আদর্শ। মিশনের এই আদর্শানুগ বহুমুখী কার্যধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ: (১) সেবাকার্য (relief), (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য।

মঠকেন্দ্রগুলির বিশেষ কার্য জনসাধারণের জীবনে ধর্মভাববৃদ্ধির সহায়তা করা হইলেও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রগুলি প্রভূত পরিমাণে কর্মরত। মঠ ও মিশন উভয় কেন্দ্রেরই রাজনীতির সহিত কোনও সংস্পর্শ নাই, তথাপি বিরুদ্ধ ভাবধারা ও পরিবেশের মধ্যে, এমনকি হিংসাত্মক পরিবেশের মধ্যেও কেন্দ্রসমূহকে কাজ করিতে হইয়াছে।

(১) **সেবাকার্য:** গত বৎসরে মিশন কর্তৃক যে-সমস্ত রিলিফ করা হইতেছিল, সেগুলি ছাড়াও আলোচ্য বর্ষে ভারতের বিভিন্ন অংশে সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

অগাস্ট ১৯৬৯ হইতে মার্চ ১৯৭০ পর্যন্ত আসামের কাছাড় জেলায় বন্যার্তসেবা এবং জুলাই ১৯৬৯ হইতে মার্চ ১৯৭০ পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের ওঙ্গোল জেলায় চিরালায় সাইক্লোন রিলিফ করা হয়। চিরালাতে একটি স্কুল, কম্যুনিটি হল ও ৭০টি পাকা বাড়ী সমন্বিত একটি কলোনী গড়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ জেলায় বন্যার্তসেবা-কার্য ১৯৬৯-র অগস্টে শুরু করিয়া অক্টোবরে শেষ করা হয়। গত বৎসর হইতে যে-সব সেবাকার্য চলিতেছিল, তাহাদের মধ্যে উত্তরবঙ্গ বন্যার্তসেবা ও গুজরাট বন্যার্তসেবা যথাক্রমে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ ও মে মাসে সমাপ্ত হয়। উত্তরবঙ্গ বন্যার্তসেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ২৮৭টি গৃহ, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি কম্যুনিটি হল নির্মিত হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ৮৩টি কূপ খনন করা হইয়াছে। গুজরাট বন্যার্ত-সেবাকার্যে মিশন কর্তৃক সিমেণ্ট কন্‌ক্রিটের ঘর তৈরি করিয়া ২১টি কলোনী নির্মাণ করা হইয়াছে; এখানে ১,৩৬৬টি দুঃস্থ পরিবার আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এইসব কলোনীতে ২টি বিদ্যালয়, ২১টি সমাজমন্দির, ৫টি ইলেকট্রিক-পাম্প-যুক্ত উচ্চ জলাধার তৈরি করা হইয়াছে।

এই সকল রিলিফ-কার্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক জিনিসপত্রের মূল্য সমেত ২৫,০০,০০০ টাকার বেশি ব্যয় করা হয়। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের পরে মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণার বসিরহাট মহাকুমায় পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তদের সেবাকার্য এবং কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বন্যাত্রাণকার্য এবং গুজরাটে খরাত্রাণকার্য আরম্ভ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মঠ-মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুলি স্ব স্ব অঞ্চলে স্থানীয় জন-

সাধারণকে অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা নিয়মিতভাবে সাহায্য করিয়াছে। এইরূপ সেবাকার্যে প্রধান কেন্দ্রও প্রভূত অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রধান কেন্দ্র প্রধানতঃ শাখাকেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কাজে ব্যাপৃত থাকিলেও, সেখানে হইতে নিয়মিতভাবে ১২৬টি দুঃস্থ পরিবারকে ও ১৮৯ জন দরিদ্র ছাত্রকে এবং সাময়িকভাবে ১১৮টি পরিবারকে ও ২১ জন ছাত্রকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে; এই সাহায্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২২,১২৮ টাকা।

(২) **চিকিৎসা:** ভারত ও পাকিস্তানে রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রকর্তৃক জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে রোগগ্রস্ত জনসাধারণের সেবাকল্পে অনেকগুলি ইনডোর হাসপাতাল ও আউটডোর ডিসপেন্সারী পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাসপাতালগুলিতে অন্তর্বিভাগে মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ১,০৩৯; এই গুলিতে ২১,৭৫০ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৫৩টি আউটডোর ডিসপেন্সারীতে পুরাতন রোগীসহ ২৭,৬০,৫৩৮ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। রাঁচির ডুরুরি স্যানাটোরিয়াম এবং নিউ দিল্লীর ক্যারলবাগ হাসপাতাল কেবল যক্ষ্মারোগীদের জন্য। কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার অন্যান্য বিভাগ ব্যতীত একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল পরিচালিত হয়। এই নার্স ট্রেনিং স্কুলের দুইটি বিভাগ: জুনিয়র ও সিনিয়র।

মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে; কোন কোন কেন্দ্রে আয়ুর্বেদিক মতেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

(৩) **শিক্ষা:** আলোচ্য বর্ষে মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি পরিচালিত হইয়াছে:

৫টি মহাবিদ্যালয়, ২টি বি. টি. কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ৬টি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিট্যুট, ১টি শারীর-শিক্ষা কলেজ, ১টি উচ্চতর গ্রামীণ-শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষি-শিক্ষা কলেজ, ৪টি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, (পলিটেকনিক), ১৫টি জুনিয়র টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, ৭৬টি ছাত্রাবাস, অনাথাশ্রম প্রভৃতি, ৩টি চতুষ্পাঠী, ৩৫টি বহুমুখী, উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৭টি অন্যান্য বিদ্যালয়, ৫৯টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র অথবা কম্যুনিটি সেণ্টার, ১টি পরিষেবিকা-শিক্ষণ স্কুল, ১টি অন্ধ ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়, ১টি দিবা-ছাত্রাবাস এবং ১টি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার স্কুল।

এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৫,৮৫৩, তন্মধ্যে ছাত্র ৫০,০৭১ এবং ছাত্রী ১৫,৭৮২।

(৪) **সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার:** এই কর্মবিভাগে বহু-সংখ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী, উৎসবাদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যান্টার্ন প্রদর্শন, নিয়মিত ক্লাস বক্তৃতা ও সেমিনারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিস্তার করা হয়। কয়েকটি কেন্দ্রে পুস্তকাদি প্রকাশনের মাধ্যমেও ইহা করা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কলিকাতা ইনস্টিট্যুট অব কালচারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রসারের মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক যে বিপুলপরিমাণ কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছে, এখানে তাহা উল্লেখ করা হইল না, কারণ মঠকেন্দ্রগুলির ইহাই প্রধান কাজ। এজন্য বক্তৃতা-সফর, শাস্ত্রালোচনা, ক্লাস প্রভৃতি ছাড়াও অনেকগুলি

বৃহৎ পুস্তক-প্রকাশন বিভাগ ও মন্দির প্রভৃতি মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে।

(৫) **গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য:** মিশনের কেন্দ্রগুলি শহরাঞ্চলে অবস্থিত এবং সেগুলি কেবল উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তদের জন্যই, এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন প্রয়োজন। মিশনের অন্ততঃ ৯টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত, আলোচ্য বর্ষে এই কেন্দ্রসমূহ এবং এগুলির পরিচালনাধীন বহু কেন্দ্র দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় নিরত থাকিয়া ১৩৭টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়াছে; তন্মধ্যে ৭টি বহুমুখী বিদ্যালয় ২টি মাধ্যমিক, ৩৯টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক ও মধ্যইংরেজী, ৩৯টি প্রাথমিক এবং ৫০টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র। ১২টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ২টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট সহ ২৩টি লাইব্রেরী, ১৪৮টি দুগ্ধবিতরণকেন্দ্র, ৬টি অডিও-ভিসুয়্যাল ইউনিট, ৯টি কম্যুনিটি সেণ্টার, ৮টি বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শিলং কেন্দ্রে একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ডিসপেন্সারীর মাধ্যমে খাসি পাহাড় অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম জুড়িয়া আলোচ্য সময়ে ২২,৬৭৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। কামারপুকুর মিশন কেন্দ্র কর্তৃক ১টি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে। নেফা অঞ্চলের কেন্দ্রটি উৎসাহ সহকারে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য আরম্ভ করিয়াছে এবং এই কার্য গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছে।

লক্ষণীয় যে, শহরাঞ্চলের চিকিৎসা-কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতেছে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র ছাত্র অর্থসাহায্য অথবা বিনা-ব্যয়ে থাকিবার ও শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আর্তত্রাণসেবাকার্য (relief) করা হয় এবং এই সেবাকার্যেও গ্রামাঞ্চলের সহস্র সহস্র দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য লাভ করেন।

বিদেশে কার্য

ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুর, ফিজি, মরিশাস, সিংহল এবং ফ্রান্সে যে কেন্দ্রগুলি অবস্থিত সেগুলি মিশনের কেন্দ্র; এগুলির মধ্যে ফ্রান্সের কেন্দ্রটি ব্যতীত অন্যগুলিতে প্রধানতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশে অবস্থিত অন্যান্য সমস্ত কেন্দ্রই রামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্র। মঠকেন্দ্রগুলি বিদেশে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারাপ্রচারে নিরত।

উল্লেখযোগ্য যে, শাখাকেন্দ্রগুলিকে চালাইবার জন্য মিশন কিংবা মঠের কোন কেন্দ্রীয় তহবিল নাই। প্রত্যেক শাখা-কেন্দ্রকে স্থানীয় সাহায্য সহায়ে নিজ ব্যয়ভার নিজেকেই বহন করিতে হয়। বিদেশের কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধেও একথা সমভাবে সত্য। আবার ইহাও সমভাবে সত্য যে, ভারতীয় কেন্দ্রগুলি বিদেশ হইতেও কোন অর্থসাহায্য পায় না, কোথাও অতি সামান্য যাহা পায় তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে; প্রায় সম্পূর্ণরূপেই সেগুলি ভারতীয় অর্থের উপর নির্ভরশীল।

বিবিধ সংবাদ

নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে আমরা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছি :—

বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব (কলিকাতা-৩), বিশ্বসংস্কৃতি মিশন (কলিকাতা-৪), সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলিকাতা-৫০), রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (কাসুন্দিয়া, হাওড়া), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (গাঙ্গাইল রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠ (আখাউড়া রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা), শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (নাথোয়াহাট, জলপাইগুড়ি), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা), ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ (কলিকাতা-১৯), ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ (বারাণসী) প্রভৃতি।

অনুষ্ঠানসূচী

[অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র, ১৩৭৭ ; বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে]

তিথি-কৃত্য

১১।	স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লানবমী	২১শে অগ্রহায়ণ	সোমবার	৭ই ডিসেম্বর
১২।	**শ্রীশ্রীমা**	**অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাসপ্তমী**	**৪ঠা পৌষ**	**রবিবার**	**২০শে ডিসেম্বর**
১৩।	শ্রীযীশুখ্রীষ্ট	—	৮ই পৌষ	বৃহস্পতিবার	২৪শে ডিসেম্বর
১৪।	স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাএকাদশী	৮ই পৌষ	বৃহস্পতিবার	২৪শে ডিসেম্বর
১৫।	স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লাষষ্ঠী	১৭ই পৌষ	শনিবার	২রা জানুয়ারী
১৬।	স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লাচতুর্দশী	২৫শে পৌষ	রবিবার	১০ই জানুয়ারী
১৭।	**শ্রীশ্রীস্বামীজী**	**পৌষ কৃষ্ণাসপ্তমী**	**৫ই মাঘ**	**মঙ্গলবার**	**১৯শে জানুয়ারী**
১৮।	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লাদ্বিতীয়া	১৪ই মাঘ	বৃহস্পতিবার	২৮শে জানুয়ারী
১৯।	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লাচতুর্থী	১৬ই মাঘ	শনিবার	৩০শে জানুয়ারী
২০।	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	২৭শে মাঘ	বুধবার	১০ই ফেব্রুয়ারী
২১।	**শ্রীশ্রীঠাকুর**	**ফাল্গুন শুক্লাদ্বিতীয়া**	**১৪ই ফাল্গুন**	**শনিবার**	**২৭শে ফেব্রুয়ারী**
	(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		**১৫ই ফাল্গুন**	**রবিবার**	**২৮শে ফেব্রুয়ারী**
২২।	স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণাচতুর্থী	২রা চৈত্র	মঙ্গলবার	১৬ই মার্চ

পূজা-কৃত্য

১।	শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লাপঞ্চমী	১৭ই মাঘ	রবিবার	৩১শে জানুয়ারী
২।	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণাচতুর্দশী	১০ই ফাল্গুন	মঙ্গলবার	২৩শে ফেব্রুয়ারী

ভ্রমসংশোধন

গত কার্তিক সংখ্যা উদ্বোধনের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের ২৮শ লাইনে 'পাতঞ্জল দর্শন' স্থলে 'পাতঞ্জল মহাভাষ্য' পড়িবেন।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥ ১৪০
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী॥ ১৪২
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥ ১৪৩

—বিষ্ণুপুরাণ, ১।৯

দেবদেব নারায়ণ লীলান্তরে এভাবে যখন
অবতীর্ণ হন নিজে নানাদেহ করিয়া ধারণ
সঙ্গে তাঁর সর্বদাই অবতীর্ণা হন নারায়ণী
অনুরূপ দেহ ধরি, কর্মে তাঁর হন সহায়িনী।
সীতা ও রুক্মিণী রূপে এসেছেন রাম আর কৃষ্ণ-অবতারে,
অন্য অন্য অবতারে সহায়িনী হয়েছেন তাঁর বারে বারে।
নারায়ণ অবতীর্ণ হন যবে দেব কিংবা নরদেহ ধরি,
অনুরূপ দেহ লয়ে লক্ষ্মীও আসেন সাথে যেথায় শ্রীহরি।
বিশ্বপতি নারায়ণ দেবলোকে দেবদেহ গ্রহণ করিলে
জগন্মাতা নারায়ণী গ্রহণ করেন দেবী-দেহ লীলাছলে।
মানুষ হইয়া যবে ধরাধামে অবতীর্ণ হন নারায়ণ
লক্ষ্মীও আসেন সাথে লীলায় মানুষী তনু করিয়া ধারণ।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমা

আমাদের সাধারণ ধারণা, অধ্যাত্মিকতায় উন্নত হইতে হইলে জাগতিক কর্মের প্রতি উদাসীন থাকিতে হয়; দুটি দিকেই নজর দেওয়া চলে না। এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই ভারত বেশ কিছুকাল জাগতিক উন্নতিকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে, যাহার ফল জাতির এই ঐহিক অবনতি। আবার, কর্মে এই অবহেলার ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেও সে পিছাইয়া পড়িয়াছে, সাত্ত্বিক ভাবের অনুকরণ করিতে যাইয়া অধিকতর তামসিকতাতেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অপরদিকে, পাশ্চাত্য জাতিগুলি বিপুল উদ্যমে কর্মে নিরত—ধর্ম তাহাদের নিকট একটি সামাজিক প্রথামাত্রেই পর্যবসিত বলা যায়।

স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, এই ধারণা আমাদের পালটাইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাসম্পন্ন হইয়াও যে কর্মে পরিপূর্ণ ভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব—শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনেই তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তবে লোককল্যাণকর্মে নিরত থাকিলেও, শ্রীরামকৃষ্ণদেব গার্হস্থ্য জীবন হইতে দূরেই ছিলেন; বিবাহ করিলেও, আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ না করিয়া তাঁহাদের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিলেও যাহাকে 'সংসার' বলে, তাহার সহিত কোন সংস্রবই তাঁহার ছিল না। অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন হইয়াও যে নিখুঁতভাবে 'সংসারের' কাজও করা যায়, এ দৃষ্টান্ত-স্থাপনের জন্য তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমাকে। গীতায় সাত্ত্বিক কর্মের কর্তার বর্ণনা রহিয়াছে—ধৃতি ও উৎসাহ লইয়া সে কর্ম করে,—বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যতখানি উৎসাহী হইয়া কর্ম করে ততখানি বা ততোধিক কর্মোদ্যমই তাহার মধ্যে দেখা যায়—অথচ সর্বাবস্থায় সে সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার এবং আসক্তি-ও অহঙ্কাররহিত থাকে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন আসিয়াছিলেন 'দুখিনী-ব্রাহ্মণী-কোলে', শ্রীশ্রীমাও তাই। কামারপুকুর তবু সমৃদ্ধ পল্লী, জয়রামবাটী তাহাও নয়, অতি ক্ষুদ্র। পল্লীর এই দরিদ্র সংসারে শৈশব হইতেই তিনি তাঁহার জননী শ্যামাসুন্দরীকে সংসারের কাজে সহায়তা করিয়াছেন—গরুর জন্য 'একগলা জলে নামিয়া দলঘাস কাটা', ক্ষেতে গিয়া ধানের শিষ কুড়ানো ইত্যাদিও করিয়াছেন, আবার ছোট ভাইদের লালন-পালনেও শ্যামাসুন্দরীকে সাহায্য করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ছোট্ট ঘরটির মধ্যে (৮´×৮´, অষ্টকোণ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্য রান্না ও সেবা, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জননী চন্দ্রামণির সেবা, প্রভৃতি ছাড়াও ভক্তদের জন্য প্রায় প্রতিদিনই রান্না করিতে হইত, পান সাজিতে হইত। এসব করিয়াও কিছু অবসর আছে দেখিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব একবার কিছু পাটের ফেঁসো আনিয়া শিকে তৈরি করিতে দিয়াছিলেন—মেয়েদের অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে নাই! শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমায়ের অনলস

নীরব সেবার কথাও সর্বজনবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর কামারপুকুরে থাকাকালীন কিছুদিন তিনি নিজে কোদাল দিয়া কোপাইয়া জমি তৈরি করিয়া শাক বুনিয়াছেন, আক্ষরিক অর্থেই সে সময় শাকান্নে জীবনধারণ করিয়াছেন, অনেক সময় নুনও জোটে নাই। পরবর্তীকালে ভক্তজননীরূপে যখন তিনি বহুজন-পূজিতা, তখনও জয়রামবাটিতে পল্লী-জননীর মতোই সন্তানদের জন্য রান্না প্রভৃতি সব কার্যই করিয়াছেন। তাছাড়া সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, পাগল রাধুদিদি ও তাঁহার মা প্রভৃতিকে লইয়া যে-সংসারে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক প্রারব্ধ লোককল্যাণকর্মকে সুস্পষ্ট রূপ দিবার জন্য দেহরক্ষার প্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশে স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়িত করিয়াছিলেন এবং যেরূপ 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত' হইয়া তিরোধানের প্রায় পূর্ব পর্যন্ত সে সংসার চালাইয়াছিলেন, কয়জন পাকা সংসারীও তাহা সেভাবে চালাইতে সক্ষম, জানি না। এক মহিলা তো একদিন বলিয়াই ফেলিয়াছিলেন, 'মা, আপনাকে মায়ায় ঘোর বদ্ধ দেখিতেছি।' (মা শুনিয়া অবশ্য মৃদুস্বরে স্বগতোক্তি করিয়াছিলেন, 'কি করি মা, নিজেই যে মায়া!')

অথচ, এই 'মায়ায় ঘোর বদ্ধ সংসারীর মতো কর্মরত অবস্থায় তাঁহাকে 'মুক্তসঙ্গ', 'অনহংবাদী' ও 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকার' বলিলেও খুবই কম বলা হইল, ইহা তো সাত্ত্বিক সাধকের অবস্থা। তিনি ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী—যাঁহাকে কোন কর্ম বা কর্মফল লিপ্ত করিতেই, স্পর্শ করিতেই পারে না। নিজের এ অবস্থার কথা মা একদিন প্রকাশও করিয়াছিলেন,—তাঁহার জনৈকা আত্মীয়া তাঁহাকে খুবই বিরক্ত করিলে বলিয়াছিলেন, 'আমি তোকে ইচ্ছে করলে এখনি মেরে ফেলতে পারি, আর তাতে আমার পাপও হবে না, পুণ্যও হবে না।' ব্রহ্মজ্ঞান বিরল হইলেও বহু সাধকের হইতে পারে। তিনি যে ইহারও বহু ঊর্ধ্বে'—জ্ঞানস্বরূপিণী—যাঁহাকে আমরা মহামায়া, জগন্মাতা, কালী প্রভৃতি বলি তাহাই, একথাও তিনি জানিতেন এবং কখনো কখনো বিভিন্ন ভাষায় তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেনও। স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবাই তাঁহার সন্তান।

যে নিরাকার নির্গুণ সত্তা লীলাচ্ছলে সাকারা সগুণা হইয়া জগদীশ্বরী ও জীবজগৎ হন বলিয়া মহানির্বাণতন্ত্র বলিতেছেন, যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া শিবঠাকুর বলিতেছেন, তুমি 'অস্মাকমপি জন্মভূ'—আমাদেরও (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও) জননী তুমি, দেবীভাগবতে যিনি নিজেই সে কথা বার বার বলিতেছেন,—সেই সত্তাই সাধারণ পল্লীমাতার রূপ ধারণ করিয়া বলিয়া গেলেন, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবাই আমার সন্তান।' বাল্যকাল হইতেই তিনি নিজ অসাধারণত্বের ইঙ্গিত পাইয়াছেন, দলঘাস কাটিবার সময় দেখিতেন তাঁহারই মতো আর একটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ঘাস কাটিয়া দিতেছে—'এক আঁটি রাখিয়া আসিয়া দেখি সে আর এক আঁটি কাটিয়া রাখিয়াছে'; কামারপুকুরে খিড়কীর দরজা দিয়া হালদারপুকুরে স্নানে যাইবার সময় কোথা হইতে তাঁহারই সমবয়সী আটটি মেয়ে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত, স্নান করিত, তাঁহাকে আবার পৌঁছাইয়া দিত (মহামায়ার অষ্টসখী?)। পরবর্তীকালে তাঁহার নিজ সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় সে-সবের সমর্থন ও সাক্ষাৎ জগন্মাতা-জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা, এসবও তো হইয়াছিল। কিন্তু

কখনও, কোথাও, তাহার জীবনের কোন আচরণে এই বিপুল মহিমা বিন্দুমাত্র 'অহং'-এর ছায়াপাত করিতে পারিয়াছিল কি? যদি পারিত, তবে কাহারও পক্ষে, কোন মুহূর্তেও তাঁহাকে 'ঘোর বদ্ধ' ভাবা সম্ভবই হইত না। আর সম্ভব হইত না স্বামী বিবেকানন্দ,-ব্রহ্মানন্দপ্রমুখ কয়েকজন বাছা বাছা সন্তান ছাড়া আর কাহারও পক্ষে 'মা' বলিয়া তাঁহার কাছে অগ্রসর হওয়া।

এরূপ হইয়াও তিনি যে নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞানীর মতো দেখাইলেন, আধ্যাত্মিকতা-সমুজ্জ্বল জীবন লইয়াও নিজেকে সাধারণ পল্লীমাতার মতো, বা সাধিকার মতো দেখাইয়া জাগতিক কর্মে, সংসারে লিপ্ত হইয়া রহিলেন, ইহা শুধু আমাদের কাছে আদর্শ স্থাপনের জন্য; যে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন, নবযুগের যে আদর্শের কথা স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় স্থানেই বার বার কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন: আধ্যাত্মিকতার সহিত কর্মোদ্যমের মিলন।

ইহাই যুগধর্ম। আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়া কেবল জাগতিক কর্মে উন্মত্তের মতো লিপ্ত থাকা নয়, আবার আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কর্ম ত্যাগ করাও নয়। শ্রীভগবানই সব হইয়া রহিয়াছেন, সব কর্মই তাঁহারই সেবা—এই ভাবই জাগতিক কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সংযোগসেতু—যে সেতুবন্ধন অতি সাধারণ মানুষের পক্ষেও যেমন সম্ভব, তেমনি সম্ভব উচ্চ আধ্যাত্মিকতার অধিকারীর পক্ষেও। তাহাই জীবনে দেখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, আর তাঁহার সহায়করূপে আসিয়াছিলেন মহাশক্তি স্বয়ং, আমাদের শ্রীশ্রীমা-রূপে। এবারেই শুধু নয়, ভগবান যখনই অবতীর্ণ হন, তখনই তাঁহার শক্তিও সঙ্গে আসেন তাঁহার কাজে সহায়তা করিতে: 'এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ। অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎ-সহায়িনী॥'—(বিষ্ণুপুরাণ, ১।৯।১৪০)। জগৎপতি দেব জনার্দন যখনই অবতীর্ণ হন, তখনই তাহার শক্তিও তাহার সহায়িনীরূপে সঙ্গে আসেন। শ্রীশ্রীমা যে পূর্ব পূর্ব অবতারের সঙ্গে সীতাদেবী, শ্রীরাধা প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও নিজেই সোজাসুজি বা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন।

আমাদের মাতৃজাতি আধুনিক যুগসন্ধিকালে বহির্জীবনে যিনি যাহাই করুন, তাঁহাদের অন্তর্জীবন যেন সদা নিবদ্ধদৃষ্টি থাকে শ্রীশ্রীমায়ের অমল-ধবল চিরপ্রশান্তিস্নিগ্ধ অধ্যাত্মজীবনের প্রতি। আমাদের জাতীয় চরিত্রগঠনে তাহা বিপুলভাবে সহায়ক হইবে। কুমারী কন্যারূপে, বিবাহিতা স্ত্রীরূপে, জননীরূপে—সর্বাবস্থাতেই পুরুষদের চরিত্রের উপর নারীর চরিত্রের প্রভাব প্রচণ্ড। স্বামীজীর কথা, "জননীগণ উন্নতা হইলে তাঁহাদের সন্তানবর্গের মহৎ কীর্তি দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে, আর তখনই ঘটিবে দেশে সংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনরুজ্জীবন।" সনাতন ভারতের যোগ্য সন্তান বলিয়া আমরা বুক ফুলাইয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারিব সেইদিনই।

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

(৪)

পূর্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য সশক্তিক ব্রহ্মবাদী এবং জগৎসত্যতাবাদী। এই মতবাদ তাঁহার সৎকার্যবাদ ও সমানাধিকরণ্য ন্যায় মানিয়া লইলে অনস্বীকার্য। 'কার্য'সত্তা 'কারণ'সত্তায় চিরবর্তমান। উহা কখনও লীনাবস্থায় থাকে, কখনও ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জগৎ ও জীব ব্রহ্মেতেই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং ব্রহ্মের 'ঈক্ষণ'শক্তির প্রভাবে উভয়ই ব্যক্ত অবস্থায় পরিণমিত হয়। আবহমানকাল হইতে এই সৃষ্টির ধারা চলিয়া আসিতেছে। আচার্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া শ্রীভাষ্যে স্বমত স্থাপন করিয়াছেন।

'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥' (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)

[(পরমেশ্বরের) পরাশক্তি বিচিত্র কার্য-কারিণী বলিয়া শ্রুত হয়, এবং ইনি জ্ঞানরূপ বল দ্বারা যে সৃষ্টিক্রিয়া করেন তাহাও স্বাভাবিক।]

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ (শ্বেঃ উঃ ৬।৭)

[লোকপালদিগের নিরঙ্কুশ মহেশ্বর, দেবগণের পরম দেবতা, প্রজাপতিদিগের অধিপতি, অক্ষর হইতেও উত্তম জগৎপতি, এবং স্তবনীয় সেই জ্যোতিকে আমরা জানি।]

'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ' ॥
(মুণ্ডক উপঃ ১।১।৭)

[মাকড়সা যেরূপ নিজ শরীর হইতে সুতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে।]

অন্য উপনিষদ্ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন —'অগ্রে আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়য়েতি।' (বৃহঃ ৬।২।২-৩) পূর্বে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপই বর্তমান ছিল [তিনি সঙ্কল্প করিলেন বহু হইব, সৃষ্টি করিব।]

এই-জাতীয় উপনিষদের বহু মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য স্বানুভবসিদ্ধ দার্শনিক মত উপস্থাপিত করিয়া প্রসন্নগম্ভীর শ্রীভাষ্যে আচার্য শঙ্কর প্রচারিত নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন :—

'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।'
(মুণ্ডক উঃ ১।১।৫)

ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ব-বিভুত্ব-সূক্ষ্মত্ব-সর্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূতযোনিত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ। (শ্রীভাষ্য ১।৮০)

['অনন্তর পরাবিদ্যার উপদেশ করা হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।' এই শ্রুতিতে ও মুণ্ডক উপনিষদেও পরব্রহ্মের প্রকৃত হেয় গুণের নিষেধ করিয়া তাঁহার নিত্যত্ব, প্রভুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, অব্যয়ত্ব বা নির্বিকারত্ব, সর্বভূতকারণত্ব, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণসকলের সম্বন্ধই প্রতিপাদিত হইয়াছে।]

জীবাত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে,

'জীব' ব্রহ্মাশ্রিত কিন্তু নিগুর্ণ স্বরূপ নহে। তাহার 'অস্মিতা' সর্বাবস্থায় থাকে এবং সুষুপ্তিতে এই 'আমিবোধ' লইয়াই জীব 'ব্রহ্ম-সত্তাকে' স্পর্শ করে।

শ্রীভাষ্যে আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন :

'তস্মাৎ স্বত এব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যন্নহমর্থ এব প্রত্যগাত্মা ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্। অহংভাববিগমে তু জ্ঞপ্তেরপি ন প্রত্যক্ত্বসিদ্ধিরিত্যুক্তম্' (১।৭৩)।

[স্বভাবতঃই জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ যে 'অহং পদার্থ' তাহাই আত্মা, (এই আত্মা) কেবল জ্ঞানমাত্র নহে (কিন্তু জ্ঞাতাও)। অহংভাব-বিরতি কেবল জ্ঞানমাত্রের যে আত্মত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে]

তারপর আবার বলিতেছেন :

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাভাবাচ্চ, অহমর্থস্য বিবিক্তস্ফুটপ্রতিভাসাভাবেঽপ্যাপ্রবোধাদ্ অহং ইত্যেকাকারেণাত্মনঃ স্ফুরণাৎ সুষুপ্তাবপি নাহং ভাববিগমঃ। ভবদভিমতায়া অনুভূতেরপি তথৈব প্রথেতি বক্তব্যম্। (১।৭৩)

শ্রুতিবাক্য—'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি'। (বৃ. উঃ ৪।৩৯)

[সুষুপ্তিকালে তমোরূপে অভিভূত থাকার জন্য এবং (ইন্দ্রিয়গম্যবাদ) পদার্থেরও প্রতীতি না থাকার জন্য তখন যদিও অনেক প্রকারের প্রতীতি থাকে না এবং স্পষ্ট প্রতীতিও থাকে না বটে ; কিন্তু তথাপি তখন এই অহং-ভাবটি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। করণ অহং (আমি) এই ভাব প্রত্যগাত্মায় স্ফুরণের (আত্মাস্ফূর্তি) প্রতীতি বিদ্যমান থাকে। (হে অদ্বৈতবাদিগণ) আপনাকেও (আত্মরূপ স্বীকৃত) অনুভূতিরও সুষুপ্তিকালে ঐরূপ স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে।]

[এই অবস্থায় এই প্রত্যগাত্মা স্বয়ংজ্যোতি হন।]

উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে—

নহি সুষুপ্তোত্থিতঃ কশ্চিদহংভাববিযুক্তার্থান্তরপ্রত্যনীকাকারা জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, ইত্যেবংবিধাং স্বাপসমকালামনুভূতিং পরামৃশতি। এবং হি সুপ্তোত্থিতস্য পরামর্শঃ—"সুখমহমস্বাপ্সম্" ইতি। অনেন প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যহমর্থস্যৈবাত্মনঃ সুখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং চ জ্ঞায়তে॥ (১-৭৩)

[কোন ব্যক্তিই সুষুপ্তিভঙ্গের পর মনে করে না যে-অহংভাবরহিত এবং বাহ্যপদার্থ-রহিত (জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদির বিশেষ স্ফুরণরহিত) কেবল জ্ঞপ্তিমাত্র (জ্ঞানস্বরূপ) আমি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থান করিয়াছিলাম। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি স্মরণ করিয়া থাকে—'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।' নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই স্মৃতির ফলে বুঝা যায় যে, সুষুপ্তিকালেও অহংবাচ্য আত্মায় জ্ঞান ও সুখ বিদ্যমান ছিল।]

তাঁহার মতে এই 'আমি-প্রত্যয়-সমন্বিত চৈতন্যময় জীব' ব্রহ্মাংশস্বরূপ। তাঁহার মতে 'মেঘের কোলে বিদ্যুৎপ্রভা'সদৃশ। জীবসত্তা ব্রহ্মসত্তার অংশ এবং তিনি অন্তর্যামিরূপে ইহার নিয়ন্তা। 'বৃক্ষেরই শাখা হয়, শাখার বৃক্ষ হয় না'। পরমহংসদেব যেমন বলিতেন, 'গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর গঙ্গা নহে'।

গীতাতে আছে—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'। (১৫।৭)

[পরমাত্মারই সনাতন অংশ সংসারে কর্তা ভোক্তারূপে প্রসিদ্ধ জীব।]

'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত'। ১৩।৩

[হে অর্জুন, সকল ক্ষেত্রেই আমাকে (পরমেশ্বরকে) ক্ষেত্রজ্ঞ (প্রত্যগাত্মা) বলিয়া

জানিবে।]

শ্রীরামানুজের মতে জীবাত্মা 'ব্রহ্মকলা'—যেমন অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ। জীবের চিদ্রূপতা স্বীকার করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করেন নাই।

জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম—এই তত্ত্ব বিশিষ্টাদ্বৈতের মূল কথা। এই পরিণামের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রুতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, জগৎপরিণাম ব্রহ্মের 'ঈক্ষণশক্তি'-প্রসূত। 'কেন' তিনি ইচ্ছা করিলেন? এই প্রশ্নোত্তর আমাদের সীমায়িত বুদ্ধি দিয়া বোঝা যাইবে না। সীমিত বুদ্ধি অসীম সম্বন্ধে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ দিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারে না—ইহা 'যুক্তির' ক্ষমতার বাহিরে। পাশ্চাত্যের মহামতি দার্শনিক কাণ্ট (Kant) এই বুদ্ধির সীমা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—Thing-in-itself (বস্তুর যথার্থ স্বরূপ) সম্বন্ধে বুদ্ধি কিছু বলিতে পারে না।

অন্য দার্শনিক বার্গসন ও (Bergson) বলিয়াছেন, 'Intellect is a constitutional materalist. It cannot grasp the flow of life, i.e. "Elan vital", in its true nature.'

[বুদ্ধি আভ্যন্তরীণ জড়প্রকৃতিসম্পন্নই। সুতরাং বুদ্ধি আবেগময় প্রাণশক্তিপ্রবাহের প্রকৃত স্বাভাবিক অবস্থা-বিষয়ে তাৎপর্যগ্রহণে অসমর্থ।]

বুদ্ধির ক্ষেত্র সীমায়িত বলিয়া শ্রীরামানুজ শ্রুতিকেই বা বোধকেই চরমসত্য নির্ধারণে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এই 'শ্রুতিপ্রমাণ'-বলে শ্রীরামানুজাচার্য জগতের ও জীবনের মিথ্যাত্ব অপ্রতিপাদন করিয়াছেন।

(ক) 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্'। (শ্বেত: উ: ৪।১০)

[প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ জানিবে]

এই মন্ত্রবাক্য বুঝাইতেছে যে মায়াশক্তি ব্রহ্মের প্রকৃতি এবং তিনি মায়াশক্তিযুক্ত।

(খ) রজতে শুক্তিভ্রম দ্বারা বহুত্ব যে কল্পিত, বুঝান হয়। এখানে শুক্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং জ্ঞানহিসাবে সত্য। শুক্তিজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইলেও রজতজ্ঞান থাকাকালীন উহাকে অস্বীকার করা যায় না। তেমনি 'বহুত্ব'-জ্ঞান ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান এবং উহা 'শশবিষাণবৎ' অলীক নহে। বহুত্বের অর্থ, 'ক্রিয়াকারিত্ব' আছে। তবে বলা যায় এই জ্ঞান আংশিক। এই জন্যই 'মায়াবাদ'বাচ্য। 'বহুত্বকে' 'একের' সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া জানাই 'পূর্ণজ্ঞান'। ইহা হইলে সেই আংশিক জ্ঞান বাধিত হয় মাত্র। বহুত্ব অলীক স্বপ্নবৎ মিথ্যা হয় না। তখন এই অনুভূতি হয়—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

ব্রহ্মকে বাদ দিয়া জগতের তথা বহুত্বের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করাকেই 'ভ্রমজ্ঞান' বলা হয়। 'ভ্রমজ্ঞান' অর্থ স্বপ্নবৎ অলীক নহে।

(ক্রমশঃ)

পৃথিবীর হে ঠাকুর!

কাব্যশ্রী পূর্ণেন্দু গুহরায়

পৃথিবীর প্রয়োজনে জেগে
প্রত্যাশার সতৃষ্ণ প্রহরে,
মরণে জীবন এলে দিতে
নবোষার দীপবর্তি করে।
সূক্ষ্ম এক ক্রান্তি-বিন্দু 'পর
প্রকম্পিতা পৃথ্বী থর-থর,
চৌদিকে দ্বান্দ্বিক জড়বাদ,
লালসার লাভার প্লাবন,
লোভের ললিত ইন্দ্রজাল,
হিংসার জান্তব নাচন।
মুহূর্তের অবহেলা, ভ্রম,
স্থৈর্যের বিন্দু ব্যতিক্রম,
দৃষ্টির ক্ষণ অসংযম,
চাঞ্চল্যের নিমেষ আরোপ,
অমনি সে অস্তিত্বের
অবধার্য চির অবলোপ।
দুর্যোগেরে স্তব্ধতায় ভরি',
স্তব্ধতারে তরঙ্গিত করি',
অনাগত আয়ুষ্মান্ দিন
সম্ভাবনা করি' স্বতোচ্ছল,
হে ঠাকুর, জ্যোতির্ময় রূপে
পৃথ্বী-পটে হইলে প্রোজ্জ্বল।
পৃথিবীর যত কিছু ব্যথা,
হৃদয়ের আর্তি বিরূপতা
স্পর্শে হ'ল চন্দনিত ধূপ,
আশ্বাস-এষণা হয়ে অভীপ্সিত
নবলগ্নে নিল নব রূপ।

লৌকিকে শরীরী তুমি,
অলৌকিকে জীবন-মৌসুমী,
পৃথ্বীর জীবন-পাত্রে
প্রেমের ক্ষমারে ঢালি',
দিলে স্বাস্থ্য, দিলে শান্তি বল
অশুচিতা হেলায় প্রক্ষালি'।
হর্ষে, হাস্যে তুলিলে কুসুমি'
পাদোদকে দিয়া পুণ্য স্নান;
পৃথিবীর প্রাণ তাই তুমি,
তাই ঋণী পৃথিবীর প্রাণ।
শংকাহরণ মৃত্যু-তরণ
পৃথিবীর হে ঠাকুর!
সত্যের সৌন্দর্যে তুমি কর ভরপুর
পৃথ্বীর হৃদয়,
'মৃত্যোর্মামৃতং গময়' এ মহাপ্রার্থনা
পূর্ণ হোক চরাচরময়।

ওঙ্কার

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ধ্যানানন্দ

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে[১৬] আছে :

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ২।৮

বিদ্বান্ ব্যক্তি মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষ সমুন্নত ক'রে, শরীরকে ঋজু রেখে, ইন্দ্রিয়সমূহকে মনোবলে হৃদয়ে সংযত ক'রে, ওঙ্কাররূপী ভেলার সাহায্যে সংসারের ভয়াবহ সমস্ত স্রোত অতিক্রম করেন।

ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উক্তি প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ বহু উপনিষদেই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আর বেশী উদ্ধৃতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অতএব উপনিষৎ থেকে আমরা এখন গীতাদি শাস্ত্রে প্রবেশ করছি।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে নিজেকে সর্ববস্তুর সার ব'লে বর্ণনা করছেন, সেখানে আছে—"প্রণবঃ সর্ববেদেষু" (৭।৮) অর্থাৎ সর্ববেদের সার হচ্ছে ওঙ্কার এবং আমিই সেই ওঙ্কাররূপী। দশম অধ্যায়ে, বিভূতিযোগে ঐ একই কথা বলেছেন—"গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্" (১০।২৫)—শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর ওঙ্কার অর্থাৎ ওঙ্কার আমারই বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। নবম অধ্যায়েও বলেছেন—'আমি ওঙ্কার' (৯।১৭)। অষ্টম অধ্যায়ে তিনটি শ্লোকে (৮।১১-১৩) শ্রীভগবান যোগীদের ওঙ্কার-উপাসনা ও ওঙ্কার-সহায়ে স্বচ্ছন্দ-তনুত্যাগের প্রসঙ্গে ওঙ্কারমাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। 'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি' (৮।১১) ইত্যাদি শ্লোকটি পূর্বে আলোচিত কঠোপনিষদের 'সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' (১।২।১৫) ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত তুলনীয়। সপ্তদশ অধ্যায়ে ত্র্যবয়ব বৈদিক মন্ত্র 'ওঁ তৎ সৎ'-এর উল্লেখ করেছেন (১৭।২৩) এবং বলেছেন যে, শাস্ত্রীয় যজ্ঞ, দান, তপঃ আদি সমস্ত ক্রিয়া ওঙ্কার উচ্চারণ করেই বেদজ্ঞগণ শুরু করে থাকেন।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে ওঙ্কারকে ঈশ্বরের বাচক বলা হয়েছে : 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' (১।২৭) এবং সমাধিলাভের জন্য ওঙ্কারের জপ ও অর্থভাবনা করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে : 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্' (১।২৮)। অর্থভাবনাসহ ওঙ্কারজপের ফল হচ্ছে যোগবিঘ্নসমূহের নাশ ও অন্তর্দৃষ্টিলাভ : 'ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ' (১।২৯)।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন : 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা' (১।২৩)—অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও সমাধিলাভ হয়। ঈশ্বরের নাম, ওঙ্কার-জপের দ্বারাই ভক্তি হয়, অন্তরায়সমূহ দূর হয় এবং সমাধিলাভ হয়ে থাকে।

ওঙ্কারের মাত্রাত্রয়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমরা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ঈশ্বরের উল্লেখ করেছি। পতঞ্জলি ঐ ভাবে অকার, উকার ও মকারের বিশ্লেষণ করেননি। তিনি ঈশ্বরকে অন্য পন্থায় উপস্থাপিত করেছেন—ব্যাসের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্র[১৭] দিয়ে নয়, অথবা 'রসো বৈ সঃ'[১৮]—

১৬ স্বামী গম্ভীরানন্দ : উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী ১।২৭৫

১৭ ব্রহ্মসূত্র ১।১।২

১৮ তৈত্তিরীয় উপ. ২।৭

রসস্বরূপের দিক থেকে নয়। তাঁর ঈশ্বর হচ্ছেন আদিগুরু, কালাতীত,[১৯] নিরতিশয় সর্বজ্ঞ[২০] (সিদ্ধ যোগীরাও সর্বজ্ঞ হ'ন, কিন্তু তাঁদের সর্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বের সমান নয়) এবং জীব যেমন পঞ্চবিধ ক্লেশ, সুখদুঃখাদি কর্মফল ও কর্মসংস্কারের দ্বারা যুক্ত, ঈশ্বরে সে সকলের নামগন্ধও নেই।[২১] ওঙ্কারের অর্থভাবনা মানে ওঙ্কারবাচ্য, এইরূপ গুণাবলী-যুক্ত ঈশ্বরকেই চিন্তা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নেই।'[২২] এখানে যে সমাধির কথা বলা হয়েছে, সেটি বেদান্তোক্ত নির্বিকল্প সমাধি। ওঙ্কারের সাহায্যে এই নির্বিকল্প সমাধি কি ভাবে হতে পারে তা পঞ্চদশীকার জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন—গুরু ও শাস্ত্র থেকে তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁর পরোক্ষ জ্ঞান হয়েছে, এবং যাঁর মনও কামক্রোধাদিদোষশূন্য হয়েছে, তাঁর বাকী থাকে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির করা, বৃত্তিশূন্য করা। এটি করতে হলে তাঁকে একান্তবাস করতে হবে এবং 'দীর্ঘপ্রণব' উচ্চারণ করতে হবে। দীর্ঘপ্রণবের অর্থে প্রসিদ্ধ টীকাকার রামকৃষ্ণ লিখেছেন যে, ৬ থেকে ১২ মাত্রা বা তারও বেশী সময় একবার ওঁ উচ্চারণ করতে লাগবে। একটি মাত্রাকে মোটামুটি ৬ সেকেণ্ড ধরা যেতে পারে। সুতরাং ৩৬ থেকে ৭২ সেকেণ্ড অথবা সম্ভব হলে তারও বেশী সময় নিয়ে এক একটি প্রণব উচ্চারণ করতে হবে। এইভাবে 'বিলম্বিত লয়ে' ওঙ্কার অভ্যাস করলে পূর্বোক্ত অধিকারী সাধক নির্বিকল্প সমাধিলাভ করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, শুধু বই থেকে পড়ে এই সাধন সম্ভব নয়। ওঙ্কার উচ্চারণের ফল যে কত ব্যাপক, কত সুদূর-প্রসারী হতে পারে, শুধু সেটি বলবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। পঞ্চদশীর শ্লোকটি এই :

বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা।
দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে॥

৪।৬৩[২৩]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় আমরা ওঙ্কার সম্বন্ধে বেশ কিছু নূতন আলোক পাই :

১) "সেই বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনি নানারূপ ধরে অবতীর্ণ হয়ে কাজ করছেন। সেই ওঁ হতে 'ওঁ শিব', 'ওঁ কালী' 'ওঁ কৃষ্ণ' হয়েছেন। নিমন্ত্রণে কর্তা একটি ছোট ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন—তার কত আদর। কেন না সে অমুকের দৌহিত্র কি পৌত্র।"[২৪]

এখানে ওঙ্কার-প্রতীক নির্গুণ-ব্রহ্ম যে ওঙ্কার-প্রতীক সগুণ-ব্রহ্মের 'প্রতিষ্ঠা' তাই বলা হয়েছে। এই কথাগুলির বিষয়বস্তু আমরা অবশ্য পূর্বেই আলোচনা করেছি—গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকের শঙ্করের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ভাষা ও উপমার গুণে এই দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বও কতই না হৃদয়গ্রাহী ও সুখ-বোধ্য হয়ে উঠেছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে উক্ত, ওঙ্কার-প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত, পঞ্চদশীকারের

১৯ পাতঞ্জল যোগদর্শন ১।২৬
২০ ঐ ১।২৫
২১ ঐ ১।২৪
২২ কথামৃত ১।২।৪

২৩ বিভিন্ন সংস্করণে শ্লোকসংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। আমরা দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা নিয়েছি।

২৪ কথামৃত, ৫।১৩।১

'প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নিগুর্ণা এব বেদগাঃ' শ্লোকটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

২) "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং—ট—অ—ম্। যোগী নাদ ভেদ ক'রে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্মত্যাগ হয়।"[২৫]

৩) "এই মায়া জীব জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যেতে পৌঁছান যায়। নাদভেদ হলে তবে সমাধি হয়। ওঙ্কার সাধন করতে করতে নাদভেদ হয় আর সমাধি হয়।"[২৬]

৪) "অনাহত শব্দ সর্বদাই এমনি হচ্ছে। প্রণবের ধ্বনি পরব্রহ্ম থেকে আসছে, যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।"[২৭]

৫) "ওঙ্কারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বলো অকার উকার মকার। ...আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট—অ—অ—ম, —ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়লো আর ঢেউ আরম্ভ হ'ল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ'ল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হ'ল। নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা, আবার লীলা ধ'রে ধ'রে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নেই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর ঐতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।"[২৮]

আগে মানুষ ওঙ্কারধ্বনি শুনেছে—নাদ ভেদ ক'রে সমাধিস্থ হয়েছে, পরে ওঙ্কারের ৩ মাত্রা, ৩½ মাত্রা, ৪ মাত্রা, ৮ মাত্রা, ১২ মাত্রা, ১৬ মাত্রা ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আগে ভূধর, সাগর, দেশ-দেশান্তর সৃষ্টি হয়েছে, পরে মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে। আগে ঘটনা ঘটেছে, পরে ইতিহাস রচিত হয়েছে। আগে মানুষ গান গেয়েছে, পরে স্বরলিপি হয়েছে। আগে মানুষ কথা কয়েছে, পরে ব্যাকরণ হয়েছে। সেই আড়াই হাজার বছর আগে পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখলেন, আজও তা' সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্ব-মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে। খুবই আশ্চর্য লাগে! কিন্তু ভাষা তার চেয়েও অদ্ভুত নয় কি? পাণিনিকে বোঝাবার জন্য ও প্রয়োজন-মত শোধরাবার জন্য কাত্যায়ন-প্রমুখ বার্ত্তিক-কারেরা বার্ত্তিক লিখলেন। কিন্তু তা'তেও কুলোচ্ছে না দেখে, তাতেও ভাষার সবটা ব্যাকরণের আইনে পড়েছে না দেখে পতঞ্জলি মহাভাষ্য লিখলেন—চেষ্টা করলেন যাতে গতিশীল ভাষার সমস্ত প্রয়োগ যথাসম্ভব ব্যাকরণের আওতায় আনা যায়। তা'হলে

২৫ কথামৃত, ১।১১।২

২৬ ঐ ৩।৪।২

২৭ ঐ ২।১৩।১

২৮ কথামৃত, ১।১৩।৬

কোন্‌টা বড়—ভাষা না ব্যাকরণ?

আমরা দেখছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অকার, উকার, মকারাদি ব্যাখ্যাকে তত আমল দিচ্ছেন না, আক্ষেপ ক'রে বলছেন—'তোমরা কেবল বলো অকার উকার মকার।...আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এইসব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নেই' ইত্যাদি!

ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু শুধু ব্যাকরণ পড়ে কেউ ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে না। ভাষা শিখলে ব্যাকরণ একধারে পড়ে থাকে। স্বরলিপির উপযোগিতা আছে, কিন্তু শুধু তা দিয়ে সঙ্গীত শেখা যায় না—ওস্তাদের কাছে যেতে হয়। সঙ্গীত শিখলে স্বরলিপি একধারে পড়ে থাকে। মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু দেশ-দেশান্তর ঘুরে এলে, মানচিত্রটা একধারে পড়েই থাকে। বেদ-বেদান্তে লেখা ব্যাখ্যা পড়ে ওঙ্কারতত্ত্ব বোঝা যায় না -সমাধিমান পুরুষের কাছে যেতে হয়, যোগ্য অধিকারী হ'য়ে। সমাধি হলে, সব ব্যাখ্যা একধারে পড়ে থাকে—যাবান্ অর্থঃ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে, তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।[২৯] সর্বত্র জলে জলময় হ'লে ডোবার জলের আর দরকার হয় না; ব্রহ্মকে জেনে তিনি ব্রাহ্মণ হয়েছেন, সমস্ত বেদবেদান্তে তাঁর কোন প্রয়োজন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'তাঁকে যখন লাভ হয়, বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র—কত নীচে পড়ে থাকে! ওঁ উচ্চারণ করবার জো নাই। —এটি কেন হয়? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ উচ্চারণ করতে পারি না।'[৩০] নিজের অনুভূতি সম্বন্ধে বলেছেন—'এখানকার অনুভূতি বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।'[৩১] তাই তাঁরই বাণীর আলোকে বেদবেদান্ত বুঝতে হয়।

সমাধির পর 'হিসাব পচে যায়।'[৩২]। 'গুণতে গেলে ১-৭-৮ এই রকম গণনা হয়'।[৩৩] ওঙ্কারের অমন যে সুন্দর বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা স্বামীজী দিলেন, তারও গুরুত্ব তিনি নিজেই কমিয়ে দিয়েছেন—'আনুমানিক গবেষণা'[৩৪] ব'লে। এর কারণ কি?

কারণ আর কিছুই নয়, ওঙ্কারের যথার্থ স্বরূপ সমাধির অনুলোম ও বিলোম মার্গে, স্বামীজী দিবালোকবৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য সাধককে সমাধিসহায়ে অনুভূতি করতে প্ররোচিত করা মাত্র। তাই ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থিত রূপ নেই। কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই যে, একটি ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা, অন্য-গুলি কিছু নয়, বা আর নূতন ব্যাখ্যা হতে পারে না। যার যেটা মনে ধরে, তার জন্য সেই ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যার চরম সার্থকতা অপরোক্ষ অনুভূতিতে।

"গাই গীত শুনাতে তোমায়"—কবিতাটিতে স্বামীজী লিখেছেন:

আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার,
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্যপথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু।[৩৫]

---

২৯ গীতা, ২।৪৬

৩০ কথামৃত, ৪।২০।৬

৩১ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ২ ও মূলগ্রন্থ পৃঃ ৫১

৩২, ৩৩ কথামৃত, ১।১৬।৩

৩৪ বাণী ও রচনা, ১।৩১৮

৩৫ বাণী ও রচনা, ৬,২৬৬

এই কবিতাটি শুধুই কাব্যরসের নির্ঝর নয়। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় লব্ধ, স্বীয় সমাধির কথা উদ্ধৃতাংশের একটু আগেই স্বামীজী পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন :

সর্ববৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়
কোটি সূর্য অতীত প্রকাশ
চিৎসূর্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান।[৩৬]

সুতরাং সমাধি থেকে অবতরণপথে ঐ আদিবাণী ওঙ্কারের কথা তিনি যে স্বানুভূত প্রজ্ঞাসহায়েই বলেছেন, তা' সহজেই বোঝা যায়।

নিজের এই অনুভূতি থেকেই স্বামীজী তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে একদিন বলেছিলেন :

সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়—জগৎটা শব্দময়, তারপর গভীর ওঙ্কারধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়। তারপর তা'ও শুনা যায় না। তা'ও আছে কি নেই—এরূপ বোধ হয়। ঐটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যক্‌ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। ···অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন 'আমি আমার' রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হয়ে ওঙ্কার অনুভব করেন, ওঙ্কার থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তারপর সর্বশেষে স্থূল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকেরা কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপে নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে, পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে—সেখানে আর নামতে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়—'ক্ষীরে নীরবৎ'।"[৩৭]

সমাধি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের স্বাধিকারভুক্ত সম্পত্তি নয়। পৃথিবীর যে-কোন দেশের, যে-কোন জাতির, যে-কোন ধর্মের মানুষ সমাধিলাভ করতে পারেন এবং সমাধিমার্গে ওঙ্কারধ্বনি নিশ্চয়ই তাঁর শ্রুতিগোচর হবে। সুতরাং 'ওঁ' এই শব্দটি সকল ধর্মেই ঈশ্বরের সার্বজনীন বাচকরূপে গৃহীত হতে পারে। এইখানেই ওঙ্কারের বিশেষ উপযোগিতা। দ্বেষ, দর্প, হিংসা ও কলহে উন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম আনতে হ'লে বিভিন্ন ধর্মসমূহের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান ও কথা-কাহিনীর অন্তরালে যে শাশ্বত অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান রয়েছে সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে ভারতবর্ষকেই এই ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে, কারণ এদেশ আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি। এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের প্রচারে ও অনুশীলনে ওঙ্কারতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, সন্দেহ নেই। স্বামীজী বলেছেন :

"ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মভাব আছে, সব এই ওঙ্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমূহ এই ওঙ্কারকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের কি সম্বন্ধ? ইহার সহজ উত্তর এই—সর্বদেশে এই ওঙ্কারের ব্যবহার চলিতে পারে; তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন ধর্মভাবের বিকাশ হইয়াছে, ওঙ্কার তাহার প্রত্যেক সোপানেই

৩৬ ঐ ৬।২৭৪

৩৭ বাণী ও রচনা, ৯।৪২-৪৩

পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী, ভেদাভেদবাদী, এমন কি নাস্তিকগণ পর্যন্ত তাঁহাদের উচ্চতম আদর্শ-প্রকাশের জন্য এই 'ওঙ্কার' অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন এই ওঙ্কার মানবজাতির অধিকাংশের ধর্মভাব-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সকল দেশের সকল জাতিই উহা অবলম্বন করিতে পারেন। ইংরেজী 'গড্' (God) শব্দ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। যদি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব ঐ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে—যেমন সগুণ (Personal), নির্গুণ (Impersonal), পূর্ণ বা পরম (Absolute) ইত্যাদি। অন্য সব ভাষায় ঈশ্বর-বাচক যে-সকল শব্দ আছে, সে সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; ঐগুলির অতি অল্প ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু 'ওঁ'-শব্দে উক্ত সর্বপ্রকার ভাবই রহিয়াছে। অতএব উহা প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত।"[৩৮]

---

৩৮ বাণী ও রচনা, ১।৩১৮-১৯

প্রার্থনা নীরবে জাগে

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

প্রার্থনা নীরবে জাগে
অন্তরের নীড় হ'তে আকাশের মুক্ত বিস্তৃতিতে—
জীবনের কাছ থেকে গভীর কথাটি ছড়াইতে,
অনন্তের বাতায়নে কে যেন রয়েছে মনে ক'রে :
কে আছে? সে কোন্ সত্য? মানুষ সে জেনেছে অন্তরে!

কারণ মানুষ পৃথিবীতে
অনেকের মাঝে থেকে একান্ত একাকী :
মন তার বহুদূরে টলে যায় কেন থাকি থাকি
নিজেই বোঝে না কিছু তার ;
নীলের স্ফটিক ভেঙে ধ্বনি ওঠে তাই বারবার।

ধূপের নম্রতা জাগে আত্ম-নিবেদনে :
যেই শান্তি ধ্যানের গহনে ;—
সেখানে সে খুঁজে পেতে চায়
অতল রহস্যময় কোন্ গূঢ় জীবনের মানে।

জননী কুন্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী জয়ন্তী সিংহ

সঞ্জয়ের উপাখ্যান অবলম্বনে কুন্তীদেবীর কি সুন্দর শিক্ষাদানের ভঙ্গী! 'এরূপ কর' কিংবা 'এরূপ করা অনুচিত'—কেবলমাত্র এটুকু বলেই শেষ করার পরিবর্তে সরস গল্পের মাধ্যমে নিজের বক্তব্যকে এত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করেছেন যে, তা হৃদয়ঙ্গম করতে কোনো ব্যক্তিরই বিলম্ব হয় না, আজ আমরা শিক্ষাদানের নানাবিধ উপায়ের কথা চিন্তা করছি, দেশে-বিদেশে সর্বত্র কত নূতন নূতন শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, কত শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ফল কি আমরা লাভ করতে পারছি? আদর্শচরিত্র, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত সুনাগরিকের আজ একান্ত অভাব। হায়! আলেয়ার পিছনে না ঘুরে, নানাদেশের অন্ধ অনুকরণ করবার চেষ্টায় বৃথা কালক্ষেপ না করে যদি আমরা একবার ভারতের সনাতন আদর্শ ও ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদান-পদ্ধতির কণামাত্রও অনুসরণ করতাম, তাহলে হয়তো সত্যই সে শিক্ষা সুফলপ্রসূ হতো—ভারত তার সন্তান-সন্ততির জন্য গর্ববোধ করতো, আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারতো।

প্রখরবাস্তবজ্ঞানসম্পন্না, দূরদর্শিনী, বুদ্ধিমতী কুন্তীদেবী অসামান্য আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। সংসারে থেকে সুচারুরূপে সংসার-জীবনের সকল কর্তব্য সম্পন্ন করলেও সংসার তাঁকে বদ্ধ করতে পারেনি। গৃহীর ছদ্মবেশে পরম যোগী ছিলেন তিনি। লোভ-ক্রোধ-মোহাদি ষড়-রিপুর প্রাবল্য তাঁর জীবনে কখনও দেখা যায়-নি,—তাঁর মতো ভক্তিপরায়ণা ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পিতজীবন রমণী জগতে দুর্লভ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন। সমগ্র কুরু-রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর তিনি। দুর্জন-বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনরূপ আরব্ধ কর্মসমাপনান্তে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করলেন। সম্পর্কে তিনি কুন্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র—রীতি অনুযায়ী যাত্রার পূর্বে তাই প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিতে এলেন পিতৃষ্বসার কাছে। কুন্তীদেবী কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ ভেবে ভুল করলেন না, স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে সম্বোধন করলেন না তাঁকে।

প্রয়াণাভিমুখ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত: পরমপুরুষ, স্বয়ং ভগবান, এ পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করে তাঁর বন্দনা করলেন, বললেন—

"নমস্যে পুরুষন্ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্॥

১।৮।১৮

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা॥

১।৮।১৯

* * *

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ॥

১।৮।২৭

অর্থাৎ 'হে ভগবান, প্রকৃতির অতীত, সর্বনিয়ন্তা, সকল প্রাণীর অন্তর ও বাহিরে স্থিত

তথাপি সকলের অলক্ষ্য ও দুজ্ঞের্য় তোমাকে আমি প্রণাম করি। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ারূপ যবনিকার দ্বারা তুমি আবৃত হও না, তুমি ইন্দ্রিয়জ্ঞানবেদ্যও নহ। অভিনেতা নটকে যেমন অনভিজ্ঞ দর্শকবৃন্দ জানিতে পারে না, তেমনি মায়াবদ্ধ অজ্ঞান জীবও তোমাকে জানিতে পারে না।······ভক্তগণই যাঁহার সম্পদ, সত্ত্বরজাদি গুণ হইতে যিনি মুক্ত, পূর্ণানন্দস্বরূপ, শান্তমূর্তি, মুক্তিপ্রদাতা তোমাকে নমস্কার করি।' (শ্রীমদ্ভাগবত-১ম স্কন্ধ)

নররূপধারী নররূপে লীলাকারী নারায়ণের মায়ায় অভিভূত না হয়ে, নরদেহধারণকালেই তাঁর স্বরূপ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা কি সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব? বেশী দিনের কথা নয়—মাত্র একশতাব্দী পূর্বে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু তিনি নরদেহে থাকাকালে ঐশীশক্তির অধিকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া আর কে তাঁকে চিনেছিলো? তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ তো দূরের কথা বরং তাঁকে বিদ্রূপ করতে অবজ্ঞা করতেও বাধেনি লোকের, 'পাগলা বামুন', 'কালীবাড়ীর পূজারী'—এমন কি 'ভণ্ড' নামেও অভিহিত করেছেন অনেকে। তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাদ যাননি।

কুন্তীর সমগ্র স্তবটি এই স্বল্প পরিসরে উদ্ধৃত বা আলোচনা করা সম্ভব নয়—কিন্তু উদ্ধৃত সামান্য অংশটুকুও অনুধাবন করলে স্তবের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি, প্রতিটি শব্দে পাই জননী বা রাজরাণী কুন্তীর নয়, গার্গী-উপালা-মৈত্রেয়ী-উভয়ভারতীর ন্যায় মহাজ্ঞানী তত্ত্বদর্শিনী দেবী কুন্তীর অপূর্ব পরিচয়।

অনবদ্য তাঁর এই স্তবটি! যিনি সারাজীবন অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, বহু বাধাবিঘ্ন-বিপদকে পরাভূত করে জীবন-সায়াহ্নে চরম পার্থিব সুখের অধিকারিণী হয়েছেন, সেই কুন্তীদেবীই অকম্পিত কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন—

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥ ১।৮।২৫

—'হে জগৎগুরু, যে বিপদ উপস্থিত হইলে পুনর্জন্মনিবারক তোমার দর্শনলাভ হইয়া থাকে, সেই সকল বিপদ আমার জন্মে জন্মে নিত্যই হউক' (শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ)। দুঃখ-বিপদের স্বাদ তাঁর অজানা তো নয়ই, বরং বলা চলে সারাটি জীবন দুঃখের অগ্নিতাপে দগ্ধ হয়েছেন তিনি, তবু এতটুকু দ্বিধা নেই তাঁর মনে—ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে, 'অকিঞ্চনগোচরের' জন্য নিঃস্ব হতে তিনি সদাপ্রস্তুত।

ভগবানের দর্শন লাভ করতে কে না চায়? ভগবানলাভ বা মুক্তি আমাদের পরম কাম্য বটে, কিন্তু তাঁর মতো এমন করে অকুতোভয়ে দুঃখবিপদকে আহ্বান করার সাহস কি আমাদের আছে? বরং 'বিপদে মোরে রক্ষা কর'—এই প্রার্থনাই করি আমরা। বর্তমান যুগের আচার্য স্বামী বিবেকানন্দও আমাদের এই কথাটিই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন—'সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, / কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

যোগী মুনি-ঋষি-তাপসদের একান্ত কাম্য—অনন্যচিত্তে ভগবদ্-ভজনা করা, বাসনাশূন্য হওয়া; কেননা বাসনাই বন্ধন, বাসনাই মনকে ভগবদ্‌বিমুখী করে, সংসারাসক্ত করে। দেবী কুন্তীর স্তবেও তাই দেখি আকুল প্রার্থনা—

"অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্তে স্বকেষু মে
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু॥ ১।৮।৪১
ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।

রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥ ১।৮।৪২

—অর্থাৎ হে সর্বেশ্বর, হে বিশ্বাত্মন্, হে বিশ্বমূর্তে, আত্মীয় যাদব ও পাণ্ডবগণের প্রতি আমার স্নেহবন্ধন ছিন্ন কর। হে মধুপতি! ভাগীরথী যেমন স্বীয় প্রবাহকে অবিচ্ছিন্ন গতিতে সমুদ্রে প্রেরণ করেন, আমার মতিও সেইরূপ অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনুক্ষণ তোমাতে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ-প্রবাহ বর্ধন করুক। (শ্রীমদ্ভাগবত-১ম স্কন্ধ)

এমন ভক্তিমতী, পরমজ্ঞানী, আন্তরসম্পদে সম্পদশালিনী ছিলেন বলেই রাজমাতা কুন্তী আজীবন দুঃখভোগের পর পার্থিব সুখের চরম অবস্থায় উপনীত হয়েও সর্বসম্পদ, সকল ভোগ-বিলাস, এমন কি মাতৃভক্ত মহাবীর পরম স্নেহাস্পদ পঞ্চপুত্রের শত অনুরোধ তুচ্ছ করে—সর্বমমত্ববন্ধন ছিন্ন করে—স্বেচ্ছায় প্রসন্নচিত্তে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে পেরেছিলেন,—(জীবনসায়াহ্নে যোগিজনকাম্য সমাধিযোগে দেহত্যাগের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর) মহামায়ার মায়া তাঁকে মোহিত করতে পারেনি।

অনন্যসাধারণ চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন বলেই মহাকাব্য মহাভারতের বিষয়সূচী-প্রসঙ্গে দেবী কুন্তীর কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের মুখে শুনি—

"বিস্তারং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্মশীলতাম্।
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যা সম্যগ্দ্বৈপায়নোব্রবীৎ ॥
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাং চ সত্ততাম।
দুর্বৃত্তং ধার্তরাষ্ট্রাণামুক্তবান্ ভগবান্ ঋষিঃ ॥"

—মহাভারতের কথা রচনা করেছেন দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। এতে বর্ণিত হয়েছে কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্যের কথা। সেই মহান ঋষি আরও বর্ণনা করেছেন বাসুদেবের মহিমা, পাণ্ডবদের সততা, ধার্তরাষ্ট্রগণের দুষ্কার্যকথা।

অবশ্য 'ধৈর্য' কুন্তী-চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে এক্ষেত্রে বিশেষ করে উল্লিখিত হলেও এইটিই তাঁর একমাত্র গুণ বলে মনে করলে যে গুরুতর ভুল করা হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সবদিকে যিনি ছিলেন রমণীকুলের আদর্শ—কেবল ভারত-বাসীর নয়,বিশ্ববাসীর চিরনমস্যা—মহাভারতের সেই মহীয়সী নারী দেবী কুন্তীর চরণে জানাই আমাদের শ্রদ্ধাবিনম্র প্রণতি; প্রার্থনা করি তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের নারী আবার ভবিষ্যৎ ভারত-ইতিহাসের গৌরব উজ্জ্বল করে তুলুক, বিস্মৃত অতীত লাভ করুক নতুন মর্যাদা।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

ইতিহাস যে সমাজ-বিজ্ঞানের উপকরণ-রূপেই সার্থকতর সে বিষয়ে স্পেন্সার[১] ও স্বামী বিবেকানন্দ মূলতঃ একমত। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, জাতীয় গৌরববোধের ক্ষেত্রে ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য কতখানি?

আজকাল সর্বত্রই 'জনসাধারণ' বা 'গণচেতনা' শব্দটি বহুলশ্রুত। জনগণের মন বলে যে বিশেষ একটি ভাবমূর্তি আমরা মনে মনে এঁকে থাকি, সে মন নিজে কিছু চিন্তা করে কি? অনেক লোকের একমত হলেই তা যে গ্রহণীয় বা প্রামাণ্য তা কখনোই হতে পারে না। সমাজের একদিকে গণচেতনা আর একদিকে প্রতিভাবানদের ক্রান্তদর্শী পথনির্দেশনা—এ দুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ই সমাজ, জাতি বা দেশকে সংগঠিত করে।

এ বিষয়ে সবচেয়ে কাছের দিনের উদাহরণ সদ্য-লোকান্তরিত ফরাসী গণনায়ক চার্লস দ্য গ্যল। ফরাসীরা অনেকটা বাঙালীর মতো স্বপ্ন-প্রধান, কল্পনাপ্রিয় এবং ভাবলোক-চারী। ফ্রান্সের ইতিহাসে একাধিকবার এই অসংবদ্ধ গণচেতনাকে একতাবদ্ধ করতে বিশেষ কোনো প্রতিভাশালী নায়কের প্রয়োজন হয়েছে। স্বৈরতন্ত্র যেমন কাম্য নয়, স্বেচ্ছাতন্ত্রও তেমনি পরিহার্য। ফ্রান্সের ইতিহাসে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্বপ্ন বারবার স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিপরীত মেরুর আকর্ষণে দোলায়িত। কিন্তু নেপোলিয়ন বা দ্য গল ফরাসীজাতির অন্তর্লোকে সেই ঐতিহাসিক গৌরববোধ জাগাতে পেরেছিলেন, যার বলে পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসীজাতির অগ্রগামিতা আজও শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য।

সমকালীন বাংলাদেশে যাঁরা বামপন্থী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা ইতিহাসকে জনগণের সংগ্রামরূপে দেখতে চান। এক হিসাবে, বিভিন্ন যুগের ইতিহাসে অতীতের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বর্তমানের বঞ্চিতদের সংগ্রাম চিরকালই রয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অথবা বর্তমান ভারতের ইতিহাসে বৈশ্য-শূদ্রের সংগ্রামে তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু বঞ্চিত নিপীড়িত জনসাধারণের জীবনাদর্শও নিশ্চয় কোনো মহৎ ভাবের পটভূমিকায় গড়ে উঠবে। শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম—এ সবের শ্রেষ্ঠ ফল তাদের জীবনে সঞ্চারিত হলে, তবেই না সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভবপর! অতীত ইতিহাসের সমস্ত ধারাটিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর জনগণ আপনা আপনি এক মহৎ সভ্যতা সৃষ্টি করে ফেলবেন—এমন আজগবী ধারণা কোনো যথার্থ বিপ্লবীর মনে ঠাঁই পেতে পারে না। কিন্তু এদেশে তা অনায়াসে সম্ভব। দেড়শো বছর আগে হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলের (নব্য বঙ্গ) দল পাশ্চাত্য সভ্যতার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ইংল্যাণ্ডের নকল করে সভ্যতার ধ্বজাধারী হতে চাইতেন, আর স্বাধীন ভারতবর্ষের তথাকথিত বামপন্থী

---

[১] "...the highest office which the historian can discharge, is that to the lives of nations, as to furnish materials for a Comparative Sociology : Education : Spenser : 1st Edn. p36.

তরুণ পাশ্চাত্য সভ্যতার আর এক ভগ্নাংশ সাম্যবাদাদের অনুকরণে দেশকে ঢেলে সাজতে চেয়ে যা কিছু এদেশের পবিত্র শ্রদ্ধেয় গৌরবজনক স্মৃতি, তাই ধ্বংস করতে উদ্যত। বলা বাহুল্য, কালাপাহাড় একদিন থামতে বাধ্য হয়েছিলেন, এরাও থামবে—কিন্তু জাতীয় ইতিহাসে অনুকরণবৃত্তির সবচেয়ে লজ্জাজনক উদাহরণ কোনো দিন মুছে যাবে না।

সাম্প্রতিক কালের তরুণমানসে এই মনোবৃত্তির সামাজিক কারণ অনুসন্ধান করলে ইতিহাস-চেতনার একটি মূলসূত্র ধরা পড়ে। প্রত্যেক দেশ, জাতি ও সমাজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব—সেই জাতির সর্বসাধারণের সম্পদ। কোণারকের মন্দির বা তাজমহল যেমন সর্বভারতের গৌরবের সামগ্রী, তেমনি রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ বা মহাত্মা গান্ধী—এঁরাও সমগ্র ভারতের মহাসম্পদস্বরূপ। ব্যক্তি বা আদর্শ হিসাবে এঁদের পার্থক্য আছে, কিন্তু এঁদের মহত্ত্ব আমাদেরও মহত্ত্বের অধিকারী করেছে—এই মহত্ত্ববোধ জাতীয় ইতিহাস-চেতনার প্রধান অবলম্বন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বাঙালী-মানসে এই ইতিহাস-চেতনার কথা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরেই সবচেয়ে তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। ·যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল—অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

"কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব, বিদ্যাপতি*, মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে সার কথা কিছু আছে?"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-জিজ্ঞাসায় বাঙ্গালীর অবিস্মরণীয় কীর্তিমানদের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে সমাজের বহুকালপ্রবাহিত জীবনধারাসম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা। সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠদের বিবরণ এবং সাধারণ মানুষের জীবন-প্রবাহের উপলব্ধি—এ দুয়ের সমন্বয়েই সমগ্র ইতিহাস গড়ে উঠতে পারে। আবার অতীত ও বর্তমানের যথাযথ মিলনের উপরেই উপযুক্ত ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা।

এদিক থেকে স্পেন্সারের গণচেতনার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ মহত্ত্বের অধিকারীদের জীবন ও সাধনার ইতিহাসের সম্মিলিত আলোচনার দ্বারাই যে ইতিহাসদৃষ্টি গড়ে উঠতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' তেমন ইতিহাসেরই দৃষ্টান্ত। তাই ভারত-ইতিহাসের

* বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দিষ্ট কবি বিদ্যাপতি যে মিথিলার কবি, তা এখন সর্বস্বীকৃত কিন্তু বাংলা দেশের একাধিক কবি 'বিদ্যাপতি' নাম গ্রহণ করে অনেক ভালো ভালো পদ রচনা করে গেছেন, সেকথাও স্মরণীয়।

২ 'বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধ : বঙ্কিমরচনাবলী : ২য় খণ্ড : পৃ : ৩৩৬ [সাহিত্যসংসদ সং]

মূলপ্রবাহ ধর্মচেতনার শ্রেষ্ঠ অধিকারীদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বৈদিক যুগ থেকে সমকালীন ইংরেজ যুগ অবধি ভারত-ইতিহাস-সমীক্ষার প্রচেষ্টা স্বামীজীর 'বর্তমান ভারতে' লক্ষণীয়।

* * *

১৮৯৬-এর ১লা নভেম্বর শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী ইতিহাসের যে চারটি যুগবিভাগ করেছিলেন, তার শেষ দুটি 'বৈশ্য' ও 'শূদ্র' ('the traders and labourers')[৩]-পরিচালিত যুগ। বস্তুতঃ ইতিহাসের এই শেষ দুটি পর্বেই অভিজাত-শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা সাধারণ মানুষের হাতে চলে আসে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস মূলতঃ রাজশক্তি থেকে বৈশ্যশক্তিতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের ইতিহাস।

বৈশ্যশাসনের যুগ সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য—"এর ভিতরে শরীরনিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ। এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার। কিন্তু ঐ সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।"[৪]

পরবর্তীকালে 'বর্তমান ভারতে' এই বৈশ্যশক্তিকে তিনি ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সমীকৃত করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'[৫] — ইংরেজ শাসনে মূলপ্রকৃতিই ছিল বণিকশাসন।

"ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাটগণের ভারত-বিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর—এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"[৬]

ইংরেজশাসনের অবসানে স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজের বাণিজ্য-উত্তরাধিকারী মূলতঃ মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই সবচেয়ে লাভবান হয়ে থাকেন। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, বা এ যুগের ভারতবর্ষ তার বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ।

সমাজজীবনে বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানকে ঈষৎ নাটকীয় ভঙ্গিমায় উঁচুদরের ব্যঙ্গমিশ্রিত ভঙ্গিমায় স্বামীজী এইভাবে প্রকাশ করেছেন—"বৈশ্য বলিতেছেন, 'উন্মাদ! অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্ত শক্তিমান আমার হস্তে। দেখ, ইঁহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান্। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যা-বুদ্ধি—ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র তেজবীর্য-ইহার কৃপায় আমার অভিমত-সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু সে মধু পান করিবে কে? - আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।"[৭]

বলা বাহুল্য, শ্রমজীবী মধুকরেরা এ যুগে আর অন্যের হাতে আপন পরিশ্রমের মধুসঞ্চয় তুলে দিতে রাজী নয়। তারই ফলে স্বামীজীর ভাষায়, "শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্যের"[৮] সূচনা। (ক্রমশঃ)

---

৩ Complete Works of S. Vivekananda : Vol, VI : pp. 81-82 (Centenary Edn) দ্রষ্টব্য।

৪ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড : পৃ : ৩০১-৩০২ দ্রষ্টব্য।

৫ শিবাজী উৎসব : সঞ্চয়িতা : রবীন্দ্রনাথ

৬, ৭, ৮ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ২০১, ২০৯, ২৪১

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী জীবানন্দ

মা কে? যিনি সন্তানকে ঘিরে থাকেন কল্যাণকারিণী সমস্ত শক্তি দিয়ে, দুঃখে বিপদে যিনি তার মন প্রাণ অধিকার ক'রে থাকেন, তিনি মা। যাঁর কথা সন্তান বলতে পারে না, বলবার ভাষা পায় না, যাঁর ভালবাসা শুধু অনুভব করে, তিনি মা। প্রত্যেক শিশুর কাছে মায়ের মতন আপন জন আর কেউ নেই। জগতে অগণিত মায়ের অগণিত সন্তান। নানা দেশে নানা ভাষাভাষী অসংখ্য সন্তানের অসংখ্য জননী। সর্বদেশে সর্বকালে মায়ের আসন আপন সন্তানের হৃদয়ে নির্দিষ্ট। শুধু মানুষেরই নয়, পশুপক্ষীরও মাতৃস্নেহ বিদ্যমান। সর্বত্র মায়ের প্রতি সন্তানের দুর্বার আকর্ষণ।

শ্রীশ্রীমা কে? তিনি সকল মায়ের সমষ্টি, সব মায়ের স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে গড়া অনুপম মাতৃমূর্তি। জগতের কোটি কোটি মাতৃহৃদয়ের স্নেহকরুণাধারা যেন একটি আধারে সঞ্চিত হয়ে আবার উচ্ছ্বসিত আবেগে নির্গত হয়ে সারা বিশ্বের অজস্র সন্তানশিরে সিঞ্চিত হচ্ছে। সে স্নেহে ভালমন্দের বিচার নেই। সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত।

'তুমি কি রকম মা?'—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বয়ং বলেছিলেন, 'আমি সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা নয়, সত্য জননী।'

সমস্ত দেবতার সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ হলেন ভগবতী দুর্গা, আর সমগ্র মাতৃস্নেহের করুণা-মণ্ডিত রূপ শ্রীশ্রীমা সারদা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীকে পূজা ক'রে জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন— তিনি সাক্ষাৎ জগজ্জননী আদ্যাশক্তি। পরম-কল্যাণময়ী বিশ্বজননীরূপে তাঁর পরিচয় জগতে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্রহ্মা মহাশক্তির যে স্তব করেছেন, তাতে আছে:

"ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥"

—তুমি লক্ষ্মী, তুমি ঈশ্বরী। তুমি হ্রী, তুমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। তুমি লজ্জা, পুষ্টি এবং তুষ্টি। তুমি শান্তি ও ক্ষান্তি।

এই শ্লোকে যা বলা হয়েছে, শ্রীশ্রীমা যেন তার প্রতিচ্ছবি। শ্রীশ্রীমা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী—নারায়ণী। তিনি অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী, পরমা প্রকৃতি। অধর্মবিমুখতা-শক্তি হ্রী তাঁতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি শুদ্ধবুদ্ধিদাত্রী। তিনি লজ্জাপটাবৃতা মহাশক্তি। সর্বজীবের পোষণকারিণী পরমশান্তিরূপা শান্তিদাত্রী তিনি, ক্ষমার প্রতিমূর্তি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে শক্রাদি-কৃত দেবীস্তুতিতে বলা হয়েছে: হে দেবি! যে পরা বিদ্যা মুক্তির কারণ, দুরনুষ্ঠেয় মহাব্রত যার সাধন, সেই পরমা ব্রহ্মবিদ্যা ভগবতী তুমিই। এ জন্য জিতেন্দ্রিয় তত্ত্বনিষ্ঠ শুদ্ধচিত্ত মুমুক্ষু মুনিরা তোমারই সাধননিরত।

"যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥"

এখানে দেবী ভগবতীর যে ছবি মানসপটে ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে জননী সারদাদেবীর

ভাবগত সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। শ্রীশ্রীমা জ্ঞানদায়িনী বিদ্যাশক্তি, তাঁর কৃপাকটাক্ষে ভক্তি মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। তিনি 'জ্ঞান্ত দুর্গা'।

শ্রীশ্রীমা হচ্ছেন মানবীর রূপ ধ'রে দেবী। মানুষের মূর্তি যখন ধরেছেন, তখন মানুষের মতো কর্মও করেছেন। সে কর্ম সাধারণ কর্ম, আবার অসাধারণও! অতি সাধারণ কর্মের মধ্যেও অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে। কর্মের মধ্যে বিকশিত হয়েছে দেবী-মূর্তি। জ্ঞানে ভক্তিতে অনাসক্তিতে শরণাগতিতে মহিমময় দিব্য রূপ।

গরীব ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভাব ব'লে দরিদ্র সংসারের ছোটবড় খুঁটিনাটি সব কর্মই করতে হয়েছে শ্রীশ্রীমাকে। প্রত্যেক কর্মের মধ্যে তাঁর সেবাপরায়ণা মূর্তি। সেবার দ্বারা, নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারা যে ব্রহ্মভাব বিকশিত হয়, তা জীবনে দেখিয়েছেন। জীবনচর্যায় ধর্ম আর কর্ম আলাদা হয়ে দেখা দেয়নি, এক হয়ে গেছে। কর্ম আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনে কিভাবে সহায়ক হয়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কর্ম কেমন? তার সামান্য পরিচয়: জয়রামবাটীতে ছোটবেলায় মজুরদের জলখাবারের মুড়ি নিয়ে যেতেন। তাঁর মার সঙ্গে ক্ষেত থেকে তুলো তুলে তার থেকে পৈতা কাটতেন। মাঝে মাঝে এক-গলা জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কাটতেন। মা অসমর্থা হ'লে রাঁধতে বসতেন, কিন্তু কোমল কচি হাতে ভাতের হাঁড়ি নামাবার সামর্থ্য ছিল না, বাবা এসে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দিতেন। ভাইদের দেখাশোনা করা তাঁর একটি প্রধান কাজ ছিল। ভাইদের নিয়ে আমোদর-নদে স্নান করতে যেতেন, স্নানান্তে আবার তাদের নিয়ে ফিরে আসতেন।

স্নেহশীল মাতাপিতার ঈশ্বরপরায়ণ জীবনের সংস্পর্শ, দৈনন্দিন কর্মের ভিতরে স্বার্থত্যাগ ও সেবাবৃত্তি তাঁর অন্তর্নিহিত দিব্যভাবকে পরিস্ফুট করেছিল। শ্রীশ্রীমায়ের মা শ্যামা-সুন্দরী দেবী বলতেন, 'মা সারদা, জনমে জনমে যেন তোমার মতো কন্যারত্ন পাই।'

এরপর যখন দক্ষিণেশ্বরে, তখন সেই ছোট্ট নহবতঘরে—স্বল্পপরিসর প্রকোষ্ঠে 'বিন্দু-বাসিনী' হয়ে অবস্থান করেছেন, অপরূপ সে চিত্র! একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে। সাধারণ মানুষ জানতেও পারতো না তিনি সেখানে থাকেন। রাত তিনটে সাড়ে তিনটেই উঠে গঙ্গাস্নানাদি সেরে পূজা জপ ধ্যান, তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কী অকুণ্ঠ সেবা!

কলিকাতা শ্যামপুকুরবাটীতে ও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তিনি কি একনিষ্ঠভাবে আত্মবৎ সেবা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, তা লোকে কল্পনাও করতে পারবে না।

পরবর্তীকালে জয়রামবাটীতে তাঁর দৈনন্দিন কর্মধারা: সকালবেলা দুঘণ্টা ধ'রে শাক-তরকারি কোটা, রান্নার জন্য ভাঁড়ার বের ক'রে দেওয়া, পূজার সব যোগাড় ক'রে নিজে পূজা করা, আবার দীক্ষাদান, প্রসাদ ও জলখাবার বেঁটে দেওয়া, অন্ততঃ একশ' খিলি পান সাজা, ভক্তগণকে ও বাড়ীর লোকদের খাওয়ানো, বৈকালে নিজহাতে লুচি রুটি তরকারি প্রভৃতি করা, দুধ জ্বাল দেওয়া, লণ্ঠন পরিষ্কার করা। সবই তিনি নিত্য নূতন প্রীতির সঙ্গে ক'রে যেতেন।

কি জয়রামবাটীতে, কি কামারপুকুরে, কি উদ্বোধনে, কি অন্যান্য স্থানে সর্বত্র তাঁর প্রাণ ঢেলে কর্ম করার ছবি, তাঁর করুণা-বিগলিত মূর্তি! নিয়ত কর্মময় জীবন, কর্মযোগের মধ্য দিয়ে নৈষ্কর্ম্যলাভের অপূর্ব

নিদর্শন! 'হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত' তা সর্বাবস্থায় অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অনুভব করতেন ব'লে শ্রীশ্রীমায়ের করুণামণ্ডিত আনন্দময়ী মূর্তি সকলের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে যেত।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রার্থনা কেমন? সে প্রার্থনা শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। তার উপরে আর কোন প্রার্থনা হ'তে পারে না। তিনি প্রার্থনা করেছেন নির্বাসনা। নির্বাসনার উপর আর কোন প্রার্থনা নেই। নির্বাসনায় সর্ববন্ধন-বিমুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান, স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি। তাই নিজে প্রার্থনা ক'রে শিখিয়েছেন—যদি শরীর মন বুদ্ধি অহংকার জাতি কুল মান ইত্যাদি বন্ধনের পারে যেতে চাও, তবে আর কিছু চেয়ো না, কেবল নির্বাসনা চাও, তাহলে এইক্ষণেই পূর্ণানন্দের অধিকারী হবে।

জগন্মাতার আর একটি প্রার্থনা। তারও তুলনা নেই। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে চাঁদের দিকে চেয়ে যুক্তকরে প্রার্থনা করেছেন, 'তোমার এ জ্যোৎস্নার মতো আমায় নির্মল ক'রে দাও।' কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছেন, 'চাঁদেও কলঙ্ক আছে; হে ভগবান, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।' পরমশুদ্ধ না হ'লে কেউ এমন প্রার্থনা করতে পারে না। শ্রীশ্রীমা পবিত্রতাস্বরূপিণী, তাই স্বামী অভেদানন্দজী মাতৃস্তোত্রে প্রণতি নিবেদন করেছেন:

'পবিত্রং চরিত্রং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥'

শ্রীশ্রীমা কিভাবে তীর্থদর্শন করতেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পুরীতে জগন্নাথক্ষেত্রে তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে যাবেন। পালকি ক'রে মন্দিরে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তিনি হেঁটে যেতে চাইলেন আর বললেন, 'আমি দীনহীন কাঙালের মতো যাব আমার প্রভুর মন্দিরে, জগৎপতি ৺জগন্নাথকে দেখে আসব।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটো নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে ক'রে, তাঁকে জগন্নাথ দর্শন করাবেন ব'লে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরীধামে যাওয়া হয়নি, তাই তিনি আগে ঠাকুরকে জগন্নাথ দর্শন করালেন, তারপর নিজে দর্শন করলেন। তার কাছে 'ছায়া আর কায়া সমান'।

দেওঘর, কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে তীর্থদেবতার সান্নিধ্য ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি ক'রে তিনি তীর্থের মহিমা বাড়িয়েছেন। 'তীর্থী-কুর্বন্তি তীর্থানি'। কোন কোন তীর্থে কোন্ যুগান্তরের জন্মান্তরের লীলাস্মৃতি জেগে উঠত তাঁর অন্তরে। রামেশ্বর তীর্থে শিবপূজান্তে তিনি অসতর্কভাবে ব'লে ফেলেছিলেন, 'যেমনটি রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন।' ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসঙ্গিনী সীতা-দেবীরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল এবং তখন তিনি এখানে শিবপূজা করেছিলেন, একথায় তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমাকে অভেদদৃষ্টিতে দেখে স্বামী বিবেকানন্দ 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় বলেছেন,

'দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।'

স্বামীজী একখানি চিঠিতে লিখেছেন, 'মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বড়।' 'মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে, দেখা যায় ভারতীয় নারীত্বের মহিমময় দিকগুলি উজ্জ্বল হয়ে পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে—পিতৃগৃহে কন্যার আদর্শ,

পতিগৃহে সহধর্মিণীর আদর্শ, সর্বোপরি জননীর মহত্তম আদর্শ। জননীর আদর্শ তাঁর মধ্যে দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে শাশ্বত মাতৃসত্তায় তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর জীবনে ও চরিত্রে তপস্বিনী উমা, সহনশীলা সীতা, ব্রহ্মবাদিনী বাক্, পতিব্রতা সাবিত্রী, হ্লাদিনী শ্রীরাধার ছবি প্রতিফলিত। আবার তাঁর অনুধ্যানে পুণ্যময়ী যশোধরা, ভক্তিপ্রাণা মীরা এবং জপনিরতা বিষ্ণুপ্রিয়ার ছবিও স্মৃতিপটে উদিত হয়।

একদিকে পুরাতন মহিমার আদর্শ ও ঐতিহ্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ শ্রীশ্রীমা, অপরদিকে তাঁর সর্বসংস্কারবিমুক্ত মনে নূতনের অভিনন্দন। তিনি নবীন পন্থীদেরও অগ্রদূত। তাই বিদেশিনী মহিলাদেরও সন্তানস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছেন তিনি; তাঁর দিব্য স্নেহচ্ছায়ায় উপবেশন ক'রে তাঁরা আত্মহারা হয়ে গেছেন —ভগিনী নিবেদিতা তো তাঁকে মেরী মাতা ব'লে উপলব্ধি করেছেন প্রার্থনাকালে।

কোথায় জয়রামবাটী, আর কোথায় সুদূর ইওরোপ আমেরিকা! দূর দূরান্তরেও করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের জয়গান; সর্বত্র মা মা ধ্বনি!

শ্রীশ্রীমা বলেছেন, 'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো তা ধুয়ে মুছে তাকে কোলে তুলে নিতে হবে।' তাই শরণাগত সন্তান পায় পরম আশ্বাসবাণী।

শ্রীশ্রীমা বলেছেন, 'দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি ক'রে যে তাকে ভাল করতে হবে তা জানে কজনে?' বাস্তবিকই তিনি মন্দ লোককেও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে উন্নত করতেন। অদোষদর্শিনী ক্ষমাস্বরূপিণী জননীর অশেষ করুণা আপামর সকলের উপর অজস্রধারায় নিপতিত!

কোন শিষ্য কাজে কোথাও বেরিয়েছেন, ফিরেছেন যখন তখন বেলা দুটো। শ্রীশ্রীমা তখনও তার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন! শিষ্য অনুযোগ করলে বলেছেন, 'বাবা, তোমার খাওয়া হয়নি—আমি কি ক'রে খাই?' এমনি মা!

শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী ছিল অতিসুন্দর। একটি উদাহরণ: একজন উঠান ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটা একদিকে ছুড়ে ফেলে দিল। তিনি বললেন, 'ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি অশ্রদ্ধা ক'রে ছুড়ে দিলে? ছুড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীরে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস ব'লে কি তুচ্ছ বোধ করতে আছে? যাকে রাখ, সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে। তাছাড়া এ সংসারের ওটিও তো একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। ঝাঁটাটিকেও মান্য ক'রে রাখতে হয়। সামান্য কাজটি শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।'

একজন মহিলাভক্তকে উপদেশ দিয়েছেন: 'কারো কাছে কিছু চেয়ো না—বাপের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়। লোকের দেওয়া জিনিস কি থাকে গো? ঠাকুর যখন দেবেন তখন রাখবার জায়গা পাবে না—ঠাকুরের দেওয়া জিনিস ফুরতে জানে না। যে চায় সে পায় না, যে চায় না সে পায়। তুমি কারু কাছে কিছু চেয়ো না।'

শিল্প-বিজ্ঞানের যুগে সুখভোগের বিচিত্র উপকরণ পেয়ে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোগমুখর। ভোগবাদের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন অপূর্ব আলোক-বর্তিকা। বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতার আবহাওয়ায় যখন ভারতীয় নারীর আদর্শ থেকে দূরে যাবার সম্ভাবনা দেখা যায়, তখন

পরমকল্যাণী শ্রীশ্রীমায়ের অনবদ্য জীবন সামনে রাখতে পারলে আর কোন ভয় থাকবে না, উপযুক্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেও ভারতীয় আদর্শের যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারা যাবে। পাশ্চাত্য মহিলাগণও তাঁর ভাবাদর্শ লাভ করলে অধিকতর মহিমান্বিতা হয়ে উঠবেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

সারা বিশ্বে হবে দিব্য শকতির নব সূর্যোদয়,
অভ্যুদয়ে ভাবী কাল অতীতের চেয়ে
জ্যোতির্ময়!

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চোখের জলে ধুইয়ে দেবেন
মনের কাদা,—তাই কাঁদান্!
দুঃখ-ব্যথার হালের ফালে
ভাঙেন যখন কঠিন প্রাণ—
বন্ধ্যামাটির বক্ষে হাসে
লক্ষ গোলাপ কী উল্লাসে!
লজ্জা-পাপে সর্বনাশে
অদ্বিতীয় এক ঈশান!
বেদনারই বহ্নিশিখায়
পুড়িয়ে তিনি অঙ্কে নেন!
ডুবলে অহং নয়ন-জলে
কমল-চরণ বাড়িয়ে দেন!
অরণ্যের এই পাখীর গানে
যে-মধুরের আভাস আনে
কালবোশেখীর ঝড়-তুফানে
সেই বঁধুয়াই বীণ বাজান।

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

নব্য জীবনবেদের কথা

"Vivekananda performed the extraordinary feat of breathing life into the purely static monism of Sankara."

R. C. Zaehner

পূর্বাভাষ

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দের অবদানকে 'নয়া বেদান্ত' বলে অভিহিত করা হ'য়েছে। ভারতীয় রেনেশাঁর প্রতিটি দিকেই এই জীবন-দর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—অর্থাৎ উনিশ শতকের ধর্ম ও সমাজ-আন্দোলন, সাহিত্য-আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলন সকলই—'নয়া বেদান্ত' দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবান্বিত হ'য়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, নয়া বেদান্তের (কার্যপরিণত বেদান্তের) মাধ্যমে স্বামীজী ব্যক্তিকে তার সত্তার উদ্বোধনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সত্তার উদ্বোধন (liberation of the spirit) ব'লতে বোঝায় ব্যক্তির সামগ্রিক মুক্তি—তার যুক্তি চেতনা চিন্তা বিশ্বাস সব-কিছুরই মুক্তি। সত্তার উদ্বোধনের আবার সমষ্টিগত তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্যকে এক কথায় 'ন্যায়' (justice) বা সমষ্টিগত জীবনে 'ন্যায্য ব্যবস্থা' ব'লে বর্ণনা করা যায়। তৃতীয়তঃ, স্বামী বিবেকানন্দ জীবনদর্শন-সম্পর্কিত বাণী এবং নির্দিষ্ট কর্তব্যভার দুই-ই নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং ফলে নয়া বেদান্তের তত্ত্বগত বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ এক অখণ্ড রূপ ধারণ ক'রেছে। চিন্তা ও প্রয়োগের এরকম অখণ্ডতা ইতিহাসে অতি বিরল ঘটনা, যা মাত্র লোকোত্তর-প্রতিভাশালী শিক্ষাগুরুদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এবং যুগান্তকারী আন্দোলন জন্মগ্রহণ করে এই অখণ্ডতা থেকেই। রেনেশাঁয় মুক্তিস্নাত ব্যক্তি অনুভব করে যে, ভাবের ক্ষেত্রে পৃথিবীকে তার কিছু দেবার আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কর্তব্যভার সম্বন্ধে চেতনার অভাবে সে তার অনুভূতিকে আন্দোলনে প্রবাহিত করতে পারে না। অপরদিকে উক্ত শিক্ষাগুরুদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তব্যভার সম্বন্ধে চেতনাই তাঁদেরকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করে এবং তাঁদের বাণী থেকে নিঃসৃত হয়ে রূপ গ্রহণ করে নব্য জীবনবেদ।[1] মার্টিন লুথার, রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি কালজয়ী পুরুষ হলেন এই গোত্রীয়। এঁরা প্রত্যেকেই রেনেশাঁয় মুক্তিস্নাত ব্যক্তি, আবার এঁরা মহান শিক্ষাগুরু।

এইবার ভারতের নবজীবনের তিনটি আন্দোলনের ওপর প্রভাবের দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের নয়া বেদান্তের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

সংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি

রেনেশাঁকে এক কথায় মুক্তি-আন্দোলন (liberation movement) ব'লে অভিহিত

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট থিসিস হিসাবে অনুমোদিত Social and Political Ideas of Swami Vivekananda গ্রন্থ ভিত্তি করে রচিত।

১ Crossman : Plato Today

করা যায়। ইতালীতে এই মুক্তি-আন্দোলন শুধু যুক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভারতীয় রেনেশাঁর ক্ষেত্রে কিন্তু শুরু থেকেই নৈতিক চেতনার মুক্তিসাধন ছিল আন্দোলনের লক্ষ্য। এই অভিমতের সপক্ষে প্রমাণ হ'লো যে, রাজা রামমোহন রায়ের আগমনের পূর্বেই আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ভিত্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছিল। জওহরলাল নেহরু ঠিকই বলেছেন, এদেশে বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান অসঙ্গতি হ'লো যে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজরা ছিল এদেশের বহু সামাজিক পরিবর্তন ও বিপ্লবের 'পূর্বসূরী ও প্রতিনিধি'।[২] ইংরেজদের মধ্যে অনেকের কাছেই সতীদাহের ন্যায় আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলো ছিল বিভীষিকার মতো, এবং এই বিভীষিকা দূর করবার বেশ কিছুটা প্রচেষ্টাও তাঁরা করেছিলেন। ওয়েলেসলী ১৮০৩ সালে গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন রদ করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে—এইরকম জনশ্রুতি ও প্রচার যাতে না ঘটে তার আশঙ্কায় আর কিছু না করলেও শাসক-সম্প্রদায় পরবর্তী সময়ে সতীদাহ-প্রথার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। তারপর ২৬ বছর পরে ১৮২৯ সালে, বেণ্টিঙ্ক আইন পাস করে ঐ প্রথা বিলুপ্ত করেন। এই সময়ের মধ্যে মেটকাফ তাঁর শাসনাধীন দিল্লী অঞ্চলে (১৮১১-১৮) ঐ প্রথা রহিত করেন। জে. পেগস্ (J. Peggs) এবং ফ্যানি পার্কস্ (Fanny Parks) নামে দুজন ইয়োরোপীয় তাঁদের দু'খানি পুস্তিকায়[৩] সতীদাহপ্রথা-রোধের জন্য বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের অবতারণা ক'রে গভীরভাবে আবেদন করেন। স্বাভাবিকভাবেই ঐ যুগের 'প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি' (representative man)[৪] রাজা রামমোহন সতীদাহপ্রথার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে পারেননি।[৫]

দ্বিতীয়তঃ, ঐ যুগ ছিল ধর্মসংঘর্ষের যুগ, যার প্রকৃতি আমরা ঠিক আজকের দিনের লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুধাবন করতে পারি না। উদারনৈতিক দর্শনের প্রভাবের দরুন ঐ যুগে আবার স্বাভাবিক অধিকার natural rights সম্বন্ধে লোকের মনে একরকম মোহের সৃষ্টি হয়েছিল। যে অধিকারকে আমরা ভারতীয়রা চিরকালই অপরিহার্য মনে ক'রে সবার ওপরে স্থান দিয়ে এসেছি তা হ'লো স্বাধীনতা, যাকে সাধারণতঃ 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার দরুন আমাদের এই চিরন্তন মৌলিক অধিকারই ব্যাহত হচ্ছিল। উদারনৈতিক দর্শনের প্রস্রবণ থেকে আকণ্ঠ পান

---

২ Discovery of India

৩ পুস্তিকা দু'খানির নাম—'The Suttee s Cry to Britain' এবং 'Twenty Years in the East with Revelations of Life in the Zenana'

৪ 'Representative man' বর্ণনাটি ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের। গ্রন্থের নাম Rammohan —the Universal Man

৫ রাজা রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বলেছেন যে সতীদাহপ্রথার প্রতি রাজার বিরুদ্ধ ভাব ছিল বাল্যকাল থেকেই যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের স্ত্রী সহমরণে গমন করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা অবশ্য এই ঘটনার সত্যতায় সন্দেহ করেন। R. C. Majumder : Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

করার পর রাজা রামমোহনের পক্ষে আর এ-বিষয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না; স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁকে অবতীর্ণ হতেই হয়েছিল। কিন্তু যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দরুন তাঁর পক্ষে আবার ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে প্রচলিত উচ্ছৃঙ্খলতা যথেচ্ছাচারিতা সমর্থন করাও সম্ভব ছিল না। ফলে তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'বিসদৃশ পরস্পরবিরোধী বিবদমান' ধর্মশক্তিসমূহের জন্য একটা মিলনভূমি।[৬] তিনি ভেবেছিলেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ ধর্মনীতির সঙ্গে যে খাদ মিশে গেছে তা দূর করতে পারলেই এই মিলনভূমির সন্ধান পাওয়া যাবে। এবং তখনও যদি খৃষ্টধর্মের আক্রমণ চলতে থাকে তবে হিন্দুধর্ম তার যথাযোগ্য প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা করতে সমর্থ হবে। এইভাবে একরকম একত্ব-বাদমুখী সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজা রামমোহন ধর্মীয় আক্রমণকারীদের নিরস্ত্র করতে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাকে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'adjustment on the spiritual plane'[৭] ব'লে অভিহিত করা যায়।

রাজা রামমোহনের এই অভিনব প্রচেষ্টা কিন্তু সার্থক হয়নি; তিনি হিন্দুত্ব (Hinduism) বা ভারতের জীবনদর্শনকে (the 'ism' of India) নূতনভাবে রচনা করতে সমর্থ হননি। এর কারণ হলো 'বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যকে' সমুচ্চ স্থান দিতে তিনি পারেননি।[৮] হিন্দু জীবনদর্শনের এই মূলসূত্রটি তিনি ঠিক ধরতে বা অনুসরণ করতে পারেননি। তাঁর যুক্তিবাদ উপনিষদের আলোয় উদ্ভাসিত হলেও হিন্দুধর্মের জাগৃতির পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না।

প্রায় এক শতকের তিন-চতুর্থাংশ পরবর্তী সময়ে বিবেকানন্দ ঐ একই দ্বৈত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু সমাধানের প্রচেষ্টা করেছিলেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে। তিনি সুস্পষ্ট-ভাবে এবং সমুচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের গণ্ডী ব'লে যেগুলোকে ধরা হয়, সেগুলো সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রথা (Social institutions) মাত্র; মূলতঃ হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। ঐ অনুষ্ঠান-প্রথাগুলো হিন্দুসমাজকে বিকৃত করলেও হিন্দু-ধর্মের কোন মূলসূত্রকে স্পর্শ করতে পারেনি। সুতরাং ওদের বিলোপসাধনের প্রয়োজন হলো সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্য, হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য নয়। সামাজিক ন্যায়ের প্রতিবন্ধক নয় এমন কোন কিছুরই উৎখাত করার প্রয়োজন নেই। ফলে তিনি মূর্তিপূজার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এবং বর্ণভেদপ্রথার সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এই ব'লে যে, আদিতে বর্ণভেদপ্রথার একটা উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল যদিও বর্তমানের অধঃপতিত রূপে প্রথাটি সামাজিক ন্যায়ের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দুধর্মসার সংহিতা ও উপনিষদেই নিহিত, যার সূত্র হিসাবে বর্ণভেদপ্রথা কখনও গণ্য হয়নি। অন্যান্য দেশের মতো এ দেশেও প্রথাটি হ'লো সম্পূর্ণভাবে সামাজিক বিবর্তনের ফল। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন ও অন্যান্য সংস্কারকদের সমালোচনা ক'রে স্বামীজী বলেছেন, "Beginning from Buddha down to Rammohan Roy, everyone made the mistake of holding the caste to be

---

৬ Seal, op. cit.

৭ My Master

৮ Tagore : Society and State

a religious institution and tried to pull down religion and caste together and failed."[৯]

অতএব, যেসকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সামাজিক অবস্থা ও সম্পর্কের ওপর ভিত্তিশীল, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির পরিবর্তনসাধন অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু আমাদের মৌলিক ধর্মনীতির বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করা হবে না; সেগুলি অস্পৃষ্ট থাকবে।[১০]

বিরোধী অভিমতের অভাব না থাকলেও[১১] সর্দার পানিক্কর প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে সামাজিক প্রথা ও ধর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের ওপর এই যে গুরুত্ব আরোপ, এ হ'লো সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দেরই দান এবং এর ফলেই পরবর্তী যুগে আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন সম্ভব হয়েছিল।[১২]

সর্দার পানিক্করের এই উক্তি সমর্থন করা হোক আর না হোক এটা স্বীকার ক'রতে হবে যে, সমাজসংস্কার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উপরি-উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ও নব্য দর্শনের এক সার্থক সমন্বয়। এর মধ্যে সামাজিক ন্যায়ের তত্ত্ব হ'লো নয়া জীবনদর্শনের দ্যোতক এবং প্রাচীন আদর্শের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই বিশেষ স্মারকের মধ্যে যে, পুনর্গঠনের জন্য ধ্বংস কখনই অপরিহার্য নয়। ভারতবাসীকে বিশেষভাবে এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে 'পুনর্গঠনের মাধ্যমে সংরক্ষণের' উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এবং প্রধানতম প্রবক্তা ব'লে অভিহিত করেছেন।[১৩]

নয়া বেদান্ত বা ফলিত বেদান্ত

যে আদর্শের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগ ছিল প্রবলতম তাকে সংক্ষেপে মুক্তি বা স্বাধীনতা (freedom) ব'লে অভিহিত করা যায়, এবং তাঁর কাছে স্বাধীনতার কোন প্রকারভেদ বা বিভাগ নেই। সামাজিক ন্যায় (social justice) যখন আংশিক মুক্তির সূচক তখন মাত্র এই ন্যায়ের আদর্শ তাঁর দর্শনের লক্ষ্য হ'তে পারে না। মানুষের সত্তার মুক্তিই হ'লো এই লক্ষ্য এবং এর জন্যে তিনি এমন এক সংহত ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রেছিলেন যা বিভিন্ন যুগে আহৃত জ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান দিনের দাবি ও প্রয়োজনীয়তার সামঞ্জস্যবিধান করতে সমর্থ হবে। এই ধর্মবিশ্বাস, এই জীবনদর্শনের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বেদান্তদর্শনের মধ্যে। অবশ্য যে বেদান্ত তিনি প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর নিজের দান, নিজের ব্যাখ্যা বেশ কিছুটা আছে। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের স্থৈতিক অদ্বৈতবাদে (Static monism) প্রাণসঞ্চারের অনন্যসাধারণ কার্য সম্পাদন ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন।[১৪] অন্যভাবে বলা যায়,

৯ C W., V (Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V)

১০ Vedantism (C. W., III)

১১ J. N. Farquhar: The Crown of Hinduism দ্রষ্টব্য।

১২ Panikkar: In Defence of Liberalism.

১৩ The Renaissance in India

১৪ অভিমতটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক R. C. Zaehner-এর। গ্রন্থের নাম Hinduism। উক্তিটি এই প্রবন্ধের শুরুতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

স্বামীজী বেদান্তদর্শনকে ফলিত দর্শনে রূপায়িত ক'রে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনবেদে পরিণত করেছিলেন। এজন্যেই একে বলা হয় 'নয়া বেদান্ত' বা 'ফলিত বেদান্ত'। এই রূপদান-কার্যে তিনি অবশ্য তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে ঋণী। স্বামী বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করা হ'য়েছিল : "Did Buddha say that the many was Real and the ego unreal, while orthodox Hinduism regards the One as the Real, and the many as unreal ?" উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন : "Yes. And what Ramakrishna Paramahansa and I have added to this is that many and the One are the same Reality, perceived by the same mind at different times and in different attitudes ."[১৫] এক ও বহুর মধ্যে এই অভিন্নতার উপলব্ধিই নয়া বেদান্তের মূলসূত্র এবং এই জীবনবেদ হ'লো নবজাগরণের যুগে দুই লোকোত্তর পুরুষের সম্মিলিত অবদান। এই কারণে নয়া বেদান্ত আন্দোলনকে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন' ব'লেও অভিহিত করা হয়।

হিন্দুধর্মের জাগৃতির ওপর বিখ্যাত গবেষক ডি. এম. শর্মা নয়া বেদান্ত বা ফলিত বেদান্তের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ক'রেছেন : (ক) বিশ্বজনীনতা (universality), (খ) নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonality) (গ) যুক্তিসিদ্ধতা (rationality), (ঘ) উদারমনতা (catholicity) এবং (ঙ) আশাবাদ (optimism)।[১৬]

১৫ Nevedita : The Master as I saw Him এবং Aggressive Hinduism

১৬ Sarma : Studies in the Renaissance of Hinduism in the Nineteenth and Twentieth Centuries

আমরা 'আশাবাদের' পরিবর্তে 'মানবতা' (humanism) ব্যবহার ক'রে এবং 'গণতন্ত্র' (democracy) ও ব্যবহারিকতা (practicality) —এই দুইটি নূতন বৈশিষ্ট্য যোগ ক'রে তালিকাটির কিছুটা হেরফের ক'রতে পারি। এক অর্থে ব্যবহারিকতাকে নয়া বেদান্তের সর্বপ্রধান লক্ষণ বা মূল উপাদান ব'লে গণ্য করা যায় এবং এজন্যই নয়া বেদান্তকে বলা হয় ফলিত বেদান্ত। এবার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ক। বিশ্বজনীনতা

বেদান্ত বিশ্বজনীন ধর্ম, কারণ বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয় যে, সকল ধর্মের মূলনীতি সম্পূর্ণ অভিন্ন। তবুও যে ধর্মের ক্ষেত্রে ভেদ দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ হ'লো বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশ এবং ধারণক্ষমতার পার্থক্য। এক চিঠিতে স্বামীজী তাঁর এক পরিচিত মুসলমান ভদ্রলোককে লিখেছিলেন, "Mankind ought to be told that religions are but the varied expressions of THE RELIGION, which is Oneness, so that each may choose the path that suits him best."[১৭] ব্রাহ্মসমাজের সারগ্রাহী ধর্ম (electicism) বা আর্যসমাজের প্রকারভেদ-নিরপেক্ষ বেদবিহিত ধর্মের (Vedicism) সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়। এখানে মনে আসে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী : ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার দুই ভাবেই দেখা যায়।

আবার, বহুর মধ্যে একের সন্ধান—হিন্দুধর্মের এই শাশ্বত আদর্শপ্রচারে স্বামী বিবেকানন্দ আধা-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে

১৭ C. W., IV

কখনও অলৌকিক শক্তি বা কুসংস্কারের সমর্থন করেননি। এ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত, যাঁরা এরূপ করেছেন তাঁরা ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির বা হিন্দুধর্মের ক্ষতিই করছেন এবং দুর্বল জনগণকে দুর্বলতর ক'রে তুলছেন। সুতরাং তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন এইসকল অলৌকিকতাকে পরিহার করে শক্তির আরাধনা করতে এবং তার জন্যে বলদায়ী, সমুজ্জ্বল জীবনদর্শন উপনিষদে ফিরে যেতে।[১৮]

নয়া বেদান্তের এই বিশ্বজনীনতা হ'লো ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে এক নূতন পথের নির্দেশ এবং তখন থেকে এই পথেই ধর্মসংস্কার-আন্দোলন চলছে বলা যায়।

খ। নৈর্ব্যক্তিকতা

দ্বিতীয়তঃ, বেদান্ত কতকগুলি মৌলিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন ঐতিহাসিক পুরুষের জীবনীর উপর নয়।[১৯] অর্থাৎ, বেদান্ত নৈর্ব্যক্তিক। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন বেদান্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা ছাড়াও ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব করে। স্বামীজীর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, এই রকম কোন নৈর্ব্যক্তিক ধর্মই শুধু ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মসমাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে সমর্থ।

গ। যুক্তিসিদ্ধতা

তৃতীয়তঃ, বেদান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ জীবন-দর্শন। সুতরাং আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ। মাত্র বেদান্ত-বিশ্বাসীর পক্ষেই আধুনিক জড়বিজ্ঞানসমূহের তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মের সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন সম্ভব।[২০] ভগিনী নিবেদিতা বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: **"All knowledge is sacred. In the truth that has been snatched from the abyss, it is not for us to say what is more and what is less binding. Mathematics is also of God's. Men of science are also Rishis."**[২১] কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. টি. এম্ব্রি (A. T. Embree) বলেছেন: ভারতে যখন বিখ্যাত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুবর্তিতাকে আমাদের চিরন্তন ধর্মীয় মূল্যমানের ওপর আক্রমণ ব'লে প্রচার করছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তখন এই যুক্তিই দেখিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ; সুতরাং পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করলে ভারত সবলই হবে, দুর্বল নয়।[২২] স্বামীজীর নিজের ভাষায়, "আধুনিক জড়বাদীরা যদি বেদান্তের সিদ্ধান্ত-সমূহ গ্রহণ করেন তবে তাঁরা তাঁদের তত্ত্ব-সমূহকে অবলম্বন করে থাকতে পারবেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার পথেও পদসঞ্চার ক'রতে পারবেন।"[২৩]

বেদান্তের প্রধান সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে অন্যতম হ'লো জীবন সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ (unity of the existence)। এই ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত জীবনকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলতে বাধ্য। কারণ এই মূল সিদ্ধান্তের

---

১৮ My Plan of Campaign (C. W. III)

১৯ The Mission of the Vedanta (C. W. III)

২০ Ibid

২১ **Religion and Dharma**

২২ C. V. (Centenary Volume)

২৩ The Mission of the Vedanta

অন্যতম অনুসিদ্ধান্ত হ'লো সৌভ্রাত্র বা সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে একাত্মবোধ।

এই অনুসিদ্ধান্তকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হ'লে যুগ যুগ ধরে যে স্বৈরাচার শোষণ পীড়ন চলে আসছে তার অবসান ঘটবে এবং ফলে সমাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এক সমবায়ী সমাজ-ব্যবস্থা বা সমবায়ী সাধারণতন্ত্র (a cooperative commonwealth)। অতএব বেদান্ত বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার মুক্তিসাধন ক'রে নৈতিক সূত্রসমূহের দার্শনিক বুনিয়াদ দৃঢ় করে। জীবন সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ মেনে নিলে কেন আমি প্রতিবেশী বা পরদেশীকে ভালবাসব, তার কারণ খুঁজতে হয় না। এইভাবে একই সঙ্গে সমাজচেতনা ও প্রজ্ঞার মুক্তিসাধন বেদান্তের মাধ্যমেই সম্ভব। স্বাভাবিকভাবেই নয়া বেদান্তকে 'বিশ্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম' (universal science-religion) বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২৪]

(ক্রমশঃ)

---

২৪ Romain Rolland : Prophets of the New India

শ্রীরামকৃষ্ণঃ

শ্রীসুধীরকুমার কর

যো রামশ্চ হি কৃষ্ণশ্চ
রামকৃষ্ণো হি প্রেমতঃ।
সকৃৎ স্মৃতে পদে যস্য
কৃষ্ণতা শ্বেততাং গতা॥
যো নরাণাং চিরং ত্রাতা
যো মোহকাম-নাশনঃ।
যো নট রসিকস্তস্মৈ
নমঃ সুশিল্পিনে নমঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

Six Systems of Indian Philosophy-র ভূমিকায় Max Muller বলেছেন : "Vedanta philosophy [is] a system in which human speculation seems to me to have reached its very acme."—"আমার মনে হয় বেদান্ত-দর্শনই মানুষের বিচারের সর্বোচ্চ শিখর।" কাজেই তারপর দূর থেকে যতটুকু তিনি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন তাতে রামকৃষ্ণের দর্শনকে পূর্বোক্ত চিন্তার শিখরকে ছাড়িয়ে যাবার মতো কিছু বলে তাঁর মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই Max Muller থেকে শুরু ক'রে রামকৃষ্ণের দর্শনকে বেদান্ত-দর্শনের (বিশেষ ক'রে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত) আলোকেই ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে এবং তাঁর সাধন-মালিকার একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হিসাবে তন্ত্র-দর্শনেরও সহায়তা নেওয়া হয়। কিন্তু জ্ঞান-লাভের সমস্যা সম্বন্ধে দু-একটি কথা এখানে আলোচনা করা যাক। মনে হতে পারে, একটি বিষয়ে জ্ঞানলাভের অর্থ হল আমাদের জ্ঞানজগতের (অর্থাৎ এতাবৎ আহৃত জ্ঞান-সঞ্চয়ের) মধ্যে এই বিষয়টির স্থান নির্ণয় করা। আমি কলকাতা শহর চিনি; উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূব থেকে পশ্চিম অনেকবার ঘুরেছি। কিন্তু একটি নতুন রাস্তার কথা শুনলাম—যে রাস্তায় আমি কখনও যাইনি। জেনে নিলাম কলকাতার কোন অঞ্চলে, কিভাবে যেতে হয় ও অন্যান্য বর্ণনা এবং গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, রাস্তাটি আদৌ কলকাতায় নয়, হাওড়ার শহরে। তখন কলকাতা থেকে হাওড়ায় যাবার জন্যে আমায় হাওড়ার সেতুর সাহায্য নিতে হবে এবং রাস্তাটি খুঁজে বার করতে হবে। এখন আমরা যদি মনে করি, কলকাতা মস্ত শহর, অতএব এ-রাস্তা কলকাতায়ই হবে এবং এই বলে বর্ণনা অনুসারে খুঁজতে থাকি তবে হয়ত ঐ রকম (মিল আছে এমন) কোনও রাস্তা খুঁজে পাব, কিন্তু তা যে রাস্তা চাই তা হবে না। **The Nature of Thought** গ্রন্থে Brand Blanshard কিন্তু ঐ দ্বিতীয় উপায়ে জানবার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন : "We think to solve problems, and our method of solving problems is to build a bridge of intelligible relation from the continent of our knowledge to the island we wish to include in it."—"আমরা সমস্যা-সমাধানের জন্য চিন্তা করি, এবং আমাদের সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতি হল আমাদের সঞ্চিত জ্ঞানের মহাদেশ থেকে যে অজানা দ্বীপটিকে আমরা আমাদের জ্ঞানের মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই সে পর্যন্ত বোধগম্য সংযোগের একটি সেতু গড়ে তোলা।" অতএব আমাদের প্রথম পদ্ধতি ছেড়ে দ্বিতীয় পদ্ধতিই নিতে হবে রামকৃষ্ণের শিক্ষাকে বোঝবার জন্য। ধরে নিলে হবে না যে, পরিচিত দর্শনরাজ্যের মধ্যে তাঁর স্থানটি আবিষ্কার করাই আমাদের কাজ। মনে রাখতে হবে পূর্বোক্ত Hopkins-এর কথা : "What he hands on to posterity is the old religion **plus** himself." এই plus-টির

জন্যই সংযোগ সেতুর প্রয়োজন, জানা জগতে খুঁজলেই শুধু হবে না।

সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে জীবসেবায় এগিয়ে চলা ঠিকই। কিন্তু সেই একমাত্র এগিয়ে চলা নয়। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ—রামকৃষ্ণ বলেছেন। মানুষের সঙ্গে আর সব কিছুর তফাত তার ধর্মবোধে, এ কথা সকলে স্বীকার না করলেও তার বৈশিষ্ট্য যে তার বুদ্ধি—এ বিষয়ে কোনও মতান্তর নেই। সে তার বুদ্ধি দিয়ে চায় সব কিছুকে অধিকার করতে বস্তু-জগতে, মনোজগতে। আর এই সব কিছুকে পাওয়াও ঈশ্বরলাভ। কারণ, একে পেলে আর অন্য কোনও পাওয়াকে এর চেয়ে বড় মনে হয় না। সব পাওয়ার চেয়ে আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে মানুষের? মানুষের বিশুদ্ধ মনই একমাত্র এ পথের সহায়। তাই ব্যক্তিই তাঁর প্রদর্শিত পথে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। নৈতিক প্রচার, সমাজসংস্কার বা জাতিগঠনের মতো বড় বড় প্রকল্প দেখা যায়নি তাঁর কাছে। আর একই কারণে মানুষের স্বাতন্ত্র্যও তাঁর কাছে পেয়েছে সম্মান—যারই পরিণতিস্বরূপ তাঁর "ধর্মীয় গণতন্ত্র"। বহুর মধ্যেই যে সেই এক, কি ক'রে সেই একের প্রকাশমালার বহুকে অস্বীকার করা যায়? "এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন করেছেন—যার পেটে যা সয়।…মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা!…যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে।" শাস্ত্র বললেন: "উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' কেউ হয়ত অর্থ করলেন, "ব্রহ্মের যখন আসলে কোনও রূপ নেই, তখন উপাসক কাজের সুবিধার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করেন।" তা কেন? রামকৃষ্ণ বললেন, "নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এসব করেছেন।" তন্ত্র এখানে রামকৃষ্ণকে সায় দিয়ে স্পষ্ট বলবেন: "সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।" সন্দেহ রইল না কিছু- সাধকের জন্য অরূপ যিনি তিনিই রূপপরিগ্রহ করলেন, না সাধকই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করলেন। কারণ এমন হলে দোষস্খালনের জন্য আবার বলতে হবে, "ধ্যানে রূপবিবর্জিতের রূপ বর্ণন করে হে রূপহীন, তোমার যে বিকলতা করেছি তার জন্য ক্ষমা করো।" তবে কি অসত্য থেকে সত্যে যাওয়া হয় না? তাও কি সম্ভব? রামকৃষ্ণ বলবেন, রূপে রূপে প্রতিরূপে অরূপা রূপধারিণী। "কি রকম জানো? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূলকিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—বরফ-আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন। জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না।" তিনি নিরাকার, আবার সাকার, আবার তাঁর কথা বলা যায় না। এ যেন জৈন দর্শনের[১] সপ্তভঙ্গি নয়ের সপ্তম ভঙ্গি—'স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ, অবক্তব্যম্ চ।' কোনও ভাবে তিনি আছেন (সাকার সগুণ), কোনও ভাবে তিনি নেই (নিরাকার নির্গুণ), আবার কোনও ভাবে তাঁর স্বরূপ অপ্রকাশ্য। সাকারের থেকে নিরাকার বেশী সত্য বা পারমার্থিক দৃষ্টিতে সাকার মিথ্যা, নিরাকারই সত্য, সাকারের একটা কাজ চলা সত্যতা আছে এমন নয়। রামকৃষ্ণের পরমার্থ-দৃষ্টিতে সাকারও যেমন সত্য

১ লেখকের 'জৈন পরামর্শবাদে উদারতা', বিশ্বভারতী, ১৩৭৩, পৃ: ৫৫৮।

নিরাকারও তেমন সত্য, সগুণ যেমন সত্য নির্গুণও তেমন সত্য, দ্বৈতও সত্য অদ্বৈতও সত্য, আবার দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত ভাবও সত্য। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব, কিন্তু তা একান্ত হবে কেন? আমার দেখার ওপর নয়, সেই তত্ত্বই বিভিন্ন রূপে দেখা দেন, তিনি এক হলেও অনেকান্ত। এই হিসাবে রামকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব বিষয়ে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী (realist), বিজ্ঞানবাদী নন। আমরাও রামকৃষ্ণকে দেখার সময় আমাদের জ্ঞান তাতে আরোপ করে একান্ত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে চাই না। [২] সেই ইঙ্গিতই প্রবন্ধের প্রারম্ভে দেওয়া হয়েছে।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোনও কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম-রূপভেদ।" এই হল রামকৃষ্ণের কালীব্রহ্ম-রূপ অদ্বয়তত্ত্ব। ব্রহ্ম নিত্য, কালী লীলাময়ী। যাঁর নিত্য, লীলা যদি তাঁরই না হয় তবে তত্ত্ব অদ্বয় হয় না। এই লীলারূপিণীকে যদি মায়া বলা যায়, তবে সে ব্রহ্মমায়া ব্রহ্মের মায়া নয়, ব্রহ্মই মায়া। রামকৃষ্ণ তাঁকেই মহামায়া বলেছেন। মহামায়া আবরণ- ও বিক্ষেপ-শীলাই ন'ন, তিনি মুক্তিদায়িনীও। আদ্যা-শক্তিতে অবিদ্যা বিদ্যা। অবিদ্যা যেমন কামক্রোধাদি দ্বারা মুগ্ধ করেন, বিদ্যা তেমন বিবেক বৈরাগ্য দিয়ে মুক্তিপথে চালিত করেন। "তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী; তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।" কাজেই শক্তি বা কালীর মত জীব-জগৎও সত্য, তবে এরা লীলা, তাই শাশ্বত নয়। শাঙ্কর বেদান্তমতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে এরা মিথ্যা, কেননা অবিদ্যাপ্রসূত। "This has been called the weak, the human, the vulnerable point in the Vedanta" - (Max Muller). "এইটেই বেদান্তের দুর্বল, মানবীয়, ভঙ্গুর অংশ।" কিন্তু রামকৃষ্ণের সবল অদ্বয় শক্তি-তত্ত্বে এমন অংশ নেই। রামকৃষ্ণ-দর্শনে পরমার্থ ভিন্ন ব্যবহার নেই, তাই দৃষ্টিরও দ্বৈত নেই। ব্যবহারের সত্য আর পরমার্থের সত্য সেখানে ভিন্ন নয়। অথচ এ শক্তিতত্ত্বে ব্রহ্মই শক্তি বলে তন্ত্রদর্শনের শিব-শক্তির মিথুনতত্ত্বের থেকে এর অদ্বয়তত্ত্ব ভিন্নশ্রেণীর।

এই সব আলোচনায় সহজেই মনে হয় তাঁর চিন্তায় এ সকল বিরোধের সমন্বয় হয়েছে। এখানেও কয়েকটি কথা ভাববার আছে। প্রথমতঃ, যা আগেই আমরা বলেছি স্পষ্ট করে, তাঁর দর্শন চিন্তাপ্রসূত (speculation) নয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতি (direct experience) তাঁর সহজ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই তাঁর সমন্বয় চিন্তায় নয়। দ্বিতীয়তঃ, সমন্বয় বললে আমাদের অনেক সময় মনে হয়—কতকগুলি খাপ খায় বা খাপ খায় না এমন বিষয়কে মিলিয়ে দেওয়া; বাঘে গরুকে একঘাটে জল খাইয়ে দেওয়ার মত একটা কিছু বাহাদুরী। তাই 'রামকৃষ্ণ সমন্বয় করেছিলেন'—এমন প্রস্তাবকে আমরা একটু সাবধানে ব্যবহার করব। সত্যই কিন্তু এত প্রকারের পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ও বিষয় তাঁর দৃষ্টির আলোকে সমন্বিত হয়েছে যে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সব চেয়ে বড় উদাহরণ

২ লেখকের 'স্বামী অভেদানন্দের বেদান্তদৃষ্টিতে ধর্ম', বিশ্ববাণী, ১৩৭৪, পৃ: ৪৪২-৪৩

সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়। এর মানে এই নয় যে, সব ধর্মকে এক ঘাটে নিয়ে এলেন। তিনি তো বলেইছেন—বিভিন্ন ঘাট দিয়ে নামলেও একই জলকে পাওয়া যায়। এ সমন্বয়ের মানে প্রত্যেক ভিন্ন ঘাটকে স্বীকার করা। এক ঘাটে জল খাওয়ানো নয়। সব ধর্ম তুলে তুলে তোড়া বাঁধা নয়। প্রত্যেক ধর্মের চরম অনুভূতি লাভ করে তার সত্যতা তিনি জেনেছিলেন, তাই প্রত্যককেই তিনি স্বীকার করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে কিছু কিছু পড়লে এ সমন্বয় হয় না। যেমন বিবেকানন্দ বলতেন, "খানিকক্ষণ বসে নাক টিপলে, খানিক পূজা করলে, খানিক কাজ করলে আর খানিক বললে 'সোঽহম্'—তা হলেই যোগ-সমন্বয় হয়ে যায় না।" তৃতীয়তঃ, রামকৃষ্ণের দার্শনিক তত্ত্বসমন্বয়ের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অর্থে একটু ভিন্নতা আছে। সেখানে সমন্বয়ের অর্থ- সকল তত্ত্ব ভিন্নভাবে সত্য এমনই মাত্র নয় বা সকল তত্ত্বের সমাহারই (combination) তত্ত্ব-সমন্বয় নয়। বিসদৃশ তত্ত্বের সামঞ্জস্য-বিধান বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া, যেট রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে পূর্বাবধি আমরা অপ্রযুক্ত বলেছি। আর বৌদ্ধিক সামঞ্জস্য-বিধানে তত্ত্বের প্রকৃত সমন্বয় হয় না, তাদের মাঝে ফাটল থেকেই যায়। বিচারের সামান্য হেরফেরেই তত্ত্ব বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তাই আমরা বলতে চাই না, রামকৃষ্ণ দর্শন-সমন্বয় করেছিলেন, কিন্তু দেখি যে তাঁর সাধনানুভূত তত্ত্বে বহু ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বই বিধৃত, আশ্রিত, সমন্বিত। সমন্বয়-তত্ত্বে বহু সমন্বিত তত্ত্বকে দেখা গেলেও সমন্বয়-তত্ত্বকে ভেঙে সেগুলিতে আসা যায় না। অর্থাৎ সমন্বয় যৌগিক নয়, সে প্রত্যেক সমন্বিত তত্ত্বের মতই মৌলিক, নিত্য অভিনব। সে বৌদ্ধ মিলিন্দ-পঙ্‌হোর রথের মতো। রথচক্র, রথাশ্ব, আসন - এদের কোনটিই রথ নয়, আবার এদের সমাহারমাত্রই রথ নয়। এদের সব কিছুর ওপর আরও কিছু নিয়েই রথ, যা চলমান। এই প্রকার সমন্বয়েই রামকৃষ্ণের রামকৃষ্ণত্ব। এইখানেই সার্থকতা শ্রীরাম-কৃষ্ণের সেই কথার : এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্তের পারে যায়। গ্রন্থের গ্রন্থি এঁদের বাঁধে না। এঁদেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য :

"তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।"

প্লাবনের সময় যেমন কূপোদকের সার্থকতা, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছেও বেদাদি শাস্ত্র দর্শনাদি গ্রন্থের তেমনই প্রয়োজনীয়তা। তাঁদের দর্শন এসবের পারে যায়।

বিদ্যাসাগর

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সার্ধশততম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে নানাভাবে তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ হইতেছে। আমরাও কিছু শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাই। বিদ্যাসাগরের মতো শক্তিমান পুরুষ ভারতবর্ষে বিরল জন্মিয়াছেন। মহাপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন: "বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোট দেখাইবার যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত ঐ গ্রন্থখানি একবার সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙ্গালিত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উন্নত চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।"

এই অসাধারণ মহাপুরুষের জীবনের নানা দিক আলোচনা করিলে ইতি করা যায় না। আমরা প্রধানত: তাঁহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে এস্থলে প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলেন: বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাসবান ছিলেন না; নচেৎ এত বড়ো পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও ঈশ্বর-সম্বন্ধে কোন উক্তি তিনি করেন নাই কেন? বস্তুত: প্রাজ্ঞের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্র এ সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয় জ্ঞান করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যথার্থই বলিয়াছেন, "যে লোক শিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। ভগবানলাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়।... উপদেশ দেওয়া যায়। লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন তা হলে হতে পারে।"

বিদ্যাসাগর বালকদের পাঠ্যপুস্তক 'বোধোদয়' রচনা করেন। ইহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা না থাকায় কেহ কেহ বইটির ত্রুটি ধরিয়া বলেন,—অল্পবয়সে পাঠ্য-পুস্তক হইতে ঈশ্বরের কথা না শুনিলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইবে কি করিয়া?" যাহা হউক এসব শুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পরবর্তী সংস্করণে বইটির প্রথমেই ঈশ্বরের কথা লিখিলেন: ঈশ্বরের দয়ার সীমা নাই। তিনি না চাহিতে আমাদিগকে সকল জিনিস দিয়াছেন —ইত্যাদি। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন: "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।" কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বেদান্তদর্শনকে বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্ত দর্শন' বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। কোথায় এরূপ উক্তি আছে জানি না। এমন কি 'লাল কিল্লা' নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসেও বিদ্যাসাগরের এই উক্তির কথা এক জনের মুখ দিয়া বাহির করা হইয়াছে। নাস্তিকতার কথা আলোচনায় এ যুগে অনেকেই উৎফুল্ল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক স্কুলে শ্রীমহেন্দ্র-নাথ গুপ্ত শিক্ষকতা করিতেন। তিনি তাঁহার রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' 'শ্রীম' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। 'শ্রীম' শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট ভক্ত। তিনি পরমহংস-দেবের নিকট খুব যাতায়াত করিতেন। তাহার

ফলেই দিনলিপি হইতে 'কথামৃত'-রচনা সম্ভবপর হইয়াছে। ঐ গ্রন্থই আমার এ প্রবন্ধে প্রধান উপাদান। ধর্মপরায়ণ গুণী জ্ঞানী লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভালবাসিতেন। তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের নিকটবর্তী ছিল। 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন।' শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাসাগরকে দেখিবার বড় সাধ হয়। শ্রীম বা মাস্টারকে একথা ঠাকুর বলিলে তিনি সকল ব্যবস্থা করিলেন—বিদ্যাসাগরকে শ্রীম আগেইএবিষয় জানাইয়াছিলেন। গাড়ী করিয়া মাষ্টার কতিপয় ভক্তসহ ঠাকুরকে লইয়া বিদ্যাসাগরের দ্বিতল গৃহের উপর তলায় সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কামরায় প্রবেশ করিলে বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২।৬৩, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপেক্ষা ১৬।১৭ বৎসর বড় হইবেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের উপর বসিলেন। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন। তারপর ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল। মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর বিদ্যাসাগরের সহিত হাস্যমুখে কথা আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ সাগরে এসে মিললাম। এত দিন খাল, বিল, হদ্দ নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখছি।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো! নোনা জল কেন? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। ক্ষীরসমুদ্র।

বিদ্যাসাগর। তা বলতে পারেন বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয় দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ; এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তুমি ত আছই।

বিদ্যাসাগর। মহাশয়, কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আলু পটোল সিদ্ধ হলে ত নরম হয়, তা তুমি ত খুব নরম। তোমার কত দয়া! (হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। কলাইবাটা সিদ্ধ ত শক্তই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকোচা পড়া! না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে। তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণ দর্শন ইত্যাদিতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরেজী বিশেষজ্ঞের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। হিন্দী ভাষাও তিনি জানিতেন।

সকলেই জানিত বিদ্যাসাগর কাহাকেও ধর্ম-শিক্ষা দিতেন না। শ্রীম একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হিন্দুদর্শন আপনার নিকট কিরূপ বোধ হয়?' বিদ্যাসাগর উত্তর করেন, 'আমার ত বোধ হয়, ওরা যা বুঝাতে গেছে বুঝাতে পারে নাই।' কিন্তু এই বলিয়া বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন বলিয়া তিনি অভিহিত করিবেন, এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। বিদ্যাসাগর ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম সমুদায় করিতেন। গলদেশে ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ করিতেন। তাঁহার লেখা যে-সকল পত্র সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলির প্রত্যেকটির শিরোদেশে 'শ্রীশ্রীহরিঃশরণম্'—ভগবানের এরূপ প্রশস্তি লিখা রহিয়াছে।

শ্রীম বিদ্যাসাগরকে আর একদিন জিজ্ঞাসা করেন—ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা? বিদ্যাসাগর তদুত্তরে বলেন, "তাকে ত জানবার জো নাই! এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যাবে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।"

বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা বলিতে বলিতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলেন। বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষড়্দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত। ... ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না। ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর—(বন্ধুদের প্রতি) বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।

এরূপ অনেক উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা বলিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরকে বলেন—"তাঁকে কি বিচার ক'রে পাওয়া যায়? তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হ'য়ে তাঁকে ডাকো। (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) আচ্ছা, তোমার কি ভাব?"

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন,—"আচ্ছা, সেকথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলব।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার ক'রে জানা যায় না।" এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন—'কে জানে কালী কেমন? ষড়দর্শনে না পায় দরশন।'

সকলে অবাক হইয়া নীরবে সব শুনিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ বাগ্দেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জিহ্বায় অবস্থিত থাকিয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ্য করিয়া লোকের হিতের জন্য কথা কহিতেছেন। রাত্রি নয়টা বাজে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখন বিদায় নিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) এ যা বললুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে—বরুণ রাজার খপর নাই।

বিদ্যাসাগর—(সহাস্যে) তা আপান বলতে পারেন। [কথামৃত, ৩য় ভাগ]

অতঃপর একদিন এক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে

দেখেছেন—কি রকম বোধ হ'লো ?''

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, এত বাহিরের কাজ যা কচ্চে সে সব কম পড়ে যেতো ; শেষে একবারে ত্যাগ হ'য়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন—একথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যান-চিন্তায় মন যেতো। কারু কারু নিষ্কাম কর্ম অনেক দিন করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায়, ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়। [কথামৃত, ২য় ভাগ]

মাষ্টার মশায় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আরও কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—"আহা, বিদ্যাসাগর মশায় কি কথাই না বলেছিলেন। বলতেন, 'ঈশ্বর তো আমাদের পিতা।' ··কি বিশ্বাসের কথা ! [শ্রীম-দর্শন, ৫ম ভাগ]

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বিদ্যাসাগরের এরূপ জ্ঞান ছিল বলিয়া তিনি কাহাকেও ধর্মোপদেশ দিতেন না। তাহা বলিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলা যায় না। তিনি মূর্তিপূজারও বিরোধী ছিলেন না। তবে পূজার চেয়ে যে লোকের প্রতি দয়াপ্রদর্শন অধিক সমীচীন একথা তিনি কখন কখন মনে করিতেন। একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মা, বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয় সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করা ভালো ?" ইহা শুনিয়া জননী উত্তর করেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" (বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত')।

শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া প্রথমেই যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি ॥

বৃক্ষবল্লরী প্রাণ ধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবন ধারণ করে ; কিন্তু সে-ই প্রকৃতভাবে জীবিত, যে মননের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের মুখ্য জীবন ছিল মননজীবন, তাই তিনি গতানুগতিকভাবে চলিতেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : "বিদ্যাসাগর গতানুগতিক ছিলেন না ; তিনি স্বতন্ত্র সচেতন পারমার্থিক ছিলেন। ···আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সরলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য আর সেসব উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল না থাকিলে জনসনের মনুষ্যত্ব লোক-সমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে।" সুখের বিষয় বিদ্যাসাগরের অনেক তথ্যপূর্ণ জীবনী এ বৎসর প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার প্রকৃত স্মৃতিপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। উপসংহারে একথা উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন নিষ্কাম কর্মী—কর্মযোগী, প্রকৃতই সিদ্ধপুরুষ —এ যুগের দধীচি।

যীশুর প্রেম ও করুণার একটি কাহিনী

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

লোকোত্তর মহাপুরুষগণ প্রেম ও করুণার প্রতিমূর্তি। তাঁরা সপ্রেম দৃষ্টি, করুণা, দিব্যস্পর্শ, এমন কি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অন্যের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার ক'রে জীবনের গতি আমূল পরিবর্তিত করতে পারেন। তাঁরা কৃপাপরবশ হয়ে কত পাপী-তাপীকেই না উদ্ধার করেছেন। মেরি ম্যাগ্‌ডালেনের প্রতি কৃপা যীশুখ্রীষ্টের জীবনের একটি বিস্ময়কর কাহিনী।

ভোগবিলাসপরায়ণা কলঙ্কিনী মেরি ম্যাগ্‌ডালেন ইহুদী সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয়া ছিলেন। এ নারী নিজের পাপ-জীবনের জন্য অনুতপ্তা হ'য়ে পরম কারুণিক যীশুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং যীশুর কৃপায় খৃষ্টান জগতে সাধ্বী (saint) পদবীতে উন্নীতা হন।

সাধ্বী ম্যাগ্‌ডালেনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করার জন্য সমগ্র খৃষ্টান জগতের রোমান্ ক্যাথলিক গির্জাগুলিতে জুলাই মাসে একটি ভোজ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবে, খৃষ্টানগণ পাপের বিষময় পরিণাম, প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুশোচনার ফল এবং প্রভু যীশুর অসীম প্রেম ও করুণার কথা স্মরণ মনন ও অনুধ্যান ক'রে থাকেন।

পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করো না—এটি সকল ধর্মশাস্ত্রের চিরন্তনী বাণী, সকল মহাপুরুষের উপদেশ। যীশু পাপকে অতি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন, পাপের বিষময় পরিণাম সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, উদ্ধত পাপীদের প্রতি অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন আবার প্রকৃত অনুতাপীদের প্রতিও অপার্থিব প্রেম ও করুণা দেখিয়েছেন।

যীশু বলেছেন: যে-কেহ পাপ করে, সে-ই ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করে, কারণ পাপানুষ্ঠান মাত্রই ঈশ্বরের নিয়ম-লঙ্ঘন। যে-কেহ পাপ করে, সে-ই ঈশ্বরকে দেখেনি এবং জানেনি। যে পাপ অনুষ্ঠান করে, সে শয়তান, কারণ শয়তান সৃষ্টির আদি থেকেই পাপ করে।

যীশুর ধর্ম অনুশোচনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। পাপ ক'রে পাপের অসারতা ও ব্যর্থতা প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করার পর ঠিক ঠিক অনুতপ্ত হলে এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলে শরণাগতকে ঈশ্বর উদ্ধার করেন। খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন—যীশু মহান পরিত্রাতা, তিনি জগতের পাপ-তাপ হরণ করবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন। যীশু বলেছেন: যদি আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, ঈশ্বর ন্যায়- ও করুণাপরবশ হয়ে আমাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং আমাদের সমস্ত অধর্ম থেকে পরিত্রাণ করেন।

নিউ টেস্টামেন্টের ল্যুক-লিখিত সুসমাচারে (Gospel) মেরি ম্যাগ্‌ডালেনের দীক্ষার অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত আছে। প্রায় দু'বছর ধর্ম-প্রচারের পরই যীশুর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তাঁকে ঈশ দূত ব'লে স্বীকার করতে আরম্ভ করে।

সাইমন নামে জনৈক ফারিসি (Pharisee) যীশুর সঙ্গে ভোজন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। যীশুকে সেবা করবার অথবা তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাবার কোন অভিপ্রায় সাইমনের

ছিল না। যীশুর পবিত্র উপস্থিতিতে তার গৃহ বহুমানিত হবে—এ অভিপ্রায়েই সাইমন যীশুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে যীশু সাইমনের গৃহে এসে ভোজনে বসলেন। সাইমন কিন্তু যীশুর মতো একজন মর্যাদাসম্পন্ন অভ্যাগতের যথোচিত সম্মান ও সংবর্ধনার কোন আয়োজনই করেনি। যীশুর সেদিকে বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি সাইমনের গৃহে গিয়েছিলেন সেবা করতে, সেবা গ্রহণ করতে যাননি। সম্মানলাভের প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। অতিথি গৃহস্বামীর সঙ্গে খট্টায় বসে ভোজন ও কথাবার্তায় সময় কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ নগরবাসিনী জনৈকা অর্থসম্পন্না কলঙ্কিনী নারী সাইমনের গৃহে যীশুর শুভাগমন-সংবাদ শুনে স্পাইকনার্ড (spikenard) নামক বহুমূল্য সুবাসিত তেলের একটি পাত্র হাতে ক'রে সেখানে উপস্থিত হন। স্ত্রীলোকটি গৃহে প্রবেশ করেই যীশুর পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অবিরল অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। তাঁর দরবিগলিত অশ্রুধারায় প্রভু যীশুর পদযুগল সিক্ত হ'ল। স্ত্রীলোকটি তাঁর দীর্ঘকেশ দ্বারা যীশুর পদযুগল মুছে দিলেন এবং সুবাসিত তেল মাখিয়ে পদচুম্বন করতে লাগলেন।

সাইমন এ অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবতে লাগল : এ লোকটি যদি ঈশ্বরের বার্তাবহ হতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই জানতেন স্ত্রীলোকটি কে এবং তার চরিত্র কিরূপ; তিনি কিছুতেই এ পাপীয়সী-প্রদত্ত পাদ্য অর্ঘ্য ও সেবা গ্রহণ করতেন না। এ স্ত্রীলোকটির কলঙ্কিত চরিত্রের কথা কে না জানে?

যীশু স্ত্রীলোকটির দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাইলেন এবং সাইমনকে বললেন : সাইমন, স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য কর। আমি যখন তোমার গৃহে প্রবেশ করেছিলাম তখন তুমি আমায় পা ধোয়ার কোন জল দাওনি, কিন্তু এ স্ত্রীলোকটি তার চোখের জলে আমার পা ধুইয়ে পরে নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছে দিয়েছে। তুমি আমার পদচুম্বন করনি, কিন্তু তোমার গৃহে আসা অবধি এ স্ত্রীলোকটি আমার পদচুম্বন করতে ক্ষান্ত হয়নি। তুমি আমার মাথায় তেল মাখাওনি, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি বহুমূল্য সুবাসিত তেল দিয়ে আমার পা দুখানি লেপন করেছে। এজন্য তোমাকে বলি, এ স্ত্রীলোকটির বহু পাপ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে ক্ষমা করেছি, কারণ সে আমাকে অধিক ভালবেসেছে এবং শ্রদ্ধা করেছে। কিন্তু যে অল্প ভালবাসে ও অল্প শ্রদ্ধা করে, তাকে অল্পই ক্ষমা করা যায়।

একথাগুলি ব'লেই যীশু প্রেম-ও করুণা-বিগলিত কণ্ঠে মেরি ম্যাগ্‌ডালেনকে বললেন : মেরি, তোমার সকল পাপ ক্ষমা করলাম। তোমার বিশ্বাস তোমাকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছে। তোমার কল্যাণ ও শান্তি হোক্‌। ভোজগৃহে যারা বসেছিল তারা সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে মনে মনে বলতে লাগল : এ ব্যক্তি কে, যিনি পাপসকলও ক্ষমা করেন?

এভাবে যীশুর অশেষ কৃপায় ম্যাগ্‌ডালেন যীশুর ধর্মে দীক্ষিতা হন। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হ'য়ে গেল! যীশুর দিব্যস্পর্শে ও সপ্রেম কটাক্ষে মুহূর্তমধ্যে কলঙ্কিনী মেরি ভক্তিমতী সাধ্বী মেরিতে পরিণতা হলেন।

পরবর্তী জীবনে মেরি ম্যাগ্‌ডালেন মহীয়সী খৃষ্টান নারীদের সঙ্গে সম্মিলিতা হয়ে উপযুক্তা শিষ্যার মতো যীশুর ধর্ম প্রচার করেন। যীশুর শেষকৃত্যের সময় তিনি বহুমূল্য বস্ত্র ও প্রসাধন-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। কথিত

আছে, যীশুকে কবর দেওয়ার পর ভক্তিমতী শিষ্যা মেরি একাকিনী কবরের নিকট দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং মাথা নত ক'রে নিম্ন-দিকে চেয়েই দেখতে পান যীশু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন : মেরি, কেঁদো না ; আমি সকলের পিতা ভগবানের নিকট চলে যাচ্ছি— সকলকে একথা বলো। আমি তোমাদের সঙ্গে সর্বদাই আছি। তোমরা স্বর্গস্থ পিতা, ঈশ্বরপুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে আমার শিক্ষা প্রচার কর।

আন্তরিক বিশ্বাস, প্রেম ও ব্যাকুলতার বলেই মেরি যীশুর এরূপ দর্শনলাভ ক'রে কৃতার্থা হয়েছিলেন। যে বস্তু একদা কর্দমে আচ্ছাদিত ছিল, তাই পবিত্রীকৃত হয়ে রাজ-রাজেশ্বর প্রভুর শিরোভূষণে স্থাপিত হবার উপযোগী হয়েছিল। মেরির পূর্বজীবনের সমস্ত কালিমাই অনুতাপের অশ্রুতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছিল। খৃষ্টান জগতে ঘোষিত হল : ভালবাসা যতই গভীর, ঈশ্বরের করুণা ও ক্ষমা ততই অধিক।

চিত্তশুদ্ধি

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র

সুবর্ণে করিতে শুদ্ধ স্বর্ণকারগণ
বার বার অগ্নিতাপে করে সমর্পণ।
ভক্ত তাই ঈশ-পদে এ প্রার্থনা করে,
'অশুদ্ধ বলিয়া মোরে রাখিও না দূরে।
বিশুদ্ধ করিতে মোরে যতো প্রয়োজন
দুঃখের অনলে দেব, করিও দহন।
পরমেশ, পূর্ণ করো এই অভিলাষ—
আমারে করিয়া রাখ তব চিরদাস!'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

স্বামী চেতনানন্দ

মানুষ নানা রকম পদবী ক্রয় করে—কেউ অর্থের বিনিময়ে, কেউ বিদ্যার বিনিময়ে। উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়েই তদনুযায়ী পদবী লাভ করা যায়। চিত্তরঞ্জন দাশকেও 'দেশবন্ধু' পদবী ক্রয় করতে হয়েছিল ত্যাগের বিনিময়ে। তিনি ছিলেন ভারতের মধ্যে এক সেরা বিলাসী। শোনা যায় ফরাসী দেশ থেকে তাঁর জামাকাপড় কেচে আসত। তিনি স্বসুখেচ্ছা ও বিলাস ত্যাগ করে দেশের জন্য বিরাগী হলেন। শাস্ত্র বলেন—'অত্যাগসহনো বন্ধু:' অর্থাৎ যিনি ত্যাগ (মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ) সহ্য করতে পারেন না, তাঁকেই বন্ধু বলে। স্নেহের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা সমগ্র জাতিকে বাঁধতে পেরেছিলেন বলেই তিনি দেশবন্ধু। 'দেশবন্ধু' বললে আর 'চিত্তরঞ্জন' নামের প্রয়োজন হয় না। দেশবন্ধু স্বমহিমায় মহীয়ান। তিনি 'একশ্চন্দ্র:'। তাঁর 'দুই-এ পক্ষ' নাই।

তিনি ছিলেন প্রকৃত নেতা। নেতা হতে গেলে নিজের 'শির' আগে বাড়িয়ে দিতে হয়। এ পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি নিজে কেবল কারাবরণে ক্ষান্ত হননি। তিনি সহধর্মিণী বাসন্তীদেবী এবং ভগিনী ঊর্মিলাদেবীকেও কারাবরণে নিয়োজিত করেন। নিজে আচরণ করে সবাইকে দেখালেন। এই অভাবনীয় ব্যাপারে তদানীন্তন সমাজে খুব হৈ চৈ পড়ে গিছিল।

চিত্তরঞ্জনের জনপ্রিয়তা ছিল তুলনাহীন। পূর্ববঙ্গের লোকগীতিতে তাঁর নামের উল্লেখ আছে। বাংলার বাউলেরা দেশবন্ধুর উপর গান রচনা করে দুয়ারে দুয়ারে গেয়ে বেড়াত। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় দেশবন্ধুর মৃতদেহ যখন দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আসে তখন এত লোকসমাগম ও এমন শোভাযাত্রা হয়েছিল, যা অন্য কারো বেলা আজও পর্যন্ত বাংলাদেশে নাকি হয়নি।

এই মহা মনীষীর চরিত্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বলেন—'যে-সমস্ত শক্তিকেন্দ্র হইতে সমুৎসারিত ভাবধারায় স্বদেশী আন্দোলন পুষ্ট হইয়াছে—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রবর্তিত প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়যুগ তাহার অন্যতম। ফেরঙ্গ সভ্যতার আঘাতে ও মোহে বিপর্যস্ত বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়। এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়, জাতি তাহার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জাতীয় আদর্শকে অতি দ্রুত কেন্দ্রীভূত ও সংহত করিয়া লইল। বিবেকানন্দ সেই আদর্শের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন।'

এক কথায় বলতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বুকে যত আন্দোলন—শিক্ষা-আন্দোলন, ধর্ম-আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, প্রভৃতি মাথা তুলেছে—সে সবের উপর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা

স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। কেহ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, কেহ করেননি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাশ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। সুতরাং ঐ সমাজের আবেষ্টনীতে লালিত হয়েও পরবর্তী জীবনে তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেন। ধর্ম বিষয়ে দেশবন্ধু উদারভাবই পোষণ করতেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন অনুরাগী বন্ধু ছিলেন।

ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন: 'আমি দেখিতেছি ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি. সেই বাংলার প্রাণধর্ম ধীরে ধীরে কোমল লীলাচঞ্চল স্রোতের মত চলিতেছে। আজ ফেরঙ্গযুগেও বাংলা সেই ধর্মের আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাব্দী পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম যে প্রাণ মূর্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সময়েই এই নগরোপ্রান্তে (ঢাকা) সেই অদ্বৈতবংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডেরিয়ার গহনবনে সেই প্রাণধর্মের মূর্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি, পদ্মা-গঙ্গার লীলার স্রোত একই প্রাণের আন্দোলন।'

১৯১৭ সালে বাঙ্গলার রাজনৈতিক সম্মিলনীতে দেশবন্ধু যে অভিভাষণ দেন—তার প্রায় প্রত্যেকটি কথাই নব্যভারতের মন্ত্রগুরু বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি: 'ঐ যে বাঙ্গালী কৃষক, সমস্ত দিন বাঙ্গলার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা-অবসানে ঘর্মাক্ত কলেবরে বাঙ্গলার কুটিরে কুটিরে, বাঙ্গলার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অহঙ্কারী মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অবিশ্বাসি, তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! আততায়ি, তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে কি কেহ না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও।'

স্বামীজী বলেছেন—'ত্যাগ ও সেবা ভারতের জাতীয় আদর্শ'। তদানীন্তন ভারতীয় যুবশক্তি স্বামীজীর ঐ বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কতটা ঐশীশক্তিতে ভরপুর হয়েছিলেন—তা তাদের কর্মে ও কথায় বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। বিবেকানন্দের উপাস্য ছিল সর্বাত্মক ব্রহ্ম—যে ব্রহ্ম সবকিছুতে ওতপ্রোত। তার মধ্যে বিশেষরূপে উপাস্য ছিল—পাপী নারায়ণ, তাপী নারায়ণ, সর্ব জাতির দরিদ্রনারায়ণ। স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে তিনি নরের মধ্যে নারায়ণ দেখতে সচেষ্ট ছিলেন। নরের মধ্যে যাতে নারায়ণের উদ্বোধন হয়—সেই বাণী প্রচারের জন্য তিনি 'নারায়ণ' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অধুনা তা লুপ্ত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৫ সালের ৺বিজয়া দশমীর পরদিন হিমালয়ের অন্তর্গত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে উপস্থিত হন। মায়াবতী আশ্রমের দিনলিপিতে লেখা রয়েছে:

18th October 1915, Monday

Day clear. Snow visible. Mr. C. R. Das with his party reached here at about 2-30 p. m. this day. The

party consisting of Mr. Das, Mrs. Das, two daughters, one son, one clerk, one brother-in-law, one friend and the servants. They were given their accommodation at the Bungalow (Mother Sevier's Bungalow). Gonen moharaj also came with them.

দেশবন্ধু সপরিবারে মায়াবতীতে খুব আনন্দেই ছিলেন। ডায়রীতে অনেক সব টুকরা টুকরা খবর আছে। আশ্রম থেকে সুদূরে অবস্থিত এক পাহাড়ী গ্রাম থেকে তাঁদের দুধের ব্যবস্থা করা হয়। পাহাড়ী চাকরেরা শিকার করে এনে তাঁদের দিত। কারণ এই পাণ্ডববর্জিত জনমানবশূন্য কুমায়ুন পর্বতমালার জঙ্গলের মধ্যে রান্নার জিনিসপত্র মেলান তখনকার দিনে খুবই মুস্কিল ছিল।

১৯১৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর ছিল বৃহস্পতি-বার। তারপর দিন ছিল দেশবন্ধুর জন্মদিন। দেশবন্ধু গরীব পাহাড়ী চাকরদের কম্বল দান করবেন বলে ১০০৲ টাকা দেন। এগুলি ছিল তাঁর জন্মদিনের উপহার।

5th Nov. Friday

This was the birth-day of Mr. C. R. Das. The three volumes of Swamiji's life were presented by the Ashrama with some vases of flower. The gardener got Re 1 from Mr. Das Chinta and Kuma (servants) who carried the presents got 8 as. each, Most of us with the Das party went to Dharamgar at noon and had our tea there.

দেশবন্ধু যখন মায়াবতী আসেন তখন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। দেশবন্ধুর অনুরোধে তিনি 'Buddhism' সম্বন্ধে একদিন তাঁর বাংলোতে আলোচনা করেন (২৭।১০।১৯১৫)।

8th Nov. Monday

Day clear. Snow visible. Mr. Das with the family members was given a parting dinner in the Ashrama. They left Mayavati this day at about 3 p. m. Brahmachari Atmachaitanya went upto the Champavat with them. Udya Singh will go upto Sukindung. Mr. Das gives Rs. 500/- to the Ashrama.

তিন সপ্তাহের অধিক তাঁরা মায়াবতীর এই মনোরম পরিবেশে কাটান। আশ্রমের ডায়রীতে (৭।১১।১৯১৫) আর একটা মজার ঘটনা আছে। মিসেস দাশ বলেন যে, তিনি রাতে যখন শুতে যান তখন একটা বাতি জ্বেলে রাখেন। আর ঐ বাতিটার সারারাত জ্বলবার কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য, রাত ৩টার সময় সেটা আস্তে আস্তে নিভে যায়—অথচ নিভবার কোন কারণ থাকে না। তাঁর ধারণা নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য ব্যক্তি এসে নিভিয়ে দিয়ে যায় এবং ইনি নিশ্চয়ই কাপ্তেন সেভিয়ার[১] হবেন।

যাহোক, মিশনের সঙ্গে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বেলুড় মঠে রাত কাটাতেন। ১৯২৫ সালে তার শরীর গেলে, উদ্বোধন পত্রিকায় (২৭ বর্ষ—৭ম সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৩২) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার একটি

১ কাপ্তেন সেভিয়ার—স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজ শিষ্য। ইনি স্বামীজীর নির্দেশে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম গড়ে তোলেন। মায়াবতীতে তাঁর মৃত্যু হয় ২৮শে অক্টোবর, ১৯০০।

প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর স্মৃতিলিপি থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

'তাৎকালিক জাগ্রত যুবক-শক্তির অধিকাংশই বিবেকানন্দের সেবাধর্মের পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আমরা চিত্তরঞ্জনকেও দেখিয়াছি। এবং এইখানেই সেই সরল উদার আত্মভোলা প্রেমিক পুরুষটির সহিত আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেকালে তাঁহাকে প্রায়ই বেলুড় মঠে আমরা দেখিয়াছি। অনেকদিন তিনি মঠে রাত্রিযাপনও করিতেন। উৎসবের দিন, সর্বসাধারণ দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বসিয়া প্রসাদ ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং ভাবানন্দে গদগদ হইয়া বলিতেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমার জাতির সহিত প্রাণের যোগসূত্র অনুভব করিয়া ধন্য হইলাম।"

এস্থলে এক রাত্রির একটা ঘটনা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির পূর্বদিন অপরাহ্নে আমরা মঠে আসিয়া দেখি, চিত্তরঞ্জন বসিয়া পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী ও প্রজ্ঞানন্দজীর সহিত আলাপ করিতেছেন। রাত্রে তিনি মঠে থাকিবেন। মঠের সংলগ্ন উত্তরদিকের একটি বাড়ীতে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রেম ও স্নেহের মূর্তবিগ্রহ বাবুরাম মহারাজ এই অতিথির যত্ন ও সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মঠে কোন অতিথি আসিলে, তা তিনি যেই হউন—বাবুরাম মহারাজ তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যস্ত হইতেন। তিনি বলিলেন—"অত বড় বিলাতী সাহেব; এই গরমে কেমন করিয়া ঘুমাইবে!" চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে ব্যস্ত হইবার জন্য যতই নিষেধ করুন না কেন, বাবুরাম মহারাজের মায়ের মত স্বাভাবিক হৃদয়ের উৎকণ্ঠা যেন কিছুতেই দূর হয় না। তিনি রাত্রে বাতাস করিতে এবং চিত্তরঞ্জনের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে জনৈক সেবককে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিলেন। চিত্তরঞ্জন শুইয়া আছেন; সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। চিত্তরঞ্জন নিষেধ করিলেও, সে বাবুরাম মহারাজের আদেশের কথা উল্লেখ করিলে, তিনি আর কিছু বলিলেন না। তখন রাত্রি ১২টা। তাঁহার নিদ্রা আসে নাই। তিনি সহসা তাহাকে শয্যাপ্রান্তে বসিতে বলিলেন, সে সঙ্কুচিত হইয়া এক পার্শ্বে বসিল। চিত্তরঞ্জন স্নেহভরে তাহাকে বাড়ীঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ববঙ্গের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আকর্ষণের কথা বলিলেন। প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের এমন সহজ সরল আলাপে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন সময়ে তিনি স্নেহভরে তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া কৌতুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, তুমি কাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাস?"

প্রশ্ন শুনিয়া সে লজ্জায় মাথা নোয়াইল।

চিত্তরঞ্জন আদর করিয়া বলিলেন, "লজ্জা কি, তুমি বল, তারপর আমিও বলিব।"

সে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া জনৈক বন্ধুর নাম করিল।

চিত্তরঞ্জন হাসিয়া উঠিলেন। সে লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। তখন চিত্তরঞ্জন প্রগাঢ় স্নেহে বলিলেন, "আমাকে যদি তুমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, তবে আমি বলিতাম, আমার বাঙ্গলাকে আমি সব চেয়ে বেশী ভালবাসি। এই বাঙ্গলাদেশকে ভালবাস। ইতিহাস পড়—

বাঙলাকে জানবার চেষ্টা কর। যেখানে থাক, আর যাই কর—এই বাঙলাকে ভালবাসিও।"

সব কথা ভাল মনে নাই। কিন্তু সেই আবেগময়ী কণ্ঠস্বর, সেই বঙ্গমাতার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের অপূর্ব বাণীর ঝঙ্কার এখনও কানে লাগিয়া আছে। সেই স্বল্প পরিচয়ের মধ্য দিয়া এক অপূর্ব মহান হৃদয়ের পরিচয়ের সৌভাগ্যে আমরা ধন্য হইয়াছিলাম।'

দেশবন্ধুর 'বাংলা' শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র মাতৃভূমি। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ছিল তাঁর জীবনপণ। কারাগারে অনভ্যস্ত জীবন, দেশবাসীর জন্য দারিদ্র্য-বরণ, নানাবিধ অত্যাচার প্রভৃতি তাঁর শরীরের উপর ক্রমাগত আঘাত হানছিল।

তিনি ছিলেন তদানীন্তন কালে বাংলা সমাজে একজন অভিভাবকের মত। সুভাষচন্দ্র বসুর 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থের প্রারম্ভে দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে সেই মর্মস্পর্শী চিঠিগুলি পড়লে মনে হয়—সে সময়কার তরুণ-সমাজ তাঁর কাছে চাইছিল একটা নির্দেশ যার দ্বারা মাতৃভূমির মুক্তি হয়। বহু প্রতিভাবান ছাত্র 'গোলামখানা' (বিশ্ববিদ্যালয়) ত্যাগ করেন—তাঁরই কথায়।

তাঁর মানবতার একটা কাহিনী: ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ছাপা হয়। কাহিনীটা অপূর্ব। দেশবন্ধু তখন আলিপুর জেলে। একজন দাগী আসামী ও ডাকাত—যাকে পরিবর্তিত করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার—দেশবন্ধুর ভালবাসায় তার সেই দুর্বৃত্ত হৃদয় নরম হয়ে যায়। তাঁর হাজত-জীবন শেষ হওয়া মাত্র তিনি তাকে বাড়ী নিয়ে যান এবং নিজের কাজে লাগান। লোকটি হয়ে ওঠে খুব বিশ্বাসী সে দেশবন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছর দেশের নানা জায়গায় ঘোরে। তার চরিত্রটি ছিল Victor Hugo-র Jean Valjean-এর মত। দেশবন্ধু দার্জিলিং-এ বিশ্রামের জন্য যখন যান, সে তখন কলকাতার বাড়ীতে থাকে। কিন্তু পুরণো স্বভাবের আবার পুনরাবৃত্তি হল। লোকটি দেশবন্ধুর বাড়ীর রূপার বাসনপত্র চুরি করে নিয়ে পালাল। কিন্তু এ কথা ঠিক যে দেশবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তবে ঐ লোকটি নিশ্চয়ই ফিরে আসত এবং ক্ষমা চেয়ে সেই মহান পুরুষের হৃদয়ের কোণে আবার স্থান করে নিত। পুনরাবৃত্তি হত সেই একই ঘটনার—যেমনটি ঘটেছিল Jean Valjean এর জীবনে। দুষ্কৃতকারী পেত ক্ষমা, প্রেমের দ্বারা হত বশীভূত, আর মহান হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তন হত একটা কলুষকালিমায় ভরা জীবনের।

আজকাল বহু দেশনেতা দেখছি আমরা, কিন্তু 'দেশবন্ধু' কোথায়?

পরলোকে ভারতরত্ন ডক্টর সি. ভি. রামন

সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ও 'নোবেল'-পুরস্কার-বিজয়ী ডক্টর সি ভি রামন (চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন) গত ২১শে নভেম্বর, ১৯৭০ সকাল ৭টা ১৫ মিনিটের সময় বাঙ্গালোরে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। গত ৭ই নভেম্বর তাঁহার ৮৩-তম জন্মদিনের আগে তিনি হৃদ্‌রোগে গুরুতর-ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই নভেম্বর তিনি ত্রিচিন-পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন; শিক্ষালাভ করেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে।

সি. ভি. রামনের বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ছিল স্বভাবজাত। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রামন তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 'রামন এফেক্ট'-এর জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ ভ্রমণকালে ভূমধ্য-সাগরের উপর দিয়া যাইবার সময় সমুদ্রের জল এত নীল দেখায় কেন—এই প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগে। ঐ বৎসরই কলিকাতায় ফিরিয়া ইহা লইয়া তিনি গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহাতে সাফল্যলাভ করেন। তিনি দেখিলেন কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থের উপর কোন একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক (যেমন 'মারকারী ল্যাম্পে'র আলো) ফেলিলে উহার মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি যখন চলিয়া যায়, তখন পদার্থের অণুগুলি ঐ আলোকের কিছু অংশ বিচ্ছুরিত করিয়া পাশে ছড়াইয়া দেয়। এই বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালী (spectrum) বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখিলেন, উহার মধ্যে মূল আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছাড়া আরো কতকগুলি নূতন, বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (সাধারণতঃ দীর্ঘতর তরঙ্গ-বিশিষ্ট) আলোকও উহাতে রহিয়াছে। বায়বীয় বা তরল পদার্থের ভিতর দিয়া গমন-কালে উহার মধ্যস্থ ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অণুগুলির সহিত আঘাত লাগার ফলে ঐ আলোকের কিয়দংশের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমিয়া বা বাড়িয়া যায়, যাহার ফলে এরূপ ঘটে। ইহার নাম 'রামন এফেক্ট' এবং এভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণের নাম 'রামন স্পেক্‌ট্রস্কোপি'। বিভিন্ন পদার্থে এই 'এফেক্ট' বিভিন্ন রূপ হয় বলিয়া ইহা দ্বারা পদার্থটির আণবিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এই আবিষ্কার তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাইবার পর তাঁহার নাম সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশু-তোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিভা বহু পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষের আগ্রহেই তিনি প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকরূপে যুক্ত থাকেন (১৯১৭-১৯৩৩)। ইহার পর তাঁহার নানা কীর্তি, সমগ্র বিশ্বে তাঁহার খ্যাতি।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স-এ তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাদামী প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে তিনি বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসর গান্ধীজীর জন্মদিনে তিনি একটি নূতন গবেষণার কথা বিজ্ঞান-জগতে

জানাইতেন। তিনি বলিতেন, 'বিজ্ঞানই আমার ধর্ম এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধর্মকেই আমি অনুসরণ করিয়া চলিব।'

১৯২২ খৃষ্টাব্দে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস. সি. উপাধি প্রাপ্ত হন; লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির 'ফেলো' হন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার অপটিক্যাল সোসাইটির সদস্য হন, ১৯৪২-এ আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন মেডেল লাভ করেন, ১৯৪৭-এ সোভিয়েট অ্যাকাদামীর সদস্য হন এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ফরাসী বিজ্ঞান অ্যাকাদামীরও তিনি সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপকের পদও অলঙ্কৃত করেন।

পরিণত বয়সেই এই আদর্শবাদী জ্ঞানতপস্বীর দেহত্যাগ হইয়াছে; তবু তাঁহার তিরোধানে বিজ্ঞান-জগতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানসাধক চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অতন্দ্র বিজ্ঞান-সাধনা বিজ্ঞানীদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করিবে।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পরলোকে কবিরঞ্জন কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাংলার সর্বজনপরিচিত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া গত ১৪ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। এই দিন কলিকাতার কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে বহু সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁহার মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ বর্ধমান জেলার কোগ্রামে কুমুদরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাসাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. পাশ করিবার পর তিনি কোগ্রাম হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী মাথরুন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হইয়া পরে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন; এখানে তিনি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাদান করিয়াছেন।

জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্তই কুমুদরঞ্জন কবিতাঞ্জলি প্রদানে সরস্বতীদেবীর পূজা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণস্পর্শ করিয়াছে। 'শতদল', 'স্বর্ণসিন্দুর', 'বীথি', 'অজয়' প্রভৃতি প্রায় বিশখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন।

সুদীর্ঘকাল হইতে তাঁহার লেখায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা সমৃদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার সহজ, সরল, অমায়িক ব্যবহার তাঁহার উন্নত হৃদয়ের পরিচয়ই বহন করিত। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

সমালোচনা

শ্রীনিম্বার্কাচার্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালী—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃ-সম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়-দাসজী কাঠিয়াবাবা প্রণীত। কাঠিয়াবাবার আশ্রম, পোঃ সুখচর, জেলা ২৪ পরগনা। তিন ভাগের পৃষ্ঠা ও মূল্য যথাক্রমে ৩৭০, ৩৫৭, ৩৬৯ ও ৮'০০, ৭'৫০, ৭'৫০।

ভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে নিম্বার্ক-দর্শনের জ্ঞানও অপরিহার্য। আচার্য শ্রীনিম্বার্কের নামেই এই দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমভাগে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের জীবনী সুবিস্তৃতভাবে উপন্যস্ত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যকালের কাহিনীগুলি দিব্যভাবে পূর্ণ। তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন, সুকঠোর তপশ্চর্যা, ধর্মপ্রচার সমস্তই জগৎকল্যাণের জন্য সাধিত হইয়াছিল। আচার্য নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের সংস্কৃত ভাষায় যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভঃ'। এই ভাষ্য সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ, সুবোধ্য ও পূর্বাপর-সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'বেদান্ত-কামধেনুঃ' নামকরণ করিয়া দশটি সংস্কৃত শ্লোকে আচার্য কর্তৃক স্বীয় দার্শনিক মতবাদ বিবৃত। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম ভাগে সানুবাদ 'বেদান্তপারিজাতসৌরভঃ' ও 'বেদান্তকামধেনুঃ' উপস্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনী-অংশে নিম্বাকাচার্যের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যে গবেষণা আছে, তাহা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে আচার্য নিম্বার্ক-রচিত গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রহ্ম জীব জগৎ মোক্ষ ও সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে যুক্তিভিত্তিক বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়; ইহাতে আচার্যের জীবন ও বাণীর একটি সামগ্রিক পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে বেদান্তের অন্যান্য মতবাদের আলোচনা সহ নিম্বার্ক-মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা আছে।

শ্রীনিম্বাকার্যের জীবনী ও তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে জানিতে হইলে এই গ্রন্থ বিশেষভাবে কাজে লাগিবে এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকেরই নিকট ইহা আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (প্রথম খণ্ড) ব্রজলীলা—জিজ্ঞাসু। প্রকাশক: শ্রীসতীশচন্দ্র মাইতি, শ্রেয়োজিজ্ঞাসা প্রকাশনী, কুমারপুর, কাঁথি, মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা ৩৯৮+১২; মূল্য পাঁচ টাকা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুঘটনাসমন্বিত লোকোত্তর জীবন অনুধ্যানের সময় সাধকের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে, যেগুলির সুষ্ঠু সমাধান দুঃসাধ্য; আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেই রকমের কতকগুলি দুরূহ প্রশ্নের সহজ-সরলভাবে উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে। 'বর্তমান রুচি-বিকারের দিনে এই শ্রেণীর গ্রন্থ আদৌ পাঠক-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কিনা—সে-সন্দেহ

অন্তরে পোষণ করা সত্ত্বেও আমরা এই প্রসূনটি পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিচ্ছি—এই ভরসায় যে, বিরাটপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হবে।'—প্রকাশকের একথা সমর্থনযোগ্য; গ্রন্থের অনেক স্থলে এবং বিশেষভাবে গ্রন্থশেষে দুই বন্ধুর কথোপকথনের মাধ্যমে তাহার পরিচয় বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে ব্রজলীলা পর্যন্ত তাঁহার মহাজীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা এই গ্রন্থে উপস্থাপিত। 'শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা' নামকরণটি সার্থক, কারণ এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থখানির উপাদান-সংগ্রহ, সম্পাদনা ও রচনা। ব্রজলীলাপাঠের পর শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের পরবর্তী লীলাগুলি অনুধ্যানের জন্য পাঠকগণের যে ঔৎসুক্য জাগিবে, গ্রন্থকার অনতিবিলম্বে তাহা পূর্ণ করিতে তৎপর হইবেন, আশা করি।

শ্রীচৈতন্যলীলাপ্রসঙ্গে—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীতমাল গঙ্গোপাধ্যায় পক্ষে রথীন্দ্র গীতা-প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১নং রথীন ব্যানার্জী লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা ৩১। পৃষ্ঠা ৭৫; মূল্য এক টাকা।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙালীর জীবনে সর্বত্র। বাংলা ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি মহাপ্রভুর প্রেমধর্মকে কেন্দ্র করিয়া অপূর্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে। সুধী গ্রন্থকার দীর্ঘ কাল ধরিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন অনুধ্যান করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছেন তাহা প্রবন্ধের মাধ্যমে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই নিবন্ধগুলিরই গ্রন্থ-রূপ। 'পুরুষসিংহ শ্রীচৈতন্য-দেব', 'নিমাইসন্ন্যাস', 'মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথ পরিক্রমা', 'কঠোর সন্ন্যাস-জীবন', 'শ্রীচৈতন্য-জীবনের অন্তিম অধ্যায়', 'কলিযুগের নবগায়ত্রী', 'মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ' ও 'মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক'—এই সকল পরিচ্ছেদে লেখকের গভীর মনন ও চিন্তাশীলতার পরিচয় রহিয়াছে। ক্ষুদ্র হইলেও শ্রীচৈতন্যলীলা-প্রসঙ্গে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক হিসাবে এই গ্রন্থের সমাদর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। প্রেমধর্মপ্রসঙ্গে তথাকথিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে গ্রন্থখানি সকলেরই পঠনযোগ্য।

মায়ের গান—কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: ডি. মেহ্‌রা, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৬০; মূল্য তিন টাকা।

গান প্রাণের জিনিস। গানের উৎস, আবেদন, অনুভূতি—সবই প্রাণে। সুধী লেখকের মায়ের গানগুলি অন্তর স্পর্শ করে। আলোচ্য পুস্তকে ৬০ খানি গানের সমাবেশ। প্রত্যেকটি গানে কিছু নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে, ভাব ভাষা অতি সহজ সরল, যেন স্বতঃস্ফূর্ত। কয়েকটি গানের আংশিক উদ্ধৃতি:

'দয়াময়ী নাম যে মা তোর
ভুলবি আমায় কেমন করে?
আমি পথ চলি, মা, এই কথাটি
শক্ত করে মনে ধরে।' (৪৭)

'(আমি) জানতে চাই না, বুঝতে চাই না,
চাই শুধু তোর চরণ ছুঁতে,
বিদ্যে চাই না, বুদ্ধি চাই না,
সাধ যায় মা, ঐ কোলে শুতে।' (৫৩)

সুর তাল লয়ে গীত হইলে গানগুলি অন্তর স্পর্শ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কাগজ মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেণ্টলুই বেদান্ত সোসাইটির বার্ষিক (এপ্রিল, ১৯৬৯—মার্চ, ১৯৭০) সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী: কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) সাপ্তাহিক প্রার্থনা ও ধর্মালোচনা সভা: রবিবার সকালে ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে কেন্দ্রাধ্যক্ষের পরিচালনায় নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি রবিবার প্রাতে তিনি ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে এবং প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধ্যানের ক্লাসের পর ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ বিশেষ দিনে বক্তৃতাদির পর ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সর্বসাধারণের জন্য এইসভাগুলিতে সোসাইটির সভ্য ও বন্ধুবর্গ ব্যতীত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তন—যথা লিন্‌ডেনউড কলেজ, সেণ্ট্রাল চার্চ অফ ক্রাইস্ট, মার্কটোয়েন হাই স্কুল, ফার্স্ট প্রেসবিটেরিয়েন চার্চ, ফার্স্ট কনগ্রিগেশন্যাল চার্চ, ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটি, সেণ্ট লুই ইউনিভারসিটি প্রভৃতি হইতে বিদ্বজ্জন ও ছাত্রগণের সমাবেশ হইয়াছিল। ছাত্রেরা সাধারণতঃ শিক্ষকগণের সহিত আসিয়াছিলেন। এই সকল সভায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিন বেলা ১১ হইতে ১২ টা ধ্যান ও নীরব প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গ্রীষ্মাবকাশের সময় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের 'টেপরেকর্ড করা' বক্তৃতা শোনানো হয়।

(২) 'কথামৃত' ক্লাস: প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় The Gospel of Sri Ramakrishna (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত) আলোচিত হইয়াছিল। এই সময় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের নিকট শ্রুত ঘটনাবলী প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত করেন এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেন।

(৩) উৎসব: আলোচ্য বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, আচার্য শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি পূজা উপাসনা ও আলোচনাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। গুডফ্রাইডে ও খ্রীষ্টজন্মদিবস সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীকালীপূজার সময় পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রসাদদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) সন্ন্যাসী পরিদর্শকবৃন্দ: আলোচ্য বর্ষে স্বামী অসক্তানন্দ ও স্বামী সর্বগতানন্দ সেণ্ট লুই বেদান্ত সোসাইটি পরিদর্শন করেন।

(৫) অতিরিক্ত সভা: স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ডি অ্যানড্রিস্ হাই স্কুলে আমন্ত্রিত হইয়া 'হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। কার্কউড চার্চের মেম্বারদের জন্য সোসাইটিতে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়।

(৬) কেন্দ্রাধ্যক্ষের ভ্রমণ: (ক) আলোচ্য বর্ষে জুলাই মাসে চিকাগোয় বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে মিচিগান 'গঙ্গা' নগরে বিবেকানন্দ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আর একবার চিকাগো বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গমন করেন। (খ) নভেম্বর মাসে

তিনি ক্যানসাস শহরে যান এবং ক্যানসাস বেদান্ত সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত সভায় 'মানবজীবনের সুনিশ্চিত ভিত্তি' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। (গ) ডিসেম্বর মাসে তিনি স্যানফ্রান্সিস্কো গিয়াছিলেন। বার্কলে কেন্দ্রে তিনি 'স্বামী প্রেমানন্দ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

(৭) অন্যান্য সংবাদ: আলোচ্য বর্ষে সেণ্ট লুই কেন্দ্রে ১৮০ জন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি ধর্মবিষয়ে বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হন।

আমেরিকার বিভিন্ন স্থান এবং ভারতবর্ষ হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সোসাইটি পরিদর্শনে আগমন করেন।

সোসাইটির সদস্যগণ গ্রন্থাগারের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

ভিত্তিস্থাপন

গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এলাহাবাদ কেন্দ্রে নূতন ডিস্পেন্সারীর ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

স্বামী গিরিশানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে নিবেদন করিতেছি, গত ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭০ সন্ধ্যা ৭টার সময় স্বামী গিরিশানন্দ (প্রকাশ মহারাজ) পরিণত বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। কিছুকাল যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অন্যান্য ব্যাধিতে অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার দেহ বারাণসীর পবিত্র গঙ্গায় সলিল-সমাধি দেওয়া হয়।

স্বামী গিরিশানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হইয়াছিল। কিছুকাল তিনি মাদ্রাজ মঠে এবং অন্যান্য কয়েকটি কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে নিরত থাকেন, তারপর বারাণসী, হৃষীকেশ, উত্তরকাশী ও অন্যান্য স্থানে জীবনের অবশিষ্টকাল তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

তিনি ছিলেন ধ্যানপরায়ণ মধুরস্বভাব ও কঠোরী সন্ন্যাসী। এই তপস্বী সন্ন্যাসী সর্বজনপ্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

পরলোকে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৩ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় স্বামী অচিন্ত্যানন্দ (মনু মহারাজ) নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৮ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বেলুড় মঠেই তাঁহার মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে তিনি মন্ত্র-দীক্ষা ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠ, ঢাকা, দিল্লী (১৯২৮-১৯৩২), লাহোর, কনখল (১৯৩৮-১৯৪১) প্রভৃতি স্থানে কর্মরত থাকার পর পাটনা (১৯৪ -১৯৪৮) এবং দিনাজপুর আশ্রমের (১৯৫২-১৯৫৪) অধ্যক্ষরূপে তিনি সঙ্ঘের সেবা করেন। দিল্লী আশ্রম বর্তমান নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে; দিল্লীতে থাকাকালীন আশ্রমের এই জমি সংগ্রহের কাজে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। জীবনের পরবর্তীকাল প্রধানতঃ তিনি বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করিয়াছেন। অধ্যয়ন ও সংস্কৃতিমূলক কাজে তিনি আজীবন অনুরাগী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

চন্দ্রশকট 'লুনাখোদ-১

রাশিয়া মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে নূতন বিস্ময় সংযোগ করিয়াছিল মানুষহীন মহাকাশযান লুনা-১৬কে চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরভাবে নামাইয়া তাহার সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের নিম্নভাগ হইতে মাটি খুঁড়িয়া সংগ্রহ করিবার পর ঐ মাটি সহ তাহাকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিয়া (সেপ্টেম্বর ১২-২০)। আবার সে নূতন রেকর্ড করিল বেতার-পরিচালিত চন্দ্র-শকট লুনাখোদ-১কে চাঁদের উপর চালাইয়া।

গত ১০ই নভেম্বর রাশিয়ার মনুষ্যহীন মহাকাশযান লুনা-১৭ উৎক্ষিপ্ত হয় এবং চাঁদের কাছে পৌঁছিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৩ মাইল দূরে থাকিয়া ১১৬ মিনিটে একবার করিয়া চাঁদকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে; পরে ১৭ই নভেম্বর সকাল ৯টা ১৭ মিনিটের সময় (ভারতীয় সময়) চন্দ্রপৃষ্ঠে বর্ষণ-সাগরে (sea of rains) ধীরভাবে অবতরণ করে। ঘণ্টা আড়াই পরে লুনা-১৭-এর ভিতর হইতে আটটি চাকা লাগানো শকট লুনাখোদ-১ বাহিরে আসিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠে চলিতে শুরু করে। এই সময় সে তার চারিদিকের ছবি তুলিয়া টেলিভিশনে পৃথিবীতে পাঠায়। লুনা-১৭র ছবিও তুলিয়াছিল। ঐ ছবি দেখিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠের অবস্থা ও সেখানে লুনাখোদের অবস্থান বুঝিয়া পৃথিবী হইতে সুগম পথে শকটিকে পরিচালিত করা হয়। বর্ষণ-সাগরের এই অংশটি প্রায় সমতল হইলেও সেখানে বন্ধুরতাও বেশ আছে; লুনাখোদকে যে সব উচ্চ নীচ স্থানের উপর দিয়া চলিতে হইয়াছে তাহার সর্বোচ্চ ঢাল অবশ্য দশ ডিগ্রীর বেশী নয়।

১৭ই হইতে ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত লুনাখোদ প্রতিদিনই চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছে। এই কালে সে চন্দ্রপৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যন্ত্র স্থাপন করিয়াছে; চাঁদের মাটি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছে, যেখানেই গিয়াছে তাহার চারিপাশের ছবি তুলিয়াছে, আরো বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছে এবং সংগৃহীত তথ্যগুলি পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে। শকটটিতে একটি প্রতিফলক-যন্ত্রও লাগানো আছে,—পৃথিবী হইতে পাঠানো লেসার রশ্মিকে প্রতিফলিত করিয়া ফেরত পাঠাইবার জন্য। শকটটিকে পৃথিবী হইতে বেতার-তরঙ্গ-সাহায্যে পরিচালিত করা হইলেও উহার শক্তির উৎস সূর্য-কিরণ। চাঁদের যে অংশে লুনাখোদ-১ রহিয়াছে, সেখানে ২৩শে নভেম্বর হইতে চাঁদের রাত্রি শুরু হইয়াছে, ১৪ দিন পরে সেখানে সূর্যোদয়। সূর্য-কিরণের অভাবে এ-কয়দিন লুনাখোদকে অচল হইয়া থাকিতে হয়। এ সময় চাঁদের তাপমাত্রাও নামিয়া যাইবে শূন্যের নীচে প্রায় ২৫০ ডিগ্রী ফারেনহিট। তাই এই প্রচণ্ড শীতের রাত্রি কাটাইবার মতো একটি স্থান বাছিয়া লইয়া গত ২২শে নভেম্বর লুনাখোদকে সেখানে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল। সেখানে এক পক্ষকাল বসিয়া থাকিবার পর আবার সে বেতার সঙ্কেত পাঠাইতে, চলিতে ও কাজ করিতে শুরু করিয়াছে। বোচাম মহাকাশ-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক হিঞ্জ কামিনস্কি জানাইয়াছেন, সূর্যালোক পাইবার পরই গত ৮ই ডিসেম্বর হইতে লুনাখোদ-১ পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমেরিকা ও রাশিয়া হইতে পাঠানো মনুষ্যচালিত ও মনুষ্যহীন যানগুলির চন্দ্রপৃষ্ঠে তথ্য সংগ্রহ করিবার পরিধি এতদিন সীমিত ছিল। লুনা-১৭-বাহিত লুনাখোদ-১ সে পরিধি অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। চাঁদের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি চন্দ্রযান না পাঠাইয়া একটিমাত্র চন্দ্রযান পাঠাইয়া তাহা দ্বারা বাহিত যন্ত্রসমন্বিত শকটের সাহায্যে চন্দ্র-পৃষ্ঠের বিস্তৃত অঞ্চল পরীক্ষা করিবার সম্ভাবনার দ্বার ইহাতে উন্মুক্ত হইল। এক্ষেত্রে শক্তির উৎস সূর্যকিরণ হওয়ায় শক্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত; শকটটি মনুষ্যহীন হওয়ায় যতদিন না উহার যন্ত্রপাতি বিকল হয় ততদিন পর্যন্ত উহাকে চাঁদে রাখিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরাইবার পক্ষে তাড়াহুড়া করিবারও কোন প্রশ্ন নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থের জাতীয় পুরস্কারলাভ

উত্তর কলিকাতার ৫৬/৪ গ্রে স্ট্রীট স্থিত হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থকে উপরাষ্ট্রপতি জি. এস্. পাঠক গত ১৭ই নভেম্বর ১৯৭০ অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, শিক্ষাব্রতে একনিষ্ঠতা এবং রচনাশৈলী—কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ এই টোলে ৭০ বৎসর অধ্যাপনা করিতেছেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় ৯৫ বৎসর। ইনি বাল্য-কালে (৮।৯ বৎসর বয়সে) শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন ও তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে লইয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি প্রায় পাঁচ হাজার সংস্কৃত শ্লোক এবং তৎসহ বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ সমন্বিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতম্' রচনা করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার বগড়ী কৃষ্ণনগর খুনীবেড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামচন্দ্র শিরোমণির বংশে তাঁহার জন্ম।

সুশীলাবালা বসুর লোকান্তর

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসিদ্ধ গৃহস্থ ভক্ত পরমধার্মিক বলরাম বসু মহাশয়ের পুত্রবধূ সুশীলাবালা বসু গত ৭ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩৭৭ (২৩শে নভেম্বর, ১৯৭০) সোমবার বেলা ১টা ৫ মিনিটের সময় কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে অবস্থিত বলরাম-মন্দিরে ৮৪ বৎসর বয়সে ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণা ও পরম-ভক্তিমতী। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ছাড়া তাঁহার বিশেষ কোন অসুখ ছিল না। দেহত্যাগের দিন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসত্যাগ হয়। বেলুড় মঠ ও বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয় হইতে সাধুগণ তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া বলরাম মন্দিরে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদী পুষ্প ও মাল্য প্রদান করা হইয়াছিল।

১২৯৩ সনের ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখেই ৮৪ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সুশীলাবালা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০৩ সনের ২৭ শে বৈশাখ ১০ বৎসর বয়সে বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাঁহাকে কোলে বসাইয়া কিছু উপহার দিয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মা মাতৃচরণে চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭২তম বর্ষ

(১৩৭৬-মাঘ হইতে ১৩৭৭-পৌষ)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বার্ষিক মূল্য

প্রতি সংখ্যা ৭০ প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৭৬ হইতে পৌষ—১৩৭৭)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়　　পৃষ্ঠা

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।